ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

শিশু-সাথী

(সচিত্র মাসিক পত্র)

ষোড়শ বর্ষ

(১৩৪৪ সন)

সম্পাদক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা

ষোড়শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৪ { ৩য় সংখ্যা

বর্ষায়

ঝম্ ঝম্ ঝরে জল এসেছে রে বরষা,
শুষ্ক ও উষ্ণ এ ধরা হ'ল সরসা!
সূর্য্যের দেখা নেই, চারিদিক স্তব্ধ,
কানে আসে বজ্রের হুঙ্কার শব্দ!
কালো মেঘ চিরে ঘন বিদ্যুৎ ঝলকে,
ধ্বংস করিবে যেন ধরণীরে পলকে!
সজল হাওয়ায় যত গাছগুলি নড়িছে,
বৃষ্টির কণা সব পাতা বেয়ে পড়িছে।
রাত্রিতে চারিদিক্ ঝিম্ ঝুম—শ্রান্ত,
আঁধার গাঁয়ের বাটে চলে না কো পান্থ।

নিমগাছে জোনাকীরা ছড়ায় কি মাধুরী ;—
পুকুরের পাড়ে শুনি ডাক ছাড়ে দাদুরী।
আঁধারের ফিস্‌ফাস্‌ কানে যেন বাজে রে,
কি জানি কি মাদকতা আছে তার মাঝে রে !
জানি না ঘুমিয়ে পড়ি কখন যে অঘোরে,
ঘুম ভেঙ্গে উঠে শুনি জল ঝরে অঝোরে।
জল ঢালে ছন্দে কি কালো মেঘ-বাহিনী,
আনমনা মনে জাগে কত কথা কাহিনী ॥

শ্রীসত্যগোপাল সরকার

মিটমাট

যেখানে হরিশ মুখুয্যের রোড্‌টা এসে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে মণ্টুদের হল্‌দে রঙের দোতলা বাড়ী। ছন্দা তার দিদি; তার চেয়ে বছর খানেকের বড়। মণ্টু সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটি হ'য়ে গ্যাছে; মণ্টুর ইচ্ছে ছিল গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরবেলাটা অঙ্ক ক'ষে কাজে লাগাবে—কারণ অঙ্কে সে কাঁচা, আর সেজন্যে তাদের স্কুলের অঙ্কের মাষ্টার নীতিনবাবু তাকে বেশ গাদাখানেক 'হোম টাস্ক' দিয়েছেন।

কিন্তু কি দারুণ গরম ! অঙ্ক কষা দূরে থাক, সে দুপুরবেলাটা চুপ ক'রে ঘুমিয়ে শান্তিতে কাটাবে তারও যো নেই। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে পাখা খুলেও নিস্তার নেই। কি ভীষণ ঘাম ! মনে হয়, শরীরের সব রক্ত যেন ঘাম হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ! মাঝে মাঝে সে বড় আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখে শরীরটা চুপ্‌সে যাচ্ছে না তো।

এমন বিশ্রী গরম।···

কি ক'রে এই নিষ্ঠুর গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে ? মণ্টু ভাব্‌তে লাগ্‌ল—হ্যাঁ, একটা কাজ কর্‌লে গরমের হাত থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে বটে।···সেটা সেদিন সে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছিল।—

পাশের বাড়ীর অমূল্যবাবু (ভদ্রলোক একটু মোটা) বেশ নিশ্চিন্তভাবে চৌবাচ্চার ভিতর চীৎপাত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছেন! মণ্টু মনে মনে ভদ্রলোকের বুদ্ধির খুব তারিফ ক'রেছিল। ভদ্রলোক মোটা হ'লেও, তাঁর বুদ্ধিটা যে মোটা নয় এটাও সে বেশ বুঝেছিল। চমৎকার তার বুদ্ধি !!······

মণ্টু ভাব্‌লে—আমাদেরও তো তিনটে চৌবাচ্চা র'য়েছে, আর তাতে জলও থাকে যথেষ্ট। দুপুরবেলাটা দিব্যি মজায় কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি তো অমূল্যবাবুর মতো চুপটি ক'রে ব'সে থাক্‌তে পার্‌ব না।

মণ্টু দৌড়ে গিয়ে তার দিদিকে মনের কথা খুলে বল্‌লে।

ছন্দা বল্‌লে—"না ভাই, তা' ক'রো না ; মা বক্‌বেন।"

"দূর ! মা তো ঘুমুচ্ছেন"—মণ্টু পাশের ঘরের দিকে চেয়ে বল্‌লে।

ছন্দা বল্‌লে—"না ভাই, আমি কিন্তু তোমার সাথে যা'ব না।"

"চল্‌না ভাই, একটু।"—মণ্টু তার দিদিকে অনুরোধ করলে। কিন্তু দিদির কেমন একগুঁয়ে স্বভাব—কিছুতেই সে তাকে রাজী করাতে পার্‌লে না। অগত্যা মণ্টুকে একাই যেতে হ'ল। সে টুপ্‌ ক'রে চৌবাচ্চায় নাম্‌ল। তারপর যখন সে মনের আনন্দে হাত-পা ছুড়ে জল ঘাঁট্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, তক্ষন তার মা সেখানে এলেন। মণ্টু তো মাকে দেখে অবাক্‌ ; কারণ এই মাত্র তিনি যে ঘুমুচ্ছিলেন ! মা এসে তাকে তো যথেষ্ট বক্‌লেনই, তার উপর কান দুটো আচ্ছা ক'রে ম'লে দিলেন।

কানমলা খেয়ে মণ্টু অপমানে, দুঃখে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। অপমানের কথা বই-কি ! সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে···বয়সও তো কম নয়—চৌদ্দ বছর ! তাকে কানম'লে দেওয়া সে দস্তুরমত অপমান ব'লে মনে করে। মণ্টু ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেল্‌ল।

মা তাকে হড়্‌ হড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে, গামছা দিয়ে বেশ ক'রে গা মুছিয়ে দিয়ে বল্‌লেন,—"শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে আয়···অসুখ হবার ভয় নেই পাজী ছেলে···জ্বর হ'লে ভুগ্‌তে হবে ত আমাকেই।" ব'লেই তিনি চ'লে গেলেন।

মা চ'লে যেতে মণ্টু চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে গিয়ে কাপড় ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে তার দিদিকে চিনে নিয়েছে। সে ভাব্‌লে—উঃ দিদি কী বিশ্বাসঘাতক মেয়ে ! একেবারে মা'র কাছে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে টুক্‌ ক'রে লাগানো হ'য়েছে !···দিদির সঙ্গে সাত জন্মেও কথা বলব না। কেন—কিসের জন্য কথা কইব ? দিদির জন্যেই তো

মা'র হাতের মার খেতে হ'ল!—দিদির সঙ্গে কথা বল্‌ব না—বল্‌ব না—কিচ্ছুতেই বল্‌ব না; তিন সত্য ক'রে এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম। যদি দিদি তার পার্কার পেন্‌টি (যেটা তার বাবা দিদির জন্মদিনে উপহার দিয়েছেন) দিয়ে দেয়?...মণ্টু একটু ইতস্ততঃ কর্‌লে, কারণ পেনটার উপর তার যথেষ্ট লোভ ছিল।

মা বল্‌লেন—"যা শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে আয়..."

না তা' হ'লেও না। প্রতিশোধ তাকে যে ক'রে হোক নিতেই হবে। কিন্তু কি ক'রে নেওয়া যেতে পারে সে তা' ভাব্‌তে পারে না। সে ভাব্‌লে—দিদির শেলাইয়ের বাক্সটা লুকিয়ে রাখ্‌লে কেমন হয়? তা' হ'লে তো শেলাই কর্‌তে পার্‌বে না—সারা বাড়ী সেটা খুঁজ্‌বে—খুঁজে আর বের করতে হবে না—এমন জায়গায় সেটা রাখ্‌ব। তখন বেশ মজা হবে। কিন্তু তাতেও কি বিশেষ সুবিধে হবে? যে আহ্লাদী মেয়ে...আর বাবা তাকে যা ভালবাসেন—গিয়ে আব্‌দার ক'রে চাইলেই আর একটা কিনে দিবেন। আর আমিই বা শেলাইয়ের বাক্স নিয়ে কর্‌ব কি?...মাঝখান থেকে ওরই ছুটো শেলাইয়ের বাক্স হ'য়ে যাবে!!

—নাঃ ও প্ল্যান্‌টা ঠিক খাট্‌ল না দেখ্‌ছি! তার চেয়ে সকালবেলায় দিদির স্কুলের বাস্ যখন তাকে নিতে আস্‌বে তখন দারোয়ানকে চুপি চুপি বল্‌ব—'এ্যাই

দিদিমণি নেহি যায়েগা—উস্কো বুখার হুয়া হ্যায়।' বল্‌লেই ব্যাটা বাস্ নিয়ে ফিরে যাবে। দিদি তখন দিব্যি সেজেগুজে বাসের জন্য ব'সে থাক্‌বে। তারপর যখন শুন্‌বে, বাস তাকে না নিয়েই চ'লে গ্যাছে, তখন মুখখানার অবস্থা যা হবে!

মন্টুর মনটা খুশীতে ভ'রে গেল। কিন্তু শেষে ভাব্‌লে—কি আশ্চর্য্য! কি যে যা-তা ভাব্‌ছি! দিদিদের স্কুলের যে গ্রীষ্মের ছুটি হ'য়ে গ্যাছে।

কিছুদিন কেটে গেল। মন্টু দিদিকে জব্দ করার মৎলব ভাঁজ্‌ছে। কিন্তু কোনটাই তার মনের মত হচ্ছে না। তার প্রতিজ্ঞার কথাও সে ভোলে নি। সে মোটেই ছন্দার সঙ্গে কথা বলে না, যদিও ছন্দা তার সঙ্গে কথা বল্‌তে এসেছিল একদিন।

সেদিনকার ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এই :—রোজ সকালবেলা উঠে' মন্টু যেমন পড়্‌তে

যাবার সময় দিদি বল্‌লে—"হ্যাঃ ভারী রাগ হ'য়েছে!..."

বসে, সেদিনও তেমনি ব'সেছে; এমন সময়ে ছন্দা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। হাতে একটা উলের নমুনা। সে মন্টুর কাছে গিয়ে তার টেবিলের এটা ওটা নাড়্‌লে; জানালার সাম্‌নে গিয়ে রঙিন প্রজাপতিটাকে ধর্‌বার উপক্রম কর্‌তে সেটা বাইরের ফুল-বাগানে উড়ে'

গেল। তারপর খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ কর্‌বার পর সে ভয়ে ভয়ে 'কিন্তু কিন্তু' ক'রে মন্টুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"ভাই মন্টু! এই উলটার সঙ্গে মিলিয়ে আমায় চার পেটী উল এনে দিবি ?"

মন্টু যেন কিচ্ছুই শুন্‌তে পায় নি, এমন ভাব দেখিয়ে জোর গলায় বারংবার পড়্‌তে লাগ্‌ল—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ পতন্তি নরকে ঘোরে…"

ছন্দা আবার তাকে ঐ কথা বল্‌লে। কিন্তু মন্টু যে শুন্‌তে পেল এবারেও তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ছন্দা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। অপমানে তার চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। সে রাগে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল; যাবার সময় বল্‌লে—"ছ্যাঃ ভারী রাগ হ'য়েছে দেখ্‌ছি! এত রাগ কিসের ? নিজে দোষ ক'রে মার খেয়ে আমার উপর রাগ কর্‌তে লজ্জা করে না ? তোর সঙ্গে কথা না বল্‌তে পেরে আমি ম'রে যাচ্ছি আর কী!"

মন্টুদের পাশের বাড়ীতে লীলারা থাকে।

লীলা হচ্ছে সেই চৌবাচ্চায় ডোবা মোটা অমূল্যবাবুর বোন। তা'রাও বেশ বড়লোক। লীলা ছন্দার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে; দু'জনে খুব ভাব। একদিন ছন্দা প্রায় লাফাতে লাফাতে লীলাদের বাড়ী থেকে এল। হাতে নীল বাক্সে একটা ব্রোচ। সেটা হীরের এবং দেখ্‌তেও খুব সুন্দর। ব্রোচটা নিয়ে ছন্দা একেবারে তার মা'র ঘরে ঢুক্‌ল। তাঁর কাছে গিয়ে বাক্সটা খুলে দেখাতেই মা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন —"ব্রোচটা কার রে ছন্দা ? বেশ জিনিষটা তো…।"

ছন্দা বল্‌লে—"ব্রোচটা লীলার…ওর বাবা ওকে কিনে দিয়েছেন।"

মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কত দাম নিয়েছে জানিস্ ?"

"তা' আমি জানি না মা"—ব'লে ছন্দা তার মা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে আব্‌দার ক'রে বল্‌লে—"আমায় এ রকম একটা ব্রোচ কিনে দিতে হবে, মা।"

মা বল্‌লেন—"আচ্ছা, আচ্ছা—"

তারপর মা নীচে কি একটা কাজে নেমে গেলেন। ছন্দা সোফায় ব'সে ব্রোচটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একমনে দেখ্‌ছে, এমন সময় নীচে থেকে উড়িয়া চাকর দামু ডেকে বল্‌লে—"দিদিমণি, ম্যাষ্টর দিদি (ছন্দার বাড়ীর শিক্ষয়িত্রী) ডাকুচি।"

শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া এসেছেন শুনে ছন্দা তাড়াতাড়ি ব্রোচটা সোফাতেই ফেলে রেখে, নীচে পড়্‌তে চ'লে গেল।

মণ্টু পাশের ঘরে ছিল; ব্যাপারটা সব সে লক্ষ্য ক'রেছে এবং আড়ালে দাঁড়িয়ে কান খাড়া ক'রে ছন্দার আব্‌দার-মাখা কথাগুলোও সে হজম ক'রেছে। ছন্দার কথাগুলো তার গায়ে যেন হুল ফুটাচ্ছিল। মায়ের উপর তার অভিমানের অন্ত রইল না। সে মনে মনে ভাব্‌লে—মা'র কি পক্ষপাতিত্ব! আমার বেলায় হাত দিয়ে একটা সুঁচও গলে না! আর দিদিকে এক মুঠো টাকা দিয়ে ব্রোচটা কিনে দিতে কিছু বাধ্‌বে না! এই তো সে'বার একটা টেনিস্ র‍্যাকেট কিন্‌তে চেয়েছিলুম; মা বল্‌লেন—'যা, যা—ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলগে যা···অতটুকু ছেলে আর টেনিস্ খেলে না!' কথাটা মনে হ'তেই মণ্টু অভিমানে মনে মনে বল্‌লে,—অতটুকু ছেলে টেনিস্ খেলে না।···চল না ময়দানে; দেখ্‌বে ফোর্থ ক্লাস ফিফ্‌থ্ ক্লাসের ছেলেরা পর্য্যন্ত টেনিস্ খেল্‌ছে,··· আর আমি হলুম ছোট ছেলে? বয়স হ'ল···

এম্‌নি কত কি সে ভাব্‌লে।

ছন্দাকে মণ্টু যেই বারান্দা দিয়ে নীচে যেতে দেখ্‌লে—সে একেবারে সোজা পাশের ঘরে চ'লে গেল। তারপর আর কী? গিয়ে দেখে ব্রোচটা সোফার উপর প'ড়ে র'য়েছে। মণ্টু কি এ সুযোগ ছাড়্‌তে পারে!—এ যে একেবারে সুবর্ণ সুযোগ! সে ব্রোচটা টুক্ ক'রে তুল্‌লে; তারপর নিঃশব্দে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

হাঁফ ছেড়ে একটা চেয়ারে ব'সে সে ভাব্‌লে—যাক্ এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এইবার দিদিকে যথেষ্টই জব্দ কর্‌তে পার্‌ব···কিন্তু এটাকে রাখা যায় কোথায়? ডেস্কের ভিতর রাখ্‌লে দিদি ঠিক হাতড়ে বের কর্‌বে। তার চেয়ে এটাকে মশারীর চালেই রাখা যাক্, সেখানে আর কেউ খুঁজ্‌তে যাবে না।—এই ভেবে মণ্টু ব্রোচটাকে মশারীর চালে রেখে দিল।

তারপর সে পড়্‌তে বস্‌ল।

ঘণ্টাখানেক পরে মণ্টু শুন্‌তে পেলে, ছন্দা মাকে জিজ্ঞেস কর্‌ছে—"মা, তুমি ব্রোচটা দেখেছ?"

মা বোধহয় ঠাকুরকে কি একটা রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বল্‌লেন—"দেখেছি বই কি! তুই যে আমায় তখন দেখালি!"

"সেটা কোথায় গেল বল্‌তে পার? সেটা কি তুমি তুলে রেখেছ?"—ছন্দা ধীরভাবে মাকে বল্‌লে।

মা বল্‌লেন—"কই রাখি নি তো।"

"কিন্তু সেটা যে এখন আমি পাচ্ছিনে! সোফার উপরেই তো রেখেছিলুম।"—ছন্দা কাঁদ-কাঁদ ভাবে বল্‌লে।

মা তখন ছন্দাকে খুব বক্‌ছেন শোনা গেল; বল্‌ছেন—"অত বড় ধাড়ী মেয়ে,... পরের জিনিষ কোথায় রাখ ঠিক নেই—যেখান থেকে পার খুঁজে বের ক'রে দাওগে যাও।...আমি ওসব কিচ্ছু জানি নে।"

ছন্দা ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে। একে ব্রোচটা খুঁজে পাচ্ছে না, তার উপর মা বক্‌লেন। তার চোখের জল দেখে মা নরম হ'য়ে বল্‌লেন,—"যাও ভাল ক'রে খুঁজে দেখগে'।...কোথায় আর যাবে বাড়ী থেকে?"

মণ্টু তখন মনে মনে খুব হাস্‌ছে আর ভাব্‌ছে—কেমন জব্দ! মা'র বকুনি এখন কেমন মিষ্টি লাগ্‌ছে! কিন্তু মণ্টুকে তখনই তার হাসি থামিয়ে ফেল্‌তে হ'ল, কারণ সে তার দিদির পায়ের শব্দ শুনতে পেলে।

ছন্দা মণ্টুর ঘরে ঢুক্‌ল। মণ্টু তখন একমনে পড়্‌ছে। ছন্দা এসে ড্রয়ার, টেবিল, আলমারী বেশ ক'রে খুঁজে দেখ্‌লে; তারপর মণ্টুর দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে রইল। মণ্টুর মাথা তখন বইয়ের ওপর ঝুঁকে প'ড়েছে খুব গভীর মনোযোগে। ছন্দা বালিশের তলা, তোষক, গদি সব উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌তে আরম্ভ করলে। ভয়ে মণ্টুর বুক্‌টা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগ্‌ল, ভাব্‌লে—এই সেরেছে, মশারীর চালে বুঝি বা হাত বাড়ায়।

মণ্টুর সৌভাগ্য বলতে হবে, ছন্দা মশারীর চাল দেখ্‌লে না; তার বদলে সরাসরি মণ্টুর পাশে এসে দাঁড়ালে।

"মণ্টু, তুই ব্রোচটা দেখেছিস ভাই?"—ছন্দা জিজ্ঞেস করলে।

মণ্টু তখন খুব পড়্‌ছে—"লেট্ এ-বি-সি বি-এ রাইট-এ্যাঙ্গল্‌ড ট্রায়েঙ্গল...।"

ছন্দা তখন আরও কাতরভাবে বল্‌লে—"ব্রোচটা দেখেছিস্ ভাই?"

মণ্টু তখন থতমত খেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"ব্রোচ! কিসের ব্রোচ? আমি তো ব্রোচের বিষয়ে কিচ্ছু জানি নে।" বল্‌তে বল্‌তে সে বাইরে যাচ্ছিল।

ছন্দা তখন মণ্টুর হাত ধ'রে মেজের উপর ব'সে প'ড়ে মিষ্টিসুরে বল্‌লে—"আচ্ছা ভাই, ওসব কথা এখন রেখে দাও, আমি তোমার বিষয়ে আজ থেকে কারু কাছে আর লাগাবো না। আমার সেই পার্কার পেনটা তোকে দেব'খন। ব্রোচটা ফিরিয়ে দে ভাই।" ছন্দার ছুই চোখ তখন জলে ভ'রে উঠেছে।

এদিকে মণ্টু দিদির কাতর ভাব আর চোখে জল দেখে যথেষ্ট চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।
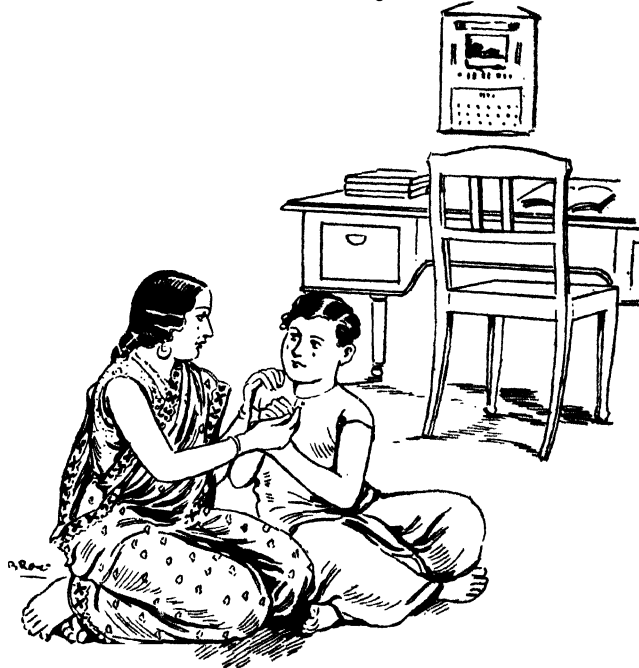
মণ্টুর হাত ধ'রে মেজের উপর ব'সে…

সে ভাব্‌লে—দিদি তো যথেষ্ট জব্দ হ'য়েছে! তা' ছাড়া অমন পার্কার পেনটাও পাওয়া যাচ্ছে…মন্দ কি!

সে ব্রোচটা দিদিকে ফিরিয়ে দিল। ব্রোচটা পেয়ে ছন্দার আহ্লাদের আর সীমা রইল না। সে পরম আগ্রহে ছোট ভাইটিকে জড়িয়ে ধর্‌ল। আনন্দে মণ্টুর চোখেও জল এল—ছুই ভাই-বোন আপন আপন চোখের জলের বিনিময়ে বিবাদ মিটিয়ে নিলে।

শ্রীনীরজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট খোকা হাসে

ছোট্ট খোকা হাসে—
তার হাসিতে পূর্ণিমাতে
আকাশ পুরের আঙ্গিনাতে
চাঁদটি যেন জ্যোৎস্না ল'য়ে ভাসে।
ঐ আমাদের ছোট্ট খোকা হাসে॥

ঐ যে খোকার মা—
ঘুমিয়ে আছেন অঘোর ঘুমে
আঁচল যে তার লুটায় ভূমে,
কোলের কাছে হাস্‌ছে ব'সে ডাকৃছে খোকা 'মা'।
ঐ আমাদের ছোট্ট খোকার মা॥

ঐ খোকাদের ঘর—
দাঁড়িয়ে হাসে শ্যামল ঘাসে
ফুলের বাগান—তাহার পাশে
একটি নদী যাচ্ছে দেখা তাদের ঘরের পর।
ঐ দেখ ভাই—ঐ খোকাদের ঘর॥

ভরা দুপুর বেলা—
খেল্‌ছে খোকা আপন মনে
মা'র আঁচলের চাবির সনে
বাজ্‌ছে চাবি ঠুং ঠুং ঠুং—তাই ত খোকার খেলা—
বাড়ছে দেখ ভরা দুপুর বেলা॥

শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকুমার

[৩]

এখানে আসার চার-পাঁচ মাস পরের কথা।

আজ ক'দিন থেকেই দেখ্‌ছিলাম—মা, মাসী-মা ও মেসোমশাই এক ঘরে ব'সে কি বিষয় নিয়ে যেন প্রায় সব সময়ই কথাবার্ত্তা বলেন। একদিন অত্যন্ত কৌতুহল হ'ল। সেদিনটা রবিবার থাকায় স্কুলও বন্ধ ছিল।

মাসী-মা প্রভৃতি যে ঘরে কথাবার্ত্তা কইছিলেন, পা টিপে টিপে সেই ঘরের বন্ধ দরজার পাশটিতে গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ালাম। ভাসা ভাসা কয়েকটা কথা আমার কানে এল।

'তোমার ছেলে ত আমরা কেড়ে নিচ্ছি না ভাই······আর তুমিও কোথাও যাচ্ছ না! তোমাদের দু'জনার ত সব সময়ই দেখা-শুনা হবে। তবে আর এত অমত কেন তোমার?' বুঝলাম এ মেসোমশায়ের গলা।

'তা হোক, কিন্তু আমি যাগযজ্ঞ ক'রে আমার ঐ একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই পর ক'রে দিতে পারব না। ও ত তোমাদেরই থাক্‌বে; যেদিন ওকে নিয়ে এখানে এসেছি, সেদিন থেকেই ত ও তোমাদের ঘরের হ'য়ে গেছে!' শেষের দিকে মা'র গলার স্বর যেন কেমন জড়িয়ে এল, ভাল ক'রে শোনা গেল না।

এমন সময় কা'রা যেন সব সেই দিকেই আস্‌ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা খুব ভাল ক'রে না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম যে—তাঁ'রা সব আমার সম্বন্ধেই কথা বল্‌ছিলেন।

'যাগযজ্ঞ', 'পর ক'রে দেওয়া'—ছোট ছোট কয়টা কথা সারাদিন ধ'রে আমার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌ল। মনটা একটু কেমন কেমন করতে লাগ্‌ল। সব ভাল ক'রে জান্‌বার জন্য ভিতরে ভিতরে বেশ ব্যস্তও হ'য়ে উঠ্‌লাম। কিন্তু উপায় নেই—কা'কেই বা জিজ্ঞেস করি?

... ...

রাত্রে হঠাৎ এক সময় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার ঘর, কে যেন আমার খুব কাছেই ফুলে ফুলে কাঁদছে মনে হ'ল। প্রথমটা ত ভাল বুঝতেই পার্‌লাম না। শেষে আঁধারটা বেশ চোখে একটু একটু স'য়ে গেল, দেখ্‌লাম বিছানার এক পাশে আমার মা-ই শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছেন!

এই এত রাত্রে কেন যে মা অমন ক'রে কাঁদ্‌ছেন, কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না। ধীরে ধীরে মা'র কাছে স'রে গিয়ে বস্‌লাম, ডাক্‌লাম,—'মা! মাগো!—' কিন্তু মা আমার ডাকে কোন সাড়া-শব্দ দিলেন না, আগের মতই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মা'র মাথায় হাত রেখে আবার ডাক্‌লাম,—'মা!'

মা ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠে' বস্‌লেন। হঠাৎ দুই হাতে আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে কান্নাভরা সুরে ডাক্‌লেন,—'নিমাই!' এখানে আসার পর অনেক দিন মা'র এমন আদর পাই নি, তাই একান্ত লোভীর মতই মা'র বুকের তলে আর একটু ঘন হ'য়ে তাঁ'কে দু' হাতে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লাম,—'কেন মা?—'

—'নিমু চল বাবা, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই—আমাদের সেই কুঁড়েঘরে; এ রাজ-প্রাসাদে আমাদের দরকার নেই!—'

মা'র কথা শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্‌লাম,—'কেন মা' চ'লে যাবে কেন?'

আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে···

—'হাঁরে তোর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না? সেই ছোট্ট ঘর আমাদের; সেই খাল, বিল, নদী, মাঠ—সে সব তুই কেমন ক'রে ভুল্‌লি বাবা? সে সব যে তোর নিজের!···'

—'সে সত্যি, কিন্তু এখান-কার সবও ত খারাপ নয় মা। আর এখানকার বাড়ী কত বড়, এখানে কত লোকজন, কত ভাল ভাল সব খেলার জিনিস! মেসোমশাই মাসী-মাও আমাদের কত ভালবাসেন, তবে কেন তুমি এসব ছেড়ে চ'লে যেতে চাইছ মা? তা ছাড়া, আমরা চ'লে গেলে মেসোমশাই আর মাসী-মা হয়ত মনে কষ্ট পাবেন—'

আমার কথা শুনে মা চুপ ক'রে রইলেন, একটি কথাও বল্‌লেন না। আমি মা'র হাত ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'কী ভাব্‌ছ মা?'

—'কিছুই না, তুই ঘুমো!—'

ঘরের কোণ থেকে প্রদীপটা তুলে নিয়ে জ্বেলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় প্রদীপের আলোয় তাঁ'র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—মা'র মুখ যেন একবারে শাদা হ'য়ে গেছে, সেখানে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হ'ল না।

ভাল ক'রে ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্‌লাম। ঘর থেকে বের হ'য়ে সোজা

নদীর ধারে চ'লে গেলাম। ভোরের আলো তখন সবে ফুটি ফুটি করছে, রাজবাড়ীর নহবৎখানায় সানাইয়ের বুকে রামকেলী বাজ্‌ছে।

কেন যে মা অমন-ভাবে আমাকে এখান থেকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, সেই কথাটা বার বার আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখানকার এই খেলনা, এত বড় বাড়ী, এত ভাল ভাল পোষাক, এত ভাল ভাল খাওয়া—এসব ছেড়ে আবার সেই আমাদের ছোট খড়ের ছাওয়া ঘরখানিতে ফিরে যা'ব—সেকথা ভাবতেই যেন আমার মন কেমন কেমন করতে লাগল। মা'র উপর একটু রাগও হ'ল। শুধু শুধু কষ্ট পেয়ে কী লাভ ?

সেখানকার সেই মানুকে গোবরা! কী অসভ্য নোংরা তা'রা? দিনরাত ধূলো কাদা বালিতে খেলে বেড়ায়। সেখানে কি ক'রে যে অত দিন তা'দের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে বেড়াতাম সে কথা ভাবতেও আমার আজ ভারি হাসি পেতে লাগল।

সেই মোটা চালের ভাত আর শুধু ডাল, আর এখানে কত লুচী তরকারি! রোজ রোজ বড় বড় মাছের মুড়ো!

আজ দুপুরে মাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে—যাতে ওইচ্ছা তিনি ভুলে যান।

বেশ একটু বেলা ক'রেই বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ীতে ঢুকতেই একজন চাকর উদ্বিগ্ন হ'য়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—'কোথায় গেছিলেন দাদাবাবু, বাড়ীর সব যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন!'

আমি তা'র কথার কোন জবাব না দিয়ে—বরাবর উপরে নিজের পড়ার ঘরের দিকে চ'লে গেলাম।

[৪]

আমার পড়ার ঘর।

মেসোমশাইর লাইব্রেরী-ঘরের পাশের ঘরটাই আমার পড়ার ঘর হ'য়েছিল। মেজেতে পুরু কার্পেট পাতা, মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের গোলটেবিল, তা'র দু'পাশে দু'খানা চেয়ার—একটা আমার জন্য, অন্যটা মাষ্টার মশাইয়ের জন্য। এক কোণায় পরপর দুটো আলমারী, একটা ভর্ত্তি পাঠ্য অপাঠ্য নানা রকম বই। তা'দের গায়ে সব সোনার জলে আমারই নাম লেখা। আর একটায় আমার খেলার সমস্ত জিনিস—থরে থরে সাজান। এই সব ফেলে আমি কোথায় যা'ব ?···যেদিকে চাই সবই আমার জিনিস!

আরও দিন পনের পরের কথা।

একদিন ভোরবেলা বিছানা হ'তে উঠে মনে হ'ল বাড়ীতে যেন খুব একটা বড় রকম আয়োজন লেগে গেছে।

বাড়ীর ভিতরের উঠানে চাঁদোয়া খাটিয়ে, কত সব পূজোর দ্রব্য সাজান হ'য়েছে। দরজার গোড়ায় কলাগাছ পোতা হ'য়েছে, মাটির কলসীর উপরে ডাব বসিয়ে সিন্দূর মাখিয়ে দিয়েছে।

সানাইয়ের মধুর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে।

সবাই ব্যস্ত-সমস্ত; চাকর-বাকর, সরকার-গোমস্তারা সব যাওয়া-আসা কর্‌ছে। সিঁড়ির বাঁকে মাসী-মার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

একটা লাল টুক্‌টুকে চওড়া পেড়ে গরদের সাড়ী তিনি প'রেছেন; বোধ হয় একটু আগে স্নান ক'রেছেন, ভিজে চুলের গোছা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বুকের উপর এসে প'ড়েছে, তাঁকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেন,—'কি বাবা ঘুম ভাঙ্গল ?'···

আমি মাথা হেলিয়ে জবাব দিলাম, 'হুঁ !'

নীচে এসে একজন দাসীকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'আজ এবাড়ীতে কি গা ?···'

সে হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে,—'ওমা তাও জান না ! আজ যে রাজাবাবু তোমায় দত্তক নেবেন গো !—'

—'দত্তক নেবেন ! তা'র মানে কী ?—'

—'তা'র মানে আজ হ'তে তুমি রাজাবাবুরই ছেলে হবে।'

—'রাজাবাবুর ছেলে হ'ব মানে ?—'

এমন সময় দূরে মাকে আস্‌তে দেখে সে বল্‌লে,—'ঐ যে তোমার মা আস্‌ছেন ওঁকে শুধোও ব'লেই দাসী কাজে চ'লে গেল।

মা কাছে এগিয়ে এলেন।

মা'র মুখ যেন খুব শুক্‌নো ও গম্ভীর মনে হ'ল। চোখের পাতা দুটো ভারী! আমি মা'র মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম,—'এরা সব কী বল্‌ছে মা ?'

মা অন্য দিকে চেয়ে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—'ঠিকই ব'লেছে! তোমার মেসোমশাই ও মাসী-মার কোন ছেলেপিলে নেই কিনা! তাই তোমাকে ওরা আজ হ'তে ছেলে ব'লে গ্রহণ কর্‌ছেন। আজ হ'তে ওরাই হবে তোমার মা ও··'

বাকীটা আর মা'র গলা দিয়ে বের হ'ল না; তিনি ধীরপদে সেখান হ'তে চ'লে গেলেন।

আর আমি অবাক্ হ'য়ে মা'র যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় বাইরে সহসা একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাক ঢুম্ ঢুম্ ক'রে বেজে উঠ্‌ল।

* * *

এ যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মস্ত একটা স্বপ্ন দেখা। কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে কী হ'য়ে গেল। আজও সে সব আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। সমস্ত দিন ধ'রে আমাকে নিয়ে পূজো মন্ত্র পড়া চল্‌ল।

নের মধ্যে যেন কেমন বিশ্রী লাগ্‌ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল মা'র কাছে ছুটে যাই।···কিন্তু

আশেপাশে কোথায়ও মাকে দেখ্‌তে পেলাম না। বৃথাই আমার দৃষ্টি তাঁকে খুঁজে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌ল। চেনা-অচেনা অনেকেই আছে, শুধু আমার মা-ই নেই! সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে শুতে যা'ব এমন সময় দাসী এসে বল্‌লে,—'রাজকুমার, আপনি আজ হ'তে অন্য ঘরে শোবেন।...'

'রাজকুমার!' কথাটা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। ভাব্‌লাম, এরা ত এতদিন আমায় 'দাদাবাবু' ব'লেই ডাক্‌ত, তবে আজ হঠাৎ কেন আবার 'রাজকুমার' ব'লে ডাক্‌ছে?...

দাসীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম,—'আমাকে রাজকুমার বল্‌ছ কেন?'

সে হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে,—'আজ হ'তে যে আপনি এ বাড়ীর রাজকুমার হ'লেন!—'

দোতালার একটা ঘরে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

প্রকাণ্ড খাটের উপর, গদী-মোড়া বিছানা। ঝালর-দেওয়া সুন্দর বালিশ। শাদা ধব্‌ধবে নেটের মশারী, হাওয়ায় দুলে দুলে উঠ্‌ছে। মাথার উপর প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন, সমস্ত ঘরে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সমস্ত ঘরময় সুন্দর ধূপের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দাসী আমায় ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে আমি একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। আর মাথার উপর ঝাড়ের আলো ঠিক্‌রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এত বড় একটা ঘরে আমি একা, কেউ কোথাও নেই। কেমন যেন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল।

ভীরু দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা ক'রে বিছানার উপর গিয়ে উঠে বস্‌লাম। তুলোর মত নরম মোলায়েম বিছানা আমার চাপে ব'সে গেল।

সহসা কেন যেন আমার ভয়ানক কান্না পেতে লাগ্‌ল। বিছানার উপর উবু হ'য়ে লুটিয়ে পড়্‌লাম! হু হু ক'রে চোখে জল এল। ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোধ হয় এক সময় ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল রাত তখন অনেক। একটু পরেই রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজ্‌ল।

বিছানা হ'তে নেমে, এক পা এক পা ক'রে দরজা খুলে বাইরের দালানে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় বাইরে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে আমাদের আগেকার শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

দরজাটা ঠেল্‌লাম, কিন্তু খুল্‌ল না, ভিতর থেকে বন্ধ! শুধু আঁধার রাত্রির বুকে কার যেন চাপা কান্নার শব্দ কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্‌লাম,—'মা!...ওমা!' কিন্তু তবু দরজা খুল্‌ল না।

কোথায় দূরে একটা রাতজাগা পাখী ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে' গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীহার গুপ্ত

দর্পচূর্ণ

সত্যি ব্যাপার ! মজা ভারী—
শুন্‌তে চাও তো বল্‌তে পারি।
কেষ্ট দাদা বিষম ছেলে,
তিনটি বছর ছিলেন জেলে ;
নাই ক' মনে ভাব্‌না ভয়—
কর্ত্তে পারেন দিগ্বিজয় !
কাঠখোট্টা মর্দ্দ ঢং,
মস্ত জোয়ান—জবড়্ জং ;
এ্যাব্বড় তাঁর গোঁফ্ জোড়াটি
পেলেই কাছে মারেন চাঁটি।
সেদিন ছাদে সন্ধ্যাবেলা
মাত্বর পেতে কচ্ছি খেলা,
এমন সময় দিদির সাথ্
কেষ্ট দাদা অকস্মাৎ—
ভূত মানে না তর্ক ঘোর,
বাপ্‌রে সে কি গলার জোর !
দিদিও সে জাঁহাবাজ ;
বল্লে—"যদি একটি কাজ
কর্ত্তে পারো মহাশয়,
মান্‌বো তোমার নেইক' ভয়।
দখিন পাড়ার কাছ ঘেঁসে
পড়ো বাড়ী, তার পাশে
সেই যে বড় বেলগাছে—
সবাই জানে ভূত আছে ;
রাত দুপুরে বারোটায়
টহল্ দিয়ে গাছতলায়,
আন্‌বে পেড়ে ফল্‌টি তার
তবেই জেনো মান্‌বো হার্।"
দাদা শুনে চটেই লাল,
বল্লে—"ছি ছি হায় কপাল ;
আমায় তোরা চিন্‌লি না
নইরে আমি রাম শ্যামা,
শর্ম্মা কি চিজ্ আলবৎ
কাল দিবি ঠিক্ নাকে খৎ।"

* *

রাত বারোটায় কেষ্টদা
লম্বা লম্বা ফেলে পা
বুক্ ফুলিয়ে এক্‌লা যায়,
সত্যি মনে ভয় না পায়।
রাত নিশুতি ঘোর আঁধার,
খন্দ খানা বন্ বাদাড়্
পেরিয়ে সেথা গাছতলায়
যেই দাঁড়ান, দেখ্‌ল ঠায়,
লম্বা ন' হাত, শ্বেত কাপড়—
আস্‌ছে বউ এক সাম্‌নে ওর !
ভীষণ সে কী বাপ্‌রে বাপ্—
মার্‌লে দাদা তিন্‌টি লাফ্ !

ভয়ের চোটে থর্‌থরি
মুচ্ছো গেল তারপরই।

*　　　　*

লম্বা বউএর ইতিহাস
দাদার কাছে হয় নি ফাঁস্‌
দিদির সেটি কার্‌সাজী
করেছিল ভোজবাজী ;
বাগ্দীপাড়ার চণ্ডীদাস
হাতে ধ'রে লম্বা বাঁশ—
কলসী থুয়ে আগায় তার
জড়িয়ে শাড়ী চমৎকার,
পেত্নী সেজে কর্লে মাৎ
দাদার গুমোর কেয়াবাৎ।

শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী

ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং

সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ এবং গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব—এই দুইটি দল 'মহারাজা কাপ্‌' ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে উঠ্‌ল। দুইটিই খুব ভাল টীম্‌ এবং কে যে শেষ পর্য্যন্ত কাপ্‌টি জিত্‌বে তা'ই নিয়ে দিন কতক বেশ একটু হৈ চৈ প'ড়ে গেল। পথে, ঘাটে, চায়ের দোকানে, স্কুলে—সর্ব্বত্রই ঐ এক কথার আলোচনা—'কোন্‌ টীম্‌ জয়ী হবে ?'

"হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে" ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে গেল

যাই হোক্‌, খুব বেশী দিন আর অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'ল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিকালবেলা ফুটবল গ্রাউণ্ডে দুই দলের খেলা সুরু হ'ল। মাঠে লোক ধরে না—এত ভীড়! শেষ পর্য্যন্ত সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবকে দুই গোলে হারিয়ে মহারাজা কাপ্‌টি নিয়ে "হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে" ক'র্‌তে ক'র্‌তে বুক ফুলিয়ে মাঠ হ'তে চ'লে গেল।

গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণ একেই হেরে যাওয়াতে মন মরা হ'য়ে ব'সেছিল, তা'র উপর সোনারপুর ইয়ং বয়েজের চীৎকারে তা'দের রাগ আরও বেশী হ'ল। আর চুপ ক'রে না থাক্‌তে পেরে, তা'রা সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলের নিকটে গিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"তবু যদি কাপ্‌টি রূপোর হ'ত !······ভারী ত একটা ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ করা কাপ পেয়েছে, তা'র জন্য আবার এত চীৎকার !!"

এই কথা শুনে সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলের সকলেই খুব চ'টে গেল। দুই দলে তখন কথা কাটাকাটি এবং বচসা আরম্ভ হ'ল। এই বুঝি মারামারি বাধে আর কি! শেষে কয়েকজন বুড়ো ভদ্রলোক তা'দের দুই দলকে থামিয়ে ব'ল্‌লেন,—"এত গোলমালের কি প্রয়োজন! স্যাক্‌রার দোকান ত আর বেশী দূর নয়।······যাওনা স্যাক্‌রার কাছে গিয়ে যাচাই ক'রে দেখ কাপ্‌টি ইলেক্‌ট্রো-প্লেট্‌ করা অথবা সত্য সত্যই রূপোর। তা' হ'লেই ত সকল গোলমাল চুকে যায়।"
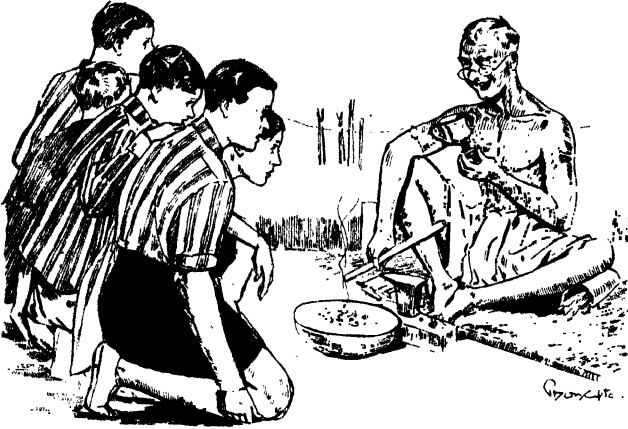
স্যাক্‌রা ব'লে উঠ্‌ল,—"এ ত রূপোর তৈরী নয়—
এ যে ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ !"

এই কথা শুনে তখনই দুই দল চ'ল্‌ল স্যাক্‌রার কাছে কাপ্‌টি যাচাই ক'র্‌তে। স্যাক্‌রা তা'র চশমাটি চোখে দিয়ে কাপ্‌টি একটু নেড়েচেড়ে দেখেই ব'লে উঠ্‌ল,—"এ ত রূপোর তৈরী নয়—এ যে ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ অর্থাৎ কলাই করা!" আর যায় কোথা, সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলটি একটু গম্ভীর হ'য়ে সেখান হ'তে চ'লে গেল।

* * *

এই রকম রূপোর কলাই করা অথবা সোনার গিল্‌ট্‌ করা জিনিষ তোমরা অনেকেই দেখে থাক্‌বে; কিন্তু কি উপায়ে অথবা কি প্রণালীতে এই রকম কলাই বা গিল্‌ট্‌ করে তা' বোধ হয় তোমাদের জানা নেই। রূপোর কলাই করা মানে—তামা কিংবা

পিতলের জিনিষের উপর রূপোর একটি আবরণ লাগিয়ে দেওয়া—যা'তে উপর হ'তে দেখে কেউ বুঝতে পার্‌বে না যে জিনিষটি রূপোর অথবা পিতলের। সোনার গিল্‌ট্‌ করা মানেও ঠিক তা'ই—রূপো অথবা তামা কিংবা অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত জিনিষের উপর সোনার একটি আবরণ লাগিয়ে দেওয়া। এই রকম গিল্‌ট্‌ করা জিনিষ দেখে মনে হয় জিনিষটি সোনার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিনিষটি সোনা হ'তে নিকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত। রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ কি প্রকারে করা হয় সেই সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌ছি।

বহুকাল পূর্ব্বে, মার্কারী (Mercury) অর্থাৎ পারদ্‌ ধাতুর সাহায্যে রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা হ'ত। যে সকল জিনিষ রূপোর কলাই করার প্রয়োজন হ'ত সেইগুলো প্রথমে বেশ ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে রাখা হ'ত। তা'রপর রূপো এবং পারদ্‌ এই দু'টি ধাতু একত্রে ভাল ক'রে মিশিয়ে ঐ সকল জিনিষের উপর এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হ'ত, যা'তে ঐ জিনিষগুলো এই মিশ্রিত ধাতুদ্বারা একেবারে ঢেকে যেত। জিনিষগুলো তখন বড় বড় উনান অথবা চুল্লীতে গরম করা হ'ত। পারদের একটি গুণ এই যে, একটু গরম ক'র্‌লেই পারদের ভাপ্‌ উঠ্‌তে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ পারদ্‌ একেবারে উপে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। জিনিষগুলো উনানে গরম করার ফলে মিশ্রিত ধাতু থেকে পারদের অংশ ক্রমে উপে যেত এবং কেবলমাত্র রূপো প'ড়ে থাক্‌ত। এইভাবে জিনিষগুলোর গায়ে রূপোর একটি আস্তরণ লেগে যেত।

সোনার গিল্‌ট্‌ ক'র্‌তে হ'লে রূপো এবং পারদের পরিবর্ত্তে, সোনা এবং পারদ্‌ একত্রে মিলিয়ে ব্যবহার করা হ'ত। এই ভাবে রূপোর কলাই অথবা সোনার গিল্‌ট্‌ করার প্রথা ব্যয়সাধ্য ছিল এবং তা' শরীরের পক্ষেও হানিকর, কারণ পারদের ভাপ্‌ অথবা ধোঁয়া অত্যন্ত বিষাক্ত। এইজন্য আজকাল আর সেই প্রথাতে কলাই বা গিল্‌ট্‌ করা হয় না। আজকাল যে উপায়ে তামা, পিতল বা অন্য ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্রে রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা হয় তা'র নাম ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (Electroplating) এবং এই কাজ পারদের পরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিক্‌ অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে করা হয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুতের সাহায্যে কলাই এবং গিল্‌ট্‌ করার প্রথা আবিষ্কৃত হয়। যিনি এই আবিষ্কার করেন তাঁ'র নাম ব্রুগ্‌নাটেলী (Brugnatelli)। প্রথমে এই নূতন প্রথায় খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় নি এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা কাজে লাগান সম্ভবপরও হয় নি। কিন্তু ব্রুগ্‌নাটেলীর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টা এবং পরিশ্রম ক'রে

এই নূতন প্রথাকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী ক'রেছেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এক্‌লিংটন্ (Eklington) নামক একজন বৈজ্ঞানিক নূতন প্রথায় রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্ করা আবিষ্কার করেন। এখন পর্য্যন্তও সেই উপায়েই রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্ করা হচ্ছে। আজকাল কি ভাবে ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং করা হয় তা' এই ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।
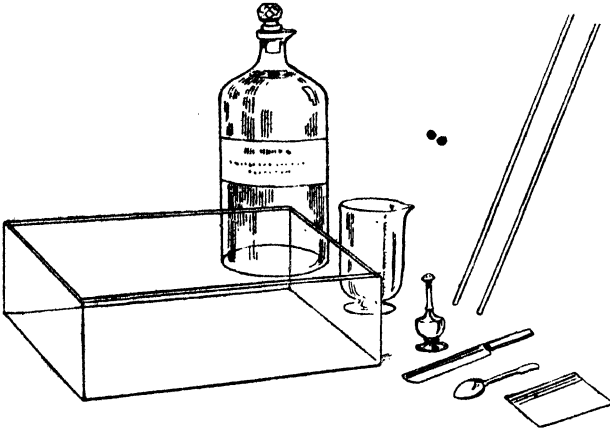
সিল্‌ভার্-প্লেটিং করার জিনিষপত্র

একটি কাঁচ অথবা চীনে-মাটির চৌবাচ্ছা-মত চতুষ্কোণ পাত্রে একভাগ সিল্‌ভার্ (রূপো) সাইনাইড্ (Silver Cyanide) এবং তু'ভাগ পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ (Potassium (Cyanide) ভাল ক'রে মিশিয়ে পঞ্চাশভাগ পরিষ্কার জলে ঢেলে দেওয়া হয়। পাত্রটির উপরে তু'টি তামার রড্ (rod) অথবা সরু লাঠি আড়া-আড়িভাবে রাখা হয়। পিতল অথবা তামার ছুরী, কাঁটা, চামচ, মেডেল প্রভৃতি যে সকল জিনিষ কলাই করা হবে, সেইগুলো প্রথমে অ্যাসিডে এবং পরে পরিষ্কার জলে ভাল ক'রে ধুয়ে, পাত্রের উপরকার একটি তামার রড্ হ'তে তামার তারের সাহায্যে পাত্রের মধ্যে রাসায়নিক তরল পদার্থের ভিতর ঝুলিয়ে রাখা হয়। অপর তামার রড্ হ'তে পরিষ্কার, খাদবিহীন এবং খাঁটি রূপোর একটি টুক্‌রো তামার তার দিয়ে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটি ব্যাটারী এনে তামার তার দিয়ে পাত্রটির উপরকার তামার রড্ তু'টির সঙ্গে সংযোগ ক'রে দিলে ব্যাটারী হ'তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Electric current) পাত্রটির ভিতর দিয়ে যাতায়াত ক'র্‌বে।

ব্যাটারীর তু'টি টার্‌মিনাল্ (Terminal) অথবা মুখ থাকে—একটির নাম পজিটিভ্ (Positive) টার্‌মিনাল্ এবং অপরটির নাম নেগেটিভ্ (Negative) টার্‌মিনাল্। যে তামার রড্ হ'তে কাঁটা, ছুরী, চামচ প্রভৃতি (অর্থাৎ যে জিনিষগুলো কলাই ক'র্‌তে হবে) ঝুলান আছে, সেইটি ব্যাটারীর নেগেটিভ্ টারমিনালের সঙ্গে

সংযোগ করা হয় এবং অন্য রড্ অর্থাৎ যেইটি হ'তে রূপোর টুক্‌রো ঝুলান থাকে, সেইটি ব্যাটারীর পজিটিভ্ টার্‌মিনালের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম ব্যবস্থার ফলে ব্যাটারী হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তি বা প্রবাহ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। তা'তে পাত্রের ভিতরে ঝুলান রূপোর টুক্‌রো ক্রমশঃ গ'লে যায় এবং কাঁটা, ছুরী, চামচ প্রভৃতি জিনিষগুলোর গায়ে ভালরকমভাবে লেগে যায়। কিছুক্ষণ এইভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে ব্যাটারী খুলে নেওয়া হয় এবং ঐ জিনিষগুলো পাত্র হ'তে তুলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেললে কেউ বুঝতে পার্‌বে না যে, সেইগুলো তামা কিংবা অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত ; মনে হবে জিনিষগুলো ঠিক যেন রূপোরই তৈরী !
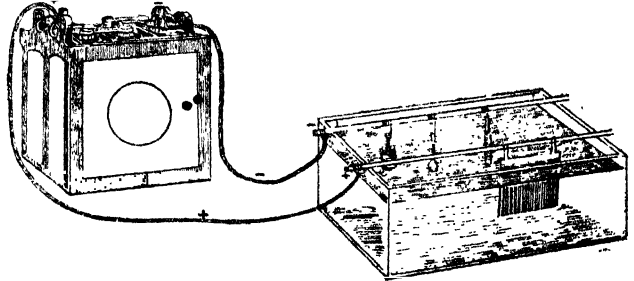
সিল্‌ভার্‌-প্লেটিং করা হচ্ছে

সোনার কলাই ক'র্‌তে হ'লে পাত্রে সিল্‌ভার্ সাইনাইডের পরিবর্ত্তে গোল্ড্ (সোনা) সাইনাইড্ (Gold Cyanide) দিতে হয়—অন্য সকল ব্যবস্থা সমান থাকে।

ব্যাটারীর পরিবর্ত্তে ডিনামিক্যাল্ ইলেক্‌ট্রিসিটি (Dynamical Electricity) অর্থাৎ যে বিদ্যুতে আমাদের আলো, পাখা, ট্রাম প্রভৃতি চলে, এইপ্রকার বিদ্যুৎও ব্যবহার করা যায়। ব্যাটারীতে খরচ বেশী পড়ে ব'লে আজকাল সব ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং কারখানাতেই ব্যাটারীর পরিবর্ত্তে ডিনামিক্যাল্ ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোনা এবং রূপোর মত আজকাল নিকেল প্লেটিং (Nickel Plating) অথবা নিকেলের কলাইএরও খুব প্রচলন হ'য়েছে। সোনা এবং রূপোর কলাই যে উপায়ে হয় সেই রকমে নিকেলের কলাইও হয়,—কেবল ঔষধপত্র অন্য রকম ব্যবহার ক'র্‌তে হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণতঃ তামার জিনিষের উপর রূপোর কলাই এবং রূপোর জিনিষের উপর সোনার কলাই বা গিল্‌ট্ খুব ভাল হয়। আবার লোহা, নিকেল এবং দস্তার উপর সোনা অথবা রূপোর কলাই ভাল হয় না। সেইজন্য লোহা, নিকেল এবং দস্তা, এই তিনটি ধাতুর নির্ম্মিত কোনও জিনিষে সোনা অথবা রূপোর কলাই ক'র্‌তে হ'লে প্রথমে ঐ জিনিষগুলো তামার কলাই ক'রে নিতে হয় এবং পরে রূপোর

কলাই অথবা সোনার গিল্ট্ করা হয়। ইলেকট্রিকের সাহায্যে কলাই করা হয় ব'লে এই প্রথার নাম হ'য়েছে ইলেকট্রোপ্লেটিং ; যদি রূপোর কলাই করা হয় তা' হ'লে বলা হয় ইলেকট্রো-সিল্ভারিং (Electro-Silvering) এবং সোনার গিল্ট্ করা হ'লে ইলেকট্রো-গাইল্ডিং (Electro-Gilding) বলা হয়।

এই রূপো এবং সোনার কলাই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না ; ভাল ক'রে ব্যবহার না ক'র্লে কিংবা নিত্য পরিষ্কার না রাখ্লে এবং ঘাম প্রভৃতি লাগ্লে খুব শীঘ্রই উপরের আবরণ অথবা কলাই উঠে যায় এবং তখন ভিতরকার ধাতুর চেহারা বা'র হ'য়ে পড়ে। তখন জিনিষগুলোর আসল চেহারা ধরা প'ড়ে যায় এবং ঐগুলো আসল কিংবা নকল তা' বুঝ্তে আর কষ্ট হয় না।

আজকাল সোনা-রূপোর কলাইএর আদর এবং ব্যবহার খুব বেশী হ'য়েছে। ছুরী, কাঁটা, চামচ, পেয়ালা, থালা-বাসন, খেলাধূলার কাপ্, মেডেল, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, পিন—এমন কি স্ত্রীলোকদের গহনা পর্য্যন্ত অসংখ্য পরিমাণে কলাই করা হচ্ছে।

এইবার আরও ছ'রকম কলাই করার প্রণালী সম্বন্ধে ব'ল্ছি ; একটি হচ্ছে জিঙ্ক্ (zinc) বা দস্তার কলাই এবং অপরটি টিনের কলাই। তোমরা বোধ হয় জান লোহা এবং ইস্পাতে নির্ম্মিত সকল জিনিষেই খুব শীঘ্র মরিচা লাগে এবং ক্রমে সেইগুলো একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, কিন্তু দস্তা হ'তে প্রস্তুত জিনিষপত্রে সহজে মরিচা লাগে না। এইজন্য লোহা অপেক্ষা দস্তার জিনিষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু লোহার জিনিষ অপেক্ষা দস্তার জিনিষের মূল্য বেশী এবং দস্তার জিনিষপত্র কম মজবুত। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা ক'রে আবিষ্কার ক'রেছেন যে, লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষে দস্তার কলাই ক'রে নিলে সেই সকল জিনিষে শীঘ্র মরিচা লাগে না। দস্তা গ'লিয়ে ফেলে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা ক'রে লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষগুলো ভাল ক'রে পরিষ্কার করার পরে সেই গলিত দস্তায় ডুবিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে জিনিষগুলো গলিত দস্তার ভিতর থেকে তুলে নিলেই দেখ্তে পাওয়া যায় যে, লোহা এবং ইস্পাতের ঐ জিনিষগুলোর গায়ে দস্তার একটি আবরণ লেগে গেছে এবং জিনিষগুলো দেখ্তেও ঠিক দস্তা হ'তে প্রস্তুত জিনিষেরই মত হ'য়েছে। এইভাবে দস্তার কলাই করার নাম জিঙ্ক্প্লেটিং (Zinc Plating) ; এর আর একটি নামও আছে, সেইটি হচ্ছে গ্যাল্ভানাইজিং (Galvanizing)।

আজকাল জিঙ্ক্প্লেটিং অথবা গ্যাল্ভানাইজি'এর আদর খুব হ'য়েছে এবং অনেক

রকম লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষই জিঙ্ক্প্লেটিং করা হচ্ছে ; তা'দের মধ্যে 'ঢেউটিন' নামে প্রচলিত জিনিষটিই প্রধান। 'ঢেউটিন' ব'ল্লেও সেইগুলো কিন্তু মোটেই টিন নহে— সেইগুলো লোহা হ'তে প্রস্তুত এবং পরে জিঙ্ক্প্লেটিং করা। এইজন্য সেগুলোকে করোগেটেড্ আয়রন্ সীট্ অর্থাৎ দস্তার কলাই করা ঢেউখেলান লোহার চাদরও বলে।

জিঙ্ক্প্লেটিংএর মত টিন্প্লেটিংএরও (Tin Plating) আজকাল খুব প্রচলন হ'য়েছে। লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্র গলিত টিনে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তুলে নিলে দেখ্তে পাওয়া যায় যে, ওই সকল জিনিষের গায়ে টিনের একটি আবরণ লেগে গেছে। বাজারে যে সকল পেট্রোল অথবা কেরোসিন তেলের ক্যানেস্ত্রা বা পাত্র দেখ্তে পাওয়া যায়, সে সকলই এই ভাবে প্রস্তুত হয়। আজকাল টিন্প্লেটেড্ অথবা টিনের কলাই করা জিনিষপত্র খুবই ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোনা এবং রূপোর কলাই করার মত দস্তা কিংবা টিনের কলাই ক'র্তে কোনও প্রকার ব্যাটারী অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, বি. এস্-সি., বি. কম.

ভাঙ্গা-ঘড়ি

বিনু সেদিন ভোরের বেলা ঢুকৃতে গিয়ে বাবার ঘরে,
হঠাৎ দেখে বাবার ঘড়ি ভাঙ্গা প'ড়ে খাটের 'পরে।
চম্কে গেল পেটের পিলে কোন্ বেচারী কর্লে এ কাজ ?
বাবা যদি জান্তে পারে রক্ষে তাহার থাকবে না আজ !
একেই বাবা বেজায় রাগী তার উপরে সখের ঘড়ি !
কার কপালে কি যে আছে, বিনু ভাবে এখন সরি।
পা বাড়াতেই পড়লো মনে, স'রেই কি তার রেহাই আছে ?
সবাই জানে বিনু খারাপ, নিস্তার নেই কারুর কাছে !
চল্লো বিনু ঘড়ি নিয়ে, মিনিট পাঁচেক খুবই ভেবে ;
নিজের গাঁটের পয়সা থেকেই বাবার ঘড়ি সারিয়ে দেবে।

পড়ার ঘরে ঘড়ি রেখে, ঘড়ির দোকান চল্‌লো বিনু।
ঢুক্‌লো ঘরে কি বই নিতে বিনুর দিদি—সবার মিনু।
চক্ষু হ'লো ছানাবড়া, বই নেয়া তো চুলোয় গেল!
বাবার রাগ তো সবাই জানে—কেমন ক'রে এমন হ'লো!
আঁচল চাপা দিয়ে মিনু ঘড়ি নিয়ে চল্‌লো তখন;
টাকা কিছু হবেই খরচ, উপায় কিছু নাইকো যখন!
নিজের ঘরের টেবিলেতে ঘড়ি রেখে টাকা এনে,
বিনুর খোঁজে যেতেই ঘরে দেবু ঢোকে আপন মনে।
ঢুকেই তখন ব্যাপার দেখে আত্মা-পাখী খাঁচা ছাড়া!
ইহার চেয়েও ভাল ছিল পাগ্‌লা কুকুর কর্‌লে তাড়া।
বাবার মেজাজ সবাই জানে দেবুই তো আজ দোষী হবে!
দোষী হ'য়ে বাবার কাছে প্রাণ বেঁচেছে কাহার কবে?
দেবু ঘরের বাইরে এলো ঘড়িটাকে হাতে ক'রে—
এমন সময় বাবার গলা শোনা যে যায় সদর-দোরে।
ভয়ে ত্রাসে দেবু কাঁদে, মিনু আসে ত্রস্ত পায়ে,
বিনু কাঁপে ভীষণ বেগে জ্বর যেন তার সকল গায়ে।
একটু পরেই বাবা আসেন, ঝড়ের বেগে ঢোকেন ঘরে;
চেঁচিয়ে বলেন, "ভাঙ্গা ঘড়ি! তবুও নজর তারই পরে?
হাতের থেকে হঠাৎ প'ড়ে ভাঙ্গলো সাধের ঘড়ি অমন!
সারাবো তাই দিছি রেখে খাটের পরেই সেটা তখন।
এর মধ্যেই উড়ে গেছে ব্যাপারখানা ঘট্‌লো কি?
কোথায় গেল ভাঙ্গা ঘড়ি বল্‌না বাপু তোরাই দেখি?"
দেবু বলে, "এই যে ঘড়ি"—হাঁপ ছাড়লেন বাবা শুনে।
হাঁপ ছাড়লো মিনু বিনু, নাচ্‌লো দেবু ন'বার গুণে!

ভারতী ঘোষ

পিশাচের কবলে

—১—

সেদিন আকাশ যেমন নীল, নির্ম্মল, চাঁদও তেমনি নির্ম্মল কিরণের বন্যা ছুটিয়ে স্থল-জল একাকার ক'রে দিয়েছিল। সেই ঝর্‌ঝরে আলোর বন্যায় হাবুডুবু খেয়ে বঙ্গোপসাগরই যে শুধু আহ্লাদে কুটী-কুটী হ'য়ে হাসির লহর তুলে তালে তালে নাচ্‌তে সুরু ক'রেছিল এমন নয়, তীরের ধব্‌ধবে বালিয়াড়ির সারি, যেন পালিশ-করা রূপোর পাতে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে—আদরে তাকে কোলে নেবার জন্যে—হাস্‌তে হাস্‌তে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। স্থলে-জলে-আকাশে সর্ব্বত্রই যেন উৎসবের হাট ব'সে গিয়েছিল!

মানুষ যত গরীব, যত হীন, যতই মূর্খ হোক্ না কেন, প্রকৃতির হাসি-কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে হাসি-কান্নার সাড়া জেগে উঠ্‌তে দেরী হয় না। প্রকৃতির সেই উৎসবে মেতে 'রণকোটা' গ্রামের জেলেরাও ফূর্ত্তি ক'রে গান ধ'রে দলে-দলে বেরুল—যে-যার দলের ডিঙ্গী নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধর্‌তে যাবার জন্যে।

এই ডিঙ্গীগুলো অনেকটা জালিবোটের মত, কিন্তু লম্বায় যেমন বড়, গভীরও তেমনি খুব বেশী—পাঁচ-ছ হাতের কম নয়, কোন-কোনটা আরো বেশী। এই সব ডিঙ্গীর উপরে পাটাতন থাকে না, পাটাতন থাকে ভিতরকার গভীর তলাতে। আর সেইখানেই সব দরকারী জিনিসপত্তর থাকে। মাছ ধর্‌তে বেরিয়ে অনেক সময় তিন-চার দিন পর্য্যন্ত সাগরের বুকে কাটাতে হয় ব'লে, সকল বড় ডিঙ্গীতেই যেমন মানুষ থাকে দশ-বার জনের কম নয়, তেমনি তাদের পাঁচ-ছ' দিনের মত খাবার চাউল, লুন, পেঁয়াজ আর তেঁতুলও থাকে সঙ্গে। ঘরে থাক্‌লেও এ ছাড়া আর অন্য তরকারীর মুখ তা'রা যেমন বড় একটা দেখ্‌তে পায় না, তেমনি সর্ব্বদাই যথেষ্ট মাছ পায় ব'লে তার জন্যে তা'রা দরকারও ভাবে না একটুও। এ সব ছাড়া, আগুনের মাল্‌সা, চিম্‌টে, তামাক, হুঁকো-কল্‌কে, তোলা উনুন, মাটির হাঁড়ী, কড়াই প্রভৃতি আর যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানী কাঠ আর খাবার জল ডিঙ্গীতে বোঝাই না ক'রে কেউই মাছ ধর্‌তে বেরোয় না। সেদিনও সেই রকম পাঁচখানা ডিঙ্গীতে ষাট-পঁয়ষট্টি জন জেলে আমোদের হল্লা তুলে বা'র হ'ল মাছ ধর্‌বার জন্যে।

বালেশ্বর জেলার অনেক জায়গাতেই চড়া পড়্‌তে সুরু হ'য়ে সমুদ্র—কিনারা থেকে স'রে গেছে চার-পাঁচ মাইল কোথাও বা সাত-আট মাইল দূর পর্য্যন্ত; রণকোটাতেও তাই। জোয়ারের সময়ে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ কিনারার বালিয়াড়ির গায়ে এসে আঁছাড় খেয়ে পড়্‌লেও, ভাঁটার সময়ে সেই চড়াতে কোথাও আধ হাত, কোথাও হাতখানেক, কোথাও এক হাঁটু আর কোথাও বা বুকভরের বেশী জল থাকে না। তাই জেলেদের গভীর ডিঙ্গীগুলো ছাড়্‌তে হয়, প্রায় মাইল

দুই পশ্চিমে সুবর্ণরেখার মোহানা থেকে। ভাঁটার সময়ে এই মোহানার মুখেও জল কম থাকলেও যে পরিমাণে থাকে, তাতে সকল ডিঙ্গীই সেইখানে সহজেই ভাসিয়ে জেলেরা বাইতে বাইতে পাঁচ-সাত মাইল গিয়ে বা'র-সমুদ্রে প'ড়ে জাল ফেল্‌তে সুরু করে। অথচ জোয়ারের সময়ে গেলে মাছের সুবিধা হয় না ব'লে, তাদের বাধ্য হ'য়ে বা'র-সমুদ্রে যেতে হয়—জোয়ার লাগ্‌বার আগেই—ভাঁটাতে ডিঙ্গী ভাসিয়ে।

সেদিনও সুবর্ণরেখার মোহানা থেকে সেই পাঁচখানা ডিঙ্গী যখন বা'র-সমুদ্রের দিকে বেয়ে চল্‌ল, তখন রাত্রি হ'য়েছে বড় জোর ঘণ্টাখানেক। শেষে একটা ডিঙ্গী চল্‌ল; তা'র মালিক ছিল একজন বুড়ো। সেই বুড়োর ডিঙ্গীতে একটি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলেকে নিয়ে মানুষ ছিল তের জন। তারই একজন বুড়োকে বল্‌লে "গির্‌ধারী বল্‌ছিল এ কটালে যদি মাছ না পড়ে, তা' হ'লে সাম্‌নের কটালও শুক্‌নো যাবে, তাই ওরা বা'র-সমুন্দরের পূবে যাচ্ছে, সেদিকে শুন্‌লুম মাছ ঢের।"
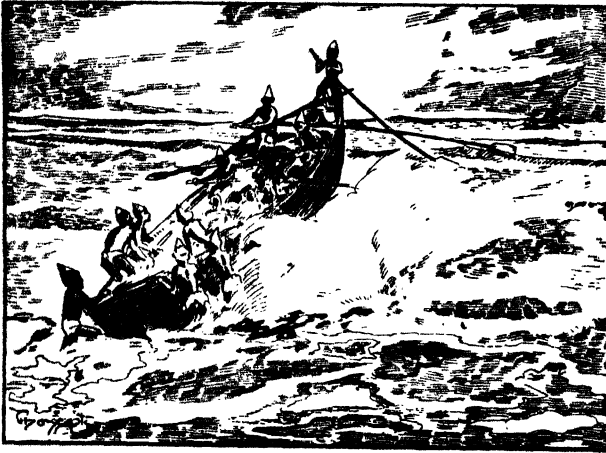
শেষে একটা ডিঙ্গী চল্‌ল

বুড়ো 'শুকানে' (হালে) ব'সে একমনে কেবলই জ্যোস্নামাথা আকাশের দূরের দিকে চেয়ে কি-যেন খুঁজ্‌ছিল। ঐ কথা শুনে বুড়ো ব'লে উঠ্‌ল—"গির্‌ধারী আর ক'টা মাছ দেখেছে, আর ধ'রেছেই বা ক'টা? আমার এই তিনকুড়ি সাত বছর পার হ'ল, আট বছর বয়েস থেকে বাড়ুয়ার ডিঙ্গীতে সমুন্দরে কাটাচ্ছি, ওকি আমার চেয়ে বেশী দেখেছে? ওই দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল দশের ভিতরে এমন একটা জায়গা আছে যে, তাকে মাছের দেশ বল্‌লেও হয়। এই একখানা ডিঙ্গীতে আর কত ধ'রে বোঝাই করবি?"

বুড়োর কথা শুনে ডিঙ্গীর সকলেই মহা উৎসাহে মেতে সেইখানে যাবার জন্যে বুড়োকে বারম্বার অনুরোধ করতে লাগ্‌ল। বুড়োর তের-চৌদ্দ বছরের নাতি রঘুয়াও আহ্লাদে ব'লে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ দাদা, সেইখানেই চল্‌ যাই। তুই আট বছর বয়েস থেকে বাড়ুয়ারী (মোড়লের) ডিঙ্গীতে গিয়ে দেখছিস্‌। আর এখন তুই হ'য়েছিস্‌ গাঁয়ের বাড়ুয়া, কিন্তু আমি এত বড় হ'য়েছি, তবু সে জায়গা আমাকে দেখালি না। আজ এমন সুন্দর রাত্তির, আজ সেইখানেই চল যাই।"

—"আরে ভাই, সেই ছেলেবেলাতে কেবল তিনবার সেইখানে গিছি। বা'র-সমুন্দরের মাইল

দশ দক্ষিণ-পশ্চিমে জলের একটা 'সো' (স্রোত) ধ'রে সেখাতে যেতে হয়। তারপরে আর ওদিকে যাই নি। এতকাল পরে এখন যদি সেই সো দিশে করতে না পারি? তার উপর দূরের আকাশ দেখে মনে খট্‌কা লাগ্‌তেছে, ওই উদিকে দিশে ক'রে ভাখ্‌।"

বুড়ো পূব-উত্তরের আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে। রঘুয়া কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"আরে, যা—যা—বুঝেছি, বুড়া হ'য়ে আর বাড়ুয়া হ'য়ে এখন তোর প্রাণে ডর হ'য়েছে খুব, তাই—"

রঘুয়াকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুড়ো রেগে ব'লে উঠ্‌ল—"বটেরে রঘুয়া, তু এত বড় কথাটা আজ আমাকে ব'ল্‌লি! আমি বুড়া! এ গাঁয়ে তোদের কোন্ জোয়ান এখনও আমার মত খাট্‌তে পারে, লিয়ে আয় তো দেখি? আর ভয়ের কথা বল্‌ছিস্—এই সমুন্দরের 'বিচে' (মাঝে) আমরা যে সব বিপদে প'ড়েছি, তোরা শুন্‌লে ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে কেঁপে অজ্ঞান হ'য়ে যাবি। তুই আমাকে বল্‌ছিস্—প্রাণে ডর হ'য়েছে, উ আকাশের দিকে দেখে মালুম করতে পারছিস্ না? আচ্ছা, যা থাকে যার কপালে, চল্ আজ সিথাতেই লিয়ে যা'ব। লে, তোরা ফূর্তি ক'রে 'হাল্‌সা' (দাঁড়) টান্। আরে ভুরুঙ্গা, এক কল্‌কি তামাক চড়া তো রে দেখি।"

ব'লে বুড়ো 'শুকানের' দু'তিনটে জোর মোচড় দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বস্‌ল। কিন্তু তার কথা মিথ্যা হ'ল না। ঘণ্টাখানেক পরে ডিঙ্গীগুলো যখন বা'র-সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে—ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে—এদিক্-ওদিক্ ছড়িয়ে পড়্‌ল তখন যেন কি যাদু-মন্ত্রে অমন চাঁদের আলোও উপে গিয়ে অন্ধকার এসে চেপে বস্‌ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমুদ্রের জল থেকে এক আশ্চর্য্য রকম গম্ভীর আওয়াজ উঠ্‌তে সুরু কর্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে পূব-উত্তরের দিক্ থেকে হঠাৎ বিষম—বোঁ বোঁ—গর্জ্জন ক'রে এমন জোর তুফান ছুট্‌ল যে, সমুদ্রের বুকে প্রলয়ের সূচনা হ'য়ে গেল।

গভীর সমুদ্রে ঢেউয়ের মাতামাতি না থাক্‌লেও তখন ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল এক একটা তাল গাছের সমান উঁচু। আর সেই ঢেউয়ে ডিঙ্গীখানাকে একেবারে তার চূড়োর উপরে তুলে পরক্ষণেই ফেল্‌তে লাগ্‌ল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত নীচে, যেন পাতালের ভিতরে। অন্ধকারে কারুরই চোখ চল্‌বার উপায় রইল না, তুফান আর সমুদ্রের গর্জ্জনে সকলের কানও গেল বন্ধ হ'য়ে। অথচ সেই সাংঘাতিক ঝড়ের মুখে প'ড়ে, ঢেউয়ে তেমনি আকাশ-পাতাল ওঠা-পড়া করতে করতে ডিঙ্গীখানা যে কোন্ দিকে কোন্ পথে, কোথায় বিদ্যুতের বেগে ছুটে চল্‌ল তা কারুরই ঠিক রইল না।

বুড়োর হুকুমে, ডিঙ্গীর উপরে বড় বড় চারখানা জাল—দু'পাশে ঝুলিয়ে—চাপা দিয়ে সকলেই ভিতরে নেমে তলাতে মহাভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে কাঁপ্‌ছিল, বুড়োই কেবল একেলা উপরে ব'সে ছিল অতিকষ্টে কোনও রকমে হাল ধ'রে। কিন্তু আধঘণ্টা না কাটাতেই সেই সঙ্গে যখন বৃষ্টি সুরু হ'ল, তখন সে, হাল বেঁধে, ভিতরে নেমে কেবল ব'লে উঠ্‌ল—"কেমন রে রঘুয়া, কারুর মুখে কথা নেই যে? এখন ঠেলা সামাল্ দে।"

—২—

ভগবানের দয়ায় সারারাত তেমনি ভাবে কেটে আবার সকাল হ'ল বটে, কিন্তু তুফান অনেক কম্‌লেও একেবারে ছাড়্‌ল না, সূর্য্যও উঠ্‌ল না, অন্ধকারও জেঁকে ব'সে রইল আকাশ-পাথার একাকার ক'রে।

এদিকে, সারারাত অনাহারে দারুণ পরিশ্রমে সকলেই ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিদেতে মরার মত হ'য়ে প'ড়েছিল। বৃষ্টির দায়ে ডিঙ্গীর ভিতরে, বাঁশের উপরে ত্রিপল ঢেকে, ঘরের মত ক'রে নিলেও ডিঙ্গীর দোলানীতে রাঁধ্‌বার উপায় ছিল না। কাজেই সঙ্গে যা 'ভুঁজা' (মুড়ি) এনেছিল তারই কতক সকলে মিলে খেয়ে তখনকার মত ক্ষিদের হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু শীগ্‌গির আকাশ পরিষ্কার হবার লক্ষণ দেখা গেল না, তা'রাও রাঁধ্‌বার জোগাড় কর্‌তে পার্‌লে না। সকলেই যে যার কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়ে ঢেউয়ের দোলানী খেতে লাগ্‌ল।

সারাদিনও সেই ভাবে কাট্‌বার পরে বিকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার হ'তে সুরু হ'য়ে, সন্ধ্যার সময়ে প্রকৃতি বেশ শান্ত হ'ল। আবার আকাশে চাঁদ উঠ্‌ল, ঢেউ কম্‌ল, মন্দ মন্দ বাতাস বইতে সুরু হ'ল। তখন ডিঙ্গীর ভিতরের ত্রিপল তুলে ফেলে সকলেই উপরে উঠ্‌ল; তারপরে ডিঙ্গীর এড়ো দিকের বাঁধনের তক্তাগুলোর উপরে ব'সে, চারদিকে দেখে, দারুণ হতাশে নিঃশব্দে কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল।

বুড়োও আগে থাক্‌তেই নিঃশব্দে উপরে উঠে, হালটি ধ'রে চুপ ক'রে ব'সেছিল। চেমা নামে বুড়োর এক সঙ্গী আর থাক্‌তে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"আমরা কোথায় এসে প'ড়েছি বাড়ুয়া দাদা?"

—"কি ক'রে জান্‌ব ভাই, এ যে বড় সমুন্দর—কুল-কিনারা নেই। আমরা যে কোন্‌দিকে কোথায়, ক'দিনের পথ দূরে এসে প'ড়েছি কিছুই তো হদিস্‌ কর্‌তে পারছি নি!"

—"তবে কোন্‌ দিকে চালাচ্ছ?"

—"কোন দিকেই না, আমি কেবল শুকানটা ধ'রে মুখটা সিধে রেখেছি—সো-তে যে দিকে নিয়ে যায়।"

—"তা' হ'লে কি উপায়?"

—"উপায় তো এখন কিছুই দিশে লাগ্‌ছে না। দেখি কি হয়, রাতটা আগে কাটুক। এখন তোরা রসুইয়ের জোগাড় কর, যা ভুরুঙ্গা উনুনটা জ্বেলে ভাত চাপিয়ে দিগে। আহা রঘুয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে, 'ছুয়া' (ছেলে মানুষ) তো? তার কথায় গোসা ক'রে আমি বড় খারাপ কাজ ক'রেছি। যা তোরা আর দেরী করিস্‌ নি, আমি চারদিকেই নজর রেখেছি, যদি কোথাও চড়া পাই তো নোঙর কর্‌ব।"

বাস্তবিকই রঘুয়ার মুখে আর কথা ছিল না। উপরে উঠে সে কেবল একদিকে একদৃষ্টে চেয়ে ব'সে ছিল। বুড়োর কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে ব'লে উঠ্‌ল—"ওই দাদা, একটা চড়ার মতো 'দুস্‌চে' (দেখা যাচ্ছে) না ? ওই-ই বাঁয়ে।"

সকলেই তাড়াতাড়ি সেই দিকে চেয়ে আহ্লাদে একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"হাঁ হাঁ—চড়াই বটে, মাইল খানেকের বেশী দূর না, ডিঙ্গীর মুখ বাঁয়ে রাখ্‌ দাদা, আমরা হাল্‌সা টানছি।"

ব'লেই আট জন তাড়াতাড়ি আটখানা দাঁড় ফেলে ফূরতি ক'রে টেনে চল্‌ল সেইদিকে। আধ ঘণ্টা পরে সেইখানে পৌঁছে বুড়ো ব'লে উঠ্‌ল—"সত্যিই তো লম্বা চড়া দূর থেকে আমার নজরে 'দুসেনি' (দেখা যায় নি), বুড়া হ'য়েছি তো বটে রে ভাই! এখন নোঙর ফেলা, এইখানে নিশ্চিন্তি হ'য়ে রাতটা কাটা'ব।"

তখনি সেই চড়াতে নোঙর ফেলে ডিঙ্গীখানাকে বেঁধে রেখে সকলেই ভিতরে নেমে রান্না-খাওয়াতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ল।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া তাদের ভাগ্যে ছিল না। ঘণ্টা দুই পরে রান্না-খাওয়া শেষ হ'য়ে বুড়ো সবে হুঁকোটি মুখে তুলে টান্‌তে যাবে, হঠাৎ এঁটো পরিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে ট'লে প'ড়ে চম্‌কে ভুরুঙ্গা ব'লে উঠ্‌ল—"একি হ'ল দাদা, ডিঙ্গী ফের চল্‌তে লেগেছে নাকি ?"

বুড়োও চম্‌কে উঠে মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে হুকুম কর্‌লে—"দেখ্‌তো রে রামু নোঙরটা খ'সে গেল নাকি, আমি তামাকটাতে দুটো টান মেরে যাচ্ছি। আরে ওঠ্‌না রামা—দেখ্‌না অঙ্কুরা।"

কিন্তু রামা উঠ্‌বে কি, তখন তার নাক ডাক্‌তে সুরু ক'রেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, কেবল ঘুমের আমেজে চোখ সবে বুজে আস্‌ছিল চিন্তা আর অঙ্কুরার। বুড়োর হুকুমে ব্যাজার হ'য়ে সে ব'লে উঠ্‌ল—"ডিঙ্গী চল্‌তে লেগেছে—না গাঁজা খেয়ে ভুরুঙ্গার মাথা টল্‌তে লেগেছে! কোথায় কি, মিছে ওই গাঁজাড়ির সঙ্গে জেগে ব'সে আছ দাদা, তাড়া ক'রে তামাক টেনে কলকিটা ওই হতভাগাকে দিয়ে শুয়ে পড়।"

কিন্তু সেই সময়ে ডিঙ্গীখানা একবার জোরে নেচে উঠ্‌তে, চিন্তা খপ্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"নারে অঙ্কুরা ভাই, ওই গ্যাখ্‌ ওঠ্‌।"

ব'লেই, ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে তুলে, দু'জনেই উপরে উঠে হঠাৎ একসঙ্গে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"শীগ্‌গির বাড়ুয়া-দাদা উপরে আয়, ডিঙ্গী জোরে ছুটেছে যে!"

—"এ্যাঁ এ্যাঁ সে কি, ঝট ক'রে সবাইকে তুলে দে ভুরুঙ্গা।" ব'লেই বুড়ো হুঁকোটা তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে দেখ্‌লে যে, ডিঙ্গীখানাকে নোঙর শুদ্ধ টেনে নিয়ে সেই মাটির চড়াটা জোরে সাম্‌নের দিকে যেন ছুটে চ'লেছে সোঁ সোঁ ক'রে!

বুড়ো ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—"সর্ব্বনাশ, আর দেখ্‌ছিস্‌ কি আমার মাথা! শীগ্‌গির টেনে

নোঙর খসিয়ে নে, চড়া কখনো ছুটে চলে? এ কোন্ সমুন্দরে এসে প'ড়েছি রে! ওটা চড়া নয়, নিশ্চয় সাংঘাতিক মগর্-মাছ-টাছ হবে।"

ততক্ষণে আরো চার-পাঁচজন জেগে উপরে উঠে এসেছিল। দারুণ ভয়ে সকলে মিলে নোঙরের কাছি ধ'রে প্রাণপণে টান্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু নোঙর খসা দূরে থাক, যেমন কাম্‌ড়ে লেগে রইল অটল হ'য়ে, ডিঙ্গীখানাও তেমনি তার সঙ্গে যে কোন্ দূর দুরান্তরে বেগে ছুটে চল্‌ল সোঁ সোঁ ক'রে তার ঠিকানা রইল না। শেষে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে নোঙরটা হঠাৎ যেন পিছ্‌লে, টানের চোটে গিয়ে ঝপাৎ ক'রে পড়্‌ল জলে। তাতে ডিঙ্গীর বেগ একেবারে না থাম্‌লেও যেমন কতকটা মন্দ হ'য়ে এল, জানোয়ারটাও তেমনি সমান বেগে ছুটতে ছুটতে কোথায় যে অদৃশ্য হ'ল আর দেখা গেল না।
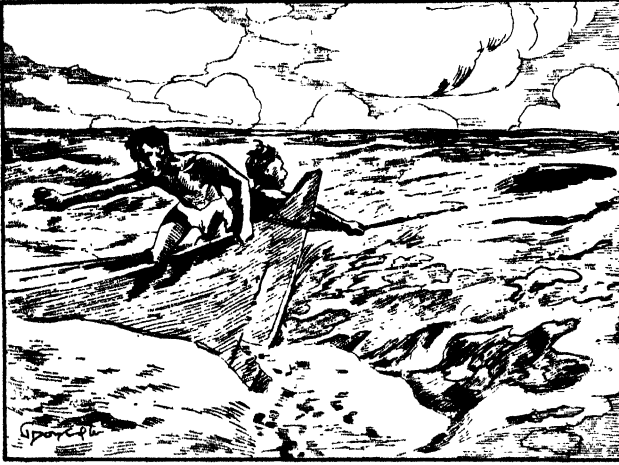
দু'জনেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—

অঙ্কুরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"দুশো হাত কাছিতে থই পাবে কি, এযে কোন্ মহা সমুন্দরে এসে প'ড়েছি, তার দিশে লাগ্‌ছে না, নইলে আর অমন সাংঘাতিক জানোয়ার দেখা যায়? থাক নোঙর অমনি জলে ফেলা, কপালে থাকে তো ভেসে যেতে যেতে কম জলে গিয়ে মাটিতে লাগ্‌বে। মোদের তো সো-তে এমনি যেতেই হবে যতক্ষণ রাতটা না কাটে। মোর 'সাঙ্গেরে' (সঙ্গে) চিন্তা আর অঙ্কুরা হেথায় থাক, আর সবাই ভগবানের নাম ক'রে গিয়ে 'টিকে' (একটু) ঘুমিয়ে লে। কে জানে কখন কি কাজ পড়বে। এখন তিনি ছাড়া আর ভরসা নেই।"

ডিঙ্গীর উপরে বুড়ো, চিন্তা আর অঙ্কুরা ছাড়া আর সকলে ভিতরে ঘুমোতে নাম্‌ল বটে, কিন্তু ঘুম আর হ'ল না কারুরই। ততক্ষণে ভুরুঙ্গা বেশ আরামে অজ্ঞান হ'য়ে নাক ডাকাচ্ছিল। সকলে মিলে তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে এক সঙ্গে ব'সে হরিনাম গাইতে সুরু ক'রে দিলে।

(আগামী মাসে শেষ হবে)

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রভাত আলোর গান

নীল আকাশের সোনার আলো আমরা এসেছি,
শীতল স্নেহ মৃদুল বাতাস সঙ্গে এনেছি।
পূবের আকাশ রঙ্গিয়ে দিয়ে, নদীর জীবন ঝিক্‌মিকিয়ে,
ঘাসের বুকে শিশির দলে চম্‌কে দিয়েছি ;—
ও ভাই খোকা ও বোন খুকু, আমরা এসেছি।

আকাশ দেশের সূর্য্য মামার বার্ত্তা এনেছি,
শ্যামল ধরার গোপন কথা আমরা জেনেছি।
ধরার রাণী চক্ষু খুলি' ডাক্‌লো মোদের ছ' হাত তুলি',
তোদের ধরায় আমরা ভালো তাই ত' বেসেছি ;—
ও ভাই খোকা ও বোন খুকু, আমরা এসেছি।

পাখীর কুলায় চুপে চুপে দৃষ্টি হেনেছি,
ফুল-কলিদের চোখে মুখে সোহাগ ঢেলেছি।
তোদের শ্যামল ধরার 'পরে, বাতাস সাথে উজার ক'রে,
পাখীর কথা ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছি ;—
ও ভাই খোকা ও বোন খুকু, আমরা এসেছি।

তোদের মুখে সোহাগ স্নেহের পর্শ দিয়েছি,
তোদের মুখের মধুর হাসি আমরা লুটেছি।
জয়ের টিকা মোদের ভালে, গান গেয়ে যাই প্রভাতকালে,
পৃথ্বীর বুকে নবীন জীবন ফুটিয়ে তুলেছি ;—
ও ভাই খোকা ও বোন খুকু, আমরা এসেছি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ

কি ও কেন ?

পৃথিবী কি সত্যই গোলাকার ?

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোলাকার, কমলালেবুর মত উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা। কথাটা কি সত্যি ? আমরা চোখে সাধারণভাবে যাহা দেখি তাহাতে তো কেবল সমতল ভূমিই দেখিতে পাই !

পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু পয়সার মত গোল নহে, কমলালেবুর মতই গোল। তাহা যদি না হইত তবে চক্রবাল চক্রাকার দেখা যাইত না। আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন, মনে হয় আমাদের চারিদিকে যেন আকাশ ঘিরিয়া আছে। পৃথিবী সমতল হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

কোন বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ক্রমাগত একই দিকে চলিলে দেখা যাইবে জাহাজখানি আবার সেই বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং জাহাজের যে সম্মুখভাগ বন্দরকে পিছনে ফেলিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেই মুখ কখন অজানা ভাবে ঘুরিয়া বন্দরের দিকেই মুখ করিয়াছে !

পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন তাহা গোলাকার দেখা যায়। গোলাকার পদার্থ না হইলে তাহার ছায়া গোলাকার হয় না। আলোর সামনে নানা আকৃতির জিনিষ ধরিয়া দেওয়ালের উপর ছায়া ফেলিয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিও।

পৃথিবীর পরিধি মাপা হইয়াছে। বিষুবরেখার উপর ইহা ২৪,৯২৬ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট কিছু কম। গোলাকার জিনিষ না হইলে মাপ সর্ব্বত্র এক হয় না।

তিনটি খোঁটা লইয়া সমুদ্রের কিনারা হইতে সমুদ্রের মধ্যে সমান অথচ একটু বেশী ব্যবধানে এমন করিয়া পোঁতা হইল যাহাতে জলের উপরের অংশ প্রত্যেকটি খোঁটার
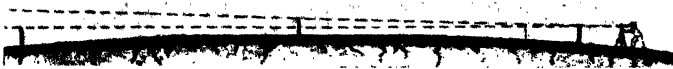
সমান থাকিবে। এখন কিনারায় দাঁড়াইয়া দূরবীন দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে মধ্যের খোঁটাটি অপর দুইটিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী গোলাকার না হইলে ইহা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর আকৃতি যে গোল ইহার পর তাহার আরও প্রমাণ চাই কি? তাহা হইলে সমুদ্রের উপকূল হইতে জাহাজের ক্রমে অদৃশ্য হওয়া ও পাহাড়ের উপর যতই উঠা যায় ততই পৃথিবীর বুকে দিগন্ত কেন সরিয়া যায়—তাহা ভাবিয়া দেখ।

চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন?

'হাঁসি-কান্না ল'য়ে যেন চাঁদের উদয়'! একই চাঁদ, সেই পৃথিবী, চিরন্তন সূর্য্য কাহারও পরিবর্ত্তন হইতে দেখি না, কেবল চাঁদের বেলাতেই পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া অমাবস্যা, আবার শুক্লা প্রতিপদ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা কেন?

চাঁদ গোলাকার, উহার ব্যাস ২১৬০ মাইল। পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া চাঁদ নিজের কক্ষের উপর পৃথিবীকে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে। উহার নিজের কোন আলো নাই। সূর্য্যকিরণ উহার উপর পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইলে আমরা যাহা দেখি তাহাই চাঁদের কিরণ—জ্যোৎস্না।

পূর্ণিমা রাত্রে সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক লাইনে (এক সমতলে নহে) পরে পরে থাকে বলিয়া সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের অর্দ্ধেকখানি, যাহা পৃথিবীর দিকে মুখ করা, আলোকিত করে। তাই সে রাত্রিতে চাঁদের সবখানিই আলোতে উদ্ভাসিত দেখি। মাসে (২৮ দিনে) একবার মাত্র এই অবস্থা হইতে পারে।

পূর্ণিমার প্রায় ১৫ দিন পরে চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া থাকে তাহা সূর্য্যের আলো না পাওয়ায় আমরা অন্ধকার দেখি। সে রাত্রে আকাশে চাঁদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই ঘোর অন্ধকার, অমাবস্যা।

সূর্য্য প্রকাণ্ড। পৃথিবী সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় বিন্দুমাত্র, চন্দ্র আরও কম। সুতরাং চন্দ্রের অর্দ্ধেকখানি সর্ব্বদাই সূর্য্যের আলোয় আলোকিত থাকে। আর চন্দ্রের একই দিক পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া সর্ব্বদা তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। সেই জন্যই আমরা প্রতি রাত্রেই চন্দ্রের একই 'কলঙ্ক' দেখিতে পাই। কিন্তু চন্দ্রের, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবার ফলে, আলোকিত অংশের সবখানিই আমরা সব সময়ে দেখিতে পাই না, ফলে 'চন্দ্রকলার' উৎপত্তি হয়। পর পৃষ্ঠার ছবিটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই তোমরা ইহা

বুঝিতে পারিবে। অমাবস্যার পর প্রতি রাত্রেই চন্দ্রের আলোকিত অংশ (গ ঘ) আমরা ক্রমশঃই বেশী দেখিতে পাই। গ ঘ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ঘ আসিয়া পূর্ণিমার রাত্রে ক'এর সঙ্গে মিলিত হয়। আবার তেমনই পূর্ণিমার পর আলোকিত অংশ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে অমাবস্যায় একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। ক খ গ চন্দ্রের অর্দ্ধেক অংশ, যাহা সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া থাকে।
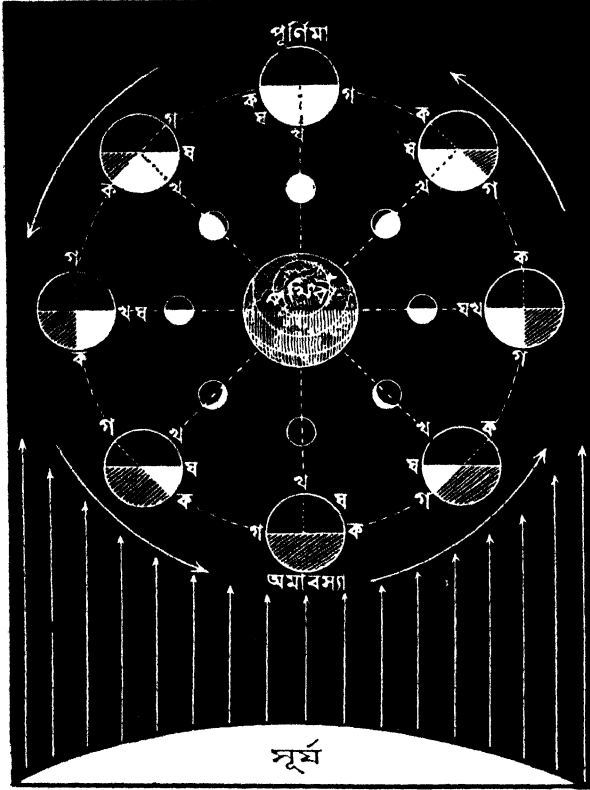
চন্দ্রের মত পৃথিবীরও নিজের কোন আলো নাই। সূর্য্যের আলো পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকেও খানিকটা আলোকিত করে। সেই জন্য অনেক সময় পরিষ্কার রাত্রে দ্বিতীয়ার চাঁদের কাস্তের মত আলোকিত অংশের বাহিরে চাঁদের বাকী অংশ আবছায়ার মত অস্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদের আলো বেশী হইলেই আর ইহা দেখা যায় না। লক্ষ্য করিয়া না থাকিলে এইবার অমাবস্যার পর লক্ষ্য করিও।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

পরীর দেশে রাজু

রাজু বড় দস্যি ছেলে। তা'র জন্য কা'রও এক মুহূর্ত্ত শান্তি নেই। কেউ একটু এদিক্ ওদিক্ হ'য়েছে কি—অমনি রাজু একটা-না-একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছে। রাজু একটুও চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে না—এতই অস্থির সে!

কতই বা ওর বয়েস, কিন্তু এরই মধ্যে রাজু তা'র দাদাদের মত বই বগলে ক'রে ইস্কুলে যেতে চায়। ছাত্র সেজে বই বগল ক'রে "ইস্কুলে যাচ্ছি" ব'লে কতবার সে যে বাড়ীর সকলকে দেখিয়েছে আর তা'র যাবার ভঙ্গী দেখিয়ে হাসিয়েছে তার হিসেব নেই। ঐ অতটুকু বয়সে ইস্কুলে পড়্‌বে কি? বাড়ীতেই তা'কে থাক্‌তে হয়।

ভাই-বোনেরা সবাই ইস্কুলে যায় আর সারা দুপুরবেলাটা রাজুর দস্যিপনা বাড়্‌তে থাকে। দুষ্টুমির জন্যে মা'র কাছে কেবল বকুনি খায়। তারপর এক সময় জানালার ধারে এসে রাস্তার লোকজন দেখে। ফিরীওয়ালার নানারকম বিকট হাকডাক শুনে সেই সব নিজে নিজেই ব'লে ক'য়ে আমোদ পায়। এমনি সব নানান খেয়াল নিয়ে দস্যি ছেলে হয়রাণ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রাজুর দাদাদের পূজোর ছুটী, তাই রাজুরও একটা মস্ত বড় ছুটী। এবার দুপুর-বেলাটা ওর একলা কাট্‌বে না। দাদাদের সাথে ও খেল্‌তে পাবে। পূজোয় এবার তা'রা অনেক দিন পরে দেশে এল। রাজুর জন্ম সহরে, কাজেই এর আগে সে গ্রাম দেখে নি। সহুরে রাজু গ্রাম দেখে অবাক্। আনন্দে তা'র মন নেচে উঠ্‌ল—এত বড় আকাশ সে সহরে দেখ্‌তে পায় নি। এত বড় নদী, এত বড় মাঠ, এত খেল্‌বার জায়গা সহরে ঐ একটুখানি দালানের কুটুরীতে সে খুঁজে পায় নি ব'লেই সহর তা'র কাছে মন্দ হ'য়ে গেল। এখানে সে প্রাণভ'রে ছুটোছুটি কর্‌তে পারে—লম্বা লম্বা দৌড় দিতে পারে।

তা'দের বাড়ীর কাছ দিয়ে কত লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে যায়—তারপর আস্তে আস্তে ঐ দূরের গ্রামগুলোর ভিতর তা'রা মিলিয়ে যায়। রাজুর ঠাকু'মার কাছে শোনা রাজপুত্রের ঘোড়ার কথা তা'র মনে আসে। এমনি ক'রে রাজু তা'দের গ্রামখানিকে ভালবেসে ফেল্‌লে। সে যেন রূপকথার দেশের খোঁজ পেয়ে গেল!

সহরের বাড়ীতে যেমন একটু বেরুতে যাবে কি অমনি মানা! এই বুঝি গাড়ী-ঘোড়ার চাপা পড়্‌ল—না হয় ভীড়ের ভিতর হারিয়ে গেল! রাজু বুঝি বাড়ী চিনে

আস্‌তে পার্‌লে না! দেশের বাড়ীতে এক পুকুর-ঘাটে যাওয়া বারণ; তা' ছাড়া অন্য কোথায়ও যাওয়াতে তা'র নিষেধ নেই। তাই তা'র আনন্দের সীমা নেই।

বাড়ীতে এসে রাজু কত রকমের খেলা শিখেছে। খেলা যে এত রকমের থাক্‌তে পারে রাজু সেটা ভাব্‌তেও পারে নি। আর সে পার্‌বেই বা কেমন ক'রে—সহরে তো পায়রার খোপের মত ছোট্ট বাড়ীর একটা কোণে ওর খেল্‌বার জায়গা! তাতে অনেক রকমের পুতুল, দম-দেওয়া মোটরগাড়ী, নানান রকম খেলনা থাক্‌লেও ওসব আর এখন তা'কে আনন্দ দেয় না।

এত খোলা জায়গা, এত সুন্দর গ্রাম, মাঠ, নদী, ঝুম্‌কো-জবার গাছের তলায় পুতুল-ঘর, কাঠ-টগরের ডালে দোলনা খাওয়া, ঝুম্‌কো-জবাফুল কানে গুঁজে ধিন্‌-তা-ধিনা নাচের মজা, এত খোলা বাতাসে প্রাণ খুলে দৌড়ান এর পূর্ব্বে সে কখনও পায় নি!

সাঁজের বেলায় চারদিক যখন অন্ধকার হ'য়ে আসে তখন রাজুর ঠাকু'মা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিতে আসেন—ওরা সবাই ঠাকু'মাকে ঘিরে গান গায়। ঠাকু'মার মত ওরাও তুলসীতলায় প্রণাম করে। এ সব যে কর্‌তে হয় সহরে থাক্‌তে রাজু তা' দেখে নি!

সান্ধ্য প্রদীপ দিয়ে—ঠাকু'মা বসেন নাতি-নাতিনী নিয়ে নানান রকম গল্প বল্‌তে; বাঘ-ভাল্লুকের গল্প—রূপকথার গল্প—আরও কত কি গল্প হয়! ঠাকু'মা কত রকমের গল্প যে জানেন তা' ভেবেই রাজু অবাক্। একমনে সে ঠাকু'মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে এই তো সেই রূপকথার দেশ। ঐ যে দূরে—অন্ধকারে ছায়ার মত বাঁশগাছগুলো বাতাসে হেলে দুলে ডাক্‌ছে, রাজুর মনে হয় তা'রা যেন রাত্রিতে বাঁশগাছ থাকে না—সবাই যেন দত্যি-দানবের বৌ। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়ে তা'কে সবাই যেন ডাক্‌ছে। রাজুর ভয় ডর নেই, ঠাকু'মার কোলে থেকেই পিট্‌ পিট্‌ ক'রে সেই দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে পায় ঐ বাঁশগাছগুলোর পেছনে আরও দূরে একটা তালগাছ। রাত্রের অন্ধকারে ও তালগাছটাকে ঠিক চিন্‌তে পারে না—ভাবে একটা দত্যি এক পায়ে দাড়িয়ে আছে। রাজুরা ভাই-বোনে এমনিভাবে প্রতিদিন ঠাকু'মার মুখে রূপকথা শুনে। কোথা দিয়ে রাত্রি হ'য়ে যায় কা'রও খেয়াল থাকে না—এতই তা'রা গল্পে মেতে থাকে।

রূপকথা শুনে রাজুর মনে জাগে নানান কথা—মনে হয় পরীর দেশটা ঐ গ্রামগুলোর পেছনে ঐ যে নীল আকাশ সেখানটাতে হবে নিশ্চয়ই। একবার

সে-দেশে যেতে পার্‌লে কতই না মজা হয়। সবাইকে পরীর দেশের খবরটা ব'লে সে বাহাদুরী নিতে পারে। এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাজুর মনে হ'ল সে যেন বাগানে পায়চারী কর্‌ছে। তারপর সে বাগানের দরজায় দাড়াতেই চোখের সাম্‌নে যা দেখ্‌লে তাতে সে অবাক্ না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লে না।

পরীর দেশের ছোট ছোট খোকাখুকুরা আজ তা'র এত সাম্‌নে এসে সত্যি সত্যি তা'র সাথে কথা কইছে! সে তো আগেই ব'লেছিল —ঐ যে দূরে নীল আকাশ ঐখানে থাকে পরীরা। সে কথা তা'র দিদিরা বিশ্বাসই করে না, কেবল হাসে আর বলে 'ওসব সত্যি নয়, শুধুই গল্প।' তবে কেন আজ ঐ পরীর দেশের ছেলেমেয়েরা তা'র কাছে খেল্‌তে এল!
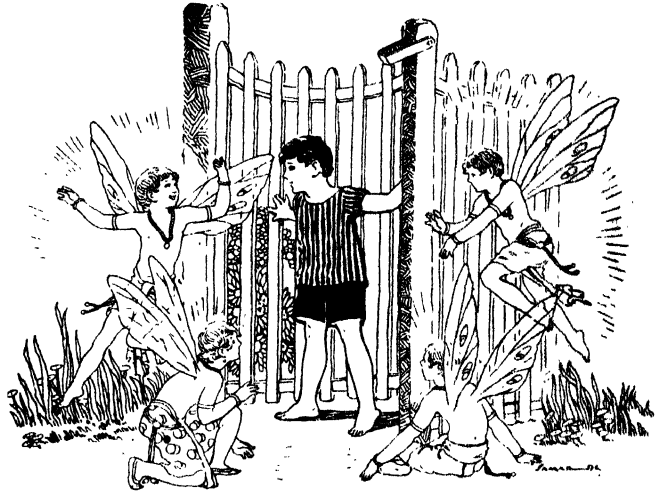
পরীর দেশের খোকাখুকুরা তা'র সাথে কথা কইছে

পরীর দেশের খুকুরা বল্‌লে—"যাবে রাজু, আমাদের দেশে? কত সুন্দর আমাদের দেশ! কত রং-বেরঙের মেঘের ভিতর দিয়ে তোমায় নিয়ে যা'ব আমাদের দেশে। শীগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও, কিন্তু তোমার 'এয়ার গান্‌টা' সঙ্গে নিতে হবে। তোমার তো খুব সাহস আছে। চল মস্ত একটা বাঘ শিকার কর্‌বে আমাদের ওখানে। তুমি বন্দুক নিয়ে এসেছ খবর পেয়েই আমাদের দেশে তোমায় নিতে এলুম।"

রাজু তা'র চোখ দুটি বড় বড় ক'রে অবাক্ হ'য়ে তাদের কথাগুলো শুন্‌লে; তারপর বল্‌লে—"আমার ডানা নেই, তোমাদের মত আকাশে উড়ে' যা'ব কেমন ক'রে? আর ফির্‌তে দেরী হ'লে বাড়ীর সবাই আমায় খুঁজ্‌বে যে!"

খোকাখুকুরা ব'লে উঠ্‌ল—"আমরাও চুপি চুপি চ'লে এসেছি কাউকে না জানিয়ে। চল দেরী হ'য়ে গেলে আবার আমাদেরও খোঁজ প'ড়ে যাবে। কতক্ষণই

বা লাগ্‌বে সময়? কত তাড়াতাড়ি আকাশ দিয়ে আমরা চলি তুমি ভাব্‌তেই পার না। আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যা'ব, হাত ধরাধরি ক'রে ধ'রে নিলে তোমার ডানার দরকার হবে না। এক ছুটে যাবে—আমাদের দেশটা একটু দেখ্‌বে, আর বাঘটা মার্‌বে শুধু। এইবার বন্দুকটা নিয়ে চল শীগ্‌গির।"

রাজু পরীর দেশে যাচ্ছে আজ পালিয়ে—কাউকে জানিয়ে যেতে পার্‌লে না! তা'র বাহাদুরী দেখানো হ'ল না ভেবে দুঃখ হ'ল মনে। শুধু পশ্চিম আকাশে সূর্য্যিমামা যেন রাজুর কাণ্ড দেখে হাস্‌ছিলেন। রাজু কত মেঘের পর মেঘ পেরিয়ে ছুটে চল্‌ছিল পরীর দেশে। এত উজ্জ্বল রং-বেরঙের মেঘ থাক্‌তে পারে আকাশে রাজু ভাব্‌তেও পারে নি কোনদিন।

পরীর দেশের দারোয়ানটাকে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে

আকাশে উড়তে উড়তে মাটিতে যেই পা ঠেক্‌ল, অমনি পরীর দেশের খোকা-খুকুরা ব'লে উঠ্‌ল—"এই তো আমাদের দেশে এসে পৌঁছে গেলুম।"

এইবার তারার গাছ আরম্ভ হ'ল। গাছে গাছে সব তারা ঝুল্‌ছে। আকাশের মিটিমিটি তারা আজ তা'র চোখের এত কাছে ঝিলিমিলি কর্‌ছে দেখে আনন্দে সে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল।

তা'র হাততালির শব্দে বুড়ো পাহারাওয়ালা ধড়ফড় ক'রে উঠে বস্‌ল। চোখের ঘুম তা'র কপালে উঠ্‌ল। রাজ্যে যে বাঘ এসেছে—ঝিমুলে তা'র চল্‌বে না। খোকাখুকুরা রাজুকে বল্‌লে—"রাজু, শীগ্‌গির এই গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাক; নইলে বুড়ো দারোয়ানটা দেখ্‌তে পেলে আমাদের পালিয়ে বেড়ানো বন্ধ ক'রে দেবে।"

অমনি রাজু একটা গাছের আড়ালে নিজেকে সামলিয়ে পরীর দেশের দারোয়ানটাকে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে; তারপর খোকাখুকুদের বল্‌লে—"কাজ নেই বাপু একদিনে সব

দেখে। শেষে আমার বাড়ী ফিরে যাওয়াটাই বন্ধ হ'য়ে যা'ক আর কি! তার চেয়ে চল বাঘটা মেরে ফেলা যা'ক। আর একদিন ব'লে ক'য়ে সময় নিয়ে এলেই হবে।"

কিছুক্ষণ পাহাড়-জঙ্গল খোঁজাখোঁজি করার পর বাঘ পড়্ল বেরিয়ে। অমনি রাজুর এয়ার গান্টা থেকে শব্দ হ'ল—'দুরুম্ দুরুম্'। কি ভীষণ ডোরা-কাটা বাঘ! একটা হালুম ডাক ডাক্তে-না-ডাক্তেই বাঘের কাজ শেষ! বাঘের পা ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল রাজু; সঙ্গে চল্‌ল পরীর দেশের খোকাখুকুরা।

কিন্তু কিছু দূর যেতে-না-যেতেই দুরুম্ দুরুম্ ক'রে আবার আওয়াজ হ'ল—আর অমনি বাঘের কি ভীষণ কান্না!

রাজু বাঘের মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়েই দেখে—ও মা, বাঘ তো নয়! দিদিটাই ডোরা-কাটা শাড়ী প'রে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। আর মা তা'কে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চ'লেছেন খাবার জন্যে।

রাজুরা সবাই ঠাকু'মার কোলে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল—পরীর দেশের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে।

শ্রীসমর দে

বিদ্যুৎ-বন্দনা

বকুল-চাঁপা গাছের ফাঁকে মার্‌লে উঁকি কোন্ জনা?
চপল তুমি, তীক্ষ্ণ তুমি, তোমায় করি বন্দনা।
মিশ্‌মিশে ঐ মেঘের থরে, কালোয় ভরা লিপির পরে,—
কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আঁক্‌ছ রূপার আল্‌পনা!
বর্ষারাণীর হাসির ঝিলিক, তোমায় করি বন্দনা।

নিকষ কালো গভীর জলে ভঙ্গী তোমার মন্দ না,
মাছরাঙ্গা সে শিকার ভোলে, চন্দনা গায় বন্দনা।
তোমার রূপের বাহার দেখে, চাতক আশায় উঠ্‌ল ডেকে,—
অপরাজিতা, বেল, চামেলী, কেতকী হয় উন্মনা;
বর্ষারাণীর দূত তুমি গো, তোমায় করি বন্দনা।

শ্রীষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত

পূজার ছুটি *

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে মামার বাড়ি পৌঁছিয়া অনিমেষ পূর্বরাত্রির কথা সকলকেই বলিয়াছে। তাহার মামাত ভাই মন্টু ত কলির কুম্ভকর্ণের গল্প শুনিয়া হাসিয়াই খুন।

মন্টুর বোন মীনার বয়স ন' বছর হইলেও কথাবার্ত্তায় সে পাকা গিন্নীর মতই। তাই তাহার বাবা তাহাকে 'মা-গিন্নী' বলিয়া ডাকেন। সে অনুদা'র গল্প শুনিয়া খুব মুরব্বির চালে একটা মন্তব্য করিয়া বসিল; বলিল—"সাহেব দুটো একেবারে বোকা—যাকে বলে হস্তিমূর্খ।" 'হস্তিমূর্খ' কথাটা মাত্র এক সপ্তাহ আগে সে শিখিয়াছে।

অনিমেষ বলিল—"কেন? বোকা দেখলে কিসে?"

মীনা বলিল—"বোকা নয় তো কি? ঘুম যার সহজে ভাঙে না তার ঘুম কি অমনি ক'রে ভাঙতে হয়?

—"তবে আবার কেমন ক'রে ভাঙবে?" অনিমেষ ও মন্টু দুইজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

মীনা বলিল—"কেন? এক পয়সার 'র' পরিমল নস্যি রাখতে পারে না ওরা?"

এমন সময় অনিমেষের মামা প্রিয়ব্রতবাবু হাসিতে হাসিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কি মা-গিন্নী! আবার কার নাকে নস্যি দেবার মতলব হচ্ছে। তোমার নস্যির জ্বালায় পুষিটার ত হেঁচে হেঁচে সর্দ্দি হয়ে গেল।" তাহার পর মন্টুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওরে মন্টু, বেলা যে সাড়ে ন'টা হ'ল। চান টান ক'রে খেয়ে নে। অনু কাল সারারাত একটুও ঘুমোয় নি—ত্রিদিবেশ ব'ল্লে। দুপুরটা ওকে একটু ঘুমতে দিস। বিকেলে পরেশনাথের মন্দির দেখতে নিয়ে যাব'খন।" তাঁহার কথায় সকলে উৎফুল্ল হইয়া তখনকার মত সভাভঙ্গ করিল।

অনিমেষ যখন উপরের ঘরে শুইতে গেল, তখন বেলা প্রায় বারোটা কি সাড়ে বারোটা এমনি হবে। মন্টুর মামীমা সকলকে বলিয়া দিলেন বেলা তিনটার আগে কেহ যেন অনুকে না জাগায়। অনুর যে ঘুমাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাহা নয়, কিন্তু মামাবাবু ও মামীমার কথা সে তো অমান্য করিতে পারে না। তাই সে বিছানায় পড়িয়া

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী লিখিত।

গড়াইতে লাগিল। আধঘণ্টা যাবৎ এপাশ ওপাশ করিতে করিতে তাহার চোখে সেই সবে তন্দ্রা আসে আসে করিতেছে, ঠিক এমনি সময় শব্দ হইল,—ঢং………

অনিমেষ ভাবিতেছিল পাশের ঘর হইতেই ঘড়ির আওয়াজ আসিয়াছে নিশ্চয়ই। ঐ বাক্সটায় আবার শব্দ হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু শব্দ তো দূরের কথা—তাহাকে দ্বিগুণ বিস্মিত করিয়া বাক্সটা কথা বলিয়া উঠিল! ভয়ে অনিমেষের গলা কাঠ হইয়া আসিল। সে চেঁচাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া একটুও শব্দ বাহির হইল না।

এদিকে বাক্স তখন গান সুরু করিয়া দিয়াছে। গ্রামের ছেলে অনিমেষ ভূতের গল্প অনেক শুনিয়াছে। কিন্তু দিনে দুপুরে ভূতেরা উপদ্রব করে এমন কথা তো সে কখনও শুনে নাই। হইবেও বা—সহরের ভূতের হয়ত সাহস বেশি। সহরের সবই তো আলাদা, ভূতও বা অন্যরকম না হইবে কেন? অনু মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল, কিন্তু তবু গান থামিল না। একটার পর একটা করিয়া গান চলিল। অনু ভাবিল—সহরের ভূত কিনা, তাই রাম-নামকে গ্রাহ্য করে না। ইহাদের ভয় দেখাইবার জন্য বোধ হয় অন্য কোন নাম আছে। কিন্তু সে তো তাহা জানে না।

ততক্ষণে তিনটা গান শেষ হইয়া গিয়াছে। অনু দেখিল, এদেশের ভূতের ব্যবহার ভাল। ইহারা গানই করে, ছোট ছেলের রক্ত-মাংসের উপর ইহাদের কোন লোভ নাই। ধীরে ধীরে তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল। সে উঠি উঠি করিতেছে, ঠিক এমনি সময় দরজাটি খুলিয়া গেল। প্রথমে অনু চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভয়ের কিছুই কারণ ছিল না। দরজা ঠেলিয়া যে ভিতরে ঢুকিল সে ব্রহ্মদত্যিও নয় বা মাম্‌দো ভূতও নয়—সে মীনা। মীনা চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"অনুদা, মা-বাবা তোমাকে জাগাতে বারণ

করেছেন। কিন্তু কি করি বল ? লুডো খেলার সঙ্গী পাচ্ছি না। ছাদের ঘরে ছোটদা ব'সে আছে ; তোমাকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলে।”

অনু ঘর ছাড়িতে পারিলে বাঁচে। লুডো খেলাটা কি রকম তাহা না জানিলেও সে তৎক্ষণাৎ মীনার প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল। মীনা ঘর হইতে বাহির হইবার সময় খুট্ করিয়া কি একটা কল টিপিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গানও থামিয়া গেল।

চলিতে চলিতে অনু জিজ্ঞাসা করিল—“ওটাতে কি আছে মীনা ?”

—“কোন্‌টাতে ?”

—“ঐ যে বাক্সটা—যেটাতে গান হচ্ছিল।”

—“বাক্স আবার কোথায় দেখলে অনুদা ? ওটা যে রেডিও।”

অনু যেন সবই বুঝিল এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল—“ও !” ছোট বোনের কাছে অপদস্থ হইবার ভয়ও তো আছে। সে তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেও তাহার মনে ঐ গানের কথাটা সারাক্ষণই জাগিয়া রহিল।

এটা কি তবে একরকমের কলের গান ? কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া হয় ? কলের গান তো তাহাদের গ্রামের বাড়িতেও আছে। তাহাতে দম দিতে হয়, রেকর্ড বসাইতে হয়, পিন লাগাইতে হয়। তবেই ত সে কল চলে আর এ গান তো আপনা হইতেই হইল ! না, ব্যাপারটা কি ভাল করিয়া জানিতেই হইবে।

বিকালে পরেশনাথের মন্দিরে যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রিয়ব্রতবাবুর আবার বিকালে চা খাইবার অভ্যাস আছে। চা না খাইলে তিনি কিছুতেই বাহির হইবেন না। মণ্টু ও মীনা তাহা ভাল রকমই জানিত। তাই তাহারা নিজেরাই বাবার চা তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। উনান ধরানর হাঙ্গামা নাই। তারের পাক দেওয়া একটা উনানের মত জিনিস, খুট করিয়া একটা সুইচ টিপিয়া দিতেই সেটা লাল হইয়া উঠিল। তাহার উপর কেটলি চড়াইয়া দিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জল ফুটিয়া গেল। মণ্টুর মুখে অনু শুনিয়াছিল ঐ উনানটার নাম ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ অর্থাৎ বিদ্যুতের উনান।

বিদ্যুতের উনান! সে এতদিন জানিত বিদ্যুতে শুধু আলোই জ্বলে। যেদিন তাহার বাবা তাহাকে একটি টর্চলাইট কিনিয়া দিয়াছিলেন সেদিন তাহার কি আনন্দই না হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! একটা বোতাম টিপিলেই হইল। না আছে তেল, না আছে প্রদীপ, না আছে দিয়াশলাই—অথচ দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। ট্রেনে সে ইলেক্‌ট্রিকের আলো দেখিয়াছে। সে আলোর বাল্‌ব্‌গুলা তাহার টর্চের বাল্‌বের চেয়ে অনেক বড়। মামার বাড়ীতে আসিয়া দেখিল আরও বড় বড় আলো দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। রাত্রি হইলে সেগুলা জ্বলিবে।

ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ

পথে চলিতে চলিতে অনু দেখিল, রাস্তায় লোহার রেল পাতা আছে তাহার উপর দিয়া এক এক জোড়া গাড়ি [illegible]তিন মিনিট অন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে। সে বলিয়া ফেলিল—"বাঃ বেশ ছোট ছোট রেলগাড়ি তো! আমরা যে গাড়িতে কাল এলাম সেটা কি বড়!"

ট্রামগাড়ি

মণ্টু হাসিয়া বলিল—"রেলগাড়ি কি অনুদা? এযে ট্রাম।"
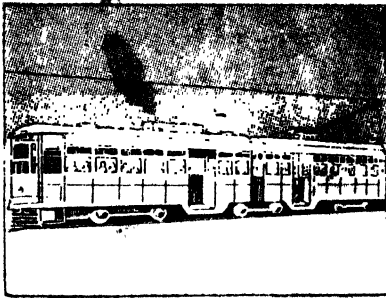
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি মণ্টু অনুর চেয়ে ছয়মাসের ছোট। তাই অনুকে সে দাদা বলে। ছোট ভাইয়ের কাছে অজ্ঞতা প্রকাশ হওয়ায় অনু একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। অনুর মামা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল তো মণ্টু, ট্রেনকে আমরা রেলগাড়ি বলি কেন?"

মণ্টু তাহার জবাব দিতে পারিল না। অনু ও মানাও চুপ করিয়া রহিল। তখন

অনুর মামা বলিতে লাগিলেন—"ঐ যে রাস্তার উপর লোহার লাইনগুলা পাতা আছে দেখছ, ওগুলাকে ইংরেজিতে বলে রেল (rail)। রেল পাতা রাস্তার উপর যে গাড়ি চলে তাহার নাম রেলওয়ে ট্রেন (railway train)। আমরা ঘরোয়া কথায় তাকেই রেলগাড়ি বলি। সে হিসেবে ট্রেনও রেলগাড়ি, আর ট্রামও রেলগাড়ি।"

মণ্টু বলিল—"কিন্তু বাবা, আমরা তো ট্রামকে কখনও রেলগাড়ি বলি না।"

—"বলি না তার কারণ আমাদের দেশে ট্রেনটাই আগে চলে। ট্রাম হয় তার অনেক পরে। ট্রাম যখন হয়, তখন ট্রেনের নাম রেলগাড়ি ব'লে প্রচলিত হয়ে গেছে। সেইজন্যে ট্রামকে আর সে নাম দেওয়া গেল না।"

অনুও তখন আলোচনায় যোগ না দিয়া পারিল না। সে বলিল—"আচ্ছা মামাবাবু ট্রেন ত স্টিমে চলে?"

—"হাঁ ট্রেন স্টিমে চলে, কিন্তু ট্রাম চলে বিদ্যুতে। ঐ যে উপরে একটা তার টাঙান আছে ওটা বিদ্যুতের তার। আর বাঙলা রেফের মত ট্রামের উপর থেকে একটা মস্ত বড় রড উঁচু হ'য়ে ঐ তারটা ছুঁয়ে রয়েছে দেখছ! বিদ্যুৎটা আসছে ওরই মধ্যে দিয়ে, তাই গাড়ি চলছে। ওটা তার থেকে সরে গেলেই গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।"
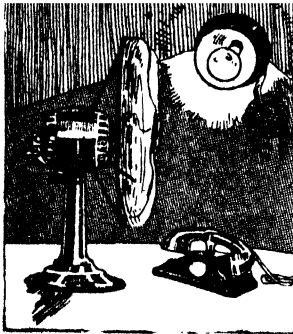
বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো

অনু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বিদ্যুতে গাড়িও চলে? বিদ্যুতে আলো জ্বলে এইমাত্র জানতাম। আজ দেখলাম মীনা আর মণ্টু বিদ্যুতের উনানে আপনার চা তৈরি করলে। আপনার বসবার ঘরে আজ সকালে ব'সে ব'সে বিদ্যুতের হাওয়াও খেলাম। এখন দেখছি বিদ্যুতে হয় না এমন কোনও কাজই নেই।"

মীনা এতক্ষণ কেবল শুনিয়াই যাইতেছিল। সে বলিল—"আর আজ যে সারা দুপুর রেডিওর গান শুনলে, সেও তো বিদ্যুতে চলে। তার কথাটা বুঝি মনে পড়ল না? তিন ঘণ্টা আগেকার কথাটা ভুলে গেলে? ইস্কুলের পড়া মনে রাখ কি ক'রে?"

মীনা এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলা বলিয়া গেল যে, কে বলিবে তাহার বয়স নয় বছর? তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

কলিকাতায় লীগ্ খেলা

অন্যান্য বছরের মত এবছরও কলিকাতায় ফুটবল খেলা চ'লেছে পুরাদমে। লীগের আদ্ধেকটা শেষ হ'য়েছে, কিন্তু যে রকম খেলা আশা করা গিয়েছিল তেমনটি হয় নি; অথচ সকল টীমেই 'বাঘা বাঘা' সব খেলোয়াড়। এবার খেলার চেয়ে যেন আস্ফালনটাই বেশী। খেলোয়াড় হিসাবে মোহনবাগানকে প্রথমটা সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী ব'লে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু খেলার বহর দেখে সকলকেই অত্যন্ত হতাশ হ'তে হ'য়েছে। এমন গোলকাণা ফরোয়ার্ড্ কলিকাতায় কেন মফঃস্বলেও খুব বেশী আছে ব'লে মনে হয় না। লীগ্ খেলার প্রথম বিভাগের ফলাফলের যে তালিকা দেয়া হ'ল তা' থেকেই কা'র কত ক্ষমতা তোমরা বুঝতে পার্বে। ইষ্ট বেঙ্গলও খুব সুবিধা কর্তে পারে নি যদিও এরিয়ান্স্‌কে পাঁচ পাঁচটি গোল দিয়েছে। এরিয়ান্স্ এবার অত্যন্ত দুর্ব্বল। কালীঘাট টীম এবার মোটের উপর শক্তিশালী। এ টীমে বাঙালী আছে, ইংরাজ আছে, অবাঙালী মুসলমান আছে, শিখ আছে, এমন কি ব্রহ্মদেশের খেলোয়াড়ও আছে। এই অষ্টবজ্র সম্মিলন ক'রেও মহামেডান্ স্পোর্টিংএর কাছে ছয় ছয়টি গোল খেতে হ'য়েছে। এতগুলো গোল খেয়ে কালীঘাটের চৈতন্য হ'য়েছে, এখন খেল্‌ছে ভালই। ভবানীপুর এ বছর এই প্রথম 'এ' ডিবিসনে এসেছে, নতুন হ'লেও এক মহামেডান্ স্পোর্টিং ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় টীমের চেয়ে ঢের ভাল খেল্‌ছে।

তোমরা সকলেই জান যে, ফুটবলের যাদুকর সামাদের পা গেলবারে ইষ্ট্ বেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। সামাদ এবারে সেই ভাঙ্গা পা নিয়েও খেল্‌ছেন এবং দু'টি খেলায় দু'টি গোলও দিয়েছেন। সামাদ বাঙালী, প্রায় ২৫ বছর একটানা একই ভাবে ফুটবল খেল্‌তে আর কোন বাঙালী পারেন নি। সামাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বে বাঙালী মাত্রেই গৌরব বোধ কর্‌বেন নিশ্চয়।

ভারতীয় টীমগুলোর মধ্যে মহামেডান্ স্পোর্টিংই প্রথম লীগ্ চ্যাম্পিয়ান্, একথা তোমাদের বেশ জানা আছে। শুধু একবার নয়, পর পর তিনবার তাঁ'রা এই সম্মানের অধিকারী হ'য়েছেন। এ বছরও যদি তাঁ'রা চ্যাম্পিয়ান্ হ'তে পারেন তা' হ'লে সারা ভারতবর্ষে এমন একটি রেকর্ড স্থাপন কর্‌বেন যা' অন্য যে কোন টীমের পক্ষে আকাশ-কুসুম ব'লে মনে হবে। মহামেডান্ স্পোর্টিংএর অখিল আমেদ এবার ভবানীপুর টীমে খেল্‌ছেন, অদ্বিতীয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড্ রসিদের পা ভাঙ্গা, একটি ম্যাচেও তিনি খেল্‌তে পারেন নি; নূর মহম্মদের খেলাও প'ড়ে গেছে। এ সত্ত্বেও তাঁ'রা একটি খেলায়ও হারেন নি; এর পরে কি হবে বলা যায় না। এখনও মহামেডান্ স্পোর্টিংই লীগের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছেন।

ইউরোপীয় টীমের মধ্যে ক্যামেরোনিয়ান্‌স্ দলের প্রথম হওয়ার আর ডালহৌসির সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করার সম্ভাবনা খুব বেশী। ক্যালকাটা মোটামুটি ভালই খেল্‌ছে। ক্যাষ্টম্‌স্‌এর খেলা বরাবর যেমন হয় এবারও তেমনি, তাদের খেলা মোটামুটি ভাল।

লীগ্ খেলার ফলাফলের তালিকা

	খেলা	জিত	হার	সমান	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েণ্ট
মহামেডান্ স্পোর্টিং	১১	৭	০	৪	২৭	৬	১৮
ক্যামেরোনিয়ান্‌স্	১১	৭	২	২	১৫	১০	১৬
ভবানীপুর	১১	৬	৩	২	১৭	১৩	১৪
কালীঘাট	১১	৬	৪	১	১৫	১৫	১৩
ক্যালকাটা	১১	৪	৩	৪	১১	৭	১২
ইষ্ট বেঙ্গল	১১	৪	৪	৩	১৮	১৩	১১
ই, বি, রেলওয়ে	১১	২	৩	৬	১১	১২	১০
কাষ্টম্‌স্	১১	৪	৫	২	১২	১৪	১০
কে, ও, এস্, বি	১১	৪	৫	২	১২	২০	১০
মোহনবাগান	১১	৩	৫	৩	৮	১২	৯
এরিয়ান্‌স্	১১	৩	৭	১	১২	২৪	৭
ডালহৌসি	১১	০	৯	২	১০	২২	২

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা

প্রতি বছরের মত এবারেও কলিকাতায় ভারতীয় দলের সহিত ইউরোপীয় দলের ফুটবল খেলা ৫ই জুন হ'য়ে গেছে। খেলাটি মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নি। ভারতীয় দল কোনও রকমে এক গোলে জয়লাভ ক'রেছে।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ধাঁধা

শিল্পী বলেন—এই ছবিতে পাঁচটি লুক্কায়িত মানুষের মুখ আছে
মুখগুলি বাহির কর দেখি!
[এই ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইবে না]

গল্প-প্রতিযোগিতার ফল

[চৈত্র মাস]

গ্রাহকদের মধ্যে—

প্রথম—শ্রীকরুণাময় ভট্টাচার্য্য—পোতাজিয়া, পাবনা (গ্রাহক নং ১৪৭০৬)

দ্বিতীয়—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বনগাঁও, যশোহর (গ্রাহক নং ১৫৩৫০)

গ্রাহিকাদের মধ্যে—

প্রথম—শ্রীমতী কিরণবালা বিশ্বাস—হিন্দপিরী, রাঁচি (গ্রাহক নং ১৪৫৫৬)

দ্বিতীয়—মিস্ রুবি হোসেন—বালীগঞ্জ, কলিকাতা (গ্রাহক নং ৮৫৮০)

তৃতীয়—কুমারী গৌরী বসু—গিরিধি (গ্রাহক নং ১০৪৫)

[গ্রাহিকাদের জন্য একটি পুরস্কার বেশি দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার সমান।]

প্রাপ্তি-স্বীকার

অরুণ—অভিষেক সংখ্যা—সম্পাদক শ্রীবিরিঞ্চিকুমার বরুয়া। নওগাঁ, আসাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

'অরুণ' আসামী ভাষায় মুদ্রিত ছেলেমেয়েদের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে মহামান্য সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের জীবন-কথা ছোটদের জন্য সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি ছবি তো আছেই তা' ছাড়া মলাটের উপরও সম্রাটের একখানা ত্রিবর্ণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press ;
5, College Square, Calcutta.

ষোড়শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৪ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ-সাঁঝে

শ্রাবণ-সাঁঝে উঠ্‌লো বেজে—মেঘের মাদল—গুরু গুরু !
ঘরের কোণে সবার আজি—পরাণ কাঁপে—দুরু দুরু !
বাহির পথে অন্ধকারে— ঝ'ড়ো হাওয়া নৃত্য করে ;
দাপটে তা'র—গাছের পাতা—প'ড়ছে ঝ'রে—ঝুরু ঝুরু ;
শ্রাবণ-মেঘের মাদল বাজে—গভীর নাদে—গুরু গুরু !

সাঁঝের ঘন অন্ধকারে—সুরু হ'লো বরষা-নাচ ;
কাঁপন তুলে' ধরার বুকে—ওই হেঁকে যায় ভীষণ বাজ ।
বাদল-ভরা পুকুর-বিলে— ভেকেরা আজ সবাই মিলে—
উল্লাসেতে গান ধ'রেছে—মুখর করি' শ্রাবণ-সাঁঝ ;
ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌ বাদল নাচে—পুকুর-জলে আঁধার-মাঝ ।

যুঁই, কামিনী, কেয়ার ঝাড়ে—বাদল ঝরে—অঝোর-ঝরে ;
বাদল-বায়ে আস্‌ছে ভেসে গন্ধ—হৃদয় মাতাল করে !
বৃক্ষ-শাখে আপন-নীড়ে— ভিজ্‌ছে পাখী বাদল-নীরে ;
জোনাক্‌-পোকাও ভিজে ভিজে—ক'রছে খেলা পুলক-ভরে ;
শ্রাবণ-সাঁঝে শ্রাবণ ধারা—ঝ'রছে আজি—অঝোর-ঝরে !!

শ্রীস্বর্গচন্দ্র দে

দুষ্টের দণ্ড

ছেঁড়াকাপড়-পরা, হাড়গোড়-বা'র-করা একজন লোক, কাশ্মীরদেশের রাজধানী শ্রীনগর শহরের একপাশে প'ড়ে আছে। আশে-পাশের লোকেরা তা'কে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কচ্ছে—"তোমার কি হ'য়েছে গা ? কি অসুখ ক'রেছে তোমার ?"

লোকটি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে—"আমার কিচ্ছু হয় নি, কোন অসুখ করে নি।"

—"তবে তোমার এমন চেহারা হ'য়েছে কেন ? হাড়গোড় যে বেরিয়ে গেছে !"

লোকটি বল্‌লে—"উপোস ক'রে প'ড়ে আছি ক'দিন, তাই এই চেহারা। কয়েকদিন খেতে পেলেই চেহারাটা সার্‌বে।"

—"আচ্ছা, তোমায় কিছু খাবার এনে দিচ্ছি।"

লোকটি বল্‌লে—"না, না, আমার জন্য খাবার আন্‌তে হবে না। আমি ইচ্ছা ক'রেই না খেয়ে আছি। মহারাজ যশস্কর যতদিন না আমার প্রতি সুবিচার কর্‌বেন, ততদিন অনশনেই কাটা'ব—স্থির ক'রেছি।"

মহারাজ যশস্করের বিচারের আশায় লোকটি যে অনশনে প'ড়ে আছে, এ কথাটি লোকের মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

কথাটা ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর কানেও গেল। অনেকের অনুরোধে মন্ত্রী মশায় রাজাকে বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনার কাছে বিচারের আশায় একটি লোক আজ ক'দিন না খেয়ে প'ড়ে আছে। আপনি যতদিন বিচার না করেন, ততদিন সে না-খেয়েই থাক্‌বে স্থির ক'রেছে।"

রাজা শুনেই বল্‌লেন—"তা'কে তো আগে আমার কাছে নিয়ে এসো। সব শোনা যাক। তা'কে খাওয়াবার চেষ্টা করা যাক।"

রাজ-বাড়ী থেকে লোক গিয়ে তা'কে নিয়ে এল রাজ-সভায়।

খুব ভক্তির সহিত প্রণাম ক'রে লোকটি বল্‌লে—"মহারাজ, আজ আমি বড়ই দরিদ্র হ'য়ে প'ড়েছি, কিন্তু এক সময়ে আমার টাকাকড়ি যথেষ্ট ছিল। তখন আমাকে গাঁয়ের সকলেই মান্‌ত, আমার কথাও বিশ্বাস কর্‌ত, আমার মত ভাল লোক, বিজ্ঞলোক গাঁয়ে আর নেই—এই কথাই সকলে বল্‌ত। অদৃষ্টের ফলে যেমন আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হ'য়ে এল, আমার ঋণও তেমনই বেড়ে গেল। দেনার দায়ে জ্ব'লে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌লাম। মহাজনরা আমাকে পীড়ন কর্‌তে সুরু কর্‌লে।
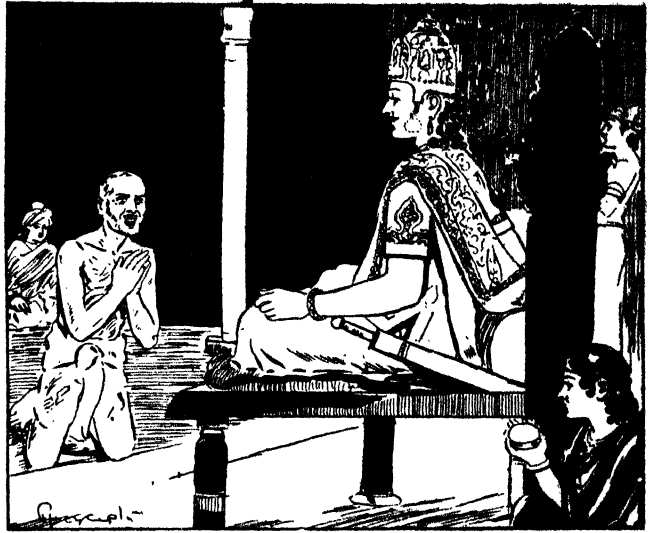
প্রণাম ক'রে লোকটি বল্‌লে……

তখন আর কোন উপায় না দেখে আমার যথাসর্ব্বস্ব একে একে বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌লাম। আমার একটি মন্দির ছিল। এক ধনী বণিককে শেষে সেই মন্দিরটিও বিক্রী কর্‌তে বাধ্য হই ; মন্দিরের পাশেই একটি কূয়া, সেই কূয়ায় নামবার জন্য সিঁড়িও আছে। গ্রীষ্মকালে নানান বাগানের মালী সেই কূয়ায় ফুল আর পাতা রাখে। মালীদের কাছ থেকে সেই জন্য যা পাওয়া যায়, তা'তে আমার স্ত্রীর খাওয়া-পরা চলে। এই জন্য মাত্র কূয়াটি রেখে বাকী সবই বিক্রী ক'রে আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাই।

"দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে আমার একে একে কুড়ি বছর কেটে গেছে। সামান্য কিছু টাকাও উপার্জ্জন ক'রেছি। দেশে ফিরে আস্‌বার জন্য প্রাণটা বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল—তাই ফিরে এলাম। কুড়ি বছর পরে দেশে ফিরে যে কি আনন্দ

পেলাম—তা আর বল্‌তে পারি না।...খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে স্ত্রীকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা'র দেহ জীর্ণ শীর্ণ, পরনের কাপড়খানি যেমন ময়লা তেমনই ছেঁড়া। এক বাড়ীতে দাসীর কাজ ক'রে এই কুড়ি বছর ধ'রে কোনও রকমে সে প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে। বড়ই দুঃখ হ'ল তা'র এই অবস্থা দেখে। জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'আমি তো তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ক'রেই গিয়েছিলাম, এ কি হ'ল তবে?'

"কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সে বল্‌লে, 'তুমি বাড়ী থেকে চ'লে যাওয়ার পর কূয়ার কাছে যেতেই বণিক্ আমায় চ'লে যেতে বল্‌লে। আমি জানি কূয়াটা আমাদেরই আছে, তাই আমি আর সেখান থেকে চ'লে গেলাম না। বণিক্ রেগে তাড়া ক'রে এসে লাঠি দিয়ে আমায় মার্‌লে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেখান থেকে চ'লে এলাম। বল তো তখন আমি কি করি? শেষে পরের বাড়ীতে ঝি হ'য়ে দিনরাত খেটে কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা ক'রে আছি। বল তো আমার আর কোন্ উপায় ছিল ঐ অবস্থায়?'

"মহারাজ, এ কথা শুনে আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। দুঃখে আমার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। বণিক্ ধনী, কাজেই সকলে তার বশ। সে যা বলে সকলেই তাই বলে। যারা আমার কথা সত্য ব'লে জানে, তা'রাও তা'রই কথায় সায় দিলে। এ অবস্থায় আর কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে বিচারের আশায় উপোস আরম্ভ কর্‌লাম।"

রাজা জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"তোমার উপোসে কি প্রয়োজন ছিল? উপোস না কর্‌লে কি আমি বিচার করি না?"

লোকটি অতি নত হ'য়ে উত্তর দিলে—"মহারাজ, নিতান্ত দরিদ্র আমি। সাহস ক'রে আস্‌তেই পারি নি। ভাব্‌লাম উপোস ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে হয়তো আমার কথা মহারাজের কানে পৌঁছবে।"

রাজা বল্‌লেন—"তুমি ভুল ক'রেছ। যাক্, এখন বল দেখি তোমার কথা।"

লোকটি বল্‌তে লাগ্‌ল—"মহারাজ, আমি কূয়াটা বিক্রী করি নি। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমাকে প্রাণদণ্ড দিবেন। আমি বিচারকদের কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা ক'রেছিলাম, কিন্তু তাঁদের কাছে জয় হ'য়েছে বণিকেরই। আজ আমি নিতান্ত দরিদ্র হ'য়ে প'ড়েছি মহারাজ, আজ আর আমার কথা কেউ শোনে না, কেউ বিশ্বাস করে না; বণিকের কথাই বিশ্বাস করে। আমি যদি বড়লোক হ'তাম—আমার কথা

কত লোকেই শুনত! মিথ্যা বল্‌লেও লোকে সায় দিত! আপনি যদি বিচার না করেন মহারাজ, আমি অনাহারে থেকে এখানেই প্রাণ ত্যাগ কর্‌ব।”

কথাগুলো শুনে ভারি দুঃখ হ'ল রাজার মনে। তিনি তা'কে বল্‌লেন—“আচ্ছা, আমি নিজেই বিচারের ভার নিচ্ছি, কিন্তু সময় তো লাগ্‌বে। কাজেই তুমি এখন খেতে পার। না খেয়ে থেকে তো লাভ নেই কিছুই।”

লোকটি দু'হাত যোড় ক'রে বল্‌লে—“মহারাজ, আমায় কিছু খেতে আদেশ কর্‌বেন না। আমি সঙ্কল্প ক'রেছি—যতক্ষণ বিচার শেষ না হয় ততক্ষণ কিছুই খা'ব না। আমার মনের যেটুকু জোর আছে তা'তে মনে হয়—না খেয়ে আরও দু'-একদিন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পার্‌ব।”　　　…　　　…

বণিককে ধ'রে আন্‌বার জন্য তখনই লোক ছুট্‌ল। বিচারকদেরও ডেকে আনা হ'ল। রাজা বিচার কর্‌তে বস্‌লেন।

বিচারকগণ বল্‌লেন—“মহারাজ, আমরা খুব ভাল ক'রেই বিচার ক'রে দেখেছি যে, বণিক্ সত্যি কথাই ব'লেছে।” লোকটিকে দেখিয়ে তাঁরা বল্‌লেন—“এই লোকটি ভারি ধূর্ত্ত। দেখুন মহারাজ, বিক্রীর দলিলে এই তো স্পষ্টই লেখা র'য়েছে—কুয়ার সহিত গৃহ বিক্রয় করা হ'ল। এই লোকটারই শাস্তি হওয়া উচিত।”

এই ব'লে তাঁরা রাজাকে দলিলটি দেখালেন। রাজা প'ড়ে দেখ্‌লেন, কুয়া যে বিক্রী হ'য়েছে দলিলে তা লেখা আছে, তবু যেন তাঁ'র কেমন কেমন লাগ্‌ল। বিচারের কথা ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি অন্য কথা আরম্ভ কর্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি এমন সব গল্প বল্‌লেন—যা শুনে সকলেই খুব হাস্‌ল। বিচার যে হচ্ছে তা সকলেই তখন প্রায় ভুলে গেল। তখন হঠাৎ তিনি বণিকের হাতের মূল্যবান আংটিটি দেখে বল্‌লেন—“ভারি চমৎকার আংটিটি তোমার; দেখি একবার।”

খুব হাসিমুখে বণিক্ তাড়াতাড়ি আংটিটি খুলে রাজার হাতে দিল।

আংটিটি হাতে নিয়ে একটু দেখেই রাজা বল্‌লেন—“আমি আস্‌ছি এখনই। তোমরা একটু ব'স।” ব'লেই রাজা ঢুক্‌লেন আর এক ঘরে।

একজন লোককে সেই ঘরে ডেকে এনে রাজা বল্‌লেন,—“তুমি এই আংটি নিয়ে বণিকের বাড়ীতে এখনি ছুটে যাও। বণিকের হিসাব-লেখককে এই আংটি দিয়ে বল্‌বে,—যে বছর এই গৃহ ক্রয় করার দলিল লেখা হ'য়েছে, সেই বছরের হিসাবের

খাতাটির বিশেষ দরকার। তুমি সেই হিসাবের খাতাটা নিয়ে এখনি ছুটে চ'লে আস্‌বে। আংটি দেখ্‌লেই সে বুঝতে পার্‌বে যে, বণিক্‌ই হিসাবের খাতা চেয়েছে। বিচারে এর প্রয়োজন আছে।"

আংটিটি খুলে রাজার হাতে দিল [১৪৯ পৃষ্ঠা]

বণিকের আংটি পেয়ে হিসাব-লেখক পুরাণো হিসাবের খাতা পাঠিয়ে দিলে। অল্প সময়ের মধ্যেই তা রাজার হাতে এল। রাজার হাতে কুড়ি বছর আগেকার হিসাবের খাতা দেখে বণিকের মনে নানা কথাই জাগ্‌তে লাগ্‌ল।

রাজা দেখ্‌তে পেলেন যে, হিসাবে লেখা র'য়েছে—দলিল-লেখককে দশ শত মুদ্রা দেয়া হ'য়েছে। রাজার ভারি সন্দেহ হ'ল—তাই তো! একটা সামান্য দলিল লেখ্‌বার জন্য এত টাকা দেয়া হ'ল কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা কিছু গোল আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দলিল-লেখককে আনিয়ে বল্‌লেন—"তোমাকে অভয় দিচ্ছি, যদি সত্যি কথা বল—কোন ভয়ের কারণ থাক্‌বে না তোমার, কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বল—তোমার কিছুতেই রক্ষা নেই। একটি মিছে কথা বল্‌লেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে জেনে রাখ। বলতো—বণিক্‌ তোমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলিলে মিথ্যে কথা লিখিয়েছে কি না।"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, একটি মিথ্যে কথা লিখিয়েছে।"

—"কোন্‌ কথাটি মিথ্যে?"

—"মহারাজ, ঐ কুয়ার কথাটি। ঐ কুয়াটাও বিক্রী হ'য়েছে—এই কথাটি আমায় লিখ্‌তে হ'য়েছে। লিখ্‌তে চাই নি মহারাজ, শেষটায় টাকার লোভে রাজী হ'য়েছি। আমি বড়ই গরীব মহারাজ।"

—"তুমি সত্যি কথাই ব'লেছ, সুতরাং তোমাকে মুক্তি দিলাম।"

বিচারকগণ একেবারে হতভম্ব।

রাজা সেই উপবাসী দরিদ্র লোকটিকে বল্‌লেন—"তোমার কথাই সত্যি। তোমার সেই ঘর ও কূয়া তোমাকেই দেয়া গেল। সেই ঘরেই গিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে বাস কর—যাও।"

রাজাকে প্রণাম ক'রে সে বেরিয়ে গেল।

রাজা তখন বণিক্‌কে বল্‌লেন—"তুমি ভীষণ ধূর্ত্ত, ভীষণ বিশ্বাস-ঘাতক। এক জন অসহায়া নারীর উপরে অত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'রেও দামী পোষাক আর হীরার আংটি প'রে বাইরে বেরুতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার অসাধ্য কোন হীনকাজ নেই—তোমার মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। যাক্, ঐ দামী পোষাক নিয়ে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ কর।"

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

তৃপ্তি

মাণিক-মুকুট ভূমে দিনু লুটাইয়া,
কুবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ড দিনু বিলাইয়া,
রতন-খচিত ভূষা ফেলি' দিয়া আজ—
ভিখারীর চির-বাস লইলাম সাজ।
দুঃখিতের অশ্রুভার মুছাবার তরে
পীড়িতের পরিত্রাণে, ফিরি দ্বারে দ্বারে;
দিনান্তে শাকান্ন ভোজ শয্যা ভূমিতল
তবু শান্তি, তবু তৃপ্তি, সুখ স্বর্গফল!
ভোগেতে অতৃপ্তি, শুধু বাড়ায় বাসনা;
ত্যাগেতে পরমানন্দ—পরম সাধনা॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাজকুমার

[৫]

দত্তক দেবার আদত মানে যে কি, অনেক দিন তা' ভালভাবে বুঝতে পারি নি। একজনের ছেলে যে কেমন ক'রে একেবারে অন্যের হ'য়ে যায় এবং কেমন ক'রে যে তা যেতে পারে, আর মা-ই বা কেমন ক'রে নিজের ছেলে অন্যকে একেবারে দিয়ে দিতে পারে, সে সব যেন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মতই ছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে আমার মা যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। আগের মত আমায় আদরও কর্‌তেন না, রাত্রে ত আলাদা বিছানায় শু'তামই, দেখা-শুনাও খুব কমই হ'ত, আবার দেখা হ'লেও—মা যেন ইচ্ছা ক'রেই আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যেতেন। প্রথম প্রথম মা'র এই রকম ব্যবহারে আমার অত্যন্ত দুঃখ হ'ত, পরে মা'র উপর অভিমান এল। শেষটায় সেই অভিমান এত বেশী হ'ল যে, আমিও আর পারতপক্ষে মা'র কাছে ঘেঁস্‌তাম না।

হয়ত দূরে মাকে আস্‌তে দেখেছি, ইচ্ছা হ'ত আগের মত ছুটে গিয়ে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরি—কিন্তু যেতাম না। চোখের কোল দুটো জ্বালা ক'রে জল ছুটে আস্‌ত!...ছুটে অন্যদিকে পালিয়ে যেতাম।

হাতের পোছায় সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে নিতাম।

প্রথম প্রথম একা একা এক ঘরে শুতে বড় ভয় ভয় কর্‌ত। শুতে গিয়ে অনেকক্ষণ কিছুতেই ঘুম আস্‌ত না। খুট্ ক'রে যদি কখন একটা শব্দ শুনেছি—অমনি বুকের মাঝে ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ছে, শুয়ে শুয়েই ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখেছি, কিন্তু যতক্ষণ না ঘুম এসেছে ভয় কাটে নি।

কতদিন এমন ভয় ক'রেছে যে—বিছানায় শুয়েই চোখ বুজে প'ড়ে আছি; চোখ বুজে বুজে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভেবেছি, যেন কাদের দেখেছি—তা'রা দেখ্‌তে ভীষণ, ওই ছাতে মাথা ঠেকেছে, গা ভর্ত্তি বড় বড় বিশ্রী লোম; আগুনের গোলার মত ইয়া-বড় বড় দুটো চোখ, যেন আমারই দিকে চেয়ে আছে, চোখ খুল্‌লেই তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যাবে, আর রক্ষা থাক্‌বে না!

ভয়ে সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে, পাশ ফির্‌তে পর্য্যন্ত সাহস হয় নি, যদি তাদের সঙ্গে গা ঠেকে যায়!

হঠাৎ হয়ত মাসীমা সে ঘরে এসে ঢুকেছেন; ডেকেছেন, 'বিনু!—' আস্তে আস্তে চোখ খুলে চেয়েছি। কেন না ইদানীং আমার নূতন নাম রাখা হ'য়েছিল, 'বিনয়'! কই ঘরে কেউ নেই ত!...কি সব মাথামুণ্ড ভাব্‌ছিলাম।

মাসীমা হয়ত বল্‌তেন—'কি রে ঘুমোস্ নি?—'

—'না ত।'

—'তবে অমন ক'রে চোখ বুজে প'ড়েছিলি যে ?'

হেসে বল্‌তাম,—'অমনি !'

কিন্তু রোজ রোজ এমনি ক'রে ভয় পেয়ে শেষটায় একদিন মাসীমাকে বল্‌লাম,—'একা ঘরে শুতে আমার বড্ড ভয় করে ।—'

সেই রাত থেকেই আমার ঘরে শোবার জন্য সুখদা নামে একজন দাসীকে আদেশ দিলেন। সে আমার ঘরের মেঝেয় শুতে লাগ্‌ল। যতক্ষণ না ঘুম আস্‌ত তার সঙ্গে গল্প কর্‌তাম। তা'রও নাকি দেশের বাড়ীতে আমারই বয়সী একটি ছেলে আছে। সে কেমন দেখ্‌তে—কি কি বই পড়ে, এই সব গল্প সে কর্‌ত, আর আমি শুয়ে শুয়ে শুন্‌তাম। শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তাম।

—'কি রে ঘুমোস্ নি ?'—

বাড়ীর মধ্যে দুটো লোককে আমার ভারি ভাল লাগ্‌ত,—একজন দাসী সুখদা, আর একজন আমাদের রাখাল বংশী। বংশী জাতিতে পাহাড়ী। তা'র যখন নয় বছর বয়স, সেই সময় মেসোমশাই একবার শিলং বেড়াতে গিয়ে ওকে নিয়ে আসেন। সেই হ'তেই ও এ বাড়ীতেই আছে।

তা'র কালো কুচ্‌কুচে রঙ—গাট্টা গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারা। মাথাভরা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরীকাটা চুল—কাঁধের উপর এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে। গলায় একটা রূপার হাসুলী।

চমৎকার সে বাঁশী বাজা'ত।

জ্যোৎস্না রাত্রে প্রায়ই সে দীঘির চাতলে ব'সে বাঁশী বাজা'ত। অনেক দিন রাত্রে তা'র বাঁশী শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারি নি—কে বাজায়। সেদিন রাত্রে যখন শুয়ে শুয়ে সুখদার সঙ্গে গল্প কর্‌ছি—হঠাৎ সেই বাঁশীর সুর কানে এল। সুখদাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'কে বাঁশী বাজায় ?'

—'ওতো বংশী !—'

—'বংশী ! সে কে ?—'

—'রাজাবাবুর চাকর !—'

—'কই ওকে ত কোন দিন দেখি নি!—'

—'বাড়ীর বাইরেই ও থাকে। রাজাবাবুর ঘোড়া দেখে, আর খায় দায় বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়!'

পরের দিন রবিবার থাকায় স্কুল বন্ধ। একজন লোক দিয়ে বংশীকে ডেকে পাঠালাম!...

খানিক পরে কে ডাক্‌ল,—'রাজকুমার!—'

চেয়ে দেখি দরজার উপর দাঁড়িয়ে উচু লম্বায় প্রায় আমারই সমান একটি ছেলে। ছেলেটি বল্‌লে,—'তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?—'

তা'র সুন্দর দেহের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ছিলাম। মাথা হেলিয়ে বল্‌লাম,—'হাঁ; তোমার নাম বংশী?—'

'হাঁ।—' ব'লে সে দাঁত বের ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল। কী সুন্দর তা'র হাসি! কালো চুলের পাশে একটা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের থোবা গোজা। ডান বগলে একটা বাঁশের বাঁশী!

'তোমার নাম বংশী?'
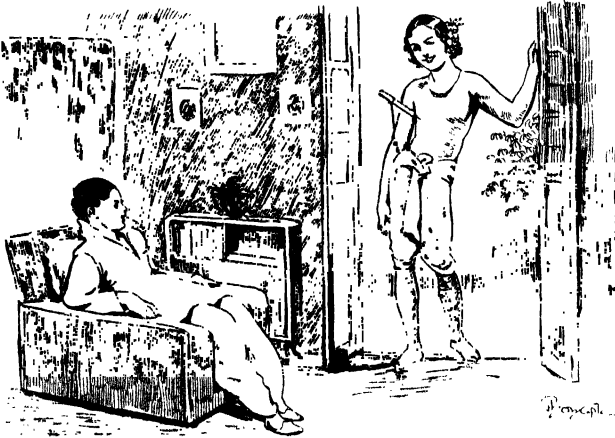
বল্‌লাম,—'তোমার বাঁশী শোনার জন্য তোমায় ডেকেছি, আমায় বাঁশী শোনাবে?'

—'খুব।—'

—'তবে আজ সন্ধ্যা-বেলা আস্‌বে ত?'

'আস্‌ব' ব'লে সে চ'লে গেল। এর পর থেকে প্রায় রাতে সে অনেকক্ষণ ধ'রে আমায় বাঁশী শুনিয়ে যেত।

এক একদিন বাঁশী শুন্‌তে শুন্‌তে কত রাত হ'য়ে গেছে। সুখদা এসে ডেকেছে—'রাজকুমার, শুতে চল। আর রাত কর্‌লে রাণীমা বকবেন। আমি বংশীকে সে রাতের মত বিদায় দিয়ে শুতে গেছি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নেও আমার দু'কানে বাঁশীর সুর থামে নি।

[৬]

একদিন শুতে এসে সুখদা আমায় বল্‌লে,—'রাজকুমার, আর তুমি রাণীমাকে মাসীমা ব'লে ডেকো না, এবার থেকে মা ব'লে ডেকো, এখন উনিই ত তোমার আসল মা!'

আমি হেসে জবাব দিলাম,—'দূর! তুই একদম বোকা। উনি আমার মা হবেন কেন? উনি ত মাসীমা। কেন—তুই কি আমার মাকে দেখিস্‌ নি?'

—'হাঁ; আগে উনি তোমার মা-ই ছিলেন বটে, কিন্তু আজ ত আর উনি তোমার মা নেই, তোমায় যে দিয়ে দিয়েছেন!…'

'দিয়ে দিয়েছেন'—ধ্বক্ ক'রে কথাটা আমার বুকে এসে বাজ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন কেমন হ'য়ে গেল।

কয়েক মাস আগের একটা দিনের কথা সহসা আমার মনের মাঝে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজের মাকে বাদ দিয়ে আর একজনকে মা ব'লে ডাক্‌ব—এ কিছুতেই আমার মন সায় দিল না। আর কেনই বা মাসীকে মা ব'লে ডাক্‌তে যা'ব; কী-ই বা তার দরকার!

……কিন্তু এর পর থেকে শুধু সুখদা কেন, অনেকেই আমায় মাসীমাকে মা ব'লে ডাক্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল। এমন কি শেষটায় মাসীমাও একদিন তাই বল্‌লেন।

সব কথা একদিন মাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব ঠিক কর্‌লাম। একদিন রাত্রে মা শোয়ার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। মা বল্‌লেন—'কে রে?'

—'আমি নিমাই।—'

দরজা খুলে গেল। মাও আমায় বুকের মাঝে টেনে নিলেন। আজ কতদিন পরে মাকে কাছে পেয়ে আমার চোখ জলে ভ'রে গেল। কতক্ষণ এইভাবে থাকার পর মা আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌লেন, তারপর ডাক্‌লেন,—'নিমাই!'

—'মা, চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই!…'

—'তা আর আজ হয় না বাবা, তোমাকে আজ আমি অন্যের হাতে বিলিয়ে দিয়েছি!—'

—'কিন্তু কেন? কেন আমায় ওদের দিয়ে দিলে মা!…আমি ত' তা'দের হ'ব না, কিছুতেই হ'ব না—দেখে নিও।—'

আমার মাথায় চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে মা বল্‌লেন—'তোরই ভালর জন্য আমি তোকে দিয়েছি বাবা! লেখাপড়া শিখে বড় হবি, সকলে কত ভাল বল্‌বে।'

—'এখানে থেকে আমি ভালও হ'তে চাই না, বড়ও হ'তে চাই না। আমাদের সেখানে—সেই হরিণগাঁয়ে—ফিরে চল মা। সেখানে গিয়ে আমি বড় হ'ব, ভালও হ'ব।'

—'কিন্তু তোর মা যে বড় গরীব বাবা, তোকে পড়াবার টাকা কোথায় পা'ব?…'

—'আচ্ছা তুমি মাসীমা'র কাছ থেকে অনেক টাকা চেয়ে নাও না কেন? তাঁর ত কত টাকা! পরে আমি বড় হ'লে সব আবার শোধ ক'রে দিও।…'

—'শুধু শুধু সে আমাদের টাকা দেবে কেন?…'

—'বাঃ রে এ বুঝি শুধু শুধু! বোনকে বোন টাকা দেবে!…আমার ছোট বোনকে আমি টাকা দেবো না?…'

—'সবাই কি বোনদের টাকা দেয়? দেয় না।—'

—'তুমি চেয়ে দেখ না কেন একদিন,—বেশ আমিই না হয় কাল চাইব, আমায় ত' তিনি খুব ভালবাসেন—নিশ্চয়ই দেবেন, দেখে নিও।'

—'ছিঃ বাবা, কা'রও কাছে কখনও কিছু চাইতে নেই!…ভগবান তা'তে অসন্তুষ্ট হন।'

তারপর একথা সে কথার পর বল্‌লাম,—'তাই ব'লে মাসীমাকে আমি কিছুতেই মা ব'লে ডাক্‌তে পার্‌ব না!'

—'মাসীমা আর মা—এর মধ্যে তফাৎ ত কিছু নেই বাবা; মা'র বয়সী সকলকেই মা বলা যেতে পারে! তুমি ত তাকে মাসীমা ব'লেই ডাক, এখন হ'তে সেই মাসীমার মাসী বাদ দিয়ে শুধু মা ব'লে ডেকো।…আর কারও মনে কখনও কষ্ট দিতে নেই। তুমি যদি তাকে মা ব'লে না ডাক, তবে তিনি তোমার উপর কত অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর তুমি তাকে মা বল্‌তে পার্‌বে না?—'

—'আচ্ছা সে না হয় দেখা যাবে!…কিন্তু তাই ব'লে তুমি কিন্তু আমার সত্যিকারেরই মা! আর সে আমার মিথ্যেকারের মা।…'

আমার কথায় মা হেসে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন,—'ওরে পাগল, মা আবার কখন সত্যিকারের আর মিথ্যেকারের হ'তে পারে রে? মা মা-ই আর কিছু নয়।—'

—'তুমি কিন্তু আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পার্‌বে না; তা' হ'লে আমি ভারি রাগ কর্‌ব! মাঝে মাঝে কেন তুমি এমন দুষ্টু মা হও বলত?—'

মা আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না। হঠাৎ আমার হাতে এক ফোঁটা গরম জল পড়্‌তেই চম্‌কে উঠ্‌লাম; বল্‌লাম,—'একি মা, তুমি কাঁদ্‌ছ?—'

মা জবাব দিলেন,—'না বাবা, কাঁদি নি ত!—'

—'আজ আর উপরে শুতে যা'ব না মা, আজ এখানে তোমার কাছেই শোব, কতদিন তোমার কাছটিতে তোমার গলা জড়িয়ে শুই নি বলত?'

…সে রাতে আর উপরে গেলাম না। মা'র গলা জড়িয়ে তাঁর বিছানাতেই শুয়ে—অনেক দিন পরে পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু আশ্চর্য্য—পরের দিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ল—চেয়ে দেখি আমি আমার ঘরে আমার রোজকার বিছানায়ই শুয়ে আছি!

গত রাত্রের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে নীচে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম।

[৭]

এর পর থেকে মা যেন আবার আস্তে আস্তে আগের মতই হ'য়ে যেতে লাগ্‌লেন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য ক'রেছিলাম,—দিনের বেলা তত যেন তিনি আমার কাছে ঘেঁস্‌তেন না, কিন্তু রাত্রে দেখা হ'লেই আমায় আগের মতই আদর ক'রে বুকে টেনে নিতেন। সেই

রাতের পর হ'তে প্রায়ই আমি রাত্রে মা'র ঘরে গিয়ে শুতাম। সেদিনও অনেক রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়্‌লে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে নিজের ঘর থেকে বের হ'য়ে নীচের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পেছন থেকে মাসীমার গলা শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম।

মাসীমা গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লেন,—'বিনয়!—'

মাসীমার এত গম্ভীর গলা এর আগে আর কখনও শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না।

হাঁ বল্‌তে ভুলে গেছি—মা'র সঙ্গে কথা হওয়ার দিন থেকে আমি মাসীমাকে মা ব'লেই ডাক্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলাম। মাসীমাও তা'তে আমার উপর বেশ খুসী হ'য়েছিলেন। মাসীমা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—'এত রাত্রে কোথায় চ'লেছ?···শুতে যাও!···'

আমি আবার এক পা এক পা ক'রে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম।

সুখদা ঘরের মধ্যে মাটীতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, মাসীমা ঘরে ঢুকে তা'কে ঘুম থেকে তুলে আচ্ছা ক'রে ব'কে গেলেন। কেন সে আমার দিকে নজর রাখে না ইত্যাদি ইত্যাদি!···আর যাবার সময় আমায় ঘুমোতে ব'লে গেলেন।···

আজও আমার মনে আছে—সেই সারাটা রাতই আমি শুধু 'মা মা' ক'রে কেঁদেছিলাম।

···পরের দিন বিকালের দিকে স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে খেল্‌তে বেরুচ্ছি হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালাম। মা বল্‌লেন,—'নিমাই শোন।'

'কী মা?' ব'লে আমি এগিয়ে গেলাম।

—'তুই আর যখন তখন আমার কাছে অমন ক'রে যাস্ না বাবা!···আমি ত সব সময়ই তোর কাছে কাছে আছি। তবে কেন আমার কাছে যাবার জন্য অত ব্যস্ত হোস্ বাবা?—'

সেদিন বুঝি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কত দুঃখে মা আমার—ঐ কথা ব'লেছিলেন!

···ব্যাকুল মন আমার সর্ব্বদাই মা'র কাছে ছুটে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করত! কিন্তু যেতাম না। মা যে তা' হ'লে আমার উপর রাগ করবেন। কত সময় একা একা ব'সে কেঁদেছি। দূর হ'তে মাকে দেখেছি, কিন্তু কাছে যেতে পাই নি!···যাবার উপায় নেই!

মাকে এইভাবে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আমি এ বাড়ীর কাউকেই আর ভাল চোখে দেখ্‌তাম না। ওরা যেমন আমাকে মা'র কাছে যেতে দিত না, আমিও তেমন ওদের কাছে ঘেঁসতাম না।

একদিন মাসীমা আমার এই ছাড়া ছাড়া ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার মন কী ভাল নেই বিনু?—'

—'কেন মা, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?—'

—'না এমনি, তুমি সব সময়ই গম্ভীর হ'য়ে বেড়াও!—'

—'ও অমনি !…ছুটীর দিন—সারাদিন বাড়ীতে ভাল লাগে না।…'

—'বেশ ত, দেওঘরে আমাদের একটা বাড়ী আছে, ওর সঙ্গে সেইখানেই গিয়ে দিনকতক ঘুরে এস না ?—'

…পরের দিন থেকেই আমাদের দেওঘর যাত্রার সব আয়োজন হ'তে লাগ্‌ল।…

কিন্তু যতই যাবার দিন এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, মনও যেন ততই বেশী খারাপ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। এখানে থাক্‌তে তবু মাকে দিনের মধ্যে অনেকবার চোখে দেখ্‌তে পেতাম, কিন্তু এখান থেকে চ'লে গেলে তাও ত দেখ্‌তে পা'ব না !…

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব কথা ভাব্‌ছিলাম, হঠাৎ পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি—মা !…

'একি মা তুমি !—' ব'লেই বিছানার উপর উঠে বস্‌লাম।

'তোর নাকি শরীর খারাপ হ'য়েছে বাবা ?' ব'লে মা আমাকে বুকের উপর টেনে নিলেন।

আমি মা'র বুকে মাথা রেখে, মাথাটা বুকে ঘস্‌তে ঘস্‌তে জবাব দিলাম,—'কে বল্‌লে ?—'

—'তোর মাসীমা বল্‌ছিল, তাই সব দেওঘর, না কোথায় যাচ্ছিস্‌।'

—'না, অমনিই বেড়াতে যাচ্ছি !…'

মা স্নেহ-ভরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।…কতক্ষণ লোভীর মত মা'র আদর ভোগ কর্‌লাম, হঠাৎ মা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—'এবার ঘুমো বাবা, রাত অনেক হ'ল !—'

আমি দু'হাতে মার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে আব্দারের সুরে বল্‌লাম,—'আর একটু থাক না মা !'

'না বাবা, তোর মাসীমা জান্‌তে পার্‌লে হয়ত বক্‌বেন !…আমি এখন যাই !—' ব'লে মা চ'লে গেলেন। আমার দুই চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বংশীর বাঁশীর সুর কানে এসে বাজ্‌ল।…আমি ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত একটা চাঁদ উঠেছে। নীল আকাশের বুক ভ'রে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সুখদা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। আমায় তখনও জেগে থাক্‌তে দেখে সে বল্‌লে,—'এখনও ঘুমাও নি রাজকুমার !'

আমি বল্‌লাম,—'না…আমার জন্য ও-ঘর থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে এস ত সুখদা।'

সুখদা বল্‌লে,—'আমি ত জানি না রাজকুমার—কোন্‌ বই !…'

তা'কে ব'লে দিলাম, কোথা থেকে কোন্‌ বইটা আন্‌তে হবে।

সে কথামত বই এনে আমার হাতে দিল। আমি আলোর কাছে গিয়ে বইটা খুলে বস্‌লাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহার গুপ্ত

বর্ষা

দারুণ নিদাঘ-তাপে শুষ্ক-কণ্ঠ ধরা
নিঝুম অসার-প্রাণ—মরুময় খরা—
মরণের ক্ষণটুকু স্মরি'
এক বিন্দু বারি তরে ছিল শুধু পড়ি।

নীলিম-আকাশে ধীরে মেঘ দিল দেখা
করি দূর রৌদ্র-জ্বালা-মরীচিকা-রেখা ;
—জানা'ল সস্নেহ পরশ,
অঙ্গে বায়ু—স্নিগ্ধ ও সরস !

ঝলকে বিজুলী বাঁকা—মেঘের ধূসর গায়,
শুভ্র পালক মেলি' নীড় মুখে ধায়
ভীত ত্রস্ত বলাকার দল ;—
নেমে এল বৃষ্টি-ধারা—ঝরে অবিরল।

গাছপালা শিরে শিরে জাগিল স্পন্দন,
কামিনী কেতকী খুলে কবরী-বন্ধন,
বকুলের পরম গৌরব,
বিলায় কদম্ব-রেণু সুস্নিগ্ধ সৌরভ।

দিগন্তে নেহারি আজি নব জাগরণ
প্রকৃতি পরিছে শ্যাম-পত্র-আভরণ !
—অবসান তৃষার বেদনা,
ধরণী পাইল ফিরে পূর্ব্বের চেতনা।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

কি ও কেন ?

সূর্য্যের স্বরূপ কি ?

প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন 'জবাকুসুম-সঙ্কাশম্' রূপে পুব আকাশে উদিত হন তখন তাঁকে দেখায় একখানা রাঙ্গা থালা, আবার সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য যখন 'হেসে পাটে বসেন' তখনও একখানা রাঙ্গা থালা। দুপুরে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের দিকে তাকায় কার সাধ্য! কিন্তু একখানা পাতলা কাচে কেরোসিনের ডিবার শীষ হইতে কালি লাগাইয়া তাহার

ভিতর দিয়া দেখ ; দেখিবে এবারেও সূর্য্যের আকৃতি একেবারে গোলাকৃতি একখানা সোনার থালা। সূর্য্য একটি উজ্জ্বল গোলাকার পিণ্ডবিশেষ।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তনে পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮ হাজার মাইল, আর সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৬৫০০ মাইল। হিসাব করা হইয়াছে পৃথিবীর ওজন ১৬২,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মণ, ইহার ৩৩২,০০০ গুণ বেশী ওজন হইল সূর্য্যের। তা হ'লে কত মণ হয় তোমরা কাগজ পেনসিল লইয়া হিসাব কর। কিন্তু এক বিষয়ে সূর্য্যকে আমাদের পৃথিবীর কাছে হার মানিতে হইয়াছে। সূর্য্য গ্যাসীয় পদার্থে তৈরি বলিয়া ঘনত্বে (density) পৃথিবীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ, সুতরাং আয়তনের অনুপাতে ওজনে কম ভারী।

পৃথিবীকে ঘিরিয়া দুই শত মাইল ঊর্দ্ধ ব্যাপিয়া যেমন একটি বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্য্যকে ঘিরিয়াও তেমনই একটি উজ্জ্বল ঘন হাইড্রোজেন-মণ্ডল আছে। আজ পর্য্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ (elements) আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ (spectroscope)

নামক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যে উহাদের ৬৬ টির অবস্থিতি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। উহারা জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় সূর্য্যের মধ্যে ও তাহাকে ঘিরিয়া আছে। আরও জানা গিয়াছে যে, উহাদের কতকগুলি গ্যাস সূর্য্যকে ঘিরিয়া ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিলেও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ক্যাল্সিয়াম ৯ হাজারেরও বেশী মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমাদের পৃথিবীর ভিতরকার তাপ খুব বেশী হইলেও ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত, কিন্তু সূর্য্যের বাহিরের তাপই ৭-৮ হাজার ডিগ্রি, আর ভিতরকার তাপ মাত্র ৪-৭ কোটী ডিগ্রি! ধারণা করিতে পার কি? ভাবিয়া দেখ ১০০ ডিগ্রি তাপেই জল বাষ্পে পরিণত হয়।

সূর্য্য আছে বলিয়া পৃথিবীতে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতির খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছে। সূর্য্যের জন্যই আমরা রৌদ্র পাইতেছি, বৃষ্টি হইতেছে, বাতাস বহিতেছে, চাঁদ আলো দিতেছে, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। সূর্য্যের জন্যই আজ ইঞ্জিন চলা সম্ভব হইয়াছে, আমরা নির্ভয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতেছি, সাত সাগরের খবর করিতেছি, আকাশ-বিহার করিতেছি, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের খবর এক লহমায় লইতে পারিতেছি। সূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তির মাত্র এক কণা কয়লা, পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত ছিল; আজ সেই কণামাত্র শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে-দিন সূর্য্যের শক্তি নিঃশেষিত হইবে সেই দিন সূর্য্যপরিবারের কোন গ্রহেই জীবের বাস আর সম্ভবপর হইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—সূর্য্য হইতে প্রতিসেকেণ্ডে তাপ হিসাবে যে শক্তি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার জন্য সূর্য্যের দেহ হইতে ১০,৮০০ কোটী মণ পদার্থ (mass) ক্ষয় হইতেছে! সেকেণ্ডে এই হিসাবে (rate) শরীরের ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে সূর্য্য আর কতদিন টিকিবে? বড় ভাবনার কথা! কিন্তু এখনই ভাবিবার কিছুই নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হিসাব করিয়াছেন—এই রেটে খরচ হইলেও সূর্য্য সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইতে ১ কোটী ৫৫ লক্ষ বৎসর দরকার হইবে। সুতরাং—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, কিছু নাই তোর ভাবনা!
নিঃশেষ হ'য়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না!

চন্দ্রের কলঙ্কের কথা তোমরা জান, পরিষ্কার চাঁদনি রাত্রে উহা দেখিয়াও থাকিবে। সূর্য্যের দেহেও কলঙ্ক (Sunspot) আছে। কিন্তু সূর্য্যের কলঙ্ক অন্য রকমের। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে আলোকমণ্ডল (photosphere) আছে, যাহার

সূর্য্যের কলঙ্ক

আলোয় পৃথিবী ও চন্দ্র আলোকিত, তাহাতে সময় সময় প্রবল ঝড় বহিতে থাকে—লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া ১৫।২০, এমন কি ৩০ দিন ধরিয়া সেই তাণ্ডব লীলা চলে। সেই সময় ঐ কলঙ্কগুলি বেশী করিয়া দেখা দেয়। উহারা সূর্য্যের দেহে বড় বড়

গর্ত্ত। উহাদের এক একটির প্রসার এত বড় যে, আমাদের পৃথিবী অনায়াসে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে পারে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কলঙ্কগুলি পরীক্ষা করিয়াই জানা গিয়াছে যে, সূর্য্য তাহার অক্ষের (axis) উপর ২৭ দিনে একবার আবর্ত্তন করে।

সময় সময় সূর্য্য হইতে অনলশিখা বাহির হইয়া আকাশের দিকে ছুটিয়া যায়

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নিমণ্ডল

এবং উর্দ্ধে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সূর্য্যগ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে গ্যাস দিনরাত জ্বলিতেছে, উহারা সেই অগ্নিমণ্ডলেরই (বর্ণমণ্ডল-chromosphere) শিখা,—হাজার হাজার মাইল ব্যাপী লেলিহান জিহ্বা!

পূর্ণগ্রহণের সময় সূর্য্যের আর একটি অপরূপ রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। চাঁদের কাল মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া স্থানে স্থানে লাল বর্ণমণ্ডল, আর উহাকে ঘিরিয়া একটি তীব্র আলোকের ছটা। সূর্য্যকে ঘিরিয়া এই মণ্ডল অবস্থিত। বর্ণমণ্ডলের গভীরতা স্থানে স্থানে দশ হাজার মাইল, কিন্তু ছটামণ্ডলের (corona) গভীরতা লক্ষ লক্ষ মাইল। সূর্য্যের প্রখর আলোকে অন্য সময় উহার অস্তিত্ব ঠিক পাওয়া যায় না।

এমন যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সৌরজগতাধিপতি সূর্য্য—এস আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

কলির দাতাকর্ণ

"মহাভারতের" বিখ্যাত বীর এবং অঙ্গদেশের রাজা কর্ণের কথা অনেকেই জানে। তাঁহার মত দান কেহ করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছিল দাতা-কর্ণ। সে সব হ'ল দ্বাপর যুগের—কত হাজার হাজার বছর পূর্ব্বের কথা। সে-কথা এখন কেবল পুঁথিপত্রেরই বিষয় হ'য়ে র'য়েছে। মাত্র একমাস পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের এক দাতাকর্ণের মৃত্যু হ'য়েছে, আজ তাঁ'রই কথা বল্‌ব।

বর্ত্তমান কালের এই দাতাকর্ণের নাম **জন্ ডেভিড্‌সন্ রক্‌ফেলার্**। তিনি কিন্তু শুধু রক্‌ফেলার (Rockfellar) নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিক্যান্। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ-ইয়র্ক ষ্টেটে তাঁ'র জন্ম হয়। তাঁ'র পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক। অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁদের দিন কাট্‌ত। নিউ-ইয়র্ক ষ্টেটের অন্তর্গত "ওয়েগো" (Owego) নামক স্থানে তাঁদের কিছু চাষের জমী ছিল,—তা'তে ফসল উৎপাদন ক'রে কোনও মতে তাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহিত হ'ত। প্রথম জীবনে আর্থিক কষ্টের মধ্যে থাকাতে—টাকার মূল্য কত এবং কি ক'রে তা' জমাতে হয়, জন্ বেশ ভালরকমই সে-কথা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট্ থেকে তাঁদের পরিবারবর্গ "ওহিও" (Ohio) ষ্টেটের অন্তর্গত "ক্লীভ্ল্যাণ্ড্" (Cleveland) সহরে চ'লে গেলেন এবং সেখানে জন্ একটা অফিসে হিসাবের খাতাপত্র লেখার কাজ পেলেন। সেই সময়ে তাঁ'র বয়স মাত্র ষোল বছর। অফিসে তাঁ'র মাহিনা হ'ল সপ্তাহে মাত্র ১২ শিলিং অর্থাৎ প্রায় ৮৲ টাকা। জন্ প্রায় তিন বছর ধৈর্য্য ধ'রে সে-কাজ ক'রেছিলেন। তিন বছর পরে ঐ কাজ ছেড়ে তিনি স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করার চেষ্টা কর্তে লাগ্লেন।

একদিন তিনি দেখ্তে পেলেন যে, একটা কাঠের ভেলা খুব সস্তায় বিক্রয় হ'য়ে যাচ্ছে; তিনি তখনই সেইটা কিনে ফেল্লেন। নিজেই ভেলাটাকে চালিয়ে নিয়ে একজন কাঠের কলওয়ালার কাছে বিক্রয় কর্লেন। তা'তে তাঁ'র একশ' ডলার লাভ হ'ল। তারপর থেকে জন্ এই রকম আরও অনেক কেনাবেচা কর্তে লাগ্লেন। চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে তাঁ'র বেশ দু'পয়সা রোজগার হ'তে লাগ্ল।

এই রকম নানা কাজ ক'রে ক'রে ত্রিশ বছর বয়সে তাঁ'র দশ হাজার ডলার জমা হ'য়ে গেল। তখন ঐ টাকা কোন্ ব্যবসাতে কি ভাবে খাটিয়ে আরও লাভবান হবেন, তিনি তা ভাব্তে লাগ্লেন।

তখনকার দিনে পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈল—খনি থেকে তোলার পরে যে উপায়ে পরিষ্কার করা হ'ত, সে প্রথা ভাল ছিল না; সেই তৈল ব্যবহার করাও বিপজ্জনক ছিল। তৈলের ব্যবসাও তখন খুবই অব্যবস্থিত এবং গোলমেলে ছিল। সেই সমস্ত দেখে—জনের মাথায় খেয়াল হ'ল, খনিজ তৈল ভাল ভাবে পরিষ্কার ক'রে যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবহার করা যেতে পারে—তিনি সেই রকম যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা স্থাপিত কর্বেন। জন্ তাঁর ভাইকেও সেই সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়ে বল্লেন। পরামর্শ ঠিক হ'লে তাঁরা একটা "রিফাইনারী" কিনে ফেল্লেন। তৈল পরিষ্কার করার যন্ত্রপাতি ও স্থানের নাম রিফাইনারী। রিফাইনারী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা খুব কাজ পেতে লাগ্লেন—পরিষ্কারের কাজও খুব ভাল চল্তে লাগ্ল। কাজ ক্রমশঃ বেশী হওয়াতে তাঁ'রা আরও একটা রিফাইনারী কিন্লেন। তারপর একটার পর একটা রিফাইনারী স্থাপন ক'রেও তাঁরা কাজ শেষ ক'রে উঠ্তে পার্লেন না। কাজ এত বেশী হ'য়ে গেল যে, শেষে তাঁদের সেই ব্যবসাকে একটা "কোম্পানী" (Company) ক'রে নিলেন।—উহাই বিশ্ব-বিখ্যাত ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী।

কোম্পানীর প্রধান কর্ত্তা হ'লেন জন্ রকফেলার্। কাজকর্ম্ম বেশ ভালরকমই চল্‌তে লাগ্‌ল, প্রচুর আয়ও হ'তে লাগ্‌ল। শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যত খনিজ তৈল উৎপন্ন হ'ত—তা' প্রায় সমস্তই এই কোম্পানীর অধিকারে এসে গেল। অন্য কোম্পানী-গুলিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার মান্‌তে হ'ল।

তৈলের মালিক হ'লেই তো হয় না—তা' দেশ-বিদেশে পাঠান এবং বিক্রীর ব্যবস্থাও কর্‌তে হয়।

দেশ-বিদেশে মাল চালানর জন্য রেলগাড়ীই প্রধান সহায়; অথচ তাহাতে রেল কোম্পানীর হাতের পুতুল হ'য়ে থাক্‌তে হয় দেখে, প্রথমে তিনি আবশ্যক কয়টি রেলপথ কিনে নিলেন। তা'তেই বুঝা যায় যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী তখন কিরূপ বিপুল অর্থের অধিকারী হ'য়েছিল। আপাততঃ রেলপথের দ্বারা তৈল চালান দেওয়ার কতক সুযোগ হ'ল, কিন্তু পূর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল না।

গাড়ীতে তৈল পাঠানতে সময় লাগে বেশী, সেইজন্য আমেরিকায় কয়েকটি কোম্পানী মাটির নীচ দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নলের সাহায্যে তৈল চলাচলের বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। সেই রকম নলকে "পাইপ লাইন" (pipe line) বলে। রকফেলার্ সেই রকম কয়েকটি "পাইপ লাইন"ও অধিকার ক'রে নিলেন। সেই সকল ব্যবস্থার ফলে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হারিয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ক্রমশঃ সমস্ত তৈলের বাজার অধিকার ক'রে নিল।

রকফেলারের জীবনের সঙ্গে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর নাম অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। কোম্পানীর অবস্থার উন্নতির সহিত তাঁ'র অবস্থাও উন্নত হ'য়েছে। এই কোম্পানী কত অল্প সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ উন্নতি লাভ ক'রেছে—তা' শুন্‌লে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—প্রায় ৭০ বছর পূর্ব্বে—ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড্ সহরের একটা বাজে রাস্তার একটা ঘরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী স্থাপিত হয়। কিন্তু রকফেলারের অধ্যবসায়, সাধনা এবং চেষ্টার ফলে সেই কোম্পানী কেবল আমেরিকা নহে, আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিচিত।

"সোকোনী" (Socony) পেট্রোলের নাম আজকাল অনেকেই জানে—বিশেষতঃ যা'রা সহরে বাস করে। আজকাল 'সোকোনী' পেট্রোল—মোটরগাড়ী, মোটরবাস্, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে বহুপরিমাণে ব্যবহার করা হয়, 'সোকোনী' কেরোসিন তেলও

জ্বালানি কাজে লাগে। এই "Socony" নামটা আর কিছুই নয়, Standard Oil Company of New-York—এই নামটার প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরের সম্মেলন মাত্র। রক্‌ফেলার্ এই "Socony"র সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁ'কে "অয়েল্ কিং" (Oil King) অর্থাৎ তৈলের রাজা বলে।

জন্ রক্‌ফেলার্ শুধু যে তৈল সম্বন্ধীয় সকল রকম ব্যবসাতেই নিযুক্ত ছিলেন তা' নয়,—অন্য ব্যবসার দিকেও তাঁ'র যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। কয়েকটি লোহার খনির তিনি মালিক ছিলেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে সুপিরিয়র্ (Lake Superior) নামক হ্রদের উপর দিয়ে লোহা ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতকগুলো মালবাহী জাহাজও তাঁ'র ছিল, কিন্তু তিনি সেইগুলো কিছুদিন পরে বিক্রয় ক'রে দেন।

জন্ ডেভিড্‌সন রক্‌ফেলার

এইরকমে নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হওয়ার পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রক্‌ফেলার্ বিষয়কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁ'র এত অর্থ এবং ঐশ্বর্য্য ছিল যে, লোকে তাঁ'কে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বল্‌ত। বস্তুতঃ তাঁ'র মত ধনবান্ লোক পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না। তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান্ হ'য়েও নিজের ভোগবিলাসের জন্য সামান্যই খরচ করতেন—

তাঁ'র প্রধান ব্যয় ছিল দানে। তিনি তাঁ'র উপার্জ্জিত অর্থের তিনভাগের দু'ভাগ জগতের কল্যাণে দান ক'রে গিয়েছেন। তাঁ'র দানের সম্পূর্ণ এবং সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব। ছোট ছোট অসংখ্য দান ছাড়া বড় দানের জন্য তিনি চারটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ক'রে গেছেন; সেইগুলোর নাম হচ্ছে **রক্‌ফেলার্ ফাউণ্ডেসন্** (Rockfeller Foundation), **জেনেরল্ এডুকেশন বোর্ড** (General Education Board), **রক্‌ফেলার্ মেমরিয়ল্** (Rockfeller Memorial) এবং **ইন্সটিটিউট্ ফর্ মেডিক্যাল্ রিসার্চ্চ** (Institute for Medical Research)।

পৃথিবীর সকল দেশের লোকের জন্য অর্থাৎ মানবজাতির কল্যাণে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রক্‌ফেলার্ ফাউণ্ডেসন্ স্থাপন করেন। সেই প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৮ কোটি ডলার দান করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তার, গবেষণা এবং ম্যালেরিয়া, পীত-জ্বর প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি কি উপায়ে দমন করা যায় সেই সম্বন্ধে কাজ করা। চীনদেশে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে **চীন মেডিক্যাল বোর্ড** নামক আর একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছে, যা'র চেষ্টাতে পিকিং মেডিক্যাল্ কলেজ হ'য়েছে। রক্‌ফেলার্ ফাউণ্ডেসনের শিক্ষাবিভাগ, লণ্ডন এবং কানাডার অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কলেজ প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য করে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থ হ'তে অনেক রকম সাহায্য দেওয়া হ'য়েছিল।

রক্‌ফেলার্ ফাউণ্ডেসনের পরেই রক্‌ফেলারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান, **জেনেরল্ এডুকেশন বোর্ড**। উহাতে তিনি ১২ কোটি ডলার দান ক'রেছেন। উহার একমাত্র উদ্দেশ্য—শিক্ষাবিস্তার।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রক্‌ফেলারের স্ত্রী মারা যান। তাঁ'র স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি **"লরা স্পেল্‌ম্যান্ রক্‌ফেলার্ মেমরিয়ল্ ফাণ্ড্"** নামক একটা স্মৃতি-ভাণ্ডার নিউ-ইয়র্কে স্থাপন করেন। সেই স্মৃতি-ভাণ্ডারে তিনি সাড়ে ছয় কোটি ডলার দান ক'রেছিলেন। ঐ ভাণ্ডার হ'তে দরিদ্র ও দুঃস্থ সন্তান এবং তা'দের জননীদের সাহায্য করা হয়।

মেডিক্যাল্ রিসার্চ্চ ইন্‌স্‌টিটিউটে তিনি ১০ কোটি ডলার দান ক'রেছেন। তা' ছাড়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র **হুক্‌ওয়ার্ম ডিজিজ্** (Hook-worm Disease) নামক একপ্রকার কীটাণুজনিত সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করার

জন্য দশ লক্ষ ডলার দিয়েছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলেন রক্‌ফেলার্। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সেখানে আড়াই কোটি ডলার দিয়েছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত **মাউণ্ট্ উইল্‌সন্ অব্‌জার্‌ভেটরী** (Mount Wilson Observatory) নামক মানমন্দিরে—একটা প্রকাণ্ড এবং খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানর জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ২০ লক্ষ ডলার দান ক'রেছিলেন। এই সকল মোটা মোটা দান ছাড়া, অপেক্ষাকৃত অল্প টাকার দানও তাঁ'র বহু ছিল। কত গীর্জ্জা, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি যে তাঁ'র কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছে তা' গণে শেষ করা যায় না।

তিনি কি ভাবে দান কর্‌তেন সেই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিউ-ইয়র্ক সহরের **ফিফ্‌থ্ এভেনিউ** (Fifth Avenue) নামক রাস্তার একটা পুরাণ' গীর্জ্জা ভেঙ্গে নূতন ক'রে তৈরী করার জন্য সকলের কাছে চাঁদা চাওয়া হচ্ছিল। মাত্র ২৮ মিনিট সময়ের মধ্যেই ৬৪,৮০০ পাউণ্ড চাঁদা পাওয়া গেল এবং অন্যান্য অনেক লোক আরও ৩২,৪০০ পাউণ্ড চাঁদা দিলেন। অত চাঁদা উঠেছে শুন্‌তে পেয়ে রক্‌ফেলার্ একেবারে ৯৭,২০০ পাউণ্ডের একখানা চেক লিখে পাঠিয়ে দিলেন!

হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে—রক্‌ফেলারের বৃহৎ বৃহৎ দানের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা। অত দানের জন্যই তাঁ'কে "দান-বীর রক্‌ফেলার্" বলা হয়। রক্‌ফেলার্ তাঁ'র পরিবারবর্গকে যা' দিয়ে গিয়েছেন তা'র মূল্য ৫০ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৪০ কোটি টাকা! তা' হ'লে ভেবে দেখ—একজীবনে তিনি কত টাকা উপার্জ্জন ক'রেছিলেন!

রক্‌ফেলার্ সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাক্‌তেন—আলস্য তাঁ'র কাছেও ঘেঁস্‌তে পার্‌ত না। তা'ই ৮০ বছরের বুড়ো রক্‌ফেলার্‌কে গল্‌ফ্ (Golf) খেল্‌তেও দেখা যেত। তিনি গল্‌ফ্ খেল্‌তে খুব ভালবাস্‌তেন। তাঁ'র স্বাস্থ্য ভাল ছিল না ব'লে তিনি নিয়মিতভাবে খেলাধূলা এবং ব্যায়াম কর্‌তেন। আবার কখনও কখনও তিনি ছদ্মবেশে নিউ-ইয়র্কের গরীব-পল্লীতে ঘুরে বেড়াতেন এবং তা'রা "অয়েল্ কিং" সম্বন্ধে কি বলে—তা' শুন্‌তেন। যা'দের অভাব বা কষ্ট দেখ্‌তেন তা'দের সাহায্য পাঠাতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল কাটানর পরে বর্ত্তমান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে—৯৭ বছর বয়সে রক্‌ফেলারের মৃত্যু হ'ল। সেই সঙ্গে জগতের একটা কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘট্‌ল।

চিন্তা জবাব করলে—"সেইখানেই তো যাচ্ছি, ডাঙ্গা আছে—মানুষ আছে, তা'রাই বাজাচ্ছে। ভগবানের দয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। এখন জলদি পৌছতে চাস্ তো সবাই হাল্সা টান।"

আর বল্‌তে হ'ল না, তখনি আর ছ'জন ছটা দাঁড় ফেলে সমান ফুর্‌তিতে একসঙ্গে টান্‌তে সুরু ক'রে দিলে। ডিঙ্গীখানাও সেইদিকে এগিয়ে চল্‌ল অনেকখানি বেগে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরও ঘন ঘন কানে আস্‌তে লাগ্‌ল স্পষ্ট—স্পষ্টতর হ'য়ে।

কিন্তু প্রায় ঘণ্টা দুই তেমনি যাবার পরে বাঁশীর সুর যখন খুবই কাছে এসে পড়্‌ল, তখন হঠাৎ জলের ভিতরে নোঙরটা খ্যাঁচ্ ক'রে মাটীতে কি পাথরে গেঁথে, ডিঙ্গীখানা বেজায় জোরে ন'ড়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়া'ল। সেই ধাক্কায় একা ভুরুঙ্গা ছাড়া, আর সকলেই তাড়াতাড়ি উপরে উঠে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রে উঠ্‌ল—"কি হ'ল—কি হ'ল ?"

তখনও বাঁশীর সুর যেন কানের কাছে খুব স্পষ্ট হ'য়ে বেজে উঠ্‌ছিল। তাই শুনে, অঙ্কুরা ব্যাজার হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—"কালা নাকি, শুন্‌ছিস্‌নি সাম্‌নে ওই বাঁশীর আওয়াজ ? ওইখানে ডাঙ্গা আছে—মানুষ আছে, এতক্ষণে পৌছে যেতুম, কেবল নোঙরটা বেজায় ব'সে গেছে! তোল্ এটাকে দেখি ?"

অনেকেই নোঙর তোল্‌বার চেষ্টায় কাছি ধ'রে টানাটানি সুরু ক'রে দিলে আর বাকী সকলে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সাম্‌নের দিকে। হঠাৎ রামা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ও সব কি দুস্‌ছে (দেখা যাচ্ছে) রে, ওরা সব মানুষ, না কি ?"

দু'হাতে ভর দিয়ে বুক পর্য্যন্ত উঁচু ক'রে···

সেই কথায় সকলেই নোঙর ছেড়ে একসঙ্গে সেইদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরও গেল বন্ধ হ'য়ে। ডিঙ্গীর সকলেই চাঁদের ফিকে আলোতে দেখ্‌লে সাম্‌নের দিকে দু'-তিনশো হাত মাত্র তফাতে একটা ছোট চড়ার উপরে দশ-পনেরোটা মানুষের মতই মুখ উপুড় হ'য়ে শুয়ে, দু'হাতে ভর দিয়ে বুক পর্য্যন্ত উঁচু ক'রে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে র'য়েছে তাদেরই

দিকে! সকলেরই মাথায় কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা খাদি-খাদি চুল—মুখ, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, সমস্তই মানুষেরই মত!

ভাল রকম নজর ক'রে দেখে, রামা আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"হুবহু মানুষ রে, ওই ছাখ ঠিক আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু পা কই? কোমর থেকে নীচের দিকটা ঠিক যেন মকর-মাছের (Porpoise এর) মত। ওরাই অমন মিঠে বাঁশী বাজাচ্ছিল?"

জন দুই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ওরা 'শিশু-মাছ'। শুনেছি, শিশু-মাছ শিস্ দেয় ঠিক বাঁশীর আওয়াজের মত।"

দু'-চার জন ব'লে উঠ্‌ল—"মানুষ-মাছ', 'মানুষ-মাছ'—শিশু-মাছ নয়। আমরাও শুনেছি ওরা শিস্ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে এনে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।"

যার যা খুশী, তাই ব'লে সকলেই চেঁচাতে সুরু কর্‌লে। মুহূর্ত্তে ডিঙ্গী থেকে বিষম চেঁচা-চেঁচি হট্টগোল উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণীগুলোও ডুবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল টপ্ টপ্ ক'রে।

"নাঃ, এ যাত্রা আমাদের আর উপায় নেই!" ব'লে নিরাশ হ'য়ে চিন্তা আর অঙ্কুরা হাত-পা এলিয়ে দিয়ে ব'সে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মুখে হতাশের কালো ছায়া ছেয়ে যেতে বাকী রইল না।

এতক্ষণের পরে বুড়ো একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'লে উঠ্‌ল—"যা করেন ভগবান! থাক্ এইখানে ডিঙ্গী বাঁধা, রাতটা কাটুক। আরে ব্যাটা ভুরুঙ্গা, এক ছিলিম তামাক চড়াতে তোর হাতে ব্যথা ধরে নাকি?"

বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো—ডিঙ্গীর ভিতরে নেমে গেল।

—৪—

রাত কেটে সকাল হ'তে—বিষম কোয়াসায় চার দিক ঢেকে গেল, তারপরে কোয়াসা কেটে যখন বেশ ঝর্‌ঝরে রোদ উঠ্‌ল, তখনও ডিঙ্গীর তলাতে বুড়ো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। সকলে মিলে মতলব ক'রে, তা'কে না জাগিয়ে, কষ্টেস্রষ্টে নোঙর তুলে ডিঙ্গীখানাকে নিয়ে গেল সেই চড়াতে, তা'দের কোন চিহ্ন খুঁজে পায় কি না, দেখ্‌বার জন্যে।

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গোছাখানেক মাথার চুলও যে না মিল্‌ল, এমনও নয়; রঘুয়া তা নিজের কাছে রেখে দিলে। চড়াতে নেমে সকলেরই এমন ফূরতি হ'য়েছিল যে, সেই খানে রেঁধে খাবার ব্যবস্থা না ক'রে ছাড়লে না।

এদিকে কিছুদূরে আবছায়ার মত পাহাড় আর গাছপালার চিহ্ন দেখ্‌তে পেয়ে সকলেরই মনে আশা জাগতে বাকী রইল না। তারপর বুড়ো জেগে উঠে যখন তা দেখ্‌লে, তখন আহ্লাদে ব'লে উঠ্‌ল—"বলেছিলুম না ভগবান যা করেন? তিনি রাখ্‌লে কেউ মার্‌তে পারে না।

ও আর যাদু নয়, স্পষ্ট ডাঙ্গা দুস্‌ছে, কিন্তু বিশ-পঁচিশ মাইলের কম দূর নয়! এখুনি ডিঙ্গী ছাড়্‌তে পার্‌লে সুবিধা হ'ত।"

"তা হবে না দাদা, আজ এইখানে ভাত না খেয়ে যা'ব না। এই ত্থাখ্ কি পেয়েছি?" ব'লে রঘুয়া সেই চুলের গোছা বা'র ক'রে দেখালে। বুড়ো অনেকক্ষণ ধ'রে নেড়েচেড়ে দেখে বল্লে—"যত্ন ক'রে রেখে দে ভাই—যখন কিনারা পেয়েছি, তখন দেশে ফেরবার একটা উপায় হবেই। সেখানে লোকে অবিশ্বাস কর্‌লে দেখাতে পার্‌বে, আর জমীদার-বাবুদের ছোট বাবুকে দিলে ত বক্‌শিস্‌ই মিলে যাবে পাঁচ টাকা।"

তারপরে সেই চড়াতে খাওয়া-দাওয়া ক'রে, জিরিয়ে আবার যখন ডিঙ্গী ছেড়ে দিলে, তখন বেলা গড়িয়ে প'ড়েছে। কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠে সেই কিনারার দিকেই যাচ্ছিল ব'লে পৌঁছুতে তেমন বিশেষ কষ্ট হ'ল না বটে, কিন্তু রাত হ'য়ে গেল আধ ঘণ্টার উপর। এদিকে ডিঙ্গীতে খাবার জল একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিনারাতে একটা মাঝারি রকমের পাহাড়ের পাশ্ দিয়ে একটা খাড়ি গিয়েছিল ভিতর দিকে। সেই খাড়ির ভিতরে ডিঙ্গীখানাকে অল্প দূর নিয়ে গিয়ে সকলেই ভুরুঙ্গাকে খাবার জলের চেষ্টায় যেতে বল্লে। কিন্তু চাঁদ উঠ্‌বার অপেক্ষায় তখন তা হ'ল না।

এদিকে, সেদিন সকাল থেকেই ভুরুঙ্গার শরীর বড় খারাপ হ'য়েছিল। কিন্তু লোভী মানুষ খেতে না পাবার ভয়ে কারুকেই তা বলে নি। তার উপর সেদিন পেট ঠেসে খেয়ে ব্যামো এমন বেড়েছিল যে, ডিঙ্গীখানা বাঁধ্‌তেই সে যে সেই অন্ধকারে ডাঙ্গাতে নেমে গিয়েছিল, আর ফিরে এসে উঠ্‌বার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নি। চাঁদ উঠ্‌তেই সে ডিঙ্গীর কাছে এসে বল্লে—"দে ত কলসীটা, কোথাও মিঠে জল পাই কি না দেখে আসি।"

কিন্তু তাকে একলা যেতে হ'ল না। আর দুটো কলসী নিয়ে রামা আর অঙ্কুরাও গেল সঙ্গে সঙ্গে। খানিক পরে রামা আর অঙ্কুরা দু'কলসী জল নিয়ে ফিরে এসে অধীর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল— "সর্ব্বনাশ ভুরুঙ্গার কলেরা হ'য়েছে, অল্প দূরেই ওই পাহাড়ের তলায় শুয়ে প'ড়ে ছটফট্ কর্‌ছে, আর উঠ্‌বার ক্ষমতাও নেই।"

শুনেই দারুণ ভয়ে অস্থির হ'য়ে ডিঙ্গীর সকলে ব'লে উঠ্‌ল—"চল দাদা, আর এখানে না, শীগ্‌গির ডিঙ্গী খুলে দিয়ে পালাই—চল।"

ভুরুঙ্গা বুড়োর চাকর, রামা আর অঙ্কুরার এক গাঁয়ের মানুষ। সংসারে কেউ নেই ব'লে এরাই তা'কে এনে বাড়ুয়ার ঘরে চাকরি ক'রে দিয়েছিল। সকলের কথা শুনে গোঁয়ার রামা ব'লে উঠ্‌ল —"ডিঙ্গী খুলে ফের সমুদ্দরে যাবি মর্‌তে নাকি? তা ছাড়া আমি আর অঙ্কুরা তো তা'কে এখানে ফেলে নড়্‌ব না।"

বুড়ো সকলকে বুঝিয়ে বল্লে—"যা করেন ভগবান, আমরা এইখানে ডিঙ্গীতে থাক্‌ব, আর

সে আছে কোথায় ডাঙ্গার উপরে তফাতে, এতে কোন ভয় নেই। তবে একটা কথা রামু ভাই, রাতে বার দুই-তিন তোদের দু'জনকে গিয়ে বেচারাকে দেখে আস্‌তে হবে।"

"তা'তে আমরা রাজি আছি।" ব'লে দু'জনে ডিঙ্গীতে উঠ্‌ল।

কিন্তু তাদের আর ভুরুঙ্গাকে দেখ্‌তে যেতে হ'ল না। ঘণ্টা দুই পরে ডিঙ্গীতে চিন্তা—ভাতের হাঁড়ী সবে নামিয়েছে, হঠাৎ একটা অতি করুণ—অতি ভয়ানক মরণ চীৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল। বুড়ো আর থাক্‌তে পার্‌লে না, এক গাছা মোটা লাঠি নিয়ে বল্‌লে—"চ'তো সবাই দেখি ব্যাপারখানা কি? আর কোন কথা না—শীগ্‌গির।"

ব'লেই বুড়ো আগে আগে ডিঙ্গী থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল কিনারাতে, রামা আর চিন্তাও একখানা কুড়ুল আর 'রামদা' (খাঁড়া) নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল ছায়ার মত। দেখা দেখি আর বুড়োব ধমক খেয়ে রঘুয়া আর চিন্তা ছাড়া অন্য সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চল্‌ল পেছনে পেছনে।

কিন্তু তাদের আর বেশী দূর যেতে হ'ল না। খাড়ির উঁচু পাড়ের উপর উঠে খানিকটা এগিয়ে যেতেই যে ব্যাপার সকলের চোখে পড়্‌ল, তা'তে সকলেই মহাভয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

একটা প্রায় ছ'হাত লম্বা ছায়ামূর্ত্তির মত—বিকট চেহারা, মস্ত লম্বা এক হাতে ভুরুঙ্গার দেহ কোমরের কাপড় শুদ্ধ ঝুলিয়ে ধ'রে অন্য হাতে তার একখানা সদ্য ছেঁড়া পা নিয়ে বিকট

সদ্য ছেঁড়া পা নিয়ে……কড়মড় শব্দ ক'রে

কড়মড় শব্দ ক'রে আরামে চিবিয়ে খাচ্ছে। টাট্‌কা রক্তের স্রোতে মুখ থেকে তা'র সারা গা লাল হ'য়ে গেছে!

শরীরের তুলনায় তা'র মাথাটা অতি ছোট, মাথাতে চুল নেই বল্‌লেই হয়—আছে কেবল সজারুর কাঁটার মত গাছ্‌ কতক শক্ত লোম। নাক বিষম চ্যাপ্টা, গালের হনু দুটো বেজায় উঁচু, তার উপরে—গর্ত্তের মত—চোখের কোটর, কিন্তু তা'তে চোখ আছে কিনা বোঝবার যো নেই, কেবল তা'দের ভিতর থেকে দুটো ছোট ছোট আগুনের গোলা থেকে-থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে। গায়ের চামড়া পোড়া কাঠের মত কঠিন কর্কশ। হাত-পাগুলো যেমন লম্বা-লম্বা তেমনি আঙ্গুল-গুলোও লম্বাতে আধ হাতের কম নয়। সকলের উপর মুখের হাঁ যেমন দু'দিকের কান পর্য্যন্ত খেলানো, দাঁতগুলো ঠিক কুকুরের দাঁতের মতই লম্বা, তীক্ষ্ণ। তেমন প্রাণী যে জগতের কোথাও থাক্‌তে পারে, এ ধারণা স্বপ্নেও কারুর মনে জাগ্‌তে পারে না।

দেখেই রামা ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে জিজ্ঞেস করলে—"ওটা ভূত, না রাক্ষস, না কি, দাদা?"

"জানিস্‌ নি ওদের বলে পিশাচ, নদী আর সমুদ্দরের ধারেই থাকে, মড়া খায়। ওদের হাতে পড়্‌লে আর রক্ষা নেই।"

অঙ্কুরা কি জিজ্ঞেস কর্‌তে যাচ্ছিল, সময় পেলে না। পিশাচটা তাদের দেখ্‌তে পেয়েই আহ্লাদে বিকট চেঁচিয়ে তাড়া করলে। বুড়োও চোখের পলকে একমুঠো ধূলো তুলে নিয়ে, কে জানে কি মন্ত্র প'ড়ে দিলে সাম্‌নের দিকে ছড়িয়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঠিক সেই পর্য্যন্ত তেড়ে এসেই পিশাচটা যেন হঠাৎ পাঁচীলে ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল! তারপরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ পেছন ফিরে লম্বা-লম্বা পায়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বুড়ো বলে উঠল—

"শীগ্‌গির ফিরে চল্‌, সকাল হ'লে আর মন্তরের তেজ থাক্‌বে না, তার আগেই আমাদের সমুদ্দরে পালাতে হবে। নইলে ব্যাটা দিনে আস্‌বে আমাদের ধর্‌তে।"

তাই হ'ল, রাত থাক্‌তেই ফিরে গিয়ে পড়তে হ'ল আবার সেই সমুদ্রে। পরের দিন একটা স্রোতে প'ড়ে মাইল ত্রিশ-চল্লিশ যাবার পরে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল একটা ষ্টীমারের সঙ্গে। তা'রাও যাচ্ছিল মাদ্রাজে। সকল কথা শুনে, 'লগ্‌-বইয়ে' লিখে নিয়ে, তা'রাই বুড়োর দলটাকে ডিঙ্গীশুদ্ধ পৌঁছে দিয়ে গেল রণকোটার কাছাকাছি। কেবল গরীব বেচারা ভুরুঙ্গাই গেল পিশাচের কবলে।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

খুকু রায়

খুকুমণি রায় !—
অবসর নেই মোটে
খেলায় ধূলায়।
সারাটি প্রথম ভাগে
তিল ঠাঁই নেই দাগে ;
অ-আ অ-আ পড়ে খুকু
চরণ দোলায়।
চীনাম্যান হেরে খুকু
ভয়ে চমকায়॥

খুকুমণি রায় !—
বিড়ালের ছবি আঁকে
দেয়ালের গায়।
ক্লিপ কাঁটা নেই কিছু
ছুটে মা'র পিছু পিছু,
এটা ওটা দাও কিনে
কহিয়া ফুঁপায়।
পুতুলের বিয়ে, খুকু
মহা ভাবনায়॥

খুকুমণি রায় !—
খেতে বসে পানতুয়া
চকোলেট চায়।
আইস্‌ফ্রুট পেলে হাতে
আহ্লাদে এত মাতে,—
ডালমুট কুট্‌কুট্‌
রোয়াকে চিবায়।
খুকু ভাবে এত গাড়ী
চলেছে কোথায়॥

খুকুমণি রায় !—
কাগজের নৌকায়
সাগর ডিঙ্গায়।
রাজকুমারের সনে
গেল কোথা রাজবনে,
গেল কোথা পক্ষিরাজ
দিদিরে শুধায়।
রবারের বেলুনে সে
ছুটে অলকায়॥

খুকুমণি রায় !—
প্রভাতের মিঠে রোদে
শিউলি-তলায়।
কচি কচি যত মেয়ে
ভারী খুশী ওকে পেয়ে,
নিজেদের ফুলে ওর
সাজিটি সাজায়।
সবাকার পানে খুকু
গরবে তাকায়॥

খুকুমণি রায় !—
বালিশের পিরামিড
গড়ে বিছানায়।
আকাশের তারা কেন
ওর দিকে চেয়ে হেন,—
ভাল মেয়ে নেই আর
তার তুলনায়।
খুকুমণি জোছনায়
ঘুমায় চুমায়॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ, এম্. এ.

একাদশীর পুনর্জন্ম

এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি,—ছাতি-ফাটা রোদে ঘুরে ঘুরে যখন তাঁ'র ভয়ানক পিপাসা পেত, তখন পুকুরের কিনারায় গিয়ে হাতের লাঠিটা জলে পুঁতে, লাঠির উপরে একখানি বাতাসা রেখে—জলের যে জায়গাটিতে কালো ছায়া পড়্ত—ঠিক সেই জায়গার জল পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ কর্তেন! খালি জল খাওয়াও হ'ত না, অথচ বাতাসাখানিও বেঁচে যেত!···

একাদশী বাড়ুয্যে ঠিক তেম্নি ধরণের লোক নন্—একথা আমি হলপ ক'রে বল্তে পারি! তথাপি তাঁ'র সম্বন্ধে এ-অঞ্চলে যে কিংবদন্তিগুলো প্রচলিত আছে—তা'র অর্দ্ধেকও সত্য হ'লে—তোমরা তাঁকে 'মাইজার' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত কর, আমি তা'তে কিছুমাত্র আপত্তি কর্ব না। একাদশীবাবু কিন্তু বল্বেন—"ওসব স্রেফ্ পাড়ার লোকদের হিংসে। পড়শীর ভালো পড়শী দেখ্তে পারে কক্ষণো? পারে না—"

তাই ত! তিনি যদি একটু 'রেখে-ঢেকে' দু'পয়সা ক'রে নিতে পারেন—তোমাদের বা তা'তে অত 'মাথা-ব্যথা' কেন?—

ভাল কথা, বল্তে ভুলে গেছি—একাদশীবাবু আমাকে কিন্তু ভারি পছন্দ করেন। আমি তাঁ'র নিন্দা করি নে, সেইটাই নাকি আমার সবচেয়ে বড় 'কোয়ালি-ফিকেশন'! 'ডেঁপো ছোঁড়ারা' তাঁ'র দুচোখের বিষ! আমার সাথে দেখা হ'তেই তিনি আমার কত সুখ্যাতি করেন! আমার মত ছেলে নাকি এযুগে আর দুটি নেই—এক্কেবারে 'সোনার টুকরো' ছেলে আমি! তবে আমি যে 'বয়েজ ক্লাবের' সম্পাদক, সেটা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। "দুষ্টু ছোঁড়াদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য"—ইত্যাদি-রকমের সংস্কৃত-বহুল অনেক উপদেশ বর্ষণ ক'রে তিনি আমাকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করেন। আমার ব্যবহারে কিন্তু 'বিনীত-ভাব' লেগেই আছে—কখন 'হাঁ-কি-না' কোন কথার প্রতিবাদ করি না।··

একাদশীবাবুর স্ত্রীর সাথে আমার মাসীমার ছোটবেলাকার বন্ধুত্ব। আমার মুখে একাদশীবাবুর একটুও প্রশংসা শুন্লে মাসীমা কিন্তু এক্কেবারে 'আগুন' হ'য়ে ওঠেন; সরোষে বলেন—"ওই কিপ্টে বামুনটার কথা তুলিস্নে, সত্য। এখুনি ভাতের হাঁড়ি ফেটে যাবে বল্ছি।"—এই ব'লে তিনি শাসাতে সুরু করেন।

আমি গম্ভীরভাবে বলি—"এ তোমার ভারি অন্যায়, মাসীমা। তোমরা সবাই মিলে নিরীহ ভদ্রলোকটিকে পাগল করবে, দেখ্ছি। আচ্ছা, তিনি তোমাদের কী ক্ষতিটা ক'রেছেন, শুনি?—"

মাসীমা ঝঙ্কার তুলে বলেন—"ভদ্রলোক! অমন ভদ্রলোকের মুখে আগুন! সইকে আমার 'হাঁড়-মাস' ক'রে জ্বালালে দিনরাত!—সেদিন কী হ'য়েছিল জানিস্, সত্য?—"

—"কী?—" আমি বিস্মিত হ'য়ে শুধালুম।

মাসীমা বল্‌তে লাগ্‌লেন—"বিয়ের পর থেকে সইয়ের সাথে আর সাক্ষাৎ ছিল না আমার। তাই সই আমায় সেদিন নেমন্তন্ন ক'রে—ছেলেকে পাঠালে যাওয়ার জন্যে। গিয়ে দেখ্‌লুম, স্বামি-স্ত্রীতে 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ' হচ্ছে! আমাকে দেখেই সই কেঁদে ফেল্‌লে; বল্‌লে—'আমারি অদৃষ্ট, ভাই! কষ্ট ক'রে এলে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লুম না।'

আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লুম—'মানে?'

সই অতি-দুঃখে বল্‌লে সব কথা—ব্যাপার সামান্যই। সইএর সাথে বিয়ের পর আমার এই প্রথম দেখা, তাই তা'র ইচ্ছা—এই উপলক্ষে একটু ভূরি-ভোজনের আয়োজন করে। স্বামীকে অনেক ক'রে বল্‌তে তিনি মাত্র একটি দু-আনি বের কর্‌লেন। তাই নিয়েই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ!...

আমি হেসে সইকে বল্‌লুম—'তুই বা মন এত খারাপ কর্চ্ছিস্ কেন?—দু-আনা পয়সাই কী কম?—' তারপর একাদশীর পানে ফিরে বল্‌লুম—'আপনি কী বলেন?—'

একটি আনি ছুঁড়ে দিয়ে প্রস্থান কর্‌লেন

একাদশী ত মহা-খুশী; বল্‌লেন—'এ...ই—আপনিই বলেন ত! আপনি হ'লেন নেহাৎ হিসেবী লোক, তাই-না স্বীকার কর্‌লেন! কিন্তু আপনার সইটি

হ'ল গিয়ে—কী আর বল্‌ব···অতিশয়-খরচে—' ব'লে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আর একটি আনি ছুঁড়ে দিয়ে প্রস্থান কর্‌লেন। সই আর আমি অতি-দুঃখেও হেসে ফেল্‌লুম। সই ক্লিষ্টকণ্ঠে বল্‌লে—'ভাই, তোর বরাত ভাল। ভগ্নীপতি, তাই-না সদয় হ'লেন!'—"

মাসীমা চোখের জলে গল্প শেষ কর্‌লেন। একাদশীবাবুর পক্ষে আর কিছু 'ওকালতি' কর্‌বার 'দুর্জ্জয় সাহস' আমার হ'ল না।···

আমাদের 'বয়েজ ক্লাবের' বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। চাঁদা তোলার ব্যাপারে তাই কয়েক দিন থেকে ভারি ব্যস্ত ছিলুম। চাঁদা নেহাৎ কম সংগ্রহ হয় নি। ব'সে ব'সে তারই একটা হিসাব কষ্‌ছিলুম।

শঙ্কর বল্‌লে—"সত্যদা, সকলেই ত চাঁদা দিলেন। কিন্তু একাদশীবাবুর কাছে ত যাওয়া হ'ল না—"

ভদ্রলোককে নিয়ে শঙ্কর আবার 'রহস্য' কর্‌তে চায় নাকি! হেসে বল্‌লুম—"থাক, থাক,—ওঁকে নিয়ে তোমরা অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না শঙ্কর—"

একাদশীবাবুর নামে কিন্তু ছেলেরা—সব্বাই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে—"তা হবে না, সত্যদা। এত বড় একটা অনুষ্ঠানে তাঁকে বাদ দেওয়া চল্‌বে না। তুমি ত সব সময়ই তাঁ'র 'ফরে'। সবাইর কাছে চাঁদার জন্য গিয়ে সুধু তাঁকেই বাদ দেওয়াটা—তাঁ'র অপমান নয়? তুমি যাও সত্যদা। তোমার মুখ চেয়ে কিছু দিলেও দিতে পারেন—বলা যায় না ত!—"

একাদশীবাবুকে স্বয়ং একবার পরীক্ষা কর্‌বার ইচ্ছা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। এযাবত সুযোগ হয় নি। সুতরাং ছেলেদের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'লুম। চাঁদার খাতাটা বগলে বাগিয়ে একাদশীবাবুর বস্‌বার ঘরে গিয়ে হাজির হলুম।

একাদশীবাবু তখন ছোট ছেলেকে 'ক, খ, গ' পড়াচ্ছিলেন। পয়সা খরচ হবে ব'লে ছেলেকে পাঠশালায় দেন নি—নিজেই পড়াতেন। আমাকে দেখে তিনি মহা-খুশী হ'লেন। আমার হাত ধ'রে মেঝের উপর বসিয়ে দিয়ে হাসি-মুখে বল্‌লেন—"সত্য যে, এস এস। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। তারপর খবর কী? হঠাৎ কী মনে ক'রে?—"

আমি অতিশয় বিনীত-ভাবে বল্‌লুম—"আমাদের 'বয়েজ ক্লাবের' বাৎসরিক উৎসব

হবে। কাজের তাড়ায় ভারি ব্যস্ত ছিলাম এদ্দিন, তাই আস্‌তে পারি নি। আজ আপনাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে এসেছি, কাকাবাবু—"

বলা বাহুল্য—বাইরের কোন অনুষ্ঠানে একাদশীবাবুর নিমন্ত্রণ 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' ছিল! অতএব আমার কথা শুনে তিনি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন! বল্‌লেন—"আমাকে নেমন্তন্ন!—কেন, কেন?—"

এবার আমি গলার স্বরটা একদম বদ্‌লে ফেল্‌লুম; বল্‌লুম—"আপনাকে নেমন্তন্ন কর্‌ব না ত কা'কে কর্‌ব, কাকাবাবু?—আপনি হ'লেন এ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি!—"

আমার ব্যবহারে একাদশীবাবু অতিশয় বিস্মিত হ'লেন; নিতান্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বল্‌লেন—"তুমিও আমাকে ঠাট্টা কর্‌তে সুরু কর্‌লে সত্য?—"

আমি চোখ কপালে তুলে বল্‌লুম—"এ কী বল্‌ছেন কাকাবাবু!—আপনাকে ঠাট্টা কর্‌ব—আমি! গোটা ছেলের দল ত আপনাকেই এবার প্রেসিডেণ্ট কর্‌বে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে—"

—"আমাকে প্রেসিডেণ্ট কর্‌বে ঠিক ক'রে রেখেছে! ওই ছেলের দল! তা'রাই না লুকিয়ে আমার নামে ছড়া কাটে? আমার নামে নিন্দা ক'রে বেড়ায়?—" একাদশীবাবুর বিস্ময়ের 'টেম্পারেচার' ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। আমাকে অবিশ্বাস কর্‌তেও তাঁ'র কষ্ট হচ্ছিল।

আমি 'মরীয়া' হ'য়ে বল্‌লুম—"না কাকাবাবু, না। ওসব মিছে কথা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—আপনাকে তা'রা দেবতা ব'লে পূজো করে।—"

একাদশীবাবু এবার আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—"আমাকে দেবতা ব'লে পূজো করে—ওই ছেলের দল! ও গিন্নী—এস, এস। সত্য, সুসংবাদ এনেছে। আমি দেবতা—আমিও মানুষ!! সত্য, তুমি সোনার টুক্‌রো ছেলে! তোমার ছেলের দল সব সোনা! আজ তোমাকে না খাইয়ে যেতে দেবো না, সত্য। তোমাকে খেতেই হবে আজ। আমি খরচ কর্‌ব—পাঁচ টাকা খরচ কর্‌ব। আর একটা কথা সত্য! তোমাদের ক্লাবের উৎসবে ত অনেক টাকা ব্যয় হবে। চাঁদা চাই নিশ্চয়ই! আমি দশ টাকা দিব, তুমি 'না' বল্‌তে পার্‌বে না, সত্য। আমিও মানুষ, সত্য—আমিও মানুষ!—" একাদশীবাবু বিপুল আবেগে ধিন্ ধিন্ ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন।

আমি কোন কথা না ব'লে তাঁ'র পায়ের ধূলো মাথায় নিলুম। আমার চোখ তখন মোটেই শুষ্ক ছিল না। একাদশীবাবুর আজ পুনর্জন্ম হ'য়েছে! আমিই তাঁ'র নতুন মূর্ত্তিটির আবিষ্কারক, একথা মনে ক'রে আমার তৃপ্তির সীমা রইল না!...
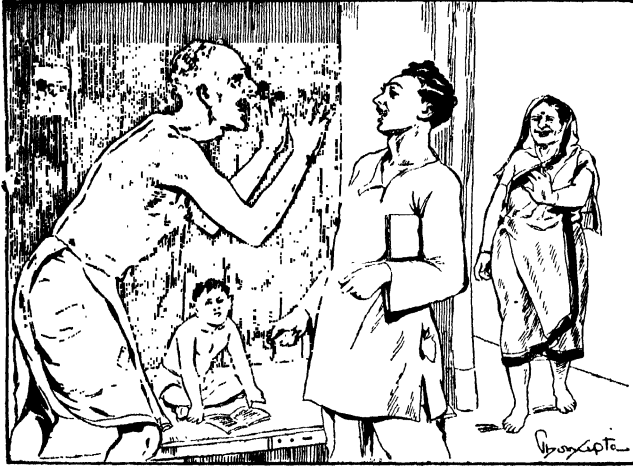
"—আমি দশ টাকা দিব—"

কাকীমা আমাকে বুকে চেপে ধ'রে মাথায় চুমু খেয়ে বল্‌লেন—"পরশ-মাণিক কখন চোখে দেখি নি, সত্য! আজ দেখ্‌লুম। তুমি সত্যিই পরশ-মাণিক! তুমি যাদু জান।—"

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত, বি. এ.

উদারতা

বিশাল পুরীতে একটি গোলাপ ফুটে যদি কোনও ফাঁকে—
সৌরভ তা'র প্রাসাদ পূরিয়া কেবলি বিলা'তে থাকে!
জীবনের কোনও কাজের মাঝে থাকে যদি উদারতা—
সার্থকতা লভে সে জীবন ;—মরণেও লভে অমরতা।

শ্রীঅতুলানন্দ দাশগুপ্ত

পূজার ছুটি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মল্লিকদের বাড়িতে নহবত বসিয়াছে। আজ ষষ্ঠীর বোধন, কাল পূজা আরম্ভ। ছেলেদের মনে আনন্দ আর ধরে না। তাহাদের হাস্য-কলরবে ঘর মুখর। অনু, মণ্টু, মীনা কাল সন্ধ্যাবেলাই দেখিয়া আসিয়াছে—ঠাকুর সাজান প্রায় শেষ। যেটুকু বাকি ছিল আজ বেলা দশটার মধ্যে তাহাও শেষ হইয়া যাইবে কি না তাই লইয়া মহা গণ্ডগোল চলিতেছে। এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—'টেলিগ্রাফ'। টেলিগ্রাফ! কোথা হইতে আসিল! কাহারও অসুখ করে নাই ত?

বিনু, মণ্টুর ভাগ্নী। তাহার একটু জ্বর হইয়াছিল—পাটনা হইতে মণ্টুর দিদি কয়েকদিন আগে চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন বিনুর জ্বর না সারিলে এবারে আর তাঁহার কলিকাতায় আসা হইবে না। চিঠি পাইয়া মণ্টুর মা'র মনে সুখ ছিল না। বছরের শেষে মেয়ে মা'র কাছে না আসিলে মায়ের মন খারাপ হইবে না? টেলিগ্রাফের নাম শুনিয়া মণ্টু ভাবিল——বিনুরই অসুখ বাড়িল নাকি?

পিওনের ডাক প্রিয়ব্রতবাবুর কানেও পৌঁছিয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া নামিয়া আসিলেন। রসিদ সই করিয়া যখন তিনি খামখানা হাতে লইয়াছেন, তখন বাড়ির সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। মণ্টুর মা তখন রান্নাঘরে ছিলেন। তাঁহার হাতের খুন্তিটা হাতেই রহিয়া গিয়াছে—ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছেন। ঝড়ের ঠিক আগে আকাশের অবস্থাটা যেমন হয় বাড়িটার অবস্থাও তখন ঠিক তেমনই।

প্রিয়ব্রতবাবু খাম ছিঁড়িয়া ভিতরের কাগজটা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তখন তাঁহার মুখের দিকে নিবদ্ধ।

প্রিয়ব্রতবাবু প্রথমে মনে মনেই পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মণ্টুর মা বলিয়া উঠিলেন—"কোত্থেকে আসছে? কে দিয়েছে?"

প্রিয়ব্রতবাবু বলিলেন—"সংবাদ ভালই, ভয়ের কারণ কিছু নেই। রাণু আর অজয় আসছে আজ রাত্তিরে। বিনু ভাল আছে।"—ঝড় আর আসিল না। আকাশের মেঘটা কাটিয়া গেল।

প্রিয়ব্রতবাবু উপরে চলিয়া গেলে টেলিগ্রাফের কাগজটা মণ্টু অধিকার করিয়া বসিল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সে। ইংরাজি কিছু পড়িতে পারে। কাগজটা খুলিয়া সে জোরে জোরে পড়িতে লাগিল—"প্রিয়ব্রত মুখার্জি—থার্টি নাইন মহিম কুণ্ডু স্ট্রীট, ক্যাল্‌কাটা। বীনু ওয়েল্। ষ্টার্‌টিং দিস্ আফ্‌টার নুন্ উইথ্ রাণু। এরাইভিং ক্যাল্‌কাটা নাইন থার্টি। অজয়।" (Priyabrata Mukherji. 39 Mahim Kundu Street, Calcutta. Binu well. Starting this afternoon with Ranu. Arriving Calcutta nine thirty. Ajoy.)

মীনার কাছে দাদার পাণ্ডিত্য অসহ্য বোধ হইল। সে বলিল—"শুধু পড়লে হয় না, নিজে থেকে মানে করতে পার?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয় পারি" বলিয়া মণ্টু সুরু করিল—"এইত! Binu well মানে বিনু ভাল। Starting this afternoon মানে—"

তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মীনা তাচ্ছল্যের ভাবে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁগো পণ্ডিতমশাই ঢের হয়েছে। বাবা এইমাত্র ব'লে দিয়ে গেলেন তাই। তা না হ'লে বোঝা যেত।"

মীনার এ ঔদ্ধত্য বড় ভাই হইয়া মণ্টু সহ্য করিতে যাইবে কেন? সেও উল্টাইয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা তুই যে এত বাহাদুরি করছিস, বলত 'উর্দ্ধ' বানান কি?"

অনু দেখিল ভাইবোনে ঝগড়া বাধে আর কি। সে তাড়াতাড়ি কথাটাকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল—"আচ্ছা ভাই মণ্টু, এখন তো বেলা ন'টা। পাটনায় এ টেলিগ্রাফটা ছাড়া হয়েছে কখন?"

মণ্টু বলিল—"এইতো দেখ না, এখানেই লেখা রয়েছে। ওখান থেকে বেরিয়েছে আটটা দশ মিনিটে।"

মন্টু যে ক্লাসে পড়ে, অন্নুও দেশের স্কুলে সেই ক্লাসের ছাত্র। কাজেই সেও ইংরেজি কিছু শিখিয়াছে। সে পড়িয়া দেখিল, মন্টুর কথা মিথ্যা নয়। তাহার আশ্চর্য বোধ হইল এই ভাবিয়া যে, ডাকের চিঠি আসিতে দু-তিন দিন লাগে, টেলিগ্রাফ আসে একঘণ্টার মধ্যে কেমন করিয়া? চিঠিও লেখা হয় কাগজে, টেলিগ্রাফও তো কাগজেই লেখা। টেলিগ্রাফ কি তাহা হইলে আকাশে উড়িয়া আসে?

এদিকে মন্টু জামাইবাবুর হাতের লেখা সম্বন্ধে সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছে—"জামাইবাবু এম. এ. পাশ করেছেন না ছাই করেছেন। হাতের লেখার কি ছিরি! পড়াই যায় না। পয়সা খরচ ক'রে টেলিগ্রাফ করেছেন, যদি না পড়া যেত তা হ'লে পয়সাটা বাজে নষ্টই হ'ত!"

মীনা চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সে চট্ করিয়া দাদার হাত হইতে কাগজটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"তোমার যেমন বুদ্ধি! এটা কি জামাইবাবুর লেখা! ওটা ত দিদি লিখেছে, নামটা দিয়েছে জামাইবাবুর। দেরাজে দিদির স্কুলের খাতাগুলো তো সবই আছে। মিলিয়ে দেখ-না গিয়ে।"

দাদার হাত হইতে কাগজটা ছিনাইয়া লইয়া……
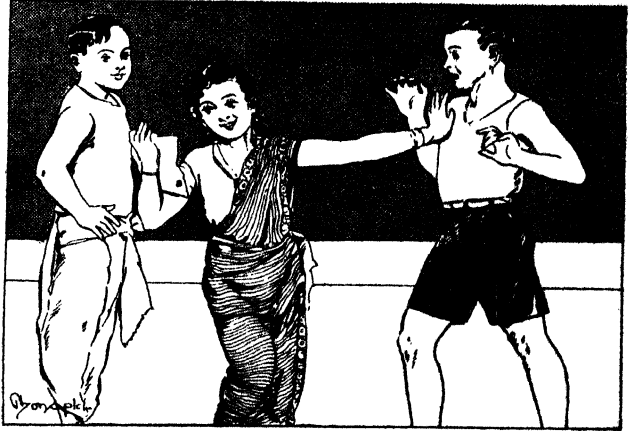
মন্টুর বাবা ছেলে-মেয়ের তর্ক শুনিতেছিলেন উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া। তিনি ডাক দিলেন—"ওরে তোরা উপরে আয়। আমি ব'লে দিচ্ছি ওটা কা'র হাতের লেখা।"

বিচারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়া গেল। টেলিগ্রাফের লেখা না দিদির হাতের, না জামাইবাবুর হাতের। হস্তাক্ষর সিমলা পোস্ট অফিসের টেলিগ্রাফের কেরানির।

অন্নু আর কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল—"মামাবাবু, টেলিগ্রাফের কেরানি জামাইবাবুর মনের কথা জানলে কেমন ক'রে?"

মামাবাবু বলিলেন—"সেই বিদ্যুতের সাহায্যে। যার সাহায্যে ট্রাম চলে, পাখা ঘোরে, আলো জ্বলে তারই সাহায্যে তিন হাজার মাইলের সংবাদ তিন ঘণ্টায় উড়ে আসে।"

অনু বলিল—"জামাইবাবু যে কাগজে লিখে দিয়েছিলেন সেইটে বুঝি উড়ে এসেছে, আর পোস্ট অফিসের লোক বুঝি তাই নকল ক'রে পাঠিয়েছে ?"

—"নারে পাগল! উড়ে আসে বললাম ব'লে সত্যিই কি আর উড়ে আসে? তা নয়। আজ এখুনি যদি তোর মাকে এখান থেকে জরুরি সংবাদ পাঠাতে চাই, তা হ'লে আমি কি করি? একটা কাগজে যা লেখার লিখে টেলিগ্রাফ অফিসে নিয়ে যাই। তোদের বামুনদীঘি পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাফের তার গেছে দেখেছিস তো? সেই তারের সঙ্গে কলকাতার যোগ আছে। এখানে কল টিপলে সেখানকার কলে 'টরে-টক্কা টরে-টক্কা'—এইরকম শব্দ হবে। মনে কর এখানে শব্দ করা হ'ল টরে-টক্কা—সেখানকার ডাকঘরেও এই রকম শব্দ হ'ল। তারা কাগজে লিখে নিলে A, আবার শব্দ হ'ল টক্কা টরে—তারা লিখলে N, আবার কলে বেজে উঠল টরে টরে টক্কা—তারা লিখে নিলে U; তিনটা শব্দের পর এক সেকেণ্ড কল থেমে রইল। তারা বুঝলে একটা কথা শেষ হয়েছে। তারপর আবার শব্দ হ'ল COME; আবার এক সেকেণ্ড চুপচাপ।
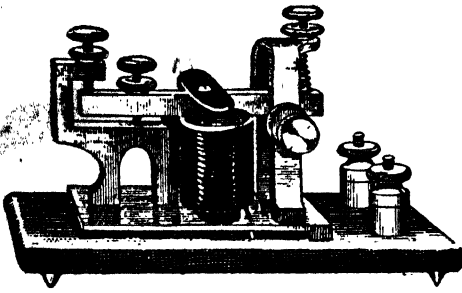
টেলিগ্রাফের কল
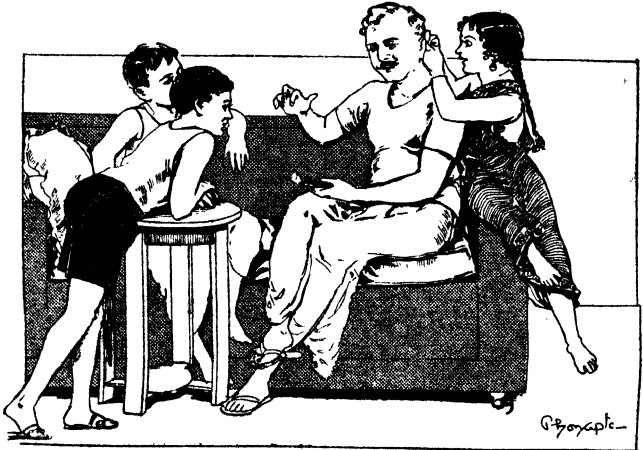
এখানে শব্দ করা হ'ল টরে-টক্কা

আবার কলে বাজল SHARP—এবার কল থামল একটু বেশিক্ষণ, ধর দু সেকেণ্ড

তারা বুঝল একটা বাক্য শেষ হ'ল। এখন পড়ে দেখলেই বোঝা যাবে মানেটা। Anu come sharp—মানে—অনু শীঘ্র চ'লে এস। 'টরে' আর 'টক্কা' এই দুটি শব্দে ইংরেজি বর্ণমালার সব ক'টা অক্ষরই জানান যায়।"

মণ্টু বলিল—"বাবা, দুটি শব্দে ছাব্বিশটা অক্ষর বোঝান যাবে কেমন ক'রে ?"

—"ঐতো বললাম শব্দগুলো সাজিয়ে নিয়ে।"

—"আচ্ছা কোন কোন শব্দে কি কি অক্ষর হয় বলো না বাবা, আমরা খাতায় লিখে নি।"

—"বলছি, লেখ।"

অমনি খাতা পেনসিল লইয়া সকলেই লিখিতে বসিয়া গেল। প্রিয়ব্রতবাবু বলিলেন—"দেখ 'টরে টক্কা' লিখতে অনেক সময় লাগে। তার চেয়ে এক কাজ কর। 'টরে'র বদল লেখ ফুটকি (·) আর 'টক্কা'র বদলে লেখ ড্যাশ (—)।"

তাহার পর তিনি বলিয়া চলিলেন আর তাহারা লিখিয়া লইল :—

A · —
B — · · ·
C — · — ·
D — · ·
E ·
F · · — ·
G — — ·
H · · · ·
I · ·
J · — — ·
K — · —
L · — · ·
M — —
N — ·
O — — —
P · — — ·
Q — — · —
R · — ·
S · · ·
T —
U · · —
V · · · —
W · — —
X — · · —
Y — · —
Z — — · ·

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

(গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের গল্প-প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ গল্প)

"দৈ চাই দৈ, চিনিপাতা দৈ"—হেঁকে চ'লেছে এক গয়লা। তা'র কাঁধে একটি বাঁক, বাঁকের দুইধারে দড়িতে ঝুলানো তিনটি ক'রে ছয়টি চিনিপাতা দৈয়ের হাঁড়ি।

বৃদ্ধ নবীন পোষ্টমাষ্টারের ছোট ছেলে, বয়স তা'র এগার কি বার, নাম সুবোধ ; কিন্তু দুষ্টুমিতে সে একেবারে গ্রামের সকল ছেলের সেরা। পাঠশালা হ'তে পালিয়ে এসে

বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ান তা'র স্বভাব, সকল রকম গাছে চড়াও সে শিখে ফেলেছে। তা'র অত্যাচারে লোকের গাছে থাক্‌ত না আম, পাক্‌তে পেত না জাম, ক্ষেতের আখ মিষ্টি হবার আগেই হ'ত নষ্ট; খেজুরগাছে উঠে কর্‌ত সে রসচুরি!! এ রকম অনেক কাজেই সে বেশ পেকে উঠেছিল।

এহেন সুবোধ যেমনি শুনতে পেল গয়লার হাঁক, বেরিয়ে এল পাড়ার একটা বাড়ী হ'তে, চুপিসারে পিছন নিল গয়লার। গয়লা চ'লেছে এগিয়ে, তা'র পিছনে নেই দৃষ্টি। সুবোধ সন্তর্পণে তুলে নিল পিছনের ভার হ'তে সবার উপরকার হাঁড়িটি। দু'চার পা গিয়েই পিছনের ভার-যে গিয়েছে ক'মে গয়লা পেল তা' টের। তাকিয়ে দেখে সুবোধ বাঁ-হাত দিয়ে দৈয়ের হাঁড়িটা ধ'রে ডান হাতে কর্‌ছে দৈয়ের সদ্‌গতি, আর গয়লাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে স'রে স'রে যাচ্ছে পালিয়ে।

"তবে রে বেটা—দাঁড়াতো" ব'লে রাস্তার ধারে বাঁক নামিয়ে গয়লা ছুট্‌ল সুবোধের পাছে পাছে। গয়লার হ'য়েছে বয়স, সে পার্‌বে কেন সুবোধকে ধর্‌তে। সুবোধ হাঁড়ি নিয়েই দিল দৌড়, কিন্তু গয়লাও ছাড়ে না। আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে সুবোধ চ'লেছে এগিয়ে।

কিছুদূর গিয়ে সুবোধ বুঝ্‌ল গয়লা বেটা প'ড়েছে পিছিয়ে, কাজেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে এক কুকুর আর গোটা কতক কাক মনের সুখে গয়লার অবশিষ্ট দৈ খাচ্ছে বিনা বাধায়! গয়লাকে হাঁক দিয়ে সুবোধ বল্‌ল—"বেটা ষাট বছরের নাবালক—তাকিয়ে দেখ্ কেমন কুকুরের আর কাকের লেগেছে ভোজ।"

গরীব গয়লা সব দৈ নষ্ট হ'তে দেখে দুঃখে কেঁদে ফেল্‌ল এবং সুবোধের পিছনে যেয়ে আর লাভ নেই ভেবে, 'দূর্' 'দূর্' কর্‌তে কর্‌তে দৌড়ে এসে পৌঁছাল তা'র বাকী হাঁড়ির কাছে।

সুবোধ তখন হাস্‌তে হাস্‌তে যেই খেতে যাবে দৈ, অমনি দেখে চেয়ে, প্রকাণ্ড এক গরু হাত দশেক দূরে—আস্‌ছে ছুটে সোজা তা'রই দিকে। ভাগ্যে সাম্‌নেই ছিল একটা খেজুরগাছ। হাতের হাঁড়িটা ফেলে দিয়ে সুবোধ উঠ্‌তে লাগ্‌ল সেই গাছে।

গরুটার রাগের ঝোঁক যেন সুবোধের উপরেই, সে এসে শিঙ লাগালে খেজুরগাছে। মনে হ'ল এই বুঝি দেয় গাছ ভেঙে। ওদিকে গয়লা গরুটাকে দৌড়্‌তে দেখে বাঁক তুলে নিয়ে, লাগ্‌ল ছুটতে। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ল যে, গরুটা সুবোধ যে গাছে আছে,

সেই গাছের গোড়ায় শিঙ লাগিয়ে নাড়া দিচ্ছে। তা'র মনে হ'ল বড়ই আনন্দ, সে আস্‌তে লাগ্‌ল গাছের দিকে ফিরে, তখন সুবোধ গাছের উপরে।

এদিকে গরুর মালিক এসে গরুটাকে বেঁধে মার্‌তে মার্‌তে বাড়ীর দিকে দিল টান। গাছে ছিল ফিঙের বাসা, ফিঙে-দম্পতি সুবোধকে গাছে চড়্‌তে দেখেই ভাব্‌লে এ বুঝি উঠ্‌ছে তাদের ডিম চুরি কর্‌তে। যেমন ভাবা—তেমনি তা'রা লাগ্‌ল তা'কে ঠোক্‌রাতে। একহাতে সুবোধ রক্ষা কর্‌ছে তা'র মাথা, আর এক হাতের সাহায্যে নাম্‌ছে সে গাছ বেয়ে। ওদিকে গয়লা এসে দাঁড়ালে গাছের অন্য ধারে। ফিঙের তাড়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে সুবোধ যেই নেমেছে নীচে অমনি গয়লা ধ'রেছে তা'র বাঁ-হাত চেপে।

"চল বেটা তোর বাবার কাছে, আমার সমস্ত দৈয়ের দাম আদায় ক'রে তবে তোকে ছাড়্‌ব" ব'লে গয়লা টানতে টান্‌তে চল্‌ল সুবোধকে নিয়ে। এমন সময় আফিসের কাজ সেরে সুবোধের বাবা এসে হাজির হ'লেন সেখানে এবং গয়লার কাছে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন সুবোধের কীর্ত্তি। তখন সুবোধ মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়েছিল গয়লার পাশে। তখন সুবোধের বাবা সমস্ত দৈয়ের দাম তিন টাকা গয়লার হাতে দিয়ে ধর্‌ল সুবোধের মাথার চুল, দিলেন ক'সে টান, সুবোধ উঠ্‌ল কেঁদে। তখন 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' ব'লে মুচ্‌কি হেসে গয়লা দিল পাড়ি।

মওলা নওয়াজ

পরলোকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশুসাহিত্য-স্রষ্টা, সদা সহাস্যবদন, বন্ধুবৎসল যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বিগত ১২ই আষাঢ়, শনিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় দুরন্ত নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৭৪ সালের কার্ত্তিকমাসে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত নেতড়া গ্রাম। উহা সুপ্রসিদ্ধ জয়নগরের নিকটবর্ত্তী। যোগীন্দ্রনাথের পিতা নন্দলাল সরকার মহাশয় গ্রামের বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার

মহাশয় ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক। যোগীন্দ্রনাথও আপন প্রতিভা ও উদ্যমের ফলে জ্যেষ্ঠ নীলরতনের ন্যায় সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ দেওঘর ইংরেজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলেজের পড়া শেষ হইলে তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

তিনি যখন দেওঘর স্কুলে পড়িতেন তখনই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া, শুধু তাঁহার সমপাঠিগণ নহে, শিক্ষকগণও চমৎকৃত হইতেন। সিটি কলেজিয়েটে শিক্ষকতার

সময়েই তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। শিশুদের জন্য লিখিত বিদেশীয় পুস্তকে ছবি দেখিয়া, বাঙ্গালা ভাষাতেও ঐরূপ ছবি দিয়া সাজাইয়া বই লিখিতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন সেই আগ্রহ পূরণের উপায় ছিল না বলিলেই হয়। উদ্যমী যোগীন্দ্রনাথ তাহাতে দমিলেন না। যোগীন্দ্রবাবু যখন শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় অগ্রসর হইলেন, ঠিক সেই সময়ে শিশুদিগের জন্য "সখা" নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। বাঙ্গালা ভাষায় শিশুদের জন্য উহাই আদি পত্রিকা। যোগীন্দ্রনাথ ঐ "সখা" পত্রিকায় শিশুদের উপযোগী রচনা প্রকাশ করিতেন। তদুপলক্ষে সখার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কাজেই তিনি "সখা" পত্রিকায় প্রকাশিত বহু ছবির ব্লক কিনিয়া ল'ন। ঐ সকল ব্লক এবং আবশ্যক মত আরও কিছু ব্লক তৈয়ারী করাইয়া তিনিই প্রথম (জানুয়ারী, ১৮৯১) বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেন; উহাই 'হাসিখুসি' নামে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিচিত। বর্ত্তমানে উহার ৩৪টি সংস্করণ হইয়াছে। উহা কেবল নামে হাসিখুসি নহে কাজেও হাসিখুসি। উল্লিখিত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্তও উহা সমভাবে বাঙ্গালার শিশুদের হাসি এবং খুসির কারণ হইয়াছে।

'হাসিখুসি' প্রকাশিত হইবার পর উদ্যমী যোগীন্দ্রনাথ শিশুদিগের জন্য বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে বর্ত্তমানে 'হাসিখুসি' দ্বিতীয় ভাগের ১৯, 'হাসিরাশি' ও 'রাঙ্গাছবি'র ১৮, 'ছবির বই'—১৭, 'ছোটদের রামায়ণ'—১৬, 'মজার গল্প' ও 'খেলার সাথী'র ১৫টি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। যোগীন্দ্রবাবুর প্রণীত পুস্তকের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। একাদিক্রমে সুদীর্ঘকাল দেশের শিশুমহলকে হাসি ও খুসিতে ভরপুর রাখা যোগীন্দ্রবাবুর পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালার অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের শিক্ষিত লোক বোধ হয় একটিও নাই যিনি 'হাসিখুসি'র একটি ছড়াও মুখস্থ বলিতে পারেন না।

যোগীন্দ্রনাথ প্রথমে শিশুদের মাসিকপত্রের লেখক, পরে পরিচালকরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'মুকুল' পত্রিকার নাম অনেকেরই জানা আছে। বস্তুতঃ যোগীন্দ্রবাবুর ন্যায় সুদীর্ঘ (প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি) কাল বাঙ্গালার শিশুদিগকে সমভাবে লেখাপড়ার ভিতর দিয়া আনন্দে নাচাইতে আর কেহই পারেন নাই। তাঁহার তিরোধানে বাংলার শিশুগণ একজন পরমহিতৈষীকে হারাইল। কেবল শিশুগণ নহে তাহাদের অভিভাবকেরাও যোগীন্দ্রবাবুর অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন।

আমরা সর্ব্বজনপ্রিয় যোগীন্দ্রনাথের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

খেলা-ধূলা

কলিকাতায় লীগ্ খেলা

এবারকার মত কলিকাতার ফুটবল লীগের প্রতিযোগিতার যবনিকাপাত হ'য়ে গেল। এবারেই ফুটবল লীগে এক নতুন রেকর্ড স্থাপিত হ'ল মহামেডান্ স্পোর্টিংএর দ্বারা। একমাত্র সৈনিকদল ডার্‌হাম্, তিন তিন বার পর পর লীগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিল। মহামেডান্ স্পোর্টিং সেই রেকর্ডও অতিক্রম ক'রে পর পর চার বছর প্রথম স্থান অধিকার ক'রে যে সম্মান লাভ ক'রেছে, তা শুধু ভারতের ফুটবলেরই নয়, জগতের ফুটবলের ইতিহাসে অপূর্ব্ব। একটি ভারতীয় টীমের পক্ষে এত বড় গৌরব লাভ এর পূর্ব্বে কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি।

প্রায় ৪০ বছর ধ'রে এই লীগ্ প্রতিযোগিতা চলছে, এর মধ্যে আর কোন ভারতীয় দল লীগ্

জেত্‌বার সম্মান লাভ করে নি ; মোহনবাগান ছয় বার, আর ঈষ্ট্ বেঙ্গল তিন বার অল্পের জন্য এই সম্মান হারিয়েছে।

লীগের শেষ-অর্দ্ধের খেলায় এবার ঈষ্ট্ বেঙ্গলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ মহামেডান্ স্পোর্টিংকে ঈষ্ট্ বেঙ্গল হারিয়ে দিয়েছে। ঈষ্ট্ বেঙ্গলের এবারকার সব চেয়ে বড় গৌরব এইটিই। শেষের দিকের অনেকগুলো খেলাতেই এই টীমটি চমৎকার ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েছে।

ভবানীপুর প্রথমটা খুবই ভাল খেল্‌ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না। তা'দেরও লীগ্ জয়ী হওয়ার আশা খুবই ছিল। প্রথম খেলায় মহামেডান্ স্পোর্টিংও তা'দের হারাতে পারে নি, বরং অতি কষ্টে ড্র রেখেছিল, কিন্তু শেষ খেলায় মহামেডান্ দল তা'দের চার চারটি গোল দিয়েছে।

ইউরোপীয় দলগুলোর মধ্যে ক্যামেরোনিয়ান্‌স্‌দেরও চ্যাম্পিয়ন্ হওয়ার আশা খুবই করা গিয়েছিল, কিন্তু ক্যালকাটা, মহামেডান্ স্পোর্টিং এবং ঈষ্ট্ বেঙ্গলের নিকট পর পর হেরে যাওয়ায় তা'দের একেবারেই নিরাশ হ'তে হ'ল।

মোহনবাগানের খেলা শেষের দিকে ভাল হ'লেও প্রথম, দ্বিতীয় হওয়ার আশা কখনই ছিল না।

যে পাঁচটি টীমের আলোচনা করা হ'ল, তা'দের ছাড়া অন্য টীমগুলোর অবস্থা লীগ খেলার ফলাফলের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে।

১২ই জুলাই থেকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা—আই. এফ্. এ. সিল্ডের খেলা সুরু হবে। এবার সারা ভারতের প্রায় সব জায়গা থেকে মোট ৫০টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। আগামী মাসে তোমরা তাদের খেলার বিবরণ শুন্‌তে পাবে।

লীগ্ খেলার ফলাফল

	খেলা	জিত	ড্র	হার	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েণ্ট
মহামেডান্ স্পোর্টিং	২২	১৪	৬	২	৪৭	১৮	৩৪
ঈষ্ট্ বেঙ্গল	২২	১২	৪	৬	৪৮	২২	২৮
ভবানীপুর	২২	১১	৬	৫	৩৪	২৯	২৮
ক্যামেরোনিয়ান্স্	২২	১২	৩	৭	৩১	২১	২৭
মোহনবাগান	২২	১০	৫	৭	২৩	১৯	২৫
কাষ্টমস্	২২	১০	৪	৮	২৬	২২	২৪
কালীঘাট	২২	৯	৫	৮	২৬	৩১	২৩
ই. বি. রেলওয়ে	২২	৫	১০	৭	২২	২৭	২০
ক্যালকাটা	২২	৫	৮	৯	১৮	২৮	১৮
কে. ও. এস্. বি.	[illegible]	৭	৪	১১	২২	৩৭	১৮
এরিয়ান্স্	[illegible]	৫	৪	১৩	২৫	৪০	১৪
ডালহৌসী	২২	০	৫	১৭	১২	৪১	৫

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press ;
5, College Square, Calcutta.

ষোড়শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৪ { ৫ম সংখ্যা

খোকনমণি

খোকনমণি বল,
কিসের আশায় এলি রে তুই এই ধরণী-তল ?
তোরে দেখে চমক লাগে,
কোথা ছিলি আসার আগে ?
ফুলের মত মুখখানি তোর আনন্দে উজল ;
খোকনমণি বল।

ওরে খোকনমণি,
তোরে দেখে ভাঙ্গা-বীণে উঠ্‌ল সুরের ধ্বনি।
(তোর) রাঙ্গা মুখের হাসির ধারা,
কর্‌ল মোরে পাগলপারা,
তুই যে আন্‌লি ধরার মাঝে আনন্দেরই খনি ;
ওরে খোকনমণি !

প্রাণের খোকন ওরে,
স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্য মাঝে কে পাঠা'ল তোরে ?
তোরে সাথী পাই রে যদি
ভুল্‌ব দুঃখ নিরবধি,
ছেড়ে দিতে রাজি সবই পাই রে যদি তোরে ;
প্রাণের খোকন ওরে !

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার রায়

সোনার সংসার

(১)

সেদিন কল্যাণী সিনেমাতে 'সোনার সংসার' অভিনয় হচ্ছিল। তা দেখ্‌তে গিয়েছিল বুড়োদের সঙ্গে আমাদের পাড়ার মণ্টু, হাবুল, সতু, ফড়িং, বেবী—মানে আর কি—প্রায় কেউই বাদ যায় নি। ছেলে বুড়োরা সকলে মিলে সেদিন সোনার সংসার দেখে এল। বুড়োদের কাছে তা' ভাল নাও লাগ্‌তে পারে, কারণ ওটি পৌরাণিক কাহিনী নয় ; তবে ছেলেরা ত দেখে খুব ভাল বল্‌লে। তা'দের মনে বাসনা হ'ল যে, তা'রাও ঐরকম সোনার সংসার অভিনয় কর্‌বে। সকলের মতও হ'য়ে গেল।

কিন্তু কোথায় অভিনয় হবে ?

মণ্টু বল্‌লে—"সতুর বাড়ীতে হোক্।"

সতু আপত্তি জানালে যে—তা'র বাবা মত দেবেন না তারপর বললে—"কেন বেবীদের বাড়ীতে হোক্ না ?"

বেবী বল্‌লে—"আমাদের বাড়ীতে হবে না ভাই। ছোড়দা'র যে ভাব, তা'তে রাগ্‌লে কি কাণ্ডটাই না করেন।"

তা হ'লে কোথায় হয়! সে একটা চিন্তার বিষয়। এমন সু-ইচ্ছাটা শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়ার দরকার। আদিত্য, সরোজ, দীপক, পীযূষ, অসিত, অসীম সকলে মিলে ঠিক কর্‌লে—মন্টুদের বাড়ীর বাগানের ধারে যে খালি জায়গা আছে সেইখানেই হবে।

বাগানের ধারে ছোট ষ্টেজ্ তৈরী হ'য়ে গেল। সাজ, সরঞ্জাম, পরচুলা, সিন্, সমস্ত জোগাড় হ'ল। সমস্ত দুপুর চেঁচিয়ে সকলে পাঠ কণ্ঠস্থ কর্‌লে। কে রমা হবে, কে খোকা হবে —সব ঠিক হ'য়ে গেল; এমন কি ডাকাত, জমিদার কে কে হবে তা' পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল। তখনই কয়েকজন সতুদের বাঁশের ঝাড়ে গিয়ে বাঁশ কেটে দু'-তিন খানা পাকা লাঠি পর্য্যন্ত তৈরী ক'রে ফেল্‌লে।

সকলে মিলে ঠিক্ কর্‌লে……

(২)

এখন অভিনয় দেখার লোক জোগাড় কর্‌তে হবে। মন্টুদের বাড়ীতে হবে ব'লে—তা'দের বাড়ীর সকলেই দেখ্‌বে। তারপর ক্ষ্যান্ত পিসীকে একদিন বাজার ক'রে দিয়ে তা'কে হাত করা হ'য়েছে। বুড়ো হরিশ চাটার্জ্জির তামাক সেজে দিয়ে তাঁ'কেও দেখ্‌তে বাধ্য ক'রেছে। ওপাড়ার জগা, মুরারী দাদা, জানকী কামার সকলেই দেখ্‌বে ব'লে আশ্বাস দিয়েছে। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই—তা'রা আগে থেকেই নেচে আছে। বুড়ো রায় মশায়ের আম পেড়ে দিয়ে তাঁ'কে হাত ক'রে—তাঁ'র বাড়ীর দুটো গ্যাস-ষ্টিক আর একটা পেট্রোমেক্স পেয়েছে। 'কাল সোনার সংসার অভিনয় হবে—সন্ধ্যা ৭টায়' একথা তা'রা পাড়াময় রাষ্ট্র ক'রে দিলে—টিন্ পিটিয়ে।

বিকালে মন্টু, হাবুল, সন্তু, ফড়িং, আদিত্য, পীযূষ, সরোজ, দীপক সকলে

এসে চাটাই, ছেঁড়া মাছর পেতে বিছানা সব ঠিক ক'রে রেখে গেল। সিন্ পড়বে কি ক'রে, কোন্ সিন্ ড্রপসিন্ হবে—সব ঠিক হ'য়ে গেল। সরোজ ওপেনিংছং দিয়ে অভিনয় আরম্ভ করবে—আর ফড়িং ক্লোজিংছং দিয়ে অভিনয় শেষ করবে।

এসব করতে করতে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। সকলে যে যার বাড়ীতে ফিরে গেল।

(৩)

পরদিন সকাল থেকে তোড়জোড় লেগে গেল। বিকাল হ'তেই সমস্ত ছেলেমেয়ে জুটে গেল। পাড়ার শেফালী, দীপালী, রূপালী, পুরবী, খোকা, চানু, মণি, পরী সবাই এসেছে অভিনয় দেখ্‌তে। খানিক পরে জগা, মুরারী দাদা, জানকী কামার এসে পড়্‌লে। মেয়েদের স্থানে ক্ষ্যান্ত পিসী, বেবীর মা, মণ্টুর মা, দিদিমা, ফড়িংয়ের দিদি, পিসী, মা সকলেই এসেছেন। আরম্ভ হবার কিছু আগে বুড়ো হরিশ খুড়ো লাঠি ঠক্‌ঠক্ ক'রে এসে হাজির, আর তাঁ'র পেছনে পেছনে রায় মশায়ও এসেছেন। সকলেই এসেছে—পাড়ার প্রায় কেউই বাদ যায় নি দেখে, তা'রা বেল্ বাজিয়ে দিলে। অমনি ড্রপসিন্ উঠে গেল।

বাড়ী পুড়তে লাগ্‌ল

সরোজ গান গেয়ে চ'লে গেল। সরোজের গান শুনে সকলে হাতে তালি দিয়ে খুব বাহবা জানালে। তা'তে ওদের খুব আনন্দ হ'ল—আর উৎসাহও বেড়ে গেল দশগুণ।

ভোলা সাজ্‌ল রমা, আদিত্য হ'ল রমেশ, আর রবি হ'ল খোকা। রমেশ রবিকে খেলা দিচ্ছে। অন্য-ধারে গ্রামোফোন হচ্ছে—এমন সময় ডাকাতদল অর্থাৎ হাবুল, ফড়িং, সতু, মণ্টু, বেবী বাঁশ হাতে সশব্দে বাড়ীতে প্রবেশ করলে। খানিক মারামারি—পরে ডাকাত সতু দিল বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে! বাড়ী

পুড়তে লাগ্‌ল—দর্শকেরা পরম উৎসাহে বিস্মিত হ'য়ে রুদ্ধশ্বাসে অভিনয় দেখ্‌ছিলেন। সহসা সকলের চমক ভাঙ্গ্‌ল—অভিনয়ের ডাকাতের আগুনে—অভিনয়ের বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ষ্টেজ, সিন্‌, সাজ আর এক বো'তল কেরোসিন পর্য্যন্ত পুড়তে লাগ্‌ল! চারদিকে আগুন আগুন রব উঠ্‌ল। যে যেদিক পার্‌লে সে সেদিক ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। জল দিয়েও আগুন নিবাতে পার্‌লে না; বরং অগ্নিদেব ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লে।

বাগানের পার্শ্বে অবস্থিত মণ্টুদের খড়ো ঘরে আগুন ধর্‌ল। বৈশাখের রোদের তাপে খড় ভীষণ তেতে ছিল। আগুনের ছোঁয়া লাগ্‌তেই সে ভীষণভাবে জ্বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সে কি ভীষণ দৃশ্য। তারপর খড়ো ঘরের সংলগ্ন পাশের তিনখানা খড়ো বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল! তখন দেখা দিল বাতাস—ক্রমে ক্রমে পাড়ার খড়ের আর কেনেস্তারা টিনের সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত হ'য়ে গেল! তারপর আর সংলগ্ন কোন বাড়ী না থাকায় অগ্নিদেব নিরস্ত হ'লেন।

রায় মশায়, হরিশ খুড়োর বাড়ীও আজ অগ্নিদেবের হাতে নিস্তার পায় নি। সারাটা পাড়া নিয়ে একেবারে অভাবনীয় সোনার সংসার হ'য়ে গেল! যত দোষ সব পড়্‌ল সতুর ঘাড়ে—কারণ সে-ই আগুন দিয়েছিল! তখন এ-ওর ঘাড়ে দোষ দিতে লাগ্‌ল—কিন্তু আর দোষারোপ ক'রে লাভ কি? যা হ'বার হ'য়ে গেল। ছেলেরা প্রতিজ্ঞা কর্‌লে জীবনে আর কোনও দিন অমন থিয়েটার কর্‌বে না।

শ্রীসত্যেশচন্দ্র সান্ন্যাল

পরীক্ষা-মন্দির

হলেতে ঘুরিছে গার্ড, নটবর সা
টুলে একা ব'সে ভাবি নাহি ভরসা,
রাশি রাশি ভারা ভারা চুল ছেঁড়া হ'ল সারা
কাটিল না তবু ফাঁড়া, দফা ফরসা,
টুকে নিতে এলো ছুটে নটবর সা।

একখানি ছোট খাতা—আমি একেলা !
চারিদিকে ছেলেদের লেগেছে মেলা,
সুদূরেতে দেখি আঁকা   তরু-ছায়া মসীমাখা,
পার্ক-খানি লোকে ভরা বিকাল বেলা ;
এ ঘরেতে সাদা খাতা—আমি একেলা !

হাই তুলে তুড়ি দিয়ে কে ডাকে কা'রে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ;
ছেলেগুলি লিখে যায়   কোনদিকে নাহি চায়
ও-ই শুধু নিরুপায় চাহে দু' ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কিবা চাও কোন অঙ্ক সে—
বারেক ফিরাও আঁখি নিকটে ঘেঁসে,
মোর কাছে যাহা চাও   থাকে যদি টুকে নাও
শুধু তুমি ব'লে দাও ক্ষণিক হেসে
'মেজারমেণ্টের' অঙ্কটা নিকটে ঘেঁসে।

যত চাও লিখে লও খাতার পরে
'আরো আছে ?'—আর নাই ! যেও না স'রে
এতক্ষণ বসি টুলে   লিখেছিনু বই খুলে
যাহা কিছু দিনু ব'লে—[illegible]ই তোমারে,
এখন আমারে কহ করুণা ক'রে।

'টাইম্ নাই' 'টাইম নাই'—হায় কি করি
আমারি বোকামি দোষে আসি নি পড়ি।
ছেলেগুলি ধীরে ধীরে   খাতা দিয়ে গেল ফিরে
শূন্য বেঞ্চির ভিড়ে, রহিনু পড়ি,
কেড়ে নিয়ে গেল খাতা অহো কি করি।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ

খোকার বড় হওয়া

এই ত সেদিন—মনে পড়ে ছোট্ট ছেলে—অ আ ক খ শেষ ক'রেছে, সকালবেলায় মাষ্টার মশায় বানান পড়্তে দিয়েছেন।

ওমা—আজই তার সে কি রাগ! খাবার দিতে দেরি, ছোট থালায় খাবার, ছোট গেলাসে জল!

উঃ—কি অবহেলা! বলে—'তোমরা কি মনে কর আজও আমি তোমাদের কচি খুকু র'য়ে গেছি—কি আশ্চর্য্যি! আমার নাম নীরোদ—নীরোদবাবু ব'লে ডাক্তে পার না?'

হরির পিঠে কিল, ভুলুর গায়ে লাথি!—বলে—'বাঃ রে বাঃ—আমি বুঝি পেণ্ট প'রে ইস্কুলে যা'ব! কেন আমার ধুতি কই?

সত্যি খোকার আজ ইস্কুলে যাওয়াই হ'ল না। মা কত বল্লেন, বাবা কত বল্লেন, কাকা কত বল্লেন। দিদিমা বড় ভাল—বড় থালায় বড় গেলাসে ব'লে ক'য়ে খাওয়ালেন। তবু বুড়িরা ভাল, তা'রা বড়র মর্ম্ম বুঝে। একদিন ইস্কুল কামাই! কি হ'য়েছে ছাই—খোকা আমার বড় ভাল ছেলে! ওর ওজন কেউ বুঝে না—বুঝে বুড়ি!

* * * *

খোকা বড় হচ্ছে। তিন চারটি ভাই-বোনের বড়দা হ'য়ে গেছে। বিশু, শিশু, টুলু, মিনু, নিশি, হাসি, খুসি সব্বাইর সে দাদা। কারও বড়্দা, মেজ্দা, সেজ্দা, কারও ছোড়্দা—হরেক রকমের দাদা। সত্যি খোকা বড় হচ্ছে।

ঝি বল্‌ত ঝাল খেলে বড় হয়। তাই উঃ আঃ—ক'রে অনেক ঝাল খেয়েছে সে। রোগীরা ওষুধ খেয়ে ভাল হয়, কিন্তু ডাক্তারকে বলে—আমি অম্‌নি ভাল হ'য়েছি। খোকাও তেম্‌নি ঝিকে বল্‌ত—'তুই ঝাল খাইয়ে খাইয়ে আমার মুখ পোড়ালি, বড় হচ্ছি কই!' অথচ সে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে প্রত্যেক দিন শরীর মেপে দেখ্‌ত কতখানি বড় হ'য়েছে!

ভোলা বল্‌ত—পড়্লে বড় হয়। তাই কখন কখন সে সত্যি খুব চেঁচিয়ে পড়্‌ত। বড় হওয়ার তার ভীষণ সখ কিনা! হাঁ সত্যি ত রাণুদের বড়্দা কত বড়। কিন্তু, যাই বল, সে পড়েছেও অনেক। মনে পড়ে, একদিন জিজ্ঞেসও ক'রেছিল—'নিতুদা, তুমি কি খুব ঝাল খেতে আর জোরে জোরে পড়্‌তে?'

নিতুদা হাস্‌লে, সবাই হেসে হেসে খোকাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লে। বেচারা

কেমন হ'য়ে গেল। রাতে খেতেও চাইলে না। ভাগ্যিস্ দিদিমা মরেন নি। তাই তিনি ব'লে ক'য়ে কোন রকমে একবাটি দুধ খাইয়ে দিলেন।

যাহোক, আরও বছর দশেক কেটে গেছে। খোকা এবার সত্যি দেহে ও মনে বড় হ'য়েছে। কলকাতায় থেকে ফিফ্‌থ্ ইয়ারে পড়ে। আদুরে বাপের আদুরে ছেলে; তাই রঘুয়া সঙ্গে আছে।

ফিফ্‌থ্ ইয়ারে পড়ে বটে, পড়াশুনায়ও ভাল; বি. এতে সেকেণ্ড হ'য়েছিল। তবু—তবু যেন ছেলেমানুষ। কলেজ থেকে ফিরে আসে, এক লাফে রঘুয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রঘুয়া কখন কখন বকে—'একি ছেলেমানুষি বাবা! মা বাবা মেয়ে খুজ্‌ছেন বে' থা' দেবেন।' রঘুয়া বড় আদর করে। গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, 'খোকা!'

রঘুয়ার গলা চেপে ধরে

খোকা বলে—'কি?'

—'জগদীশবাবুর মেয়েটি যেন—'

খোকা এক লাফে রঘুয়ার গলা চেপে ধরে; রঘুয়াকে বকে—রেগে যায়। রঘুয়া কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলে—'আমি কালই কর্ত্তাবাবুর কাছে লিখছি—তুমি দেখ্‌বে'খন।'

খোকা বলে—'রঘুদা, খাব।' রঘুয়া থাক্‌তে পারে না—খাবার নিয়ে আসে। রাতে যখন কড়মড়িয়ে মেঘ ডাকে, খোকা আৎকে ওঠে; ডাকে—'রঘুদা—'

রঘুয়া বলে—'খোকা, তুমি ত এখন বড় হ'য়েছ।' তবু কাছে এসে ঘুম পাড়ায়। এম্‌নি ক'রে দিন যায়।...

* * * *

—'টুক্ টুক্ টুক্—বাবু!'

—'কি? কে—পোষ্ট্‌ম্যান?'

ওই লোকটা কত লোককে কাঁদায়, কত লোককে হাসায়। এন্‌ভেলাপে পুরে কত না অজানা রহস্য দোরে হাজির করে!

—'ক্রীং ক্রীং ক্রীং!'

—'নাঃ—ও যে টেলিগ্রাফ-মেসেঞ্জার।···রঘুদা,—ওটা টেলিগ্রাম!—দেখি!'—

* * * *

আজ খোকার কেউ নেই। পিতা নেই, স্নেহময়ী মাতাও দুরন্ত কলেরায় ভুগে বাবার পিছু পিছু কোন্ রাজ্যে চ'লে গেছেন। সে কেঁদেছিল,—কেঁদে চীৎকার ক'রে—'মা মা, বাবা বাবা'—ব'লে ডেকেছিল। কিন্তু কেউ সাড়া দেন নি।

দিদিমা বেঁচে আছেন—অন্ধ, চলাফেরার শক্তি নেই। অদৃষ্টের দারুণ পরিহাস! যাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মরি মরি ক'রেও বুড়ি মরে নি—আজ তা'রাই গেল চ'লে। দেবতা তাঁর চোখের আলো নিবিয়ে দিলেন।—বুড়ি আজ অন্ধ—দুনিয়া তাঁর কাছে অন্ধকার।

* * * *

বুড়ি বেঁচে আছে। জানে না কেন বেঁচে আছে বা থাকবে—তবু বেঁচে আছে।

খোকার ওকালতির পসার বেশ জমেছে। ছোট ভাইরা কলেজে পড়ে। বোনেদের সবাইর বে' হ'য়ে গেছে।

এখন তিনটে ছেলের বাবা সে। সে-ই ত, সে-দিনের আর একটি স্মৃতি!

বুড়ি শুয়ে শুয়ে বল্‌ছেন—'খোকা রে, হা পোড়া অদেষ্ট আমার, দেখ্‌তেও পাচ্ছিনে,—সত্যি কি তুই এখন অনেকখানি বড় হ'য়ে গেছিস্ খোকা?'

আজ তা'র সংসারে সে-ই যে সব চাইতে বড়!

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

নিরাময়-রশ্মি

সূর্য্যালোক জীবের জীবনস্বরূপ; প্রাণরক্ষার ও প্রাণ-প্রসারণের প্রধান সহায়ক এবং জড় জগতের সমস্ত শক্তির (energy) অফুরন্ত ভাণ্ডার। যতই দিন যাইতেছে ততই বৈজ্ঞানিকগণ উহার আরও অনেক রকম উপকারিতা ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন।

ইউরোপ আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ। সেজন্য সেখানকার অধিবাসীদের সর্ব্বদা গরম কাপড় পরিধান করিতে হয়। কাজেই অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদের মত সূর্য্যালোকের সহিত তাহাদের সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলা ত কেহ আর অন্ধকারে থাকিতে চাহে না। তাই প্রকৃতির আলো গৃহে আনিবার জন্য তাহারা জানালার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ঠাণ্ডার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাতে লাগাইয়াছে কাচের সার্শি। তাহাতে ঘরে আলোক আসিবার কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই সত্য; কিন্তু সূর্য্যের আলোর মধ্যে যে 'আল্ট্রাভায়োলেট' রশ্মি (Ultra-violet-ray) আছে, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ ঐ রশ্মি কাচের সার্শি ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। তাহারা ভাবিয়াছিল, টাট্‌কা বাতাস আর সার্শি-ছাঁকা আলোক পাইলেই হইল—যেন তাহা হইলেই প্রকৃতির নিকট হইতে চাওয়া ও পাওয়ার সমস্ত দাবী ফুরাইয়া যায়—কিন্তু তাই কি?

ইন্দ্রধনুতে যে সাতটি রং দেখা যায়, সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিলেও তাহাতে সেই সাতটি রংএর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সাতটি রংই একত্রে ইংরেজীতে 'স্পেক্‌ট্রাম' (Spectrum) নামে অভিহিত। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি উহাদের অন্যতম। অবশ্য খালি চোখে সেই রশ্মি দেখা যায় না।

এজগতে অনেক তথ্যই হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে—নানা ঘটনার সমাবেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা যাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করি, তাহা হয়ত পাই না; কিন্তু অন্যদিক দিয়া এমন একটা কিছু লাভ হয়—জগতে যাহার মূল্য ঢের বেশী। কলম্বস ভারতে আগমনের পথ খুঁজিতে যাইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, চায়ের কেট্‌লীতে জল গরম হইতেছিল—কিন্তু তাহাই একদিন বাষ্পীয় যান

আবিষ্কারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। সূর্য্য-কিরণের নিরাময়-শক্তি আবিষ্কারের পশ্চাতেও ঐ রকম একটা মজার ইতিহাস আছে।

কোন শিশু-হাসপাতালে একদিন দেখা গেল, যে-সমস্ত শিশু সূর্য্য-রশ্মি সেবন করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি আরোগ্য লাভ করিতেছে। ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরীক্ষা-সিদ্ধ করিয়া আসল তথ্যটি আবিষ্কারে মন দিলেন। সাদা ইঁদুর লইয়া প্রথমে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং সেই পরীক্ষাতেই তথ্যটির চাবিকাঠি পাওয়া গেল। বস্তুতঃ শিশুদের সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিলে উহাদের হাড় শক্ত হইতে থাকে এবং রক্তে ফস্ফেটের (Phosphate) মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

এই নিরাময়-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave-length) খুব ছোট এবং স্পেক্ট্রামের বেগুনী রং বর্ণাংশের শেষে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই রশ্মি, কাচ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু আজকাল এই রশ্মি কৃত্রিম উপায়েও উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রীনল্যাণ্ড, লেপল্যাণ্ড প্রভৃতি রৌদ্র-বিরল প্রদেশ সমূহেও কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যকিরণ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাঃ বলিয়ার ক্ষয়-ক্ষত-গ্রস্ত রোগীদিগকে "লেসিনে" তাঁহার 'আলপাইন ফার্ম্মে' সূর্য্যকিরণ সেবন করাইয়া নিরাময় করিয়া আসিতেছেন। সেইখানে রোগীদিগকে অনাবৃত-দেহে একরকম উলঙ্গ অবস্থায় সারাদিন কাজ করিতে হয়। ফার্ম্মটি সু-উচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য—সেখানে সূর্য্যালোক অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। আলোক পৃথিবীতে আসিবার কালে—বায়ুর মধ্যে যে সমস্ত ধূলিকণা ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ আছে—সে-সব ভেদ করিয়া আসে। সুতরাং পৃথিবীতে আলোকরশ্মি সেরকম বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

মানবদেহে 'আল্ট্রাভায়োলেট' রশ্মির কি ক্রিয়া—তাহা এখনও সম্যক্ জানা যায় নাই। সে সম্বন্ধে শুধু এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ কিরণ চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সংগঠন বদলাইয়া দেয় এবং জার্ম (germ) বিষক্রিয়া প্রভৃতির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করে। সূর্য্যকিরণ প্রয়োগদ্বারা বাত ভাল করা যায়, ক্ষত স্থান খুব তাড়াতাড়ি শুকাইয়া উঠে এবং আরোগ্যাভিমুখী রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

অনাবৃত দেহের উপর আঁল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি—ধূলিকণা প্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্যের

সহিত মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে—সম্পাত করিতে দিলে, রক্তপীড়ন (Blood-pressure) কমিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ধীর অথচ ঘন ঘন হইতে থাকে। সুতরাং নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সময় আমরা অনেকটা বাতাস ভিতরে টানিয়া লইতে অথবা বাহির করিয়া দিতে পারি। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি শরীরের ক্যাপিলারী নালিকাগুলিকে আয়তনে বড় ও বলশালী করিয়া দেয়—শ্বেত ও লাল অসৃক্-কণিকার (Blood-corpuscle) সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উহা ক্ষয়-রোগে চূণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া "টিউবার কিউল" নামক জার্ম নষ্ট করে। এই ভাবে দেহও ক্রমশঃ সবল সুস্থ হইয়া উঠে। এইখানে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সূর্য্যালোক সেবন করিবার সময় দেহ যাহাতে অত্যধিক উত্তপ্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে 'আল্ট্রাভায়োলেট' রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য একমাত্র ধনীরাই এই চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ—দরিদ্রের পক্ষে এখনও তাহা 'বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার' মত। সম্প্রতি সূর্য্যের আলোক সেবন করিবার হুজুগ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দুই-একটি দেশের কোন কোন নরনারী সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় রৌদ্র সেবন করিবার এক নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশেও সূর্য্যালোক সেবন করিবার পদ্ধতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। গায়ত্রী ও সন্ধ্যা মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, উহা প্রধানতঃ সূর্য্যের উপাসনা।

হিন্দুরা সূর্য্যের যে সকল নাম রাখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক নামের মূলগত অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে—তাঁহারা সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি বিষয়ে কত সূক্ষ্মজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন! আজকালও দেখা যায় ভারতের পল্লীতে পল্লীতে নবজাত শিশুর মাতা শিশুকে তৈলসিক্ত করিয়া রৌদ্র সেবন করাইয়া থাকেন। বাস্তবপক্ষে আমাদের দেশও সূর্য্যরশ্মির ঐ নিগূঢ় সত্যটি গণনাতীত কাল হইতেই জ্ঞাত আছে।

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

এস গো ভাদর !

এস গো ভাদর ! সাদরে বরণ করিছে তোমায় কৃষক-দল,
আসা-পথ চেয়ে বেঁচে আছে তা'রা তুমি যে তা'দের হৃদয়ে বল ;
বরষা তা'দের দিয়াছে ভরসা— তুমি সফলতা করিবে দান,
বরষের দুখ বিদূরিত হবে রাখ যদি তুমি সম্ভ্রম-মান।
প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত নাহিক তা'দের কৃত্রিম বেশ,
সরলতা-মাখা কোমল হৃদয়ে নাহিক হিংসা, নাহিক দ্বেষ ;
শ্রমিক সাজিতে জানে শুধু তা'রা চাহে নাক' হ'তে বিরাট মহান,
সসীম তা'দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আত্মীয় পর সকলে সমান ;
'আউসে' ও 'পৌষে' সম্পদ জানে লক্ষ্মীর ঝারি এ-দুটি মাস,—
তাই আজি তা'রা আবাহন করে— এস গো ভাদর ! ঘুচাতে ত্রাস।
অর্দ্ধ অশনে অনশনে কভু কেটেছে তা'দের কত যে দিন,
মাঠের কাজটি ছাড়েনিক' কভু দেহ যত তা'র হয়েছে ক্ষীণ ;
এস গো উদার মহান ভাদর ! অর্ঘ্য দানিছে কৃষক-দল,
'আউসে' পূর্ণ গোলা গুলি ক'রে দাও গো তা'দের হৃদয়ে বল !
'মোটা' ধান তা'রা বড় ভালবাসে তৃপ্তিতে খাবে মোটা রাঙা ভাত,
'চিকনের' দিকে লক্ষ্য থাকিলে সহরের শিরে পড়িত হাত !
এস গো ভাদর ! আদর তোমার নহে শুধু আজ ঝিঙের ঝোলে,
দীন কৃষকের আশ্রয় তুমি— শান্তি পাবে তা'রা তোমার কোলে।

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকুমার

[৮]

দীর্ঘ এক মাস পরে দেওঘর থেকে ফিরে এলাম। মাকে একবারও না দেখ্‌তে পেয়ে এতদিন আমার কী ভাবেই না কেটেছে ! আজ আর কারও কথা শুন্‌ব না ভেবে—প্রথমেই এক ছুটে মা'র ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম।

দরজাটা খোলা—ঘরটা যেন হা হা কর্‌ছে !…মা নেই ! ঘরের প্রত্যেক জিনিসপত্র যেখানকার যেমন ঠিক তেমনই আছে, শুধু মা-ই নেই। ডাক্‌লাম,—'মা ! মাগো !…'

শূন্য প্রতিধ্বনি ফিরে এল—নাই! নাই! নাই!···

চোখ ফেটে জল এল।

ছুটে সুখদার কাছে গেলাম; বল্‌লাম,—'সুখদা, আমার মা, আমার মা কই?'

সে কোন জবাব দিলে না, মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

একে একে বাড়ীর প্রায় সকলকেই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, কিন্তু কেউই কোন জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইল।

ছুটে মাসীমার ঘরে গেলাম। আজ আর তাঁকে 'মা' ব'লে কিছুতেই ডাক্‌তে পার্‌লাম না, অনেকদিন পরে আবার মাসীমা ব'লে ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'মাসীমা, আমার মা কোথায়?—'
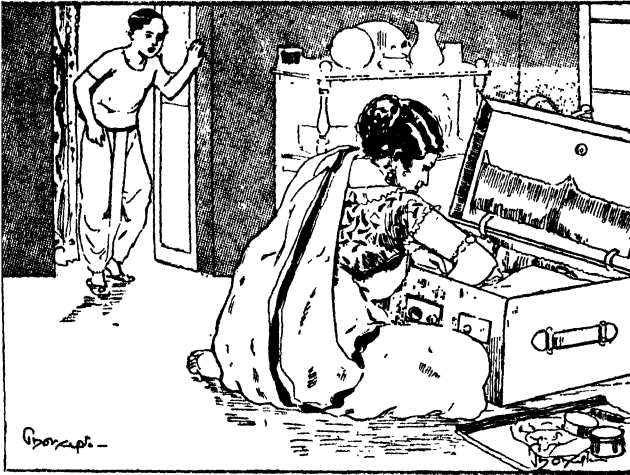
'মাসীমা, আমার মা কোথায়?'

একটা বাক্সের ডালা খুলে তিনি যেন কি খুঁজছিলেন, মুখ না তুলেই জবাব দিলেন,—'তোমার মা চ'লে গেছেন!—'

—'চলে গেছেন?—কোথায়?'

'জানি না!'—ব'লে তিনি আপন মনে আবার নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। আমি ক্ষাণিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বেরিয়ে সোজা আমার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। সমস্ত দিনে একটি বারের জন্যও ঘর হ'তে বের হ'লাম না, চাকর ভাত খেতে ডাক্‌তে এসেছিল, তা'কে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।··বিকালের দিকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। টেবিলের উপর একটা বই পড়েছিল, অন্যমনস্কভাবে সেই বইটা হাতে নিয়ে তা'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে, হঠাৎ একটা চিঠি হাতে ঠেক্‌ল। তা'র উপরে লেখা র'য়েছে—

"নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু!

নিমাই, বাবা আমার।"

একি! এযে আমারই মা'র হাতের লেখা! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চিঠিটা খুল্‌লাম। তা'তে লেখা ছিল—

"নিমাই—বাবা আমার,

আজ শুধু তোমার ভালর জন্যই তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি! এসে আমায় না দেখে হয়ত

মনে খুব কষ্ট হবে, হয়ত কাঁদ্‌বে! কিন্তু কেঁদ না। আমি যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে যা'ব না! ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা ক'রো; আর কারও মনে কখনও কোন কষ্ট দিও না, তা হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে!...

ইতি তোমার শুভার্থিনী মা!—"

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ে চিঠিটা ভিজিয়ে দিল।...

মাগো! কেন আমায় একাকী এখানে ফেলে গেলে? কেন আমায় তোমার সঙ্গে নিলে না মা? ...তোমায় ছেড়ে একা একা কেমন ক'রে এখানে আমি থাক্‌ব!

গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিকষ কালো অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী একাকার হ'য়ে গেছে। শুধু ওই দূর আকাশের গায়ে হেথা হোথা দু'একটা নক্ষত্র আগুনের ফুল্‌কীর মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। মাঝে মাঝে রাতের হাওয়া চুপি চুপি আসা-যাওয়া কর্‌ছে!

মা যে ঘরে শুতেন সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কোথায় যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা মিউ মিউ ক'রে বোধহয় তা'র মাকে খুঁজে ফির্‌ছিল।

দরজাটা ঠেলে অন্ধকার ঘরের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একা আমায় এখানে ফেলে কোথায় গেলে মা! কতদিন যে তোমায় একটি বার দেখি নি।

মেঝের উপর শুয়ে কত কাঁদ্‌লাম।...কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোধহয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ বাঁশীর সুরে ঘুমটা ছুটে গেল। বংশী যেন কোথায় ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে! আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দালানে চ'লে গেলাম। মনে হ'ল দীঘির পার হ'তেই যেন সুর ভেসে আস্‌ছে। হাট্‌তে হাট্‌তে দীঘির ধারে চ'লে গেলাম। সব চাইতে নীচেকার ধাপে, যেখানে দীঘির জল এসে তা'কে ডুবিয়ে দিয়েছে সেইখানটিতে—জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে ব'সে বংশীই আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম তা'র পাশে।

সে এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছিল যে, প্রথমটা আমার এখানে আসা সে টেরই পায় নি। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তা'র বাঁশী বাজান শুন্‌তে লাগ্‌লাম। কী করুণ ও মধুর তা'র বাঁশীর আওয়াজ! চারদিককার আকাশ বাতাসও যেন নীরবে কান পেতে তা'র বাঁশীর সুর শুনছে।

অনেকক্ষণ বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সে যখন থাম্‌ল, আমি তখন মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম,—'বংশী!'

সে চম্‌কে মুখ তুলে পিছন পানে তাকালে—'একি রাজকুমার!'—

'হাঁ ভাই আমি!'—ব'লে আমি ধীরে ধীরে তা'র পাশটিতে বস্‌লাম।

আমার এরূপ ব্যবহারে সে যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে—মনে হ'ল। বা হাতটা তুলে তা'র কাঁধের উপর রাখ্‌লাম। হঠাৎ দু'হাতে তা'কে জড়িয়ে ধ'রে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠ্‌লাম, বল্‌লাম,—'বংশী আমার মা?'...

সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ কেঁদে, কতকটা সুস্থ হ'লাম। বংশী বল্‌লে,—'ঘরে চল রাজকুমার।'—

আমি তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, দোলা দিতে দিতে বল্‌লাম,—'দেখ, আমার একটা কথা শুনবি বংশী!—'

—'কী?'—

—'এবার থেকে আমায় তুই আর রাজকুমার ব'লে ডাকিস্ না, নিমাই ব'লে ডাকিস্—কেমন বুঝ্‌লি?—'

সে যেন আমার কথাটা ভাল ভাবে বুঝতেই পারে নি এমনি ভাবে অনেকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর, আবার কি ভেবে আমায় ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে বল্‌লে,—'ঘরে চল।'

দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম।

[৯]

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও একটা মাস কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যেন কেটে গেল। মা ব'লে গেছিলেন ভালভাবে পড়াশুনা কর্‌তে, তাই দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই পড়ার বই নিয়ে কাটাবার চেষ্টা কর্‌তাম—কিন্তু পার্‌তাম না। পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ যে কখন আনমনা হ'য়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম কিংবা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমাদের হরিণগাঁয়ের ছোট কুড়ে ঘরটির দরজায় গিয়ে হাজির হতাম…হঠাৎ যখন খেয়াল ভাঙ্‌ত—চেয়ে দেখ্‌তাম, বই যেমন খোলা তেমনই র'য়েছে, একটি লাইনও পড়া হয় নি। আবার বইয়ের অক্ষরের দিকে মন দিতাম।

দিন রাত এইভাবে মা'র কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শরীর আমার দিন দিনই ভেঙ্গে পড়ছিল। একদিন শোবার ঘরের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লাম,—ইস্ কী ভয়ানক রোগা হ'য়ে গেছি!

খাওয়া, খেলা, বেড়ান কিছুই যেন আর তেমন আমার ভাল লাগ্‌ত না।…… এমনি ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুর্গাপূজা এসে গেল।

নাটমন্দিরে কারিগর প্রতিমায় রং চড়াতে লাগ্‌ল। সেদিন মন্দিরের ধারে একটা টুলে ব'সে ব'সে প্রতিমায় রং দেওয়া দেখ্‌ছিলাম, একজন ভিখারী এসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধর্‌লে,—

'দশ দিশি আলো ক'রে
উমা আমার, আয় মা ঘরে।—'

ভারী মিষ্টি গলাটি তা'র।

গান শেষ হ'লে, আমি তা'কে বল্‌লাম,—'আর একটা গান গাওনা ভাই!'......

সে অল্প একটু হেসে আবার গান ধর্‌লে,—

'ওমা কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে
তুলে নে কোলে,......'

গানের সুরের সাথে সাথে আমার সমস্ত প্রাণ মন যেন হু হু ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আজ প্রায় দুই মাস হ'য়ে গেল—মাগো কোথায় তুমি! ভিখারী তখন গাইছিল,—

'সারা দিন মা ক'রে খেলা
ফিরেছি এই সাঁঝের বেলা,......'

তা'র গান শেষ হ'লে তা'কে বস্‌তে ব'লে ভিতরে চ'লে গেলাম। বাক্স থেকে একটা টাকা এনে দিলাম। সে দু'হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌লে, 'রাজা হও বাবা!—'

আমার চোখের কোলে জল ভ'রে এল। হায়রে আর যে আমি রাজা হ'তে চাই না, রাজা হওয়ার সাধ আমার মিটেছে, আর এ রাজপুরীর মোহও আমার কেটে গেছে, এখন চাই শুধু আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া মাকে—আর সেই ফেলে-আসা হরিণগাঁর ছোট্ট কুড়ে ঘরখানি। যেখানে একদিন মা'র মুখে গল্পের রাজকুমারের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে দাওয়ায় চাঁদের আলোয় মা'র কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।......

[১০]

এমনই ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজার দিন ঘনিয়ে এল। ঢাকের বাদ্যে চারদিক্ গম্ গম্ ক'রে উঠ্‌ল। মাটির মা তো এলেন, কিন্তু আমার রক্ত-মাংসের মা কি আস্‌বেন না? তাঁর কি আজও আসার সময় হ'ল না?

পূজার দিনে আমাদের অতিথশালায় কত দূর দেশ থেকে হেঁটে হেঁটে কতই না লোক এসেছিল। তাদের মাঝে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম—যদি তা'রা আমার মায়ের কথা বল্‌তে পারে! তা'রা কতজনা হয়ত আমার মা'র পাশ দিয়েই হেঁটে এসেছে, হয়ত তাঁর সঙ্গে কথাও ব'লেছে!......মা কি তা'দের কাছে আমার কথা কিছু ব'লে দেয় নি?......ছোট্ট একটা কথা, 'কেমন আছ' কিংবা 'সুখে থেক!' এমনি কিছু!

পূজার তিন দিন বাড়ীতে যাত্রা গান হ'ত বরাবরই এবারও বিদেশ থেকে যাত্রার দল

এসেছিল। সুখদার কাছে শুন্‌লাম—আজ নাকি 'বিজয়-বসন্ত' পালা হবে। মা'র মুখে একদিন বিজয়-বসন্তর গল্প শুনেছিলাম, তাই বেশ একটু আগ্রহ নিয়েই গিয়ে গান শুন্‌তে বস্‌লাম।

... ...

নিষ্ঠুর রাজা বিজয়-বসন্তের মাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছোট ভাইটি কেঁদে কেঁদে দাদাকে শুধাচ্ছে,—

'ও দাদা বল বল,

আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল !—'

ওগো তোমরা বল আমার মাও ত হারিয়ে গেছে, তাঁকেও ত খুঁজে পাচ্ছি না !—

... ...

আগের দিন থেকেই শরীরটা খুব খারাপ হ'য়েছিল—জ্বর-জ্বর-ভাব। মাথাটাও বেশ ভার-ভার লাগ্‌ছিল। প্রায় সারা রাত ধ'রে যাত্রা হ'ল। যখন যাত্রা ভাঙ্গ্‌ল, তখন আর হেঁটে ঘরে যেতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা হ'ল না, সেইখানে মাটিতে সতরঞ্চের উপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।......হঠাৎ এক সময় সুখদার ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল,—'একি ! রাজকুমার, তুমি এইখানে শুয়ে ! আর আমরা সারাটা বাড়ী তোমায় খুঁজে মর্‌ছি।......উঃ ! একি, গা যে তোমার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গো !'......

সে আমায় বুকের উপর তুলে নিল। সমস্ত শরীর তখন আমার যেন জ্বলে যাচ্ছে। চোখের পাতা খোলা যায় না—জ্বালা করে !......হাত পা গায়ে অসহ্য বেদনা, মাথাটাও যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সুখদা কোলে ক'রে নিয়ে আমায় বিছানায় শুইয়ে দিলে। .....একটু পরেই যেন কা'র মুখে সংবাদ পেয়ে মাসীমা এসে আমার ঘরে ঢুক্‌লেন।

—'হাঁরে সুখদা, বিনুর নাকি অসুখ ক'রেছে ?... ..'

আমার গায়ে হাত দিয়েই তিনি ভয়ে চম্‌কে উঠলেন,—'উঃ গা যে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, শীগ্‌গির কর্ত্তাবাবুকে ডেকে আন্‌ তো !'—

সুখদা কর্ত্তাবাবুকে ডাক্‌তে নীচে ছুটে গেল।

... ...

তারপর আর ভাল ক'রে সব আমার মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হ'ল চেয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে একটা আলো জ্বল্‌ছে, আমার চার পাশে সব ওষুধের শিশি। মাথার কাছে মাসীমা ব'সে, এক ধারে চেয়ারে ব'সে কর্ত্তাবাবুও।

আমায় চোখ মেল্‌তে দেখে মাসীমা উদ্বিগ্ন-ভাবে আমার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আকুল-স্বরে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'কেমন আছ বাবা ?'

... ...

আর একদিন মনে হ'ল, কর্ত্তাবাবু যেন মাসীমা'কে বল্‌ছেন,—'পরের ছেলেকে জোর ক'রে কোন দিনও আপন করা যায় না। পরকে আপন কর্‌তে হ'লে তা'কে সময় দিতে হয়!..... ওর মাকে এভাবে ওর কাছ থেকে জোর ক'রে দূরে সরিয়ে দিয়েই তুমি এমনি কর্‌লে। ছেলেটা ভেবে ভেবেই এমনি ক'রে শুকিয়ে গেল।......'

আর একদিন!

মনে হ'ল মাসীমারই গলা,......তিনি যেন কা'কে জিজ্ঞেস কর্‌ছেন,—'ডাক্তার কী বল্‌লে?'

উত্তর হ'ল—'এখন ওকে ভাল ক'রে তুল্‌তে হ'লে, ওর মা'কে নিয়ে আসা ভিন্ন আর উপায় নেই।'

'তবে তাই এনে দাও। বাছা আমার আগে ত বেঁচেই উঠুক।'—মাসীমা বল্‌লেন।

... ...

তার পর হঠাৎ একদিন যেন আমার অত্যন্ত পরিচিত একটা গলার আওয়াজ কানে ভেসে এল।

'নিমাই...নিমু! বাবা আমার!......'

এযে আমারই মা'র কণ্ঠস্বর! তবে কি তিনিই আবার ফিরে এলেন! ফিরে এসেছ মা? তোমার নিমাইকে দেখ্‌তে আবার ফিরে এলে কী! ভয়ে ভয়ে ধীরে চোখ খুল্‌লাম, দেখ্‌লাম এক যোড়া জলভরা চোখ আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে!...

'মা!...মাগো, সত্যিই তুমি এলে মা?'

'হাঁ বাবা, এই যে আমি এসেছি!'

'হাঁ বাবা, এই যে আমি এসেছি!'

'এবার আমি শীগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে উঠ্‌ব।...এত তোমাকে ডাক্‌তাম, তুমি কোথায় ছিলে মা?'...

শীর্ণ দুটি কম্পিত হাত তুলে মা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকের মাঝে মুখটা গুঁজে আদরের সুরে ডাক্‌লাম—'মা, মা মাগো!—'

শ্রীনীহার গুপ্ত

—শেষ—

ভাদরে

কল্ কল্   কল্ কল্   নিরবধি রে,
ফুলি ফুলি   দুলি দুলি   ছুটে নদী রে।
বাঁকে বাঁকে   বসে তা'র   কত বলাকা,
দুধবৎ   শাদা শাদা   তাদেরি পাখা।
রাজহাঁস   প্যাঁক্ প্যাঁক্   জলে সাঁতারে,
এক এক   দলে দলে   চলে কাতারে।
মাছরাঙা   বার বার   স্নান করে রে,
এক এক   ডুবে তা'রা   মাছ ধরে রে।
সূর্য্যিমামা   ধীরে ধীরে   চলে আকাশে
ঢেকে গেছে   মেঘ-জালে   নহে ফাঁকা সে।
ধানে ধানে   গেছে ভ'রে   সারা মাঠ রে,
জলে জলে   গেছে ডুবে   কত ঘাট রে।
মাঝি ভাই   করে পার   ছোট নায়েতে,
চ'লে যায়   লোকগুলি   নিজ গাঁয়েতে।
বিলে বিলে   জলে জলে   ফুটেছে কমল,
ঢালে রাতে   চাঁদামামা   আলোক অমল।
চারা চারা   ধান গাছে   দোল লাগে রে,
কুমুদেরা   ঘুম হ'তে   আজি জাগে রে।
পড়ে তাল   দুপ্ দাপ্   তাল-তলাতে,
বাড়ীগুলি   যায় ডুবে   জল বাড়াতে।
বনবীথি   হ'ল আজ   ঘন কাল রে;
পাখীদের   গান আজি   লাগে ভাল রে!
খোকাখুকু   ভগবানে   ডাক আদরে,
গাও গীত   মন সুখে   আজি ভাদরে!

আবুল হোসেন মিঞা

হোপ ডায়মণ্ড বা আশা-মণি

কোহিনূরের ইতিহাস সম্বন্ধে তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয় জান। আজ তোমাদিগকে আর একটি হীরার কথা বলিব। তোমরা তাহা শুনিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

তোমরা হয়ত শুনিয়াছ যে, আকাশে যে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহ উদিত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেইরকম হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি রত্নও মানুষের জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ তাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। আজকাল কিন্তু অনেকেই সে-বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয়। মানুষের পূর্ব্বকার বিশ্বাস কতটা সত্য, তাহা তোমরা এই হীরাটির ইতিহাস হইতে জানিতে পারিবে। কারণ ইহার সহিত কত হত্যাকাণ্ড, কত রক্তপাত ও অশ্রুপাতের করুণ কাহিনী জড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই।

যে হীরার কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি তাহার নাম **'হোপ ডায়মণ্ড'** বা **আশা-মণি**। 'হোপ ডায়মণ্ড' নাম কেমন করিয়া হইল তাহা তোমরা পরে জানিতে পারিবে। এই হীরাটি রঙিন হীরার রাণী। ইহার বর্ণ হরিদ্রাভ নীল। ইহার আকার—লম্বা চওড়ায় প্রায় এক ইঞ্চি করিয়া এবং পুরু প্রায় আধ ইঞ্চি; ওজন ৪৪$\frac{১}{৪}$ ক্যারেট ও আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০,০০০ পাউণ্ড।

হোপের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। কোল্লারের খনি হইতে উহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু কবে উহা খনির অন্ধকার গহ্বর হইতে লোক-চক্ষুর গোচর হইয়াছিল, তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। উহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে—গুপ্ত বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে।

হূণ-বিজয়ের পর যশোধর্ম্মদেব, **বিক্রমাদিত্য** উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। কথিত আছে, তিনি এই হীরাটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া উজ্জয়িনীর দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন; কিন্তু একদিন রাজকার্য্য পরিচালন সময়ে কোন বিশ্বাসঘাতকের ছুরীতে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়া যায়।

উজ্জয়িনী ধ্বংসের পর বহু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যদিয়া হীরাটি দশম শতকের

শেষভাগে কোন এক **রাজপুত নৃপতির** আশ্রয় গ্রহণ করে। অল্প দিন পরেই সেই নৃপতির একমাত্র পুত্র জলে ডুবিয়া মারা যায়। তাঁহার সুখের সংসার ছয় মাসের মধ্যেই ছারখার হইয়া যায়।

তাহার পর আরও তিন শতক নীরবে কাটিয়া গেল। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে হোপ **মালিক কাফুরের** হাতে যাইয়া পড়িল। মালিক কাফুর তখন গুজরাটের সিংহাসনের রক্ষক। কিন্তু হায়! হীরা পাইয়া তিনিও বেশীদিন সুখে কাটাইতে পারিলেন না। অল্প দিনেই গুজরাটের সহিত দিল্লীর ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও মালিক কাফুর গুজরাটের সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিলেন না। গুজরাট লণ্ডভণ্ড হইল। অবশেষে তিনিও নিজের বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা নিজের তরবারীতে গলদেশ ছিন্ন করাইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিলেন। এই তরবারীর মূলদেশেই তিনি হীরাটিকে যত্নের সহিত স্থান দিয়াছিলেন।

আরও কয়েক শতক—রক্তপাত ও অনর্থপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যাটক **ট্রাভার্‌নিয়ার্** ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন। হোপের রূপে মুগ্ধ হইয়া বহু ধনের বিনিময়ে তিনি উহা হস্তগত করেন এবং ফরাসীদেশে লইয়া যান। অতি অল্পকালেই উহার রূপের কথা ফরাসীদেশে ছড়াইয়া পড়ে। **চতুর্দ্দশ ল্যুই** তখন ফরাসীদেশের সম্রাট্। তিনি রাজভাণ্ডারের প্রভুত ধন দিয়া উহাকে ক্রয় করেন। কিন্তু ট্রাভার্‌নিয়ার্ উহাকে বিক্রয় করিয়া যে উহার ভয়াবহ পরিণামের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন তাহা নয়, তাঁহাকেও অতি হীন অবস্থায় অনাহারে রুশিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রাণ দিতে হইল। সম্রাট্ ল্যুই হীরাটি রাণী **এণ্টিয়নেট্‌কে** দান করেন। অল্পদিন পরেই, ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি ও সম্রাজ্ঞী এণ্টিয়নেট্ শোচনীয়ভাবে নিহত হইলেন।

হোপ কিছুদিন রাজকুমারী **ল্যাস্‌বেলার** অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। সুতরাং রাজকুমারীও প্যারী সহরে প্রজাহস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্রাট ল্যুই হীরাটিকে আমষ্টার্ডামে কোন বিখ্যাত মণিকারের নিকট কাটাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। যে **রাজদূত** উহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে পরদিন প্রত্যূষে শয্যায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। যাহারা এই রাজদূতকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল—তাহারা সকলেই জাহাজ-ডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছিল!

তাহার পর আসিল **ল্যুইয়ের মন্ত্রীর** পালা। তিনি আশা-মণিকে একদিন মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া রাজদরবারে গিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার অদৃষ্টে কারাবাস ঘটিল এবং সেই কারাগারের ভিতরেই অতি শোচনীয়ভাবে তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর হোপ **পঞ্চদশ ল্যুইয়ের** হস্তগত হইল। তিনি প্রথমে হীরকটি তাঁহার পত্নী **ডুবারেকে** দেন এবং পরে কন্যা **এলিজাবেথকে** দেন। কিন্তু সেই দুই মহিলাকেই ফাঁসীতে ঝুলিতে হইয়াছিল, আর পঞ্চদশ ল্যুইকে বসন্তরোগে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় ফরাসীদেশে বিষম রাষ্ট্রবিপ্লব। ফরাসী রাজকোষের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। সেই সুযোগে বিপ্লব-পন্থীরা হোপকে চুরি করিয়া ফরাসীদেশ হইতে সরাইয়া ফেলিল। ত্রিশ বৎসর উহার আর কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহাতেও উহার ভয়াবহ পরিণামের সূত্র ছিন্ন হইল না।

এইবার আশা-মণি লইয়া আসিল ইংলণ্ডের পালা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে **ফ্রান্সিস্ বোলে** নামক কোন ফরাসীর নিকট **দানিয়েল ইল্‌সন্** নামক লণ্ডনের কোন রত্ন-বিক্রেতা হোপকে প্রাপ্ত হইলেন। বিক্রয়ের পরদিন প্রত্যূষে বোলে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে **টমাস্ হোপ্** নামক একজন ধনী মহাজন ইল্‌সনের নিকট হইতে আঠার হাজার পাউণ্ড মূল্যে উঁহাকে ক্রয় করেন। টমাস্ হোপের নাম হইতেই এই হীরাটির বর্ত্তমান নাম "হোপ ডায়মণ্ড"। টমাস্ হোপও হীরাটিকে পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই—কারণ অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিল। টমাস্ হোপের সংসার মরুময় হইল। বাধ্য হইয়া তিনি উহা রাজপুত্র **ক্যানিটোভস্কিকের** নিকট বিক্রয় করিলেন। যে **দালাল** এই বিক্রয়কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল সেও পাগল হইয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিল।

রাজপুত্র ক্যানিটোভস্কি হোপকে তাঁহার প্রিয়তমা অভিনেত্রী **লরেন্স লেভনিকে** উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজপুত্রের সহিত লরেন্সের বিবাদ ঘটিল। কোন এক নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতেই রাজপুত্র, লরেন্সকে রঙ্গমঞ্চে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন এবং নিজেও ধরা পড়িয়া প্রাণ দিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে হোপের আবির্ভাব হইল আমেরিকায়। ওয়াশিংটন্ সহরের প্রসিদ্ধ ধনবতী মহিলা **ই. বি. ম্যাকলিন** বহু স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে উহা ক্রয় করিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা প্রথম লোক-চক্ষুর গোচর করেন। ক্রয় করার

কিছুদিন পরেই তাঁহার একমাত্র পুত্রকে মোটর-সংঘর্ষে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সাহসী মহিলা ইহাকে এখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

এইরূপে হোপ—এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটাইল। উহার ভয়াবহ পরিণামের সূত্র এখনও ছিন্ন হয় নাই; কবে ছিন্ন হইবে কেহ বলিতে পারে না।

এখন তোমরা বেশ বুঝিতেছ যে, হীরকাদি রত্ন মানুষের জীবনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্যভাবে ও অজ্ঞাতসারে আসিয়া মানুষকে বিপদের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দেয়।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সিংহ

রূপ ও গুণ

টুকটুকে রং পলাশ ফুলে
বাগান করে আলো,
তা' ছেড়ে লোক কেন বলে
গোলাপ সবার ভালো?
গোলাপ ফুলে মধুর সুবাস,
গন্ধবিহীন রঙিন্ পলাশ;—
গুণ না হ'লে রূপে কি পায়,—
কে চায় তারে বল?
গোলাপ-পলাশ দু'য়ের মাঝে
গোলাপ জগৎ-আলো! *

মরহুম্ শেখ ফজলল্ করিম সাহিত্যবিশারদ্

---

* কবি শেখ ফজলল্ করিম সাহেব গত বৎসর আশ্বিন মাসে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতা "শিশুসাথী"তে প্রকাশিত হইবে। ইহার অধিকাংশই তাঁহার অল্প বয়সের লেখা।—শিঃ সাঃ সঃ

চন্দ্রে গমন

(গল্প)

পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদকে কেমন সুন্দর দেখায়! প্রথম যখন পূবের দিকে উঠ্‌তে থাকে, তখন চাঁদকে একখানা বড় থালার মত দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সত্যই কি চাঁদ ঐ থালার মত? না, তা' নয়। চাঁদকে যদি একগাছি দড়ি দিয়ে ঘেরাও কর্‌তে হয় ত কতটা লম্বা দড়ি লাগ্‌বে?—৬ হাজার ৭ শত ৯৪ মাইলেরও কিছু বেশী লম্বা! আর একটা পেরেক যদি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে চন্দ্রের এপার ওপার করা যায় ত সে পেরেকটা কতখানি লম্বা লাগ্‌বে? বেশী নয়—২ হাজার ১ শত ৬২ মাইল! অথচ আমরা উহাকে একখানা থালার সমান দেখি কেন? না—দূরে আছে ব'লে। কত দূরে আছে?—২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৪০ মাইল!!

ফাল্গুন মাসে দিন-রাত যখন হু হু ক'রে বাতাস বইতে থাকে তখন কত অসুবিধা! চাঁদে কিন্তু একটুকু বাতাস নেই। তাই এখানে যার ওজন ৬/ মণ, চাঁদে তার ওজন মাত্র ১/ মণ! ভারি মজা কিন্তু—না?

আর একটি কথা। এখানে কত লাফাতে পারি?—বড় জোর দশ ফুট। চাঁদে কিন্তু একেবারে ৬০ ফুট! এখানে ঘণ্টায় ৩ মাইল রাস্তা হাঁটা যায়—ওখানে পারা যায় ১৮ মাইল। এই রকম কত কি মজা সেখানে। সেখানে হাজার কামান এক সাথে দাগ্‌লেও একটুও শব্দ হবে না। কেমন ব্যাপার! কার না লোভ হয় সেখানে যেতে?

বিলাতের উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব গবেষণা ক'রে ঠিক কর্‌লেন, যদি পৃথিবী থেকে ২০ কি ২৫ মাইল খাড়া উপরে যাওয়া যায়, তবে চাঁদে যাওয়া যেতে পারে। কেননা, ২৫ মাইলের উর্দ্ধে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই। সেখানে যেতে পার্‌লে, আর কোন চেষ্টা কর্‌তে হবে না, শক্তি দিতে হবে না—অমনি চলা যাবে। সে চলা কত যুগ—কত কাল? কোন গ্রহ কি উপগ্রহ যদি টেনে নেয় ত রক্ষা, নইলে কেবল চল্‌তেই হবে। তবে ভরসা আছে মর্‌তে হবে না। মাধ্যাকর্ষণের উপরে গেলে, খেতে হবে না, ঘুমোতে হবে না, হাঁট্‌তে হবে না; এমনিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা যাবে আর বাঁচা যাবে। মন্দ নয়—কি বল? আজকালের অর্থ-সঙ্কটের দিনে সেখানে গেলে বেশ হয়, না?

যা'ক সে-সব কথা। জার্ম্মানদেশে একদিন তিনজন বড় বৈজ্ঞানিক ঠিক কর্‌লেন—তাঁরা চাঁদে যাবেন। ঐ লোভনীয় চাঁদের লোভ আর তাঁদের সংবরণ হ'ল না। তাঁদের মধ্যে একজন ইটালিয়ান, তাঁর নাম দেওয়া যাক **ই**, এফ, আর, **এস্**। একজন জার্ম্মানীর—তাঁর নাম হো'ক **জি**, এফ্, আর্, এস্, আর একজন লণ্ডনের—তাঁর নাম **এল্**, এফ্, আর, এস্।

তখন রকেটের আবিষ্কার হ'য়েছে।

রকেট্‌টা কি? বন্দুকের যেমন বুলেট, কামানের যেমন গোলা, এক জায়গা থেকে ছুড়্‌লে আর এক জায়গায় পৌঁছে—তেমনই এটাও একটা জিনিস, যাকে বারুদের সাহায্যে ধাক্কা দিলে দূরে গিয়ে পড়ে। যত জোরে ধাক্কা দেওয়া যাবে সে ততই দূরে যাবে।

সেই তিনজন বৈজ্ঞানিক মিলে যুক্তি আট্‌লেন—"তাই ত হে, আমাদের যেতে হবে ২,৩৮,৮৪০ মাইল। অতদূর যাবার ধাক্কা দিতে হবে, সে ত যে সে ধাক্কা নয়! সে ধাক্কা খেয়ে আমরা বেঁচে থাক্‌ব ত?—তাই ত! একবার পরীক্ষা করা যা'ক!"

তারপর তাঁরা ছোট ক'রে একটা রকেট্‌ তৈরী কর্‌লেন। আর তার মধ্যে দুটো খরগোস পূর্‌লেন। ওদের শরীর খুব নরম আর আঘাত সহ্য কর্‌তে পারে কম, তাই খরগোস দুটোকে পূরে দিয়ে তাঁরা রকেট্‌ নিয়ে রাইন নদীর ধারে গেলেন। বিশাল নদীর চর। সেখানে ছাড়্‌লেন রকেট্‌। বেজায় শব্দ হ'ল—"গু-ড়ু-ম"। রকেট্‌ গেল উড়ে—আর মাইল চারি তফাতে গিয়ে পড়্‌ল সেটা। তিন সাহেব গেলেন সেখানে—খুল্‌লেন সেই রকেট্‌। দেখেন মজার এক কাণ্ড! একটা খরগোস আছে চুপ্‌ ক'রে ব'সে—আর একটি নেই। কি হ'ল সেটা? খোঁজ খোঁজ—তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও যখন সেটা পাওয়া গেল না, তখন মেসিন খোলা হ'ল খণ্ড খণ্ড ক'রে—নাঃ তা'তেও নেই। বৈজ্ঞানিক তাঁরা; একটুকু ব্যতিক্রম হ'লেই তাঁদের মগজে নানা বুদ্ধি এসে যায়। এবারেও তাই মস্ত একটা গবেষণায় পড়্‌তে হ'ল তাঁদের—সেই খরগোস হারিয়ে। হঠাৎ জি ব'লে উঠ্‌লেন,—"ওহো, এটা শাদা খরগোস—আর সেটা ছিল মেটে এবং ছোট। এ সেটাকে খেয়ে ফেলেছে।"

পরীক্ষায় সফল-কাম

এল্‌ বল্‌লেন—"তাই নাকি? কেটে দেখি বেটাকে।"

কেটে দেখা হ'ল, বাস্তবিকই এর পেটে গেছে সেটা। যাই হোক পরীক্ষায় সফল-কাম।

তারপর বারুদ যোগাড়, মেসিন-তৈরী, অক্সিজেনের টিউব ইত্যাদি প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌ল। ২,৩৮,৮৪০ মাইল পথ যেতে যেমন তেমন ধাক্কায় ত আর চল্‌বে না! আর রকেটে থাক্‌বে তিন তিনটে হোমরা চোমরা মানুষ—আরও কত কি!

কাগজ কলম নিয়ে হিসেবে বস্‌লেন তাঁরা। তিনটে লোকের ওজন—৭॥ মণ; রকেট্‌ মায় সিট সমেত—তিন মণ; অন্ততঃ এক মাসের খাবার ২॥ মণ, তেল, স্পিরিট, ঔষধপত্র ইত্যাদি ১০ সের; কাগজ, ম্যাপ, নোটবুক ৫ সের; অক্সিজেনের টিউব ইত্যাদি ২৲ মণ— মোট ১৫।৫ সের; আরও অধিক ॥৫ সের, সর্ব্বমোট ১৬৲ মণ। তা'কে সরাসরি উপরে ঠেলে দিতে হবে—যেন

আবার ঠিক সময়মত পৌঁছান যায়। জি সাহেব হিসেব কর্‌লেন—ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে গেলে ১২ দিন ৬ ঘণ্টা ৪ মিনিট লাগ্‌বে চাঁদে পৌঁছুতে। প্রতিপদের রাত্রি ১০ টায় যাত্রা কর্‌লে ত্রয়োদশীর রাত্রি ৪টা ৪মিনিট সময়ে সেখানে যাওয়া যাবে। ত্রয়োদশীর রাত্রে বারটার সময় ৪০ মাইল দূরে থাকা যাবে—চাঁদের থেকে। আরও কিছু গেলেই চাঁদের আকর্ষণে প'ড়ে একেবারে চন্দ্রলোকে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে! কাজেই বারুদ লাগ্‌বে ৩ হাজার মণ। বারুদও যোগাড় হ'ল। দেশ-বিদেশে খবর দেওয়া হ'ল—"তিনজন বৈজ্ঞানিক চাঁদে যাচ্ছেন!" কাগজে কাগজে খবরের ছড়াছড়ি। আর আর বৈজ্ঞানিকের মাথায় গোল লাগিয়ে দিলে—কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুদের ত হিংসাই হ'ল। তাদের দেবতার সুধা সাহেবরা খেয়ে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিবে?

প্রতিপদ। জার্ম্মান প্রান্তরে বারুদের স্তূপ, আর লোকে লোকারণ্য। রকেট্ তৈরী হ'য়েছে দোতালা; উপরে থাক্‌বে খাবার সব—আর নীচে থাক্‌বেন বৈজ্ঞানিকরা আর অক্সিজেনের সরঞ্জাম। সমস্ত বড় বড় বিজ্ঞান-ঘাঁটিতে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে "রাত্রি দশটায় যাত্রা"। জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, রুসিয়া—কোন জায়গা বাদ যায় নি।

রকেট্

রাত্রি দশটা বাজ্‌ল। তিনজনে উঠে পড়্‌লেন রকেটে। এল্ সাহেব সাথে ক'রে একটা কুকুর নিয়েছেন। রকেটে উঠে বেশ ক'রে সব পথ বন্ধ ক'রে দিলেন—বাতাস তার ভিতরে যেতে পার্‌বে না। তাঁরা ব'লে গেলেন—'চাঁদে গিয়ে তাঁদের প্রথম কাজ হবে ঐ কালো জায়গায় (যেটাকে আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলি) আয়না বসিয়ে দিবেন—মাইল খানেক। তা হ'লে এক মাইল পরিমাণ স্থান আর কালো থাক্‌বে না। দূরবীণে তা ধরা পড়্‌বে। চতুর্দ্দশীর রাত্রে তা দেখা যাবে।'

তারপর একটা ইঙ্গিত—সঙ্গে সঙ্গে—গু--ড়ু--ম ক'রে ভীষণ শব্দ, তারপর সব নিস্তব্ধ।

এদিকে জলে জাহাজগুলো সব ডুবো ডুবো, কোন্ ষ্টিমারের কা'র সাথে ধাক্কা, আর কোন্‌টা যে উলট্ খেল তার ঠিক নেই—সমুদ্রে বিরাট ঢেউ, যেন প্রলয় কাণ্ড। নাবিকরা সব হতভম্ব। মিটারে কোন ঝড় বা ভূমিকম্পের চিহ্ন নেই। এ কি হ'ল তবে? তারপর সকলের খেয়াল হ'ল—আজি যে প্রতিপদ, এখন রাত্রি ১০টা। ওরা আজ চাঁদে গেল, এ তা'রই পরিচয়। কাছে যারা ছিল, তাদের কথা আর বল্‌ব কি? কা'র গিন্নী কা'র ছাদে, আর কা'র পায়খানা কা'র রান্নাঘরে গেছে তার ঠিক নেই! চারদিকে একটা বেজায় উল্‌ট পাল্‌ট কাণ্ড!!

সব ঘাঁটি থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কোথায় কত দূরে গেলেন তাঁরা।

এবার তাঁদের ব্যাপারখানা একবার দেখুন। ৩ হাজার মণ বারুদের ধাক্কা খেয়ে, তাঁদের জ্ঞানের খেই গেল হারিয়ে। মিনিট পনের পরে জি সাহেবের জ্ঞান হ'ল। পাশেই এল্‌ সাহেব সটান—বেঁচে আছেন কি নেই বোঝা যায় না। যাই হোক তাঁ'কেও সজ্ঞানে আনা গেল, কিন্তু ই সাহেব কোথায়? কুকুরটিও যে নেই! বহু খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, উপর তলায় দু'জনেই গলা জড়াজড়ি ক'রে প'ড়ে আছে! কুকুর, ই. সাহেবকে কামড় দিয়ে, আঁচড় কেটে প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে। তা' যাক্‌গে—ই সাহেবকে ত পাওয়া গেল। তাঁ'কেও সেরেসুরে নেওয়া গেল।

ঘড়ি দেখে বোঝা গেল, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাঁরা পার হ'য়ে গেছেন। আর ভয় নেই—চল্‌লেন তাঁরা হু হু ক'রে—কোথায়, কোন্‌ দিকে, কোন্‌ প্রলয়ের মুখে, তার ঠিক নেই। মন্দ নয়, খাওয়া আর চলা! কিন্তু কুকুর যে ম'রে প'চে উঠেছে! ওটাকে ত আর ভিতরে রাখা যায় না! ফেলানই বা যায় কেমন ক'রে? জানালা খুল্‌লেই এক হল্‌কা বিষাক্ত বায়ু এসে তিনজনকেই শেষ ক'রে দিবে। চল্‌ল আর একদিন। ক্রমেই দুর্গন্ধ বেশী হ'তে লাগ্‌ল। ফেল্‌তেই হবে ওটাকে।

তারপর কোনরূপে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে একটু জায়গা খুলে ফেলে দিলেন কুকুরটা।

রকেট্‌ চল্‌ল হু হু ক'রে। গেল আরও চার-পাঁচ দিন।

তিনজনেই দূরবীণ দিয়ে এদিকে ওদিকে দেখ্‌ছেন—যদি নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায়। জি সাহেব একবার পিছন ফিরে পৃথিবীটাকে দেখ্‌তে গিয়ে বল্‌লেন,—"আরে ওটা কি—কালো, আমাদের পিছনে আস্‌ছে?"

—"তাই ত হে—অন্য কোন উপগ্রহ নয় ত?"

এল্‌ সাহেব বল্‌লেন—"ওঃ ওটা যে আমার সেই কুকুরটা হে!"

ই সাহেব জবাব দিলেন—"ঠিক কথা, কিন্তু ওটা কেন ঘুরছে আমাদের পিছনে পিছনে?"

জি সাহেব বল্‌লেন—"ঐ ত উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের কথা, যে, মাধ্যাকর্ষণ পার হ'লে সবাইকে এমনি চল্‌তে হবে। কোন শক্তির দরকার হবে না। তারই সত্যতা প্রমাণ হ'ল আজ।"

—"তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই চাঁদে যা'ব, কেমন?"

—"হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই।"

আরো তিনদিন যায়। এখন তিনজনেই উদ্‌গ্রীব—কখন চাঁদ দেখা যাবে কাছেই।

পৃথিবীতে আর কারও টেলিস্কোপে তাঁরা ধরা পড়্‌ছেন না। অনেক দূরে গেছেন তাঁরা।

অষ্টম দিবসে উদ্‌গ্রীবভাবে সবাই তাকিয়ে আছেন,—'হুস্‌' ক'রে সাম্‌নে দিয়ে কি যেন একটা চ'লে গেল! যেন কে বন্দুক ছুড়েছে—তারই বুলেট্‌। আধ সেকেণ্ড সময়ও পেলে না তাঁরা তা'কে দেখে নিতে।

আকাশের ম্যাপ বের কর্‌লেন, হিসেব কর্‌লেন—অমুক দিকে, অমুক সময়, পৃথিবী থেকে

অতদূরে কোন গ্রহ-উপগ্রহ আছে কিনা? কত ম্যাপ, কত হিসেব, কত নোটবুক খুঁজে খুঁজে পেলেন, বাস্তবিকই একটা ছোট্ট উপগ্রহ আছে, চন্দ্র আর পৃথিবীর মাঝখানে। এটাই সেটা। আর একটা সত্যতা পেলেন তাঁরা।

এমনি ক'রে ১২ দিন পার হ'য়ে গেল; বাকি ৬ ঘণ্টা ৪ মিনিট—সেও অতীত। কিন্তু চাঁদ কোথায়? আবার সকলে হিসেব কর্‌তে বস্‌লেন—৩ হাজার মণ বারুদে এমন অবস্থায় ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগ দিতে পারে কিনা। ১২ দিন ৬ ঘণ্টা ৪ মিনিটে ২,৩৮,৮৪০ মাইল আসা যায় কিনা ইত্যাদি কত রকম হিসেব হ'তে লাগ্‌ল। সে-সব কথা আমরা বল্‌ব কি ক'রে? বিজ্ঞানের হিসেবই আলাদা। কিছুতেই তাঁরা ঠিক পেলেন না—কেন তাঁরা এখনও চাঁদে পৌঁছলেন না! চাঁদ কি তবে এই সময় অন্য কোথায়ও থাক্‌বে? না, তাও ত হ'তে পারে না—বিজ্ঞানের হিসেব। তা'ও একজনের নয়, তিন তিন জনের। যত বারই হিসেব করেন—তত বার ঐ একই ফল।
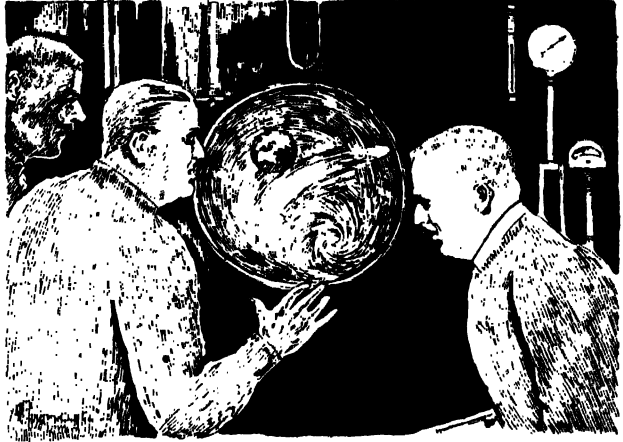
কত গ্রহ, উপগ্রহ 'শো শো' ক'রে চ'লে যায়…

'৩ হাজার মণ বারুদে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে ১২ দিন ৬ ঘঃ ৪ মিঃ সময়।' হিসেব ক'রে ক'রে ঘামিয়ে উঠ্‌লেন তাঁরা। ব্যাপার কি?

ই সাহেব হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"ও হে আমাদের ভুল, ঐ যে উপগ্রহটা আমাদের সাম্‌নে দিয়ে গেল, ওর ত একটা আকর্ষণ আছে; কাজেই ওরই টানে আমাদের গতি (direction) বদল (change) হ'য়ে গেছে। আর তাই আমরা এখনও চাঁদে যেতে পার্‌ছি না। চাঁদকে আমরা ফেলে এসেছি কোথায় তার ঠিক নেই। ১৫।১৬ ঘণ্টা হ'য়ে গেল। এখন আমরা এই যে উপগ্রহটি তাঁরই দিকে ঘুরে চ'লেছি—চাঁদে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই আর।"

তাঁদের সব আশা শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেল। কোথায় চল্‌লেন তাঁরা? কোন্ মহা প্রলয়ের টানে তাঁরা চ'লেছেন? রাত্রি নেই, দিন নেই—শুধু আলো—আলো আর আলো। বুধ, শুক্র, সূর্য্য সবাই আলো দিচ্ছে। দিক নেই, পথ নেই, তাঁরা আজ ব্রহ্মাণ্ডের ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে দিশেহারা, পথহারা মহামৃত্যুর যাত্রী। কত গ্রহ, উপগ্রহ 'শো শো' 'বোঁ বোঁ' ক'রে চ'লে

যায়, তাঁরা দূরবীণে তাই দেখেন আর চলেন। কত কাল, কত যুগ চল্‌বেন তাঁরা কে জানে? অনন্ত কাল চল্‌তে পারেন, হয়ত আবার যুগান্তের ক্ষুধার্ত্ত গ্রহের গ্রাসেও পড়্‌তে পারেন। কিন্তু উপায় কি? তাই নিশ্চিন্ত-মনে তাঁরা সিগারেট ফুক্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে পৃথিবীতে কারও দূরবীণে তাঁরা ধরা পড়্‌ছেন না। চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা সব পার হ'য়ে গেল। চাঁদের কলঙ্কের কোন ব্যতিক্রম নেই। সবাই উৎসুক, কোথায় গেলেন তাঁরা? পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক নিশ্চেষ্ট ব'সে নেই। সবাই ভাবেন—আকাশের কোথায়ও না কোথায়ও আছেনই তাঁরা। কিন্তু বড় বড় টেলিস্কোপেও যে ধরা পড়েন না? গ্রহাদির তুলনায় তাঁরা কতটুকু? সবাই নিরাশ। কিছুদিন গেল চ'লে।

জাপানে একদিন বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া প'ড়ে গেল। প্রশান্ত মহাসাগরে কি পড়্‌ল? কোন ছুট্‌-তারা (shooting star) নয় ত? দেশ-বিদেশে ফোন কর্‌লেন তাঁরা—"কোন টেলিস্কোপে কেউ কি দেখেছেন, কোন তারা ছুট্‌তে এবং পৃথিবীর দিকে আস্‌তে?" সব জায়গা থেকে একই উত্তর এল—"না।"

জার্ম্মেনরা বুদ্ধি কর্‌লেন ও জায়গাটাতে ডুবারু ডুবিয়ে দেখা যা'ক কি প'ড়েছে। জাপানের কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নিয়ে—ডুবারু, সাবমেরীন, জাহাজ সব নিয়ে তাঁরা হাজির
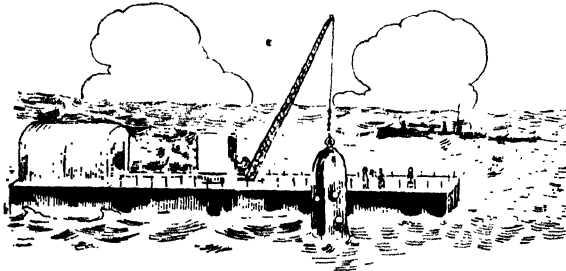
এ্যাঃ! এই ত সেই রকেট্‌!

হ'লেন সেখানে। বহু খোঁজাখুঁজির পর ঠিক উঠালেন সেইটা। এ্যাঃ! এই ত সেই রকেট্‌! সেই চাঁদের রকেট্‌!! খুল্‌লেন রকেট্‌টা, দেখ্‌লেন—ঠিক তিন মহাশয় ব'সে বেশ আরামে সিগারেট টান্‌ছেন! হাঃ হাঃ হাঃ—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে শান্তিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন চাঁদে!

পৃথিবীর মায়া তাঁরা ছেড়েছিলেন, কিন্তু মা কি সন্তানের মায়া ছাড়্‌তে পারেন? তাই হঠাৎ কাছে পেয়ে, তাঁদের কোলে টেনে নিয়ে একেবারে প্রশান্ততে শান্তি দিচ্ছিলেন।

শ্রীশশধর সরকার

ঘরে ফিরে চল

পল্লীমায়ের সোনার ঘরের ছেলেমেয়ের দল !
মাকে ছেড়ে কোন্ সুদূরে আছিস্ তোরা বল ?
রূপ-নগরীর মধুর মায়ায় তোদের সবার মনকে ভুলায়,
দেখ্‌তে না পাস্ মায়ের হেথায় ঝ'র্‌ছে আখি-জল !
পল্লীমায়ের আনন্দ-ধন, ঘরে ফিরে চল !

বাস্তুভিটা শূন্য প'ড়ে—ভ'রেছে জঙ্গল,
দিকে দিকে পতিত জমি—চলে না লাঙ্গল !
ভারে ভারে পণ্য-মাথে, লোক চলে না হাটের পথে,
মহামারীর প্রকোপে সব হ'ল শ্মশান-স্থল !
অনাদৃতা মায়ের পাশে আবার ফিরে চল !

গাঁয়ের গাঙে বয় না উজান, শুকিয়ে গেছে জল !
ফোটে না আর শুক্‌নো দীঘির বক্ষে শতদল !
কলসী-কাঁখে পল্লী-মেয়ে, আসে না দূর-পথটি বেয়ে,
বাঁশী হাতে রাখাল-ছেলের নাইকো চলাচল !
দুঃখে মায়ের ফাট্‌ছে হিয়া তোরা ফিরে চল !

ঘরের লক্ষ্মী নাইকো ঘরে ডাক্‌বে কে আর বল ?
আল্পনা আর হয় না আঁকা জুড়ে গৃহ-তল !
আর ত কোথাও উঠান বোঝাই ধান্যে ভরা নাইকো মরাই,
অনাহারী বুভুক্ষুদের চোখগুলি ছল্ ছল্ !
ঘরের লক্ষ্মী আন্‌তে ঘরে এবার ফিরে চল !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

কি ও কেন ?

ঋতু পরিবর্ত্তন হয় কেন ?

সূর্য্য বারমাস সেই একই পূবের দিকে উঠিয়া সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সেই একই সূর্য্য, সেই একই পৃথিবী, অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে দারুণ গরম, আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে 'ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে, গাঙে ছোটে বান্', আশ্বিনে 'গা সিন্ সিন্', পৌষে প্রচণ্ড শীত, মাঘ ফাল্গুনে মিষ্টি মধুর হাওয়া ; গ্রীষ্মে দিন বড় আর রাত ছোট, আর শীতে বড় রাত আর ছোট দিন হয় কেন ? ২৪ ঘণ্টার দিন রাত ভাগ হইয়া ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখি না কেন ?

পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় বৃত্তাকার একটি পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পথটি একটি সমতল ক্ষেত্রের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে এবং বৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্রটি সূর্য্য ও পৃথিবীর পেটের মধ্য দিয়া গিয়া উহাদিগকে দুই সমান ভাগে ভাগ করিয়াছে। এই পথে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন, এদিকে পৃথিবী নিজেও তাহার অক্ষের (axis) উপর ঘুরিতেছে এবং নিরক্ষ রেখার (equator) নিকট এই ঘুরিবার বেগ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার মাইল। ইহাতে পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যের দিকে থাকে তখন সেখানে হয় দিন, আর সূর্য্যরশ্মি-বঞ্চিত পিছনের অংশে রাত্রি। একই স্থানে পরপর রাত্রি দিন, আবার রাত্রি হওয়াতেও পৃথিবীর আহ্নিকগতি প্রমাণ করিতেছে।
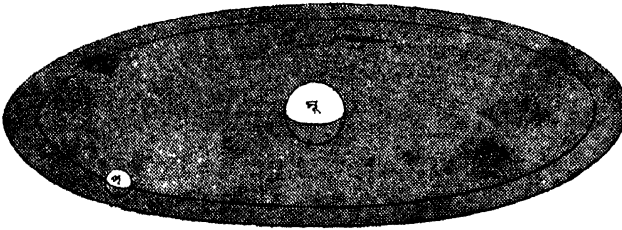
১নং চিত্র

পৃথিবীর অক্ষরেখা সূর্য্যকে ঘুরিবার সময় যদি সমতল ক্ষেত্রের ধারে উহার সহিত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া (perpendicularly) থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে দিন রাত্রি হইত সমান অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করিয়া এবং সূর্য্য বার মাসই পৃথিবীর নিরক্ষ রেখার উপর থাকিয়া উহার উপর কিরণ বর্ষণ করিত। তাহার ফলে নিরক্ষ রেখা

ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সূর্য্যকিরণ সোজাভাবে পড়িত, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে সূর্য্যরশ্মি ক্রমশঃ হেলিয়া পড়িত। ইহাতে নিরক্ষ রেখা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে হইত অসহ্য গরম, কিন্তু মেরুর দিকে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা এবং মেরু প্রদেশে প্রচণ্ড শীত। বৎসরে কোন স্থানেই ঋতু পরিবর্ত্তন হইত না, কোন স্থানে গরম ঠাণ্ডার তারতম্য হইত না। কারণ সূর্য্যের তাপ সেই স্থানে বার মাস ধরিয়া একইভাবে পাইত, আর দিন রাত্রি হইত সমান।
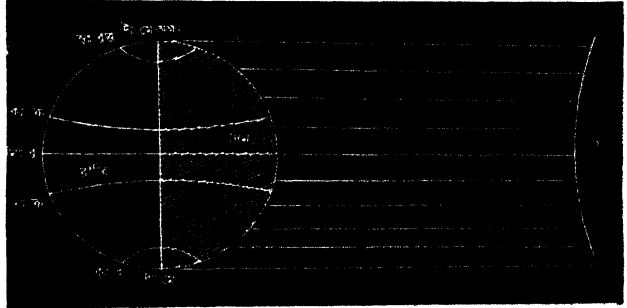
২নং চিত্র

কিন্তু তাহা না হইয়া শীতকালে দিন ১০½ ঘণ্টা ও রাত্রি ১৩½ ঘণ্টা এবং গ্রীষ্মকালে তাহার উল্টা হয় কেন? মেরু প্রদেশে ক্রমাগত ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রিই বা হয় কেন? এই বাংলা দেশেই শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর আবির্ভাব ও তিরোভাবই বা হয় কেন?

ইহার কারণ **পৃথিবীর অক্ষ সূর্য্যকে ঘুরিবার সমতল ক্ষেত্রের সহিত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া ৬৬½° ডিগ্রি কোণ করিয়াছে, এবং পৃথিবীর অক্ষ বারমাস চব্বিশ ঘণ্টা সমতল ক্ষেত্রের সহিত একই কোণ করিয়া একই দিকে হেলান থাকিয়া সূর্য্যকে পরিক্রমণ করিতেছে।** বিষয়টি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাক্।

ঋতু-পরিবর্ত্তন

৩নং চিত্রটি দেখ, ১০ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) ও ১০ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পথের এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক নিরক্ষ রেখার উপর থাকে। সুতরাং এই দুই দিন সূর্য্যের আলো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে সমানভাবে পড়ে। তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই দিবারাত্রি সমান হয়। ১০ই চৈত্র আমাদের দেশে পূর্ণ বসন্ত ঋতু এবং ১০ই আশ্বিন পূর্ণ শরৎ ঋতু। ১০ই আষাঢ় (২১শে জুন) পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থিতি এমন হয় যে, পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে ২৩½° হেলিয়া পড়ে। উহাতে উত্তর গোলকার্দ্ধ সূর্য্যের তাপ বেশীক্ষণ ধরিয়া

পায় এবং সূর্য্য থাকে ঠিক কর্কটক্রান্তির (Tropic of cancer) উপর। এই সময় তথায় ভরা গ্রীষ্মঋতু ; আর দক্ষিণ গোলাকার্দ্ধ বেশীক্ষণ অন্ধকারে থাকায় সেখানে ভরা শীতঋতু।

১০ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থান ১০ই আষাঢ়ের ঠিক

৩নং চিত্র
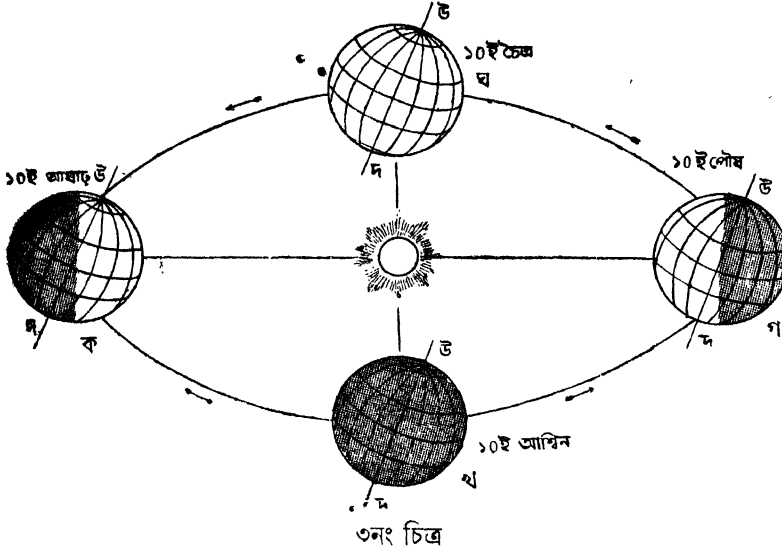
বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সময় উত্তর মেরু দূরে চলিয়া যায় এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সুতরাং একই নিয়মে উত্তর গোলকার্দ্ধে শীত ঋতু এবং দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হয়। সূর্য্য তখন মকরক্রান্তির (Tropic of capricorn) উপর থাকে।

৪নং চিত্র
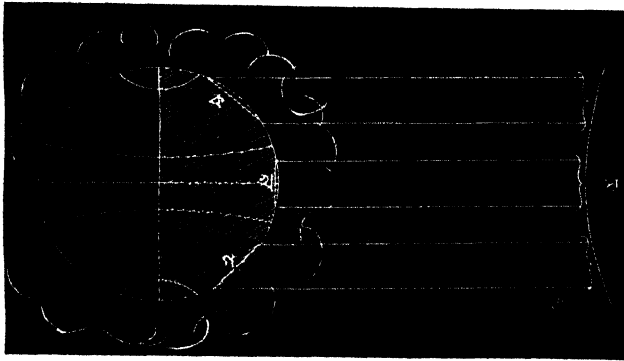
আমরা দেখিলাম সূর্য্যরশ্মি সোজাভাবে যেখানে পড়ে সেখানে গরম, আর যেখানে যত হেলিয়া পড়িবে সেখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইবে। কেন ? পৃথিবীকে ঘিরিয়া একটি বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর উপর সূর্য্যরশ্মি

লম্বভাবে পড়িলে পৃথিবীর যতখানি স্থান উত্তপ্ত হয়, হেলিয়া পড়িলে তদপেক্ষা বেশী স্থান জুড়িয়া সেই একই রশ্মি পড়ে, কাজেই পশ্চাদুক্ত স্থানের (ক) প্রত্যেক অংশ পূর্ব্বোক্ত স্থানের (খ) প্রত্যেক অংশ হইতে কম তাপ পায়। ইহা ব্যতীত হেলিয়া পড়া রশ্মিকে বায়ুস্তরও ভেদ করিতে হয় বেশী। তাহাতেও অনেকখানি তাপ কমিয়া যায়। উপরোক্ত দুই কারণে যে সব স্থানে সূর্য্যরশ্মি হেলিয়া পড়ে সেই সকল স্থান শীতল হয়। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় সূর্য্য তাপের যে তারতম্য আমরা লক্ষ্য করি তাহাও এই একই কারণে হয়।

এখন বুঝা গেল—পৃথিবীর ঘুরিবার পথে সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানের উপর শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। কিন্তু দিন ও রাত্রি ছোট বড় হয় কেন? ৫নং চিত্রটি দেখ। ৫ (ক) চিত্রে যে অবস্থা দেখান হইয়াছে উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর ১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্রের অবস্থা। ঐ দুই দিন সূর্য্য ঠিক পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের উপর থাকে। ক খ গ ঘ বৃত্তটি দেখ। বৃত্তটির খ গ ঘ অংশ ঘ ক খ অংশের সমান, অর্থাৎ পৃথিবীর অর্দ্ধেকখানি সূর্য্যের আলো পাইতেছে আর অর্দ্ধেকখানি অন্ধকারে; কাজেই দিন রাত সমান।
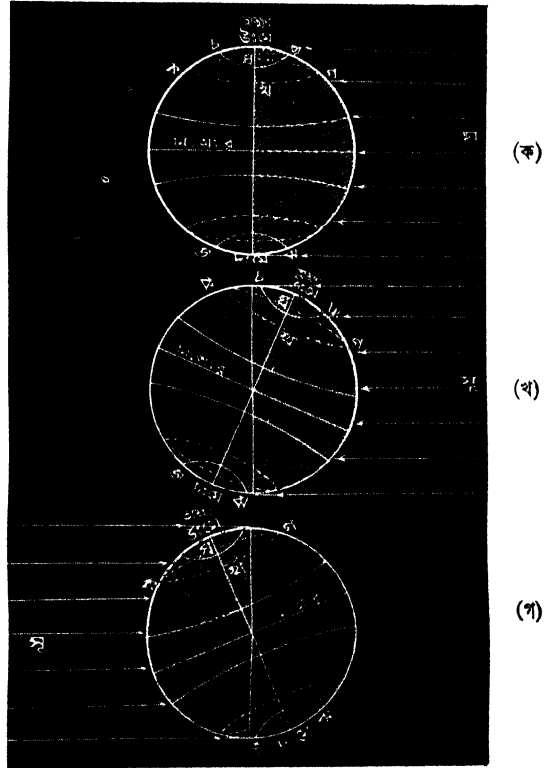
৫নং চিত্র

কিন্তু ৫ (খ) চিত্রটি দেখ। ইহা ১০ই আষাঢ়ের অবস্থা। সূর্য্য এখন ঠিক কর্কটক্রান্তি বৃত্তের উপর অবস্থিত। উত্তর মেরু প্রদেশ (চ ছ বৃত্ত) সব সময়েই আলো পাইতেছে, দক্ষিণ মেরু প্রদেশ (জ ঝ বৃত্ত) সব সময়েই অন্ধকারে রহিয়াছে। এই অবস্থা দুই মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া চলে বলিয়া উত্তর মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা

যায় ও দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা যায় না। আবার ১০ই পৌষ হইতে ঠিক ইহার উল্টা অবস্থা হয়।

এখন ক খ গ ঘ বৃত্তটি দেখ। খ গ ঘ অংশ আলোকিত ঘ ক খ অংশ আলোক-বঞ্চিত। দেখিলেই বুঝিবে বৃত্তটির খ গ ঘ অংশ ঘ ক খ অংশ হইতে আয়তনে বড়। সুতরাং পৃথিবীর বেশী অংশ সূর্য্যের আলোক পাইতেছে; কাজেই দিন বড়, রাত্রি ছোট। তেমনই ৫ (গ) চিত্রে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা হইবে, তখন সূর্য্য মকরক্রান্তি বৃত্তের উপর থাকে। কাজেই রাত্রি হয় বড়, আর দিন হয় ছোট।

উপরে পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের যে কথা বলিলাম, তাহা তোমরা নিজেরা অতি সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। বাজারে এক আনা দিলে একটা ছোট রবারের বল্ কিনিতে পাইবে। পুরাতন টেনিস্ বল্ হইলেও চলিবে। বল্‌টিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া উহার উপরে কালি দিয়া একটি বৃত্ত আঁকিয়া দেও। সেইটি উহার নিরক্ষ বৃত্ত; উহার উপর ও নীচে ২৩½° ডিগ্রি তফাতে আর দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত কর—তাহারা হইবে কর্কটক্রান্তি বৃত্ত ও মকরক্রান্তি বৃত্ত। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর নিকট আর দুইটি বৃত্ত নিরক্ষবৃত্ত হইতে ৬৬½° ডিগ্রি তফাতে আঁকিয়া দেও, উহারা হইবে সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত। এইবার একটি লোহার সরু শলাকা লইয়া বল্‌টির উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়া চালাইয়া দেও, সেই শলাকাটি হইবে পৃথিবীর অক্ষ (axis)। একখানা গোল টেবিল লও। টেবিলের উপরটা হইবে পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সমতল ক্ষেত্র, উহারই ধার দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে বৎসরে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে। এখন একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি কর। টেবিলটি ঘরের মধ্যে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ছোট মোমবাতি জ্বালিয়া দেও। এইবার টেবিলখানার ধার দিয়া টেবিলরূপী সমতল ক্ষেত্রের সহিত বলের শলাকাটি ৬৬½° ডিগ্রি কোণ করিয়া এবং একই ভাবে তাহাকে হেলান রাখিয়া মোমবাতিকে প্রদক্ষিণ কর। টেবিলের সমতল উপরি-ভাগ যেন বল্‌টির নিরক্ষ রেখার সমসূত্রে সর্ব্বদাই থাকে। এইবার দেখিবে, দুই অবস্থায় বল্‌টির একদিক সমানভাবে আলোকিত হইবে, এক অবস্থায় উত্তরার্দ্ধে শলাকাটি মোমবাতির দিকে হেলিবে, আর এক অবস্থায় উহা হইতে দূরে চলিয়া যাইবে এবং এই অবস্থায় আলো ও অন্ধকারের তারতম্যও হইবে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম. এস্-সি.

মাসী-পিসী

শোন রে খোকা শোন রে খুকী শোন রে পেতে কান।
তোদের কাছে গাইব আমি মাসী-পিসীর গান।
আগ্নি কালের মাসী-পিসী তোদের মাঝেই রইত মিশি
গুন্ গুনিয়ে ঘুম পাড়া'ত ভেঙে তোদের মান।

তাঁদের গানে উঠ্‌ত ডেকে
সাত সমুদ্রের ওপার থেকে
কত রাজা রাজ-পুত্তুর
ভালে লয়ে চাঁন।

আস্‌ত কত মণি-মাণিক
ঘুমের মাঝে তারি খানিক
স্বপ্ন হ'য়ে উঠ্‌ত ফুটে'
আকুল করি প্রাণ।

সোনার নৌকা আস্‌ত ভেসে
তেপান্তরের মাঠের শেষে,
শালিক শ্যামা দয়েল কত
ধর্‌ত মিঠা তান।

ফুট্‌ত কত বেলা বকুল
চাপা-ভাই আর ভগ্নি পারুল,
ঘুম-সায়রে উঠ্‌ত ডেকে
আনন্দেরই বান।

বায়োস্কোপের ছবির মত
উঠ্‌ত ফুটে স্বপ্ন কত
ভোরের বেলা তা'রাই কর্‌ত
পরাণ আনচান।

ঘুমের পিসী ঘুমের মাসী
কোথায় তাঁ'রা গেছে ভাসি—
তাঁদের সাথে সকল কথার
হয়েছে অবসান।

নাই তো রে সেই সন্ধ্যেবেলা—
খোকা খুকীর মধুর মেলা,
ফুরিয়ে গেছে হায় যে রে আজ
হাসি রূপের গান।

আজো আমার বুকের মাঝে
সেই মাসী সেই পিসী রাজে,
তাঁদের এনে তোদের হাতে
কর্‌লাম আমি দান।

শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ী শিশু

সিংভূমের গভীর জঙ্গলে পাহাড়ীদের দেশ। যিনি সেখানকার রাজা ছিলেন, তাঁকে বল্‌ত মানকী। কয়েক বৎসর আগেও মানকীর রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল, তারপর তা লোপ পেয়েছে; এখন সেখানে রাজত্ব কর্‌ছে সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারী রেঞ্জার ও ফরেষ্টার মিলে। আর অধিকাংশ পাহাড়ী সহরে যেয়ে মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শিখ্‌ছে। তার ফলে তাদের শিক্ষার উন্নতি হ'য়েছে ঢের—জগতের নানা খবর তা'রা রাখ্‌তে শিখেছে। তাদের এখন আর ধারণা নেই যে, সমস্ত জগৎটাই সিংভূমের মত বনজঙ্গলময়। নানাদিক দিয়ে উন্নত হ'য়ে হয়ত একদিন ওরা জগতের সভ্যদলভুক্ত হ'য়ে যাবে; কিন্তু ওরা যা' হারিয়ে ফেলেছে, সেই নির্ভীকতার তুলনা মিলে না। ওরা পূর্ব্বে যে-রকম সাহসী ছিল, এখন আর তা নেই, বিবিধ উন্নতির সাথে তা'রা তা হারিয়ে ফেলেছে। তবে এখনও কদাচিৎ গভীর জঙ্গলে পাহাড়ীদের মধ্যে তেমন দুর্জ্জয় সাহস দেখা যায়। তাদের কথাই আজ একটু বল্‌ব।

ওরা শিশুবেলা হ'তে যে কি রকম কষ্ট সহ্য ক'রে বেড়ে উঠে, তা শুন্‌লে বিস্ময়ের সীমা থাক্‌বে না। আরও বিস্মিত হ'তে হবে ওদের অসীম সাহসের পরিচয় পেলে।

আমাদের শিশুরা যেমন রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প ভালবাসে, ওরাও তেম্‌নি মা-ঠাকুমার কাছে ব'সে শোনে—কেমন ক'রে কবে ভীল-সাঁওতালের ভিতর যুদ্ধ বেঁধেছিল, কে কবে কি কৌশলে বাঘ শিকার ক'রেছিল। সেই সকল কাহিনী শুন্‌তেই ওরা খুব ভালবাসে। পূর্ব্ব-পুরুষদের গৌরব-কাহিনী ওদের প্রাণে আনন্দের অসীম দোল দিয়ে যায়। আর রাজার গল্প শুন্‌তে চাইবেই বা কি? ওদের রাজার অট্টালিকাও নেই, মণিমুক্তোর পোষাক-পরিচ্ছদও নেই,—ওদের মত ওদের রাজাও নেংটী-পরা সামান্য মানুষ মাত্র। রাণী মোটেই পর্দ্দানসীন ন'ন্। পাহাড়ী মেয়েদের সাথে গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে তিনি গোবর কুড়ান, যুবরাজ গ্রামের ছেলেদের সাথে যায় মাঠে মেষপাল চরাতে। কাজেই ওদের দেশের রাজার গল্পে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্যের কথা মোটেই কিছু নেই। ওদের রাজারা কর্ত্তা হয়—বল-বীর্য্য, বুদ্ধি, সাহস প্রভৃতির গুণে।

নিবিড় বনের একপ্রান্তে ছোট ছোট পাতার কুটীর নিয়ে ওদের গ্রাম। নিকটেই পাহাড়—পাহাড়ের অপর পারে রূপালী পার্ব্বত্য নদী নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে আপন মনে কুল্ কুল্ শব্দে ব'য়ে যায়।

তখন বর্ষাকাল। নদীর জল দু'কূল ছেপে ফুলে উঠেছে। একদিন সূর্য্য ডুবু-ডুবু, বেলা নেই,—দিনের সোনালী আলো রূপালী চাঁদের সাথে কোলাকুলি ক'রে বিদায় নিচ্ছে,—হঠাৎ নদীতে বান ডাক্‌ল,—জল সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে চল্‌ল। প্রায় বর্ষায়ই অমনি বান ডাকে। তাই পাহাড়ীরা ভয় পেল না—স্ত্রী, পুরুষ দলে দলে ঐ পাহাড় পার হ'য়ে নদীর দিকে চল্‌ল,—কেননা সেই বানের জলে নানা দেশের কাঠ ভেসে আস্‌বে, আর ওরা সারা রাত নদীতীরে দাঁড়িয়ে বাঁশ দিয়ে সেই কাঠ টেনে আন্‌বে।

ওদের পার ক'রে দিচ্ছিল আট বছরের একটি পাহাড়ী বালক। কি দুর্জ্জয় সাহস তা'র। জনহীন নদীতীরে একা সেই বালক তা'র নৌকোটি নিয়ে ব'সে আছে, মাঝে মাঝে দু'এক জন পার হ'য়ে যায়, পয়সা দেবার কোন দরকার নেই,—জনপ্রতি আধপয়লা (আধ সের) চা'ল দিলেই হ'ল।

সব দিন ত সমান যায় না। বান ডাক্‌লে মাঝে মাঝে সেই সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিও হয়। সে-দিনও খুব ঝড় উঠ্‌ল। ক্রমে ক্রমে সব পাহাড়ীরা নদী পার হ'য়ে চ'লে গেল। সকলের শেষে পাহাড়ী বালক দুর্য্যোগের আঁধারে আলোহীন পাহাড়ের উপর দিয়ে একাকী চল্‌ল গ্রামের দিকে। ঝড়-বৃষ্টিতে চারধার অন্ধকার! সহসা দূরে একটু আলোর রেস ভেসে উঠ্‌ল। কোন পথিকের আলো মনে ক'রে বালক সে-দিকে দৌড়ে গেল; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে—এক প্রকাণ্ড পাহাড়ী সাপ! তা'র মাথার খানিকটা জায়গা মণির মত চক্‌চক্‌ কর্‌ছিল। পাহাড়ী বালক ভয়ে পালিয়ে যাবার ছেলে নয়, পাথর দিয়ে চমৎকার কৌশলে সেই সাপটি মেরে বাড়ী ফিরে গেল।

যখন হেসে হেসে বালক তা'র মায়ের কাছে সেই সাপ মারার গল্প কর্‌লে, মা তখন হেসেই কুটিকুটি!

ওদের সবটাতেই হাসি। সব বিষয়কেই ওরা হেসে তুচ্ছ ক'রে দেয়। খুব দুঃখেও ওদের হাস্‌তে দেখা যায়। পাহাড়ী বালক-বালিকা মাতৃকোলে থেকে পর্ব্বত-ক্রোড়ে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে ওদের জীবন কষ্টসহ ও নির্ভীক হ'য়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের দেশের কোন কোন মা ছেলেদের রোদে বেড়াতে দেখ্‌লে ভয় পান, ভাবেন লু লাগ্‌বে; জলে গেলে বলেন—ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, অন্ধকারে যেতে দেখ্‌লেই বলেন—সাপে কাম্‌ড়াবে। তাই তাঁদের ছেলেরা হ'য়ে যায় অত ভীতু।

শ্রীসুধারাণী দেবী

পূজার ছুটি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাসি-গানে, আনন্দ-উৎসবে পূজার তিনটা দিন কাটিয়া গেল। আজ বিজয়া—গঙ্গার জলে প্রতিমা ভাসান হইবে। তাহারই আয়োজন চলিতেছে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সকলেই মল্লিক-বাড়ির সাম্‌নে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনু এবং মণ্টুও বাদ পড়ে নাই। এখন বেলা চারটা কি বড় জোর সাড়ে চারটা। ছ'টার সময় প্রতিমা বাহির হইবে। মোটর লরি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই উপর প্রতিমা উঠান হইতেছে। হঠাৎ মীনা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"বেশ তো তোমরা! আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি, আর তোমরা এখানে বেশ মজা ক'রে ঠাকুর দেখছ। ওদিকে যাদবপুর থেকে মাসীমা যে ডেকে পাঠিয়েছেন—যেতে হবে এক্ষুণি। মা তাই তোমাদের খুঁজতে পাঠালেন।"

মীনা ছুটিয়া আসিয়া বলিল···

—"যাদবপুর থেকে মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন? বাঃ কি মজা!" বলিয়া মণ্টু লাফাইয়া উঠিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কে এসেছেরে আমাদের নিতে?"

—"কে আবার আসবে এতদূর থেকে? মেসোমশায় এক্ষুণি বাবাকে টেলিফোন করেছেন! এখন চল দেখি। আর দেরি ক'রো না। কি অনুদা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে, চল।"—বলিয়া মীনা এক হাতে অনু এবং অন্য হাতে মণ্টুকে টান দিয়া, তাহাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অনু টেলিগ্রাফের ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়াছে, কিন্তু টেলিফোনে দূরের কথা কেমন করিয়া শোনা যায় সেটা সে ভাবিয়া পায় নাই। যাদবপুরে বসিয়া একজন কথা

বলিলেন, এখানে বাড়িতে বসিয়া আর একজন তাহা শুনিলেন—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়। সে ঠিক করিয়া রাখিল—আজ যাদবপুর যাইবার পথে গাড়িতে বসিয়াই মামাবাবুর কাছে টেলিফোনের কথাটা জানিয়া লইবে। জগতে এ রকম আরও কত আশ্চর্য্য জিনিসই না আছে!

যাদবপুরের যাত্রী সবশুদ্ধ পনের ষোলর কম নয়। কাজেই একটা ছোট রকমের বাস ভাড়া করা হইল। অনু মামাবাবুর পাশে একটু জায়গা করিয়া লইল। মীনা এবং মণ্টুও অনুদার কাছে কাছেই রহিল।

মোটরে যাইতে হইলে খানিকটা পথ রেললাইনের পাশ দিয়া যাইতে হয়। লাইনের দুইধারে উঁচু উঁচু লোহার থামের উপর অসংখ্য তার টাঙানো। প্রিয়ব্রতবাবু সে-দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিলেন,—"বলত মণ্টু, ঐ তারগুলো কিসের?"

"টেলিগ্রাফের তার বাবা।"—মণ্টু সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল।

"শুধু টেলিগ্রাফের নয়, টেলিফোনের তারও ওর মধ্যে আছে।"

অনু এই অবসরই খুঁজিতেছিল। সে বলিল,—"মামাবাবু, টেলিগ্রাফের নয় সঙ্কেত আছে। কিন্তু টেলিফোনে যে কথা শোনা যায়—সেটা কেমন ক'রে হয়?"

মামাবাবু তাহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মোটরের এঞ্জিনে একটা ভীষণ রকমের শব্দ হইল—ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘটাং। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক্ কসিল। ঘড়াং করিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া রাস্তার মধ্যেই রথ দাঁড়াইল।

ড্রাইভারের পিছনে বসিয়াছিল দারোয়ান রামদীন পাঁড়ে আর জগবন্ধু ঠাকুর। পাঁড়েজি খৈনি টিপিয়া সেই সবে হাতটি মুখের কাছে উঠাইয়াছে এমন সময় ঘ্যাঁচ্ করিয়া গাড়ি থামিল—পাঁড়েজি টাল সামলাইতে পারিল না—তাহার খৈনি মুখে না পড়িয়া পড়িল চোখে। চুন-মেশান দোক্তার গুঁড়া যেই চোখে পড়া অমনি আর যায় কোথা? "আঁখ গিয়ারে বাবা" বলিয়া সে এমন ভাবে মাথা নাড়িল যে, তাহার মাথা স-বলে লাগিল জগবন্ধুর মাথায়।

জগবন্ধু সেই সর্বপ্রথম কটক জিলা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার মাথার মাঝখানে একটি মাত্র ঝুঁটি আর চারিদিক কামানো। রামদীনের মাথার ঘা জগবন্ধুর নেড়া মাথায় সহিবে কি করিয়া? বেচারির কানের গোড়া চালতার মত ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু শুধু ঐখানেই কি দুর্গতির শেষ? সে তখন বটুয়া হইতে সুপারি বাহির করিয়া

যাঁতি দিয়া তাহাই কাটিতে ব্যস্ত ছিল। রামদীনের ধাক্কায় তাহার সুপারিটা যাঁতি হইতে সরিয়া গিয়া তাহার বদলে ঢুকিয়াছিল বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল। ভাগ্য ভাল বলিয়াই কোন রকমে আঙ্গুলটা রক্ষা পাইয়া গেল।

গাছের পাতায় তখনও রোদ আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য তখন ডুবি ডুবি করিতেছেন। ড্রাইভার ভরসা দিল—সন্ধ্যার আগেই যন্ত্র ঠিক হইয়া যাইবে।

কিন্তু তখন গাড়ির ভাবনার চেয়ে পাঁড়েজির ভাবনাই হইল বেশি। তাহাকে ধরিয়া গাড়ির বাহির করিয়া আনা হইল। সঙ্গে ঠাণ্ডা জল ছিল—তাহা দিয়া ভাল করিয়া চোখ ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। জ্বালা খানিকটা কমিল বটে, কিন্তু চোখ দুইটা জবাফুলের মত রাঙা হইয়া রহিল।

খৈনি···পড়িল চোখে

ঠাকুরের আঙ্গুলটার বিশেষ কিছু হয় নাই, অল্প একটু কাটিয়াছিল মাত্র। নেক্ড়া ভিজাইয়া আঙ্গুলটাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

রাস্তার পাশেই মাঠ। অনেকগুলি ছেলে সেখানে খেলা করিতেছিল। গাড়ি দাঁড়াতেই তাহারা সকলে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দুটি ছেলে বোধ হয় কোন একটা মজার খেলা খেলিতেছিল—তাহারা খেলা ছাড়িয়া গাড়ি দেখিবার জন্য আসিল না।

মণ্টুর বাবা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অনু, মণ্টু, চল ঐদিকে একটু বেড়িয়ে আসি। গাড়ি ছাড়তে এখনও আধ ঘণ্টার কম নয়।"

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

দুই ভৃত্য

গেরুয়া বসন-ধারী চলে দরবেশ
লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্—পাকা তাঁর কেশ।
বয়স যে কত তাঁর বুঝা নাহি যায় ;
দাঁড়ালেন একদিন ধনী-দরজায়।

ঘরের মালিক যিনি বহু সমাদরে
বসালেন দরবেশে আপনার ঘরে।
ব্যস্ত তিনি, চাকরেরা কেহ নাই কাছে—
জোর গলে হাঁক দেন—"কে কোথায় আছে ;
অকেজো লোক দ্বারা কাজ নাহি হয়—
'পেঁচো' কোথা, 'সেদো' কোথা"—বার বার কয়।

দরবেশ কহে ধীরে—"ক'রো না ক' রোষ,
আছে মোর দুই ভৃত্য—**সংযম, সন্তোষ ;**
নিয়ত সেবিছে তা'রা বড় মোর ভক্ত—
ক'রে ফেলে হাসিমুখে যত কাজ শক্ত !"

মওলা নওয়াজ, বি. এল্

পরলোকে মার্কোনি

আজ পৃথিবীর যে-কোন দেশের লোক ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্তে দূরদূরান্তরের বক্তৃতা, গান প্রভৃতি শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছে। যে যন্ত্রের গুণে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহার আবিষ্কারকের নাম **মার্কাস গুগ্‌লি এল্‌মো মার্কোনি**।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে এপ্রিল, ইউরোপের ইটালি দেশে—বোলান সহরে মার্কোনির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম **গাইসেপি**—মাতার নাম **এনি জেম্‌সেন**। মার্কোনি মাতা-পিতার দ্বিতীয় পুত্র। শিশুবয়স হইতেই বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-বিষয়ক আলোচনায়

তাঁহার অতিমাত্র আগ্রহ ছিল। তাহারই ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই মার্কোনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল—বোলান বিশ্ববিদ্যালয়।

বিখ্যাত জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক **হার্ট্‌জ্‌** একটি অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রের কার্য্যকারিতা-শক্তি দেখিয়া মার্কোনির মনে চিন্তা জাগে যে, তার সংযোগ ছাড়াও দূরদূরান্তরে সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। অম্‌নি তিনি সে-বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। সেই গবেষণায় তাঁহার মা ও বাবার উৎসাহ ছিল প্রচুর। পন্‌চেলিও নামক স্থানে পিতার যে পল্লীভবন ছিল, সেখানে পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই বৎসর অনবরত চেষ্টা ও গবেষণার ফলে তিনি বিনা-তারে—শুধু ব্যোম (ইথার)-তরঙ্গের সাহায্যে—২০ হাত দূরস্থিত একটা ঘণ্টা বাজাইতে সমর্থ হ'ন। সেই পরীক্ষা-কার্য্যে তাঁহার স্নেহময়ী পরম উৎসাহদায়িনী মাতা ছিলেন—প্রত্যক্ষকারিণী। পুত্রের সাফল্যে মায়ের যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে 'অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ব্যাপার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পন্‌চেলিওর নিভৃত পল্লীভবনে—অন্ধকার রাত্রে সে-দিন যে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল—সেই ধ্বনি আজ জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ জগদ্ব্যাপী বৈজ্ঞানিকদল সেই ঘণ্টাধ্বনির আহ্বানে বিজ্ঞান-বিপণিতে শত শত নূতন সামগ্রীর সমাবেশ করিতেছেন।

মার্কোনি

ক্রমে ২০ হাত বাড়িয়া—এক ক্রোশ হইল। মার্কোনি তখন নিজের আবিষ্কার ইটালীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে বিক্রয় করিতে চাহিলেন। এই অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা বাচ্চা বৈজ্ঞানিকের কথায় গভর্ণমেণ্ট কান দিলেন না।

সফলতার উৎসাহে উদ্দীপ্ত মার্কোনি তাহাতে দমিলেন না—তিনি নিজের আবিষ্কারের কথা—ইংলণ্ডের ডাক-বিভাগের টেলিগ্রাফের অধ্যক্ষ **স্যর উইলিয়ম্‌ প্রিস্‌**কে জানাইলেন। গুণগ্রাহী স্যর উইলিয়ম প্রিস্‌ তৎক্ষণাৎ মার্কোনিকে ইংলণ্ডে

ডাকিয়া লইলেন। সেই সময়ে মার্কোনির বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। স্যর উইলিয়ম প্রিস্ এই শীর্ণকায় যুবককে বেতারের আবিষ্কারক জানিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন। মার্কোনি বৃটিশ ও বিদেশী শাসন বিভাগের সম্মুখে নিজের আবিষ্কৃত ব্যাপার দেখাইলেন। প্রতিনিধিগণ যুবক বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। স্যর উইলিয়ম প্রিস্ তাঁহার গবেষণার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ব্রিষ্টলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেতার সংবাদ চলিতে লাগিল। মার্কোনি তাঁহার বেতারযন্ত্রের পেটেণ্ট (একচেটিয়া) স্বত্ব লাভ করিলেন।

একদিন যিনি মাতৃভূমিতে অগ্রাহ্য হইয়াছিলেন, পররাজ্য ইংলণ্ডের সাহায্যেই তাঁহার আবিষ্কার সফল হইয়াছিল। তাঁহার এই সফলতা দেখিয়া ইটালির সম্রাট্ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি অবিলম্বে ইটালি যাইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্পেজিয়া নামক স্থানে বেতারযন্ত্র স্থাপন করিলেন। সেখান হইতে ১২ মাইল দূরস্থিত যুদ্ধ-জাহাজে বেতারে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। তারপরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইয়া তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বেতারবার্ত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

সফলতার সঙ্গে সঙ্গে মার্কোনির উৎসাহ, উদ্যম ও আবিষ্কার বাড়িয়া চলিল। তিন-চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডের **দক্ষিণ কর্ণওয়াল্** হইতে আমেরিকার **নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড** পর্য্যন্ত তিন হাজার মাইল দূরে—সমুদ্রের উপর দিয়া বেতারবার্ত্তা প্রেরণে সমর্থ হইলেন। সেই সংবাদ অবিলম্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইল। চারিদিক হইতে মার্কোনির কাছে অসংখ্য অভিনন্দন আসিতে লাগিল। আমেরিকা ও ইউরোপে বেতারযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া গেল। পুত্রের এই সফলতার সংবাদ সর্ব্বাগ্রে বেতারবার্ত্তায় তাঁহার বাপ-মাকে জানান হইল। সরকারী ভাবেও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইংলণ্ডে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে প্রথম বেতারের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। জগতের চারিদিকে বেতারের ও তাহার আবিষ্কারকের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

তারপর হইতে অনবরত চেষ্টায় বেতারের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে—উহা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আগে বেতারে কেবল সংবাদই পাঠান যাইত,—এক্ষণে উহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতারে টেলিফোন, কথাবার্ত্তা, গান-বাজনা, বক্তৃতা, হস্তলিপি, ফটো প্রভৃতি প্রেরণের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

মার্কোনি আজীবন বিজ্ঞানের সেবায়ই নিরত রহিয়াছেন। তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব

আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি রোমনগরে আবাসবাটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তথায়ই বাস করিতেন। সাধারণতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। গত ১৮ই জুলাই (১৯৩৭ খৃঃ) রবিবার, তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরু পোপের সহিত ঘরোয়াভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তুই দিন পরে ২০শে জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়, হৃদ্‌যন্ত্র পক্ষাঘাতে বিকল হওয়াতে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর।

খেলা-ধূলা

আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা

প্রতি বছরই আই. এফ. এ. শীল্ড-প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের নানা দিক থেকে বহু শক্তিশালী দল যোগ দিয়ে থাকে ; কিন্তু এ বছর যত দল যোগ দিয়েছিল, এত আর কোন বছরই যোগ দেয় নি। এবার মোট ৫১টি দল যোগ দিয়েছিল। কাজেই এক এক দিনে পাঁচ-ছ'টা খেলাও হ'য়েছিল।

কলিকাতার বাইরের, বাংলাদেশের যতগুলো দল এসেছিল তার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী ছিল ঢাকার উয়ারী দল। আই. এফ্. এ শীল্ড খেলায় উয়ারী দলের যথেষ্ট সুনাম আছে। তাঁদের সুনাম এবারে একটুও কমে নি, বরং ঢের বেড়েছে। এবারে তাঁরা তিন দিন খেলেছেন এবং তিন দিনই অতি চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন। শুধু রেফারির ভুলে তাঁরা ক্যাল্‌কাটার মত প্রবল দলের কাছে ২—১ গোলে পরাজিত হ'য়েছেন।

কলিকাতার দলগুলোর মধ্যে মহামেডান্ স্পোর্টিংএর উপরই সকলের ভরসা ছিল সব চেয়ে বেশী, তারপর মোহনবাগান। আর বাইরের মিলিটারী দলগুলোর মধ্যে লিষ্টার, এইচ. এল. আই., ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড্ যে সেমি-ফাইনাল্, ফাইনাল্ অবধি যাবে এ কথা প্রায় সকলেই ব'লেছিল। সকলে যা আন্দাজ করে, অনেক সময়েই ঠিক তার উল্টো ফল হ'তে দেখা যায়। তৃতীয় রাউণ্ডে ইষ্ট্ বেঙ্গলের মত বিখ্যাত দল

হেরে গেল কাষ্টম্‌স্‌এর কাছে। লিষ্টার্‌ দল খুব ভাল খেলেও মোহনবাগানের কাছে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই পরাজয় স্বীকার কর্‌ল। তারপর মহামেডান্‌ স্পোর্টিং। পর পর চার বছর কলিকাতার প্রথম ডিভিসন লীগে চ্যাম্পিয়ন্‌ হওয়ায় কলিকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয় দল থেকে বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠন ক'রে মহামেডান্‌দের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করা হ'য়েছিল। এই পরীক্ষায়ও মহামেডান্‌ স্পোর্টিং উত্তীর্ণ হ'য়েছে—তাঁদের পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হয় নি। এই দলটি যখন চতুর্থ রাউণ্ডে উঠ্‌ল তখন প্রায় সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল—এঁরা ফাইনাল অবধি যাবেন এবং গেলবারের মত এবারেও শীল্ড-বিজয়ী হ'য়ে তাঁদের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রমাণ কর্‌বেন। কিন্তু হ'ল কি! খুব চমৎকার খেলেও, ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেডকে কোণঠাসা ক'রেও ২—০ গোলে হেরে গেলেন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে।

এদিকে মোহনবাগান চতুর্থ রাউণ্ডে উঠ্‌তে বাঙালীর মনে সত্যিই এই আশার সঞ্চার হ'য়েছিল যে, হয়তো মোহনবাগানই এবার শীল্ড-বিজয়ী হবে। ভারতীয় দলের মধ্যে তাঁরাই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের বছরে, শীল্ড-বিজয়ের গৌরব লাভ করেন। এ বছরও ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের বছর। কাজেই প্রায় সকলেই নিশ্চিন্ত ধারণা ক'রে রেখেছিল যে, চতুর্থ রাউণ্ডে ডি. সি. এল. আই. দলকে হারিয়ে তাঁরা সেমি-ফাইনালে যাবেন; কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় জয়লাভের বহু সুযোগ পেয়েও তাঁরা হেরে গেলেন ২—১ গোলে।

কোনও ভারতীয় দলই চতুর্থ রাউণ্ড পার হ'তে পার্‌লে না। এদিকে ক্যালকাটা 'বি' ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান্‌ পুলিশ দলের কাছে হেরে যাওয়ায় পুলিশ দলই সকলকে তাক লাগিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠ্‌ল। ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড ও ডি. সি. এল্‌. আই. দলের সেমি-ফাইনাল খেলায় প্রথম দিন ড্র হ'ল, দ্বিতীয় দিনের খেলায় ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড্‌ দলই জয়লাভ ক'রে ফাইনালে উঠ্‌ল। চতুর্থ রাউণ্ডে নামকরা মিলিটারী দল এইচ. এল্‌. আই. কলিকাতার কাষ্টম্‌স্‌ দলের সঙ্গে দু'দিন ড্র ক'রে তিন দিনের দিন অতি কষ্টে ২—১ গোলে জয়লাভ ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠ্‌ল। এই বিশেষ নামজাদা সৈনিক দলের সঙ্গে কলিকাতার পুলিশ দলের সেমি-ফাইনাল খেলা হ'ল। এই খেলায়ও ২—[illegible] গোলে জয়লাভ ক'রে পুলিশ যখন ফাইনালে উঠ্‌ল তখন সকলেই একেবারে থ হ'য়ে গেল। পুলিশের দল ফাইনালে উঠ্‌বে এ আশা কেউ কোন দিনই করে নি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে এমনি ক'রে 'বি' ডিভিসনের টীম কুমারটুলি ফাইনালে উঠে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্ল্যাকওয়াচের কাছে ২—১ গোলে হেরে গিয়েছিল।

এবার ফাইনালে ষষ্ঠ ফিল্ড্ ব্রিগেডের সঙ্গে খেলায় পুলিশের পরাজয় হ'য়েছে শোচনীয় ভাবে, ৪—১ গোলে। ব্রিগেড্ দল খুব শক্তিশালী না হ'লে ফাইনালের একটি দলকে চার চারটে গোল দিতে পারত না। একটি পেনাল্টি পেয়ে পুলিশ দল একটি গোল শোধ দিতে পেরেছে। এবারকার মত সৈনিক দলই শীল্ড-বিজয়ের গৌরব লাভ করলে। দেখা যাক্ আস্‌ছে বছরে কোন ভারতীয় দল আবার শীল্ড্-বিজয়ের গৌরব লাভ করে কিনা।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ধাঁধা

প্রথম দ্বিতীয়াক্ষরে রত্ন আমি হই,
প্রথম তৃতীয়ে কিন্তু হীন হয়ে রই।
প্রথম চতুর্থে রহি সাগর-সলিলে,
দ্বিতীয় চতুর্থে বাস শ্রীরবি-মণ্ডলে।
তৃতীয় চতুর্থে কভু নাহি রহি স্থির,
সমুদয়ে আমি কিন্তু অচল শরীর ॥

দ্রষ্টব্য—(১) ধাঁধার উত্তর **১০ই ভাদ্রের মধ্যে** পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক পত্রে **গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) কোন গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে—পত্রিকা বাহির হওয়ার অন্ততঃ ১০ দিন আগে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সংবাদ শিশুসাথী আফিসে পাঠাইতে হইবে।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press;
5, College Square, Calcutta.

ষোড়শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরতে

আলোর পথে সোনার রথে শরৎ এসেছে,
নীল গগনে শাদা মেঘের তরী ভেসেছে।
হাল্কা হাওয়ায় যায় ভেসে যায় স্বপন-পরীরা,
দেয় ছড়ায়ে ভুবন ভ'রে রূপের মদিরা।
আগল-ভাঙ্গা পাগল বাতাস হ'য়ে শরীরী,
সবুজ ক্ষেতে দোল দিয়ে যায় তুলে লহরী।
ফুল ফুটেছে,— গুন্ গুনিয়ে ডাকে ভোমরা—
"ধরায় আজি স্বর্গ নিতে এসো তোমরা।"
প্রভাত-রবির রঙীন আলো হারিয়ে দিশি রে
লয় যে শরণ মুক্তা-বরণ প্রভাত-শিশিরে।

কমল-বনের বিমল শোভায় স্তব্ধ দাদুরী,
ছড়ায় হরিৎ দূর বনানী স্বপন-মাধুরী।
বুক চুমিয়ে শুভ্র চরের শান্ত তটিনী—
গলায় পরি' বীচির মালা চলছে নটিনী।
দিগন্তে আজ মহামিলন ভুবন-গগনে,
মিলন-বাঁশী উঠ্‌ছে বাজি মধুর লগনে।
ধরায় আজি দিলি ধরা কে তুই দুলালী ?
আলোয় গানে প্রাণের ব্যথা সবার ভুলালি !

দেওয়ান মুস্তাফিজুর রহমান, বি. এ., বি. টি.

নিষ্কৃতি

—১—

যত রকম দুষ্টামী গ্রামে হ'ত, তা'র মধ্যে ভোলা যে অবশ্য থাক্‌বে, সে বিষয়ে কা'রও মতভেদ ছিল না। কি বেজায় ডাংপিটে ছেলে রে বাবা !

সংসারে দূর-সম্পর্কের এক মাসী ভিন্ন তা'র আর কেউ ছিল কিনা তা কেবল স্বয়ং ভগবানই বল্‌তে পারেন। ওর জন্মের মাস তিনেক পরেই মা গেলেন, বছর ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তে বাবাও সেই পথে চল্‌লেন। বাধ্য হ'য়ে মাসী ক্ষান্তমণিকে—দূর-সম্পর্কের হ'লেও রক্ত-সম্বন্ধ যখন আছে—তখন আস্‌তেই হ'ল। ক্ষান্তরও ভোলা ছাড়া বোধ হয় ত্রিজগতে আর কেউ ছিল না। একটা কালো গরু, তা'র বাছুর আর বিঘা কুড়ি ছিল ভোলার জমি। মর্‌বার সময় জল পাবার যখন আর ভাবনা নেই, তখন ক্ষান্ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভোলাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দিল। ভোলাও বেশ নিশ্চিন্ত-মনে বই শ্লেট নিয়ে সময়মত বেড়িয়ে বেড়ায়—সাঁকোর নীচে, বেণেদের বাঁশঝাড়ে—বাড়ুয্যেদের আমবাগানে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে, সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে মাসীকে জানিয়ে দেয় যে, সে প'ড়ে এল।

বোনপো যখন 'ফার্ষ্ট বুক' পড়্‌ছে, তখন সরকার বাহাদুর কবে যে তা'কে ডেকে

"জজ ম্যাজিষ্ট্রেরের" পদটা দিয়ে দেয়—সেই আশায় ক্ষান্ত দিন গণে; বড় কষ্টে আনন্দটা চেপে রাখে সে। ভোলার দুষ্টামীর কথা সে প্রায়ই শুন্‌তে পায়—কিন্তু সেকেলে পণ্ডিতেরা যে ব'লে গেছেন—'যে ছেলে ছোটকালে যত বেশী দুর্দ্দান্ত হয়, বড় হ'লে সে তত বেশী কাজের লোক হয়!' ক্ষান্তও আশায় আশায় থাকে, আর রোজ জিজ্ঞেস করে —"হাঁ রে, আর কতখানি—ক'বেলা পড়্‌লে হাকিম হয়?" মনের কথাটা অবশ্য ক্ষান্তমাসী কাউকে জান্‌তে দেয় না।

রোজ সন্ধ্যার সময় তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে "ভোলা যেন হাকিম হয়"— এই প্রার্থনা ক'রে ক্ষান্ত সেখানে বহুক্ষণ ধ'রে প্রণাম করে।

শেষে একদিন আর থাক্‌তে না পেরে সে ভোলাকে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"হাঁ রে, তুই যখন হাকিম হবি, আমাকে সুখে রাখ্‌বি তো?"

প্রথমটা ভোলা কিছুই বুঝ্‌তে পারে নি—তাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মাসীর দিকে তাকাচ্ছিল। শেষে বুঝে ফেলে বেশ গম্ভীর-ভাবে মাথা নেড়ে সে বল্লে—"সে সময় তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবো—সেখানে কেবল সাহেব আর মেম—তা'রা সব 'হ্যাট্ ম্যাট্' ক'রে কথা বলে।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে মাসী জিজ্ঞেস কল্লে—"সে কি রে—তা'রা কি ভাত খায় না?"

বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে ভোলা বল্লে—"হেঁ হেঁ মাসী, তা'রা কি ভেতো বাঙ্গালী? তা'রা সব পোলাও ছাড়া কথাই বলে না!"

আনন্দের আতিশয্যে মাসী আর কথা কইতে পারে না; মনে মনে ভাবে— ভোলার মাথায় কত বুদ্ধিই না ভরা আছে! কেমন সব বইগুলো মুখস্থ ক'রে ফেলেছে, কিছুদিন পরে ভোলা যে হাকিম হবে, সে একেবারে ধ্রুবসত্য।

আদর ক'রে ভোলার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মাসী বল্লে—"পাঠশালার সময় হ'য়ে এসেছে, দু'টো মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি যা—দেখ দিকিন বাছা, ভাল ক'রে বইগুলো মুখস্থ ক'রে শীগ্‌গির হাকিম হ'তে পারিস্ কিনা।"

ভোলা মুখ কাচু মাচু ক'রে বল্লে—"না মাসী, আজ আর স্কুলে যেতে পার্‌ব না, শরীরটা বড্ড কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।"

মাসীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল; তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—"না বাবা, আজ তবে আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, বেশী পড়্‌লে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। ঐ

যে সরকারদের তিনু—বেশী প'ড়ে মাথাটা খারাপ ক'রে ফেলেছে—ও বুঝি আর হাকিম হ'তে পার্‌বে না? যা'ক্ চুপ ক'রে শুয়ে পড়্‌গে।" বক্-বক্ কর্‌তে কর্‌তে মাসী কার্য্যান্তরে চ'লে গেল।

স্কুলের দায় থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভোলা মনে মনে মাসীর ও হাকিমীর মুণ্ডপাত কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে গেল পাখীর বাচ্চা সংগ্রহ কর্‌তে।

—২—

সে-দিন বোধ হয় পথ ভুলেই ভোলা পাঠশালায় গিয়ে হাজির। ভোলাকে দেখেই পণ্ডিত মশায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন, আচ্ছা রকম ঘা-কতক দিয়ে দিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় ভোলা গম্ভীর হ'য়ে মনে মনে পণ্ডিতকে জব্দ কর্‌বার ফন্দী আঁট্‌তে লাগ্‌ল।

একবার পড়া ব'লে দিয়েই পণ্ডিত মশায় বেশ মোটা এক টিপ নস্যি নাকে দিয়ে পা দু'টো চেয়ারে গুটিয়ে বস্‌লেন। আফিংএর কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেল। পণ্ডিত মশায় চেয়ারে ঢুল্‌তে লাগ্‌লেন।

ভোলার প্ররোচনায় সকলে আস্তে আস্তে পণ্ডিত মশায়কে চেয়ারশুদ্ধ ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে চল্‌ল নদীর দিকে। বাইরের মুক্ত বাতাসে পণ্ডিত মশায় বেশ নাক ডাকাতে লাগ্‌লেন। নদীর ধারে বটগাছের ছায়ায় একটা জায়গায় পণ্ডিত মশায়কে রেখে সকলে দে চম্পট্। তারপর সকলে পাঠশালায় এসে বেশ জোরে জোরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

ঘণ্টা খানেক পরে পণ্ডিত মশায়কে সশরীরে হাজির দেখে সকলের ত মুখ শুকিয়ে গেল। রাগে পণ্ডিত মশায়ের চোখ-মুখ লাল।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ভোলা টিপ ক'রে প্রণাম ক'রে বল্‌ল—"এ কি স্যার, এরি মধ্যে আপনি স্বর্গ থেকে ঘুরে এলেন?"

ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ও অবাক্ হ'য়ে ভক্তিমান ভোলাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ছেলেরা বুঝ্‌ল ভোলা বেশ ভাল রকম একটা ফন্দী এটেছে।

ভ্রূকুটি ক'রে পণ্ডিত মশায় ওকথার অর্থ জান্‌তে চাইলেন।

নেহাৎ বিস্মিতের ন্যায় ভোলা ব'লে উঠ্‌ল—"সে কি স্যার, আপনি পড়াতে

পড়াতে বল্‌লেন—'আমি স্বর্গ থেকে স্নান ক'রে আসি'—ব'লে কি সব মন্ত্র পড়্‌তে লাগ্‌লেন—চেয়ারশুদ্ধ আপনি উড়ে চল্‌লেন! আমরা পিছু পিছু ছুট্‌লাম, আপনি বল্‌লেন, 'তোরা সব পড়, আমি আস্‌ছি!' তাই ত স্যার আমরা মন দিয়ে পড়্‌ছি।"

এরূপ মুখভঙ্গী ক'রে ভোলা কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্‌ল যে, ছেলেরা কেন—স্বয়ং পণ্ডিত মশায়ও বুঝলেন, কি রকম ছেলের পাল্লায় তিনি প'ড়েছেন। ভোলাকে কাছে ডেকে বেশ গম্ভীর হ'য়ে পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন,—"বাবা ভোলা,—আমার পেটে যা বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল সবই তোমাকে শিখিয়েছি—এখন তুমি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান—আর কেন? এবার আমাকে ইস্তাফা দাও।"

একটা প্রণাম ক'রে ভোঁলা বাড়ী চ'লে গেল। পণ্ডিত মশায় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

—৩—

—"মাসী—মাসী গো"—

চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ভোলা বাড়ী ঢুক্‌ল। কালো বেড়ালটা ভোলাকে দেখেই স'রে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌ল। কিন্তু ভোলার উপর চালবাজী! ভোলা ছুটে গিয়ে তা'র লেজ ধ'রে বন্ বন্ ক'রে ঘুরাতে ঘুরাতে ছুড়ে তা'কে ডোবার ভিতর ফেলে দিল। নাকানি চুবানি খেয়ে মেনীটা স'রে পড়্‌ল।

শশব্যস্তে মাসী এসে বল্‌ল—"সে কি রে, ইস্কুল থেকে যে চ'লে এলি?"

গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে ভোলা বল্‌ল—"দেখ্‌ছ কি?—আমার পড়া শেষ হ'য়ে গেল, আজ পণ্ডিত মশায় আমাকে ডেকে আদর ক'রে কোলে বসিয়ে বল্‌লেন—'বাবা ভোলা, তুমি তো সব শিখেছ, আর তো কিছু বাকী নেই—এবার কাজের চেষ্টা দেখ'।"

অবাক্ হ'য়ে মাসী বল্‌ল—"সে কি রে ভোলা! অতগুলো বই তুই সব মুখস্থ ক'রে ফেলেছিস্?"

দাঁত বা'র ক'রে ভোলা বল্‌ল—"আমাকে কি তোমরা যা' তা' ছেলে মনে কর নাকি? এখন ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও দিকিন।"

আদর ক'রে কাছে বসিয়ে মাসী তা'কে খাওয়াতে লাগ্‌ল এবং বোনপো যে শীগ্‌গির হাকিম হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নানা উপদেশ দিতে লাগ্‌ল।

—৪—

অমাবস্যার রাত্রি। ভোলারা কালীপূজা কর্‌বে। ছেলের দল বেশ মেতে উঠেছে।

ছুতোরদের কালু কালী-প্রতিমা গড়েছে; লাল জীভটাই কেবলমাত্র সে যে কালীর মূর্ত্তি তা'র নিদর্শন দিচ্ছিল। বাড়ুয্যেদের আমবাগানে পূজার ব্যবস্থা হ'য়েছে। গোটা কুড়ি ছোট-বড় কলার ডগা ও কচুর ডগা বলিদান হবে।

প্রসাদের উপকরণ মন্দ নয়। একরাত্রির মধ্যে আশে পাশের সমস্ত নারিকেল গাছের ফল একেবারে নিঃশেষ! তা' ছাড়া অন্যান্য ফলের তো কোন হিসাবই নেই। ভোলা পূজায় রত। কালু একখানা বর্ণপরিচয় নিয়ে মন্ত্র ব'লে দিচ্ছে। অন্য সকলে লোলুপ-নয়নে প্রসাদের দিকে তাকিয়ে সময়ের অপেক্ষা কচ্ছে। নির্ব্বিঘ্নে পূজা শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু গোল বাধ্‌ল বলিদানের সময়।

ভোলা বল্‌ল—"আমি পুরুত, আমিই বড়টা বলি দেবো।"

কালু বল্‌ল—"আমি ঠাকুর গড়্‌লাম, মন্ত্র পড়ালাম—আমি বড়টা কাট্‌ব না তো কি তুই কাট্‌বি?"

দুইজনে নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল—কেউ হট্‌বার পাত্র নয়। অন্য সকলে রগড় দেখ্‌বার জন্য দুইজনকেই উৎসাহিত কর্‌তে লাগ্‌ল। ঝগ্‌ড়া হ'তে হ'তে শেষে হাতাহাতি সুরু হ'ল! প্রবলবেগে ভোলা কালুর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বল্‌ল, "তোকেই আমি বলি দেবো—দেখি কে তোকে রক্ষা করে।" একখানা ছোরা নিয়ে ভোলা কালুর লম্বা চুলগুলো ধ'রে কাট্‌তে প্রস্তুত!

উর্দ্ধশ্বাসে দে চম্পট্

সভয়ে সকলে পিছিয়ে গেল। মরিয়া হ'য়ে কালু ভোলার নাকের উপর তা'রই ছোরাখানা রেখে—দিল এক টান্! ব্যস্ আধখানা নাক আল্‌গা হ'য়ে গেল, আর ভোলা বিকট চীৎকার দিয়ে প'ড়ে গেল মাটিতে! সেই অবসরে

কালু উর্দ্ধশ্বাসে দে চম্পট্! কেবল পূজার স্থান থেকে নয়, ভয়ে সে গ্রাম ছেড়েই পলায়ন কর্‌ল। ছেলেরা যে যেমন পার্‌ল প্রসাদ লুণ্ঠন ক'রে স'রে পড়্‌ল।

—৫—

কয়েক মাস পরে গ্রামে যাত্রার দল এসেছে। ভোলার নামের সঙ্গে এখন সকলে 'নাককাটা' শব্দটা উপসর্গ-স্বরূপ প্রয়োগ কর্‌তে প্রায় ভুল করে না। বেচারা নাকে একখানা রুমাল ঢাকা দিয়ে থাকে। বদ্‌মায়েসী তা'র এখন বেশ প'ড়ে এসেছে। গ্রামের সকলে সেজন্য কালুকে মনে মনে ধন্যবাদই দেয়।

সে-দিন সকালে মাসীর মনে আবার হাকিমী ভাবনা জেগে উঠ্‌ল; বল্‌ল—"হাঁ রে ভোলা, কবে হাকিম হবি? নাক কাটা হ'লে হাকিম হ'তে পার্‌বি তো? মুখপোড়া ছোড়া নাকটাই দিল কেটে!"

দুঃখিত-স্বরে ভোলা বল্‌ল—"মাসী, আমি তো আগেই ব'লেছি নাক কাটা থাক্‌লে হাকিম হওয়া যায় না। তবে জান কি—এই যে গাঁয়ে যাত্রার দলটা এসেছে না—তা'রা কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে চায়।"

বিশেষ আগ্রহ ক'রে মাসী বল্‌ল—"কেন রে—ওরা তোকে নিয়ে কি কর্‌বে?"

—"কেন আবার কি! ওদের শূপর্ণকার (শূর্পণখার!) পার্ট কর্‌বার লোকের বড্ড অভাব তাই।" মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে ভোলা কোন রকমে কথাগুলো ব'লে ফেল্‌ল।

"ওরে বাবা! সেই রাক্ষসীর খেলা? না বাবা কাজ নেই, ঘরের ছেলে ঘরেই থাক, রাক্ষসের খেলা কর্‌তে হবে না। রাত্রে বোধ হয় আবার ঘুমই আস্‌বে না। তোকে হাকিমও হ'তে হবে না, শূপর্ণকাও হ'তে হবে না—তুই ঘরেই থাক বাবা।"

এবার সকল দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ভোলা পরম নিশ্চিন্ত-মনে মাসীর কোলে মাথা রেখে প'ড়ে রইল।

শ্রীসুনীলকুমার ব্যানার্জ্জী

আপন জন

ঝড়ে যথা লণ্ডভণ্ড করে বনস্থল,
করে যথা লুঠপাট ডাকাতের দল,
সেইরূপ দেশ-মাঝে আসি' মহামারী
লুঠিয়া লইল প্রাণ ফিরি' বাড়ী-বাড়ী।

মাতা-পিতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আর
হারাইল যুবা এক—কেহ নাই তা'র।
মহাশোকে কাঁদে যুবা, করে হায় হায়—
"কোন্ সুখে আমি এবে রহিব ধরায় ?
মরিব ডুবিয়া আজি তটিনীর জলে।"—
এত ভাবি' শোকাকুল যুবা পথে চলে।

ধরিয়া অন্ধের হাত বুড়ী একজন
বিমলিন মুখে আসি' দিল দরশন।
কহিল সে, "বাবা মোর, তোমারি মতন
ছেলে ছিল আমাদের, নিঠুর শমন
হরিয়াছে প্রাণ তা'র, বুড়া-বুড়ী তাই
দুয়ারে দুয়ারে আজি ভিখ মাগি' খাই।
তোমারি সে ভাগ্যবান বাপ-মায় স্মরি'
দাও কিছু দয়া ক'রে,—আশীর্ব্বাদ করি।"

তাহাদের ভিক্ষা দিয়ে, কিছু দূরে যেতে,
বালক দাঁড়া'ল আসি' কাছে হাত পেতে।
কহিল সে, "পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু আর
আপন বলিতে কেহ না আছে আমার।
অনাথেরে লেখা-পড়া শিখাবার তরে,
পিতার মতন কিছু দিন দয়া ক'রে।"

ব্যাকুলতা-ভরে তা'রে করি' ধন দান,
বিমনা যুবক হ'ল পথে আগুয়ান।
পথিকের পদ-শব্দ করিয়া শ্রবণ,
পথি-পাশে মল-লিপ্ত রোগী একজন
দীন-নেত্রে কহে, "ভাই, একটুকু জল !"—
আবার চেতনা তা'র হইল বিকল।

করা'য়ে সলিল পান, কোলে তুলি' তায়
চলিল যুবক ফিরে গেহে পুনরায়।
সেই ক্ষণে গঙ্গা-ধারা শুভ ভাবনার
বিদূরিল আত্ম-নাশ-বাসনা তাহার।
ভাবিল সে, 'মাতা-পিতা, ভাই ছেলে আর
ফিরে পেনু বাহিরিয়া পথে এই বার।
শিক্ষাহীন, অন্নহীন, আতুর যাহারা
পরম আপন জন আমার তাহারা।
নিদাঘে প্রচুর বারি করি' বরষণ,
করে মেঘ জগতের মঙ্গল সাধন।
সেইরূপ ইহাদের কল্যাণের তরে
রহিব বাঁচিয়া আমি সেবা-ব্রত ধ'রে

শোক-তাপ-অন্ধকার করি' বিতাড়ন,
ভাতিল যুবার প্রাণে আলোক তখন।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেলোফেন্

কমলপুর হাই স্কুলে প্রাইজ বিতরণ হ'য়ে গেল। তরুণ এইবার সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্ষ্ট ক্লাশে ফার্ষ্ট হ'য়ে প্রমোশন পেয়েছিল ব'লে অনেকগুলো বই প্রাইজ পেল। বইগুলোর মলাটের উপর এক রকম পাতলা, চক্‌চকে, স্বচ্ছ কাগজ লাগান। তরুণ সবেমাত্র বইগুলো নিয়ে হলের বাইরে পা দিয়েছে, এমন সময় বিশ্বনাথ, ভবেশ, নীরেন প্রভৃতি বন্ধুরা তা'কে একেবারে ঘিরে ফেল্‌ল। "দেখি. দেখি, কি কি বই পেয়েছ?" ব'লে নীরেন তরুণের হাত থেকে একটি বই কেড়ে নিল; ভবেশ আবার সেইটি নীরেনের হাত থেকে একেবারে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল! এই রকম টানাটানি এবং কাড়াকাড়ির ফলে একটি বইএর মলাটের চক্‌চকে, স্বচ্ছ কাগজটি ফাৎ ক'রে খানিকটে ছিঁড়ে গেল।

ভবেশ ব'লে উঠ্‌ল—"এই-যাঃ! বইখানার এমন সুন্দর মলাটটি ছিড়ে গেল!"

বাধা দিয়ে নীরেন বল্‌ল—"হ্যাঁ···ভা—রী ত এক টুক্‌রা সেলোফেন্—তা'র জন্যে আবার এত চিন্তা!"

"সেলোফেন্! সে আবার কি জিনিস নীরেন! কৈ আমরা ত তা'র নামও শুনি নি।"—ভবেশ বল্‌ল।

বিশ্বনাথও একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"সেলোফেন্ কা'কে বলে, নীরেন?" বন্ধুরা সকলেই সেই ছেঁড়া মলাটের কাগজটি হাত দিয়ে বিশেষ আগ্রহে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

... ...

এই রকম সেলোফেন্ কাগজের মলাট-লাগান বই তোমরাও অনেক দেখে থাক্‌বে, কিন্তু সেই কাগজের নাম যে 'সেলোফেন্' তা' বোধ হয় ভবেশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মত তোমাদেরও জানা নেই। সেলোফেন্ কি, কি জিনিসের সাহায্যে এবং কি ভাবে তৈরী হয়—সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'চার কথা বল্‌ছি।

সেলোফেন্, সাধারণ কাগজের মত এক রকম কাগজ; তবে সাধারণ কাগজ যে ভাবে তৈরী হয় সেলোফেন্ সে উপায়ে তৈরী হয় না। উহা একটি রাসায়নিক জিনিস, রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত। সেলোফেন্ প্রস্তুত কর্‌তে গেলে প্রধানতঃ প্রয়োজন সেলুলোজ। তাহা কাঠ, কাঠের গুঁড়া, খড়, তূলা, সূতা প্রভৃতিতে বহু-পরিমাণে আছে; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সেই সকল জিনিসের মধ্যে,

সেলোফেন্ প্রস্তুত করার কাজে কাঠ অথবা কাঠের গুঁড়া এবং তুলাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী। তা' ছাড়া কাঠ এবং তুলাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। আবার কাঠের মধ্যে পপ্‌লার (Poplar), ফার্ (Fir), বার্চ্চ (Birch), স্প্রুস্ (Spruce) প্রভৃতি গাছের কাঠ বা কাঠের গুঁড়াতেই সেলুলোজ্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেই সকল কাঠের গুঁড়া, তুলা প্রভৃতি প্রথমে ভাল ক'রে পরিষ্কার করা হয়। পরে ঔষধপত্রের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে গলিয়ে ফেলে নাইট্রো-সেলুলোজ্ নামক একটি পদার্থ পাওয়া যায়। সেই নাইট্রো-সেলুলোজ, ইথার এবং অ্যাল্‌কোহল্ নামক দু'টি তরল রাসায়নিক জিনিসের সঙ্গে সংমিশ্রিত ক'রে পরিষ্কার করা হয়; তারপর কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। কিছুদিন থাকার পরে সেই তরল পদার্থ চট্‌চটে আঠার মত হ'য়ে পড়ে। তখন ঐ পদার্থটি খুব শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে নীচের দিকে চেপে একটি চওড়া ও খুব সরু ফাঁকের ভিতর দিয়ে গ্লিসারিন্‌পূর্ণ পাত্রের মধ্যে বা'র ক'রে দিলে তাহা অত্যন্ত পাত্‌লা কাগজের আকার ধারণ করে। সেই কাগজ খুব চওড়া রীল্ (Reel) অথবা মাকুতে জড়িয়ে রাখা যায়। উহারই নাম সেলোফেন্।

সাধারণ কাগজের তুলনায় সেলোফেন্ দেখ্‌তে খুব চক্‌চকে, পাত্‌লা, অথচ শক্ত। সেলোফেনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা খুব স্বচ্ছ—ঠিক যেন কাঁচ। সাধারণ কাগজে অনেক রকম রং করা যায় না; কিন্তু সেলোফেনে বহু প্রকারের রং করা যায়। সেলোফেনে ছাপার কাজও চলে। সেই সকল কারণে জিনিসপত্রের মোড়কের কাজে সাধারণ কাগজের পরিবর্ত্তে সেলোফেন্ ব্যবহার করা যায়।

আজকাল বই, ঔষধপত্রের বাক্স, সিগারেটের টিন, কৌটা, বোতল প্রভৃতি মোড়ার কাজে সেলোফেন্ বহুপরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ কাগজের তুলনায় সেলোফেনের দাম কিছু বেশী, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেলোফেন্ ব্যবহার করা হয়; কারণ সেলোফেনে মোড়া হ'লে জিনিসপত্র দেখ্‌তে ভারী সুন্দর হয়।

সেলোফেন্, ইউরোপে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত সেলোফেন্ প্রস্তুত হয় না, ভবিষ্যতে হ'তেও পারে। সেলোফেন্ প্রস্তুত করার জন্য কাঠ, কাঠের গুঁড়া বা তুলা ভারতবর্ষে প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম্. এ., বি. এস্-সি., বি. কম্.

ডাকাত

—১—

কাজলার বিল। বর্ষার 'টই টম্বুর' কালো জল থৈ থৈ করে। কালো জলের বুকে শত শত কুমুদ-কহ্লার হাওয়ায় দোদুল দোলে!

সূর্য্যের আলো ঠিক্‌রে পড়ে, যেন সব রূপার কুচি অসংখ্য বীচি-মালার বুকের 'পরে চিক্ চিক্ ক'রে জ্বল্‌তে থাকে। আকাশের সূর্য্য শতধায় চূর্ণ হ'য়ে কাজলার বুকে রূপালী স্বপন গ'ড়ে তোলে।

দিক-প্রসারী অথৈ বিল। দৃষ্টি চলে না। শুধু কালো জল ছোট ছোট ঢেউয়ে ভেঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। চখা-চখির দল নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে উড়ে আসে। ডাহুক-ডাহুকী পদ্মবনের ঝোপে ঝোপে দিবানিশি ডাকে। হংস-মিথুনের কল-কাকলী বিলের জলে অনুরণন তোলে। কিন্তু কাজলার বিল রাতের আঁধারে মৃত্যু-বিভীষিকায় ভয়াবহ হ'য়ে উঠে। তা'র বুক বেয়ে নাও নিয়ে যেতে দুর্দ্দান্ত মাঝি-মাল্লারও বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হ'য়ে যায়। তা'রা বলে, 'না কর্‌তা মুই পার্‌ব না,—নোটন সর্দ্দার —তা'র হাতের খড়্গ কাউকে রেহাই দেয় না। ছেলে-বুড়ো সকলকেই কেটে কুচি কুচি ক'রে সে কাজলার জলে ভাসিয়ে দেয়। প্রাণে একটু দয়া নেই, মায়া তা'র একটুও নেই, এমনি নিষ্ঠুর সে!'

রাতের কালো মিশ্‌মিশে আঁধার যখন কাজলার কালো জলের উপর ঘাপটী মেরে নেমে আসে, তখন শুধু ওই কালো আকাশের গায়ে মেঘের বাতায়ন খুলে দেবপুরীর তারার প্রদীপ জ্ব'লে উঠে। একটা চাপা হাওয়া—রাত্রির নিস্তব্ধ আঁধারে—ভূতের চাপা নিঃশ্বাসের মতই ঘুরে ঘুরে ফিরে। নোটন সর্দ্দার ছোট্ট ছিপ্‌টা নিয়ে তা'র সাক্‌রেদ মোনার সাথে, খড়্গ হাতে ছায়ার মতই ঘোরে ফিরে! তা'র হাতে কা'রও নিস্তার নেই! কেউ পায় না পার! সে মৃত্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে খড়্গ হাতে,—একটা ক্ষীণ দীর্ণ চীৎকার নৈশ আঁধারে বাতাসের গা ভেদ ক'রে করুণ বিষণ্ণতায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে!

কাজলার কালো জল একটুখানি রাঙা হ'য়ে উঠে!

—২—

নোটন সর্দ্দার। কালো বলিষ্ঠ পেশী-বহুল দেহ—চওড়া বুকের ছাতি! লোহার মতই শক্ত কঠিন হাতের গুল!—বাবরী-কাটা ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুলের গোছা উন্নত কাঁধের উপর সাপের মতই এঁকে বেঁকে লুটিয়ে প'ড়েছে।

রাত্রির আঁধারে সে যখন গলা ছেড়ে হুঙ্কার দেয়, রে—রে—রে—এ—এ··· তখন যোজন-ব্যাপী দিগন্ত সে প্রতিধ্বনিতে গম্ গম্ করে।

সংসারে তা'র কেউ ছিল না, ছিল শুধু মা-হারা ছোট্ট ভাইটি ঝোটন। ঝোটনকে ছেড়ে সর্দ্দার একটি পা-ও কোথা নড়্‌ত না। তা'কে বুকে পিঠে ক'রে সর্ব্বদাই ফির্‌ত!···

ছোট্ট ছোট্ট দুটি কচি কচি বাহু দিয়ে নোটনের গলাটি জড়িয়ে ঝোটন ডাকে, 'দাদা রে! দাদা!'···একটা খেলার বলের মতই আকাশে ছুড়ে লুফে ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে সর্দ্দার খেলা করে। ঝোটন খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে। ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতে হাততালি দেয়!

দাদার বুকের তলে মুখটি গুঁজে না শু'লে ঝোটনের ঘুম আসে না! দাদা না খাইয়ে দিলে ছোট ভাইটির খাওয়া হয় না।

জমীদার বাড়ীতে, নোটন রাজাবাবুর প্রিয় বরকন্দাজ। নোটন সর্দ্দার না হ'লে রাজাবাবুর কোন কাজ হয় না! রাজাবাবু ডাকেন,—'নোটন!'

অমনি মাথায় পাগড়ী এটে পাঁচ হাত লম্বা এক তেল-পাকান বাঁশের লাঠি হাতে, কাঁধের উপর ভাই ঝোটনকে নিয়ে নোটন সর্দ্দার সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে বলে—'কর্‌তা!'

সে-বারে বাৎসরিক খাজনা সদরে পৌঁছে দিতে হবে। ছোট ভাইটিকে পিঠে নিয়ে নোটন চল্‌ল সদরে খাজনা পৌঁছে দিতে!

গভীর রাতে কাজলার বিলে ডাকাতের শব্দ উঠ্‌ল—হৈ! হৈ!—রে! রে!—

সেই উৎকট—বীভৎস চীৎকারে কাজলার বুকখানা কেঁপে উঠ্‌ল!—

টাকার থলি বাঁচাতে গিয়ে, ডাকাতের লাঠি ঝোটনের কচি মাথার উপর ছিটকে পড়্‌ল। একবার মাত্র 'দাদা' ব'লে ঝোটন দাদার বুকেই এলিয়ে পড়্‌ল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠে নোটনের কাপড়খানা দিলে রঙিয়ে!!···

'ঝোটন্! ঝোটন্ রে!' অত বড় শক্তিশালী নোটন—ভাইয়ের মৃত-দেহটি বুকের উপর চেপে ধ'রে—তা'র সে কি মর্ম্মভেদী আকুল কান্না!···

তার পর নোটনের হাতের লাঠিতে একটি ডাকাতও রেহাই পেলে না। কাজলার কালো জল রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল !···

টাকার থলি অন্য বরকন্দাজের হাতে তুলে দিয়ে ঝোটনের শিথিল ঠাণ্ডা মৃত-দেহটা বুকের উপর তুলে নিয়ে, নোটন সর্দ্দার রাতের আঁধারে কাজলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল,—আর উঠ্‌ল না !

শুধু কাজলার কালো জলের বুকে দেখা গেল একটা আবর্ত্ত !

সকলে কত ডাক্‌লে, 'সর্দ্দার ! নোটন সর্দ্দার !' সকলের আকুল ডাক আঁধারের বুকে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে গেল। কিন্তু সাড়া এল না নোটন সর্দ্দারের !

তার পর একদিন শোনা গেল, কে এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত কাজলার বিলে ভীতি জাগিয়ে তুলেছে ! তার বুকে একটু দয়া নেই,—একটু মায়া নেই !—বড় কঠিন সে ডাকাতের প্রাণ !—অশ্রুতে সে গলে না ! কাকুতিতে সে টলে না !

সেই ডাকাতই নাকি নোটন সর্দ্দার !

—৩—

ষ্টীমার নদীর জলে আলোড়ন তুলে—আঁধারে আস্তে আস্তে মিশে গেল।

রাত্রি তখন মাত্র আটটা কি সাড়ে আটটা। পরের ষ্টীমারটা কাল সেই সকাল নয়টার পর ! অথচ ষ্টেশনে ব'সে থাকারও জায়গা নেই ! ছোট্ট একটা টিনের সেড্‌, সেই সেডের তলাতেই সব—মাল-ঘর, টিকিট্‌-ঘর, যাত্রী বস্‌বার ঘর, ষ্টেশন-মাষ্টারের থাক্‌বার ও শোবার ঘর ! জয়ন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

অত রাত্রে কাজলার বিল বেয়ে কোন মাঝিই ত যেতে চায় না। অথচ গৃহে মাতা মৃত্যু-শয্যায়, দেরী হ'লে হয়ত আর দেখাই হবে না। সেই স্নেহময়ী মা !···

জয়ন্তর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠ্‌ল !···শেষ পর্য্যন্ত এতদূর এসে মাকে শেষ দেখা তা'র হবে না ! কী করে ! যাত্রীর মধ্যে জয়ন্ত নিজে, তার দিদি আর দিদির আড়াই বছরের ছেলে—বিশু !

অনেক টাকা বকশিসের লোভে শেষ পর্য্যন্ত এক কম-বয়সী মাঝি রাজী হ'ল। দুর্গা ব'লে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল !—

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা হবে। নৌকা কাজলার বিলে প্রবেশ কর্‌ল।

দিগন্ত-প্রসারী কাজলার বিল। আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ শাদা শাদা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় বিলের কালো জল স্বপ্নের মতই মনে হয়। তখন শরৎ কাল। পূজার আর বড় বেশী দেরী নেই।

কমল, কুমুদ, কহ্লার বিলের বুকে যেন ফুলের জাজিম পেতে দিয়েছে। কল্ কল্ হল্ হল্ ক'রে নৌকার দু'ধারে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ!···

গা'টার মধ্যে কেমন যেন ছম্ ছম্ করে! দিগন্ত-প্রসারী মৃত্যুর মতই ভয়াবহ নিবিড় মৌনতা! কত শত অতৃপ্ত আত্মা দুর্দ্দান্ত ডাকাতের হাতে চিরতরে মৌন হ'য়ে গেছে সেখানে। আজিও হয়ত সেই জলের তল তা'দের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভারী হ'য়ে উঠে!

—'বিশু কী ঘুমিয়ে দিদি!'

ভিতর হ'তে দিদি বল্লেন,—'হু!'···

কী একটা দুঃশ্চিন্তা বুকের মাঝে ঝড় তোলে!···ওই আলো আঁধারে কী একটা বস্তু এদিকেই এগিয়ে আস্‌ছে না?—হাঁ!—তাই ত!

মাঝি ডাকে—'বাবু!'

—'দেখেছি মাঝি!'

—'নোটন সর্দ্দার বাবু!—এসে পড়্‌ল আর রক্ষা নেই!—হায় ভগবান!'

বিদ্যুতের মতই—দেখ্‌তে দেখ্‌তে নোটন সর্দ্দারের ছিপ কাছে এসে পড়্‌ল।

'সামাল যাত্রী!'—মেঘের মত ডাকাতের কণ্ঠস্বর দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে তুল্‌লে! খড়্গের দু'ঘায়ে দু'জন মাঝি জলশায়ী হ'ল!

মোনার হাতের তীব্র মশালের আলোয় চারদিক আলোকিত! দিদির কাতর চীৎকারে বিশু চোখ খুলে চাইলে! জয়ন্ত আগেই ঘায়েল হ'য়ে নৌকার পাটাতনে অজ্ঞান—মৃতবৎ প'ড়ে!

নোটনের হাতে খড়্গ মাথার উপর মশালের আলোয় লক্-লক্ ক'রে উঠ্‌ল। তাজা রক্তের ধারা তখনও তার গা বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়্‌ছে।

আর রক্ষা নেই! এখনই সব শেষে হ'য়ে যাবে। নোটনের চোখ দুটো হিংস্র পশুর মতই যেন রক্ত-পিপাসায় ঝক্-ঝক্ ক'রে জ্বল্‌ছে!—এই নেমে এল!—দিদির চোখ দুটো বুজে এল। সহসা সেই সুগভীর স্তব্ধতার বুকে এক প্রাণ-খোলা শিশুর খিল্ খিল্ হাসি ঝরণার উৎক্ষিপ্ত জলধারার মতই চারদিক ভরিয়ে দিলে।

অতবড় হিংস্র, ডাকাতের রক্তমাখা হাতের খড়্গটা বুঝি একটা খেলার জিনিস !

বিশু হাস্‌তে হাস্‌তে কচি কচি বাহু দুটি মেলে খড়্গটা ধর্‌তে গেল ! 'দা-দ্‌-দা ! দা-দ্‌-দা'—আধো আধো ডাক ! কোথা হ'তে কী হ'য়ে গেল !

সেই কতদিনকার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট ভাইটি। সেই ঝোটন যেন তার কচি কচি দুটি বাহু মেলে দাদার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চায়!

বিশু হাস্‌তে হাস্‌তে কচি কচি বাহু দুটি মেলে···

উদ্যত খড়্গ হাতের শিথিল মুষ্টি থেকে খ'সে পায়ের নীচে ছিট্‌কে পড়্‌ল।

আপনার অজান্তে নরহন্তা ডাকাতের রক্তমাখা দুটি হাত বিশুর দিকে এগিয়ে গেল !

শিশু ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল ডাকাতের বুকে !

জ্যোৎস্নালোকিত আকাশপথে একটা রাত-জাগানো পাখী মাথার উপর দিয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে গেল !

বিশু তখন তা'র কচি কচি দুটি বাহু দিয়ে নোটন সর্দ্দারের গলাটা আক্‌ড়ে ধ'রেছে !—যেমন ক'রে ধ'রেছে কতদিন তা'র ছোট্ট ভাই ঝোটন।

ডাকাতের চোখের কোল ভিজে উঠ্‌ল !

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

খোকার ধর্ম্মঘট

ছোট্ট খোকা নই তো আর, আমি এখন বড় ;
জুজুর ভয়ে, ভূতের ভয়ে নই তো জড়সড়।
কাজলা দীঘির গল্প শোনা, নীল আকাশের তারা গণা,
সোনার কাঠী রূপার কাঠী, বেঙ্গমী বেঙ্গমা ;—
বইয়ের পাতায় থাকবে তা'রা এখন হ'তে জমা।
ভোর না হ'তে মধু এসে ডাক্‌বে 'খোকন চল,
—বেলা হ'ল ঘুম ভাঙ্গে না !'—তোমরা বুঝেই বল,
ডাকাডাকি অমন ধারা— রাগ হ'লে তাই বলি 'দাঁড়া' ;
অমন ধারা আদর আমি সইতে রাজী নই,
মধুর মনে রাখাই উচিত ছোট্ট খোকা নই।
দিদির সাথে চল্‌ছে আড়ি আজকে কিছু দিন ;
নীলু, বাচ্চু, গদাই, শিবু আরও জনেক তিন
আমায় সেদিন ডাক্‌তে এলে, দিদি তাহার কাজটি ফেলে,
বল্‌লে গিয়ে 'খোকন কোথা ! হয়তো বাড়ী নেই।'
'খোকন' কেন বল্‌তে গেল আপত্তি তো সেই !
বাবার দেখি বড্ড যে ভুল জামা জুতো কিনে,
'খোকন' ব'লে ডাকেন এসে ; ঐ নামটি বিনে—
মা-ও নাকি ভুলেই যান। ভাবনা শুধু মান অপমান,
কোথায় বা কেউ ফেল্‌বে শুনে বিপদ হবে ভারী ;
বন্ধুরা সব রাত্রিদিন পেতেই আছে আড়ি।
এই প'ড়েছি—'অপমান বজ্রাঘাতের তুল্য'—
'প্রথম পাঠে'র কথাটির আছে সমান মূল্য !
খেয়াল যদি না হয় কা'রও, ধার্‌ব না তো কা'রও ধারও ;
বাবা, মা, দিদি, দাদা বুঝবে মজা তাঁ'রা,
'রতন' ব'লে ডাক্‌লে পরে মিল্‌বে শুধু সাড়া।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এ.

কাফ্রি ছেলেমেয়েদের সহিত একদিন

ভোরের আলো দেখা দিবার পূর্ব্বে—অতি প্রত্যূষে—মধ্য-আফ্রিকার গ্রামগুলি কত নিস্তব্ধ! প্রত্যেক বাটীর দরজা বন্ধ, গ্রামের লোক সব যে যার আপন ঘরে ঘুমাইতেছে। ঘরগুলি ঘাস, পাতা, খড় প্রভৃতি দিয়া ছাওয়া। ঘরের মধ্যেই ঝাঁপের উপরে গৃহপালিত মুরগীগুলিও ঘুমাইতেছে। বাহিরে কেবল কুকুরগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভোর হইবার কিছু পূর্ব্বেই একটির পর আর একটি মুরগী ডাকিতে থাকে এবং ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় নামিয়া পড়ে। কাজেই ঘরের লোকজনও তখন উঠিয়া পড়ে। মায়েরা উঠিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাড়া দিতে থাকে। "কি কুড়ে ছেলে গো, এখনও উঠ্‌ল না আর কত ঘুমুবে, উঠে পড়"—এইরূপ তাড়া দুই-চারিবার খাইয়া ছেলেমেয়েরা শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসে ও কিছুক্ষণ প্রাতঃকালীন খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া প্রাতরাশের জন্য জল গরম করিতে থাকে। খিঁচুড়ি, পায়স কলাভাজা ইত্যাদি উহাদের প্রাতঃকালীন আহার। আহারে উহাদের বিশেষ কিছু বাহুল্য নাই।

উহারা প্রায় সকলেই এক কাপড়ে দিনরাত থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোমরে একখানি কাপড় জড়াইয়া রাখে এবং কখনও কখনও পুঁতির মালা প্রভৃতি ব্যবহার করে। বয়স্ক পুরুষেরা কাপড় পরে—কখনও কখনও কাঁধের উপর বাঘ, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি কোনও জন্তুর চামড়া ফেলিয়া রাখে। বড় বড় মেয়েরা রঙীন ও ছাপান কাপড় ব্যবহার করে। পোষাক-পরিচ্ছদেও উহাদের বড় বাহুল্য নাই; কিন্তু উহারা চুলের খুব যত্ন করে। এক প্রকার তাল জাতীয় বৃক্ষের ফল হইতে উৎপন্ন "পাম তৈল" নামক ভেষজ তৈল সকলেই মাখে এবং রান্নায়ও তাহা ব্যবহার করে। তৈল মাখিয়া উহারা স্নান করে। বড় বড় মেয়েরা ছোট ভাই-বোনদিগকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে যায়। চারি-পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েরা হয়ত জল দেখিয়া একটু ভয় করে, কিন্তু আট-নয় বৎসরের ছেলেমেয়েরা জলে খুব সাঁতার কাটে ও ঝাঁপাঝাঁপি করে। ছেলেমেয়েরা যাহাতে সকলেই সাঁতার কাটিতে শিখে তাহার প্রতি উহারা খুব লক্ষ্য রাখে। আফ্রিকার অনেক জলাশয়ে বড় বড় কুমীর আছে। ছেলেরা যেখানে স্নান করে সেখানে প্রায়ই কুমীর থাকে না,

থাকিলেও বয়স্ক লোকেরা তাহা মারিয়া ফেলে। স্নানের পূর্ব্বে উহারা বেশ ভাল করিয়া দাঁতন করে ও মুখ ধোয়।

বড় বড় বালক ও যুবকেরা বাটীর একটি পৃথক্ ঘরে থাকে ও নিজেদের অল্প-স্বল্প রান্না নিজেরাই করে। মা কোনও ভাল জিনিস রান্না করিলে ছোট বড় সকল ছেলেকেই ডাকিয়া খাওয়ায়।

প্রাতঃকালীন আহার শেষ হইলে পুরুষেরা গৃহ প্রস্তুত বা মেরামত, বন কাটা, মাটি খোঁড়া, চাষ করা, শিকার ইত্যাদি নানাবিধ কাজে লাগিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরাও বসিয়া থাকে না; তাহারাও আমাদের দেশের সাঁওতালদের মত ছোট ছোট ছেলেগুলিকে পিঠে বাঁধিয়া কাজের সন্ধানে বাহির হয়। ওদেশের স্ত্রীলোকেরা শস্যবপন, তরিতরকারী

একটি কাফ্রি-পরিবার

উৎপাদন ইত্যাদি নানাপ্রকার কাজ করে। সেইজন্য অনেক সময় উহারা বাটী হইতে দুই ক্রোশ দূরে চলিয়া যায়; বেলা প্রায় ৩টার সময় সান্ধ্য আহারের জন্য শাক্-সব্জী ও তরিতরকারী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরে। শিশুগুলি কখনও কখনও মায়ের পিঠের উপরই ঘুমায়, আবার কখনও কখনও মা তাহাদিগকে মাটিতে গাছের তলায় শোয়াইয়া রাখে।

গ্রামের নিকট স্কুল থাকিলে বড় ছেলেমেয়েরা বিলাতী ছিটের কোট, ফ্রক, শার্ট প্রভৃতি পরিয়া স্কুলে যায়। উহারা আমাদের মত বই, শ্লেট প্রভৃতি হাতে করিয়া না লইয়া তাহা মাথায় বাঁধিয়া লয়। বইএর উপর জলখাবারও বাঁধা থাকে। তাহার

পর দলবদ্ধ হইয়া হাসিঠাট্টা ও গল্পগুজব করিতে করিতে স্কুলে যায়। উহাদের দেশের স্কুলগুলি প্রায়ই পাদরী সাহেবদিগের স্থাপিত। সুতরাং সেই সকল স্কুলে পাশ্চাত্য ধরণে লেখাপড়া শিখান হয়।

যে সকল গ্রামে শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, তথায় ছেলেরা গৃহপালিত পশু চরায়, শস্যক্ষেত্রে পাহারা দেয়, পাখী, ইঁদুর ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতে এবং তীর, ধনুক প্রভৃতি লইয়া খেলা করে। উহারা খুব মাংস-প্রিয়। যদি শিকার মিলিয়া যায় ত উহার মাংস, তরিতরকারী বা অপর কোনও খাদ্যের সহিত সিদ্ধ করিতে দেয়। পায়স উহাদের এত প্রিয় খাদ্য যে, যে পাত্রে পায়স রান্না হয় তাহা চাঁছিয়া খাইতেও বড় ভালবাসে।

মেয়েরা উঠান ও বাড়ী-ঘর ঝাঁট দেয়, শুইবার মাদুর ঝাড়িয়া পরিষ্কার করে, জ্বালানী কাঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করে এবং বড় বড় কাঠের উদুখলে মুষল দিয়া শস্যের খোসা ছাড়ায় বা তাহা চূর্ণ করে। উহারা আমাদের মত ঢেঁকির ব্যবহার করে না। জল আনিতে যাইবার সময় দল বাঁধিয়া একত্র যায় ও আমাদের দেশের মেয়েদের মত কত গল্প করে।

বাটীর সকলে আপন আপন কাজ সারিয়া সন্ধ্যায় ফিরিলে উহারা আহার করে। সেই সময় অন্যান্য খাদ্যের সহিত সিদ্ধ বা ভাজা তরকারি, মাছ পোড়া, বাষ্প-দ্বারা সিদ্ধ পাতায় পোড়া মাছ (অনেকটা আমাদের দেশের ইলিশ মাছ ভাতের মত) ইত্যাদি আহার করে ; কোনও কোনও দিন মাংস খায়। আহারান্তে মাছ বা মাংসের কাঁটা ও ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি গৃহপালিত কুকুর ও মুরগীকে দেয়।

সন্ধ্যায় আহারের পর ছেলেমেয়েরা নানাপ্রকার খেলা করে—যথা "মুরগী-বিড়াল খেলা" "ব্যাঙ্‌লাফানি খেলা" ইত্যাদি। দুনিয়ার সকল দেশের ছেলেমেয়েদের মত লুকোচুরি খেলা খেলিতেও উহারা ছাড়ে না। ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অনেক সময় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা চলিতে থাকে। তারপর যে যার ঘরে গিয়া ঘুমায় ও পরদিন প্রাতঃকালে আবার মুরগীর ডাক শুনিয়া বা মায়ের তাড়া খাইয়া উঠিয়া পড়ে। এইরূপে উহাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়।

শ্রীভীমাপদ ঘোষ, এম্. এ.

ইন্দ্রসেন

সে আজ অনেকদিনের কথা। যিশুখৃষ্টের জন্মেরও প্রায় চারশ' বছর আগেকার ব্যাপার। এখনকার মত তখন ট্রাম-বাসের প্রচলন হয় নি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনকার চেয়ে তখন সভ্যতায় যে খাটো ছিল, তা নয়।

পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী। তা'র পাশেই ছোট একটি কুটীর—বিশাল মহীরুহের পাশে ক্ষুদ্র লতার মত।

সেই কুটীরে বাস করে ইন্দ্রসেন ও তা'র বিধবা মা। ইন্দ্রসেনের বয়স সবে চৌদ্দ বছর। ফুট্‌ফুটে চেহারা—এক কথায় অপূর্ব্ব সুন্দর কিশোর সে। দেখ্‌লে মনে হয় —রাজপুত্র। কিন্তু তা'র মা সূতো কেটে দিন কাটাতেন।

ইন্দ্রসেনের মা সূতো কাটেন খুব সরু—খুব মিহি। সেই সূতো তিনি তাঁতীদের দিতেন। দিয়ে যা পেতেন তা'তে সুখে না হোক স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাট্‌ত। তাদের সেই ছোট নীড়ে যেন রাজ্যের আরাম ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বল্‌ছি—সে-সময় ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করা কাপড় নিয়ে লজ্জা নিবারণ কর্‌তে হ'ত না। তখন ভারতবর্ষের কাপড় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রপ্তানী হ'ত। ভারতের সূক্ষ্ম কাপড় ইউরোপের রাজপ্রাসাদে ও সৌখীন সমাজে সমাদৃত ছিল।

ইন্দ্রসেন ও তা'র মা'র দিন বেশ স্বচ্ছন্দে যাচ্ছিল। কিন্তু সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ ইহাই জগতের নিয়ম।

ইন্দ্রসেনের মা অসুখে পড়্‌লেন। একদিন নয়, দু'দিন নয়, প্রায় ছয় মাস কেটে গেল, কিন্তু মা'র সার্‌বার কোন লক্ষণই নেই। ক্রমে জমানো টাকা-পয়সা, তারপর বাসন-পত্র সব শেষ হ'ল। তারপর ধার,—শেষকালে এমন অবস্থা হ'ল যে, দিন আর কাটে না। ইন্দ্রসেন ছেলেমানুষ, কোন কাজই কর্‌তে পারে না। একদিন সূতো কাট্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু পারে নি। কি করে? খালি কাঁদে, চোখের জলে তা'র বিছানা ভিজে যায়। বলে—'ঠাকুর! মাকে ভাল ক'রে দাও।' মা তাঁর শীর্ণ হাত ইন্দ্রের মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বলেন—'ভয় কি বাবা? আমি শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌ব।' কিন্তু হায়!

হতভাগ্য ইন্দ্রসেন কি জান্‌ত যে, তা'র মা 'শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌ব' ব'লে পালাবেন—এই জগৎ ছেড়ে আর এক জগতের আশ্রয়ে ?

ইন্দ্র সকাল থেকেই বেরোয়; যদি কিছু আহারের যোগাড় কর্‌তে পারে। দেখে—হাটে কত জিনিস, কত খাবার।

একদিন সে চুরি কর্‌লে। চুরি না ক'রে সে কর্‌বেই বা কি ? মা আহারের অভাবে মৃতপ্রায়। সে দেখ্‌লে এক দোকানদার তা'র দোকান ছেড়ে দূরে একজনের সঙ্গে কথা কইছে। সেই সুযোগ বুঝে ইন্দ্রসেন দোকানীর পয়সার থলেটি চুরি কর্‌লে। চুরি কর্‌বার কঠোর শাস্তি তা'র অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তা'র মা'র জীবনের জন্য সে কি না কর্‌তে পারে !

দোকানদার "চোর ! চোর !!" ব'লে চেঁচিয়ে ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেল্লে এবং তখনই তা'কে নগর-রক্ষীর কাছে সমর্পণ কর্‌লে। নগর-রক্ষী তা'কে প্রধান ধর্ম্মাধিকরণিক রুদ্রগুপ্তের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে গেল।

ইন্দ্রসেনের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনে রুদ্রগুপ্তের মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল। কিন্তু তা'র মুক্তি দিবার কোন উপায় নেই। কারণ ইন্দ্রসেনের দোষ প্রমাণ হ'য়ে গেছে।

রুদ্রগুপ্ত তা'কে বিচারের জন্য সম্রাট্‌-সকাশে প্রেরণ কর্‌লেন। কারণ, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

*　　*　　*　　*

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা—দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভার মত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নের সমাবেশ সেই রাজসভায়। ইরান, তুরান, চীন, পারস্য—এমন কি সুদূর মিশর থেকে তাঁর জন্য সব বহুমূল্য উপঢৌকন এসেছে। রাজসভার দ্বারে দ্বারে সশস্ত্র সতর্ক প্রহরী, নিদর্শন-পত্র ছাড়া কা'রও প্রবেশ নিষেধ। গুপ্তচরেরা প্রচ্ছন্ন-ভাবে রাজসভায় ঘুর্‌ছে। কিন্তু বিচারের এখনও অনেক দেরী। মহারাজ গুপ্তচর-বিভাগের বড় কর্ত্তার কাছ থেকে রাজ্যের সমস্ত খবর জেনে তারপর বিচারে বস্‌বেন।

ক্রমে বিচারের সময় সমাগত হ'ল। ইন্দ্রসেনকে রাজসভায় আনা হ'ল। তা'র দুই হাত লোহার শিকলে বাঁধা; সুন্দর মুখ ভয়ে বিবর্ণ। নগরপাল মহারাজকে ইন্দ্রসেনের চৌর্য্যের সমস্ত বিবরণ নিবেদন কর্‌লে।

মহারাজ গম্ভীর-স্বরে ইন্দ্রসেনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"এই চুরি তুমি ক'রেছ ?"

ইন্দ্রসেন নিরুত্তর।

বিচক্ষণ মহারাজের বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'ল না—কেন ধর্ম্মাধিকরণিক রুদ্রগুপ্ত স্বয়ং বিচারটি সম্পন্ন না ক'রে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন, মহারাজ তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁরও ত হাত পা বাঁধা; তাঁকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখ্‌তে হবে। তিনি মনে মনে বল্লেন—'ধর্ম্মাধিকরণিক রুদ্রগুপ্ত, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লাম না—কিছু মনে ক'রো না। আমার কাছে দয়া ও স্নেহের চেয়ে বিধি ও শৃঙ্খলা বড়।' মহারাজের মুখে কঠোরতার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল।

দুই হাত লোহার শিকলে বাঁধা

—"ইন্দ্রসেন, কেন তুমি এ চুরি কর্‌লে?"

—"রুগ্না মা না খেতে পেয়ে……"

বাধা দিয়ে মহারাজ বল্লেন—"আমি তা জানি। কিন্তু চুরি কর্‌বার দরকার কি ছিল? তুমি আমার কাছে আবেদন কর্‌তে পার্‌তে!"

ইন্দ্রসেন চুপ ক'রে রইল। হায়! একথা কেমন ক'রে সে জানাবে যে, বড়র কাছে দরবার বড়রই চলে, ছোটর চলে না।

মহারাজ আবার বল্লেন—"রাজ্যের আইনানুসারে চুরির শাস্তি প্রাণদণ্ড। তোমায় আমি সেই শাস্তিই প্রদান কর্‌লাম। ইন্দ্রসেন, মনে রেখো, আগামী পরশ্ব আমার এ আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে।"

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সভা ত্যাগ কর্‌লেন। সভাসদেরা নিস্তব্ধ। তাঁরা অনুকম্পার দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে একবার চাইলেন মাত্র।

নিঝুম রাত। আকাশে অগণিত তারা। দূরে—অতি দূরে তা'রা মিট্‌ মিট ক'রে চাইছে। চতুর্দ্দশীর চাঁদ টুক্‌রো টুক্‌রো ভাঙ্গা মেঘের পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রকাণ্ড প্রাসাদ তন্দ্রাচ্ছন্ন, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। নগরের চারিদিকে পরিখা। পরিখার নির্ম্মল জলের উপর চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তা'তে ঢেউ উঠ্‌ছে। চাঁদের আলোয় ঢেউগুলো গলান রূপার মত ঝক্‌-ঝক্‌ কর্‌ছে।

নগরের পাশ দিয়ে নদী কল-কল-রবে বেগে ছুটে চ'লেছে। বুকের উপর তা'র অসংখ্য নৌকা, জাহাজ, নানা রকমের বাণিজ্য-সম্ভারে বোঝাই। সুদূর আরব, পারস্য থেকে তা'দের আমদানী। বিচিত্র তাদের গঠন, বিচিত্র তাদের রঙ্‌। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রায় মগ্ন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চোখে নিদ্রা নেই। তিনি উদাসভাবে শয্যায় শয়ান আছেন। তাঁর মনে কিসের একটা দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। পাশে গ্রীক রাজকুমারী হেলেন। হেলেন বীণা বাজিয়ে মহারাজকে তাঁর দেশের রাগিনী শোনাচ্ছিলেন। বাজাতে বাজাতে হেলেন ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। মহারাজ আর তাঁকে ডাক্‌লেন না।

হেলেন বীণা বাজিয়ে মহারাজকে···

রাত্রি তৃতীয় প্রহর— ঘোষক দামামা বাজিয়ে জানিয়ে দিল। নিঃশব্দে প্রাসাদ-রক্ষী নারী-সৈন্য পরিবর্ত্তিত হ'ল। ঐ সঙ্গে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন।

তিনি মনে মনে বল্লেন—"বালক ইন্দ্রসেন! তুমি মা'র জীবনের জন্য চুরি ক'রেছ, আর আমি আমার মাতা মুরার জন্য সমগ্র নন্দ-বংশ ধ্বংস ক'রেছি! তোমাতে আমাতে পার্থক্য কোথায়?"

প্রভাত হ'ল। পাখীরা সব প্রভাতী গাচ্ছে। তা'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে দূরে নহবৎখানায় দরবারী কানাড়ার আলাপ চল্‌ছে। এমন সময়ে রাজ-লিপি হস্তে প্রহরীকে নগরপালের বাড়ীর উদ্দেশে যেতে দেখা গেল।

খানিক পরে কারাগারের রুদ্ধ বিশাল লৌহ কবাট ঝন্ ঝন্ ক'রে খুলে গেল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্রসেন। দ্রুতগতিতে সে তা'র জীবনের ধ্রুবতারা—জীর্ণ কুটীরের দিকে ফিরে চ'লেছে। আজ সে মুক্তি পেয়েছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্তের মত মাকে দেখ্‌তে সে ছুটে চ'লেছে।

এক একবার সে মনে কর্‌ছে যে, তা'র মা হয়তো সুস্থ হ'য়ে পথ চেয়ে ব'সে আছেন, আবার যেন কি রকম অশুভক্ষণে মনে হচ্ছে যে, তা'র মা শেষ-নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

অবশেষে ইন্দ্রসেন বাড়ী পৌছুল। কিন্তু এ কি? সব নিস্তব্ধ। জীর্ণ কুটীরখানা তা'কে যেন রাহু-গ্রাসের মত হাঁ দেখিয়ে গিলে ফেল্‌তে আস্‌ছে, আর উঠানে তা'র মা'র নিজের হাতে পোঁতা ডালিমগাছটা যেন তা'কে বিদ্রূপ কর্‌ছে!

অশ্রু-সিক্ত-নয়নে ইন্দ্রসেন কাতরভাবে "মা মা" ব'লে ডেকে ঘরে ঢুক্‌ল। তখন তা'র মা ইহজীবনের মত বেশ নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে মগ্ন। সে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল মা'র বুকের উপর। পাগলের মত ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে, মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে সে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"মা, মা, আমি এসেছি, তোমার ইন্দ্র ফিরে এসেছে, একবারটি চেয়ে দেখ……দেখ।"

শ্রীনীরজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরীসেনের গুণাগারী

এক যে ছিল গৌরীসেন, ড্যাক্সোভরা আছিল তার টাকা।
সবাই বলে—'পাওনা শোধো,—বাপের দেনা ক'দিন চলে রাখা?'
'বাপের দেনা! অবাক্ কথা!'—গৌরী ভাবে—'কয় কি শুনি সবে!-
নিজেরি তার খাতক এরা, তাইতো জানি,—কর্জ্জ দিল কবে?'
সবাই কহে—'ওহে মোড়ল, সরলভাবে চাইছি টাকা ব'লে,
ভাব্‌ছ বুঝি বলছি মিছে—মুখটি বুজে' চুপ্‌টি ক'রে র'লে!
বেহাই-সাধু কানাই-দাদু তোমারই তো আপন পিসা-খুড়া,
বলুন দেখি সত্যি তাঁরা সবার কাছে দায়িক কিনা বুড়া?'

কানাই বলে—'ন্যায্য ক'ব—বেজার-খুশী যে-ই না তাতে হোক্,—
জানই তো হে, শর্ম্মা নহে প্রাণ গেলেও মিথ্যা বলার লোক।
ভাদ্রমাসের একত্রিশে দুপুর-বেলা অরন্ধনের দিনে,—
দেয়ার ডাকে আকাশ ফাটে বাতাস ওঠে সহসা দক্ষিণে!
আমরা ভাবি—তাই তো এ কি!—হঠাৎ কেন আকাশভরা মেঘ?
বাদলধারা সৃষ্টিছাড়া, এমন ঝোড়ো বায়ুর কেন বেগ?—
বদন-মামা দেখেন—ওমা!—হাটের দিকে মাঠের পথে যেতে,
মোড়ল-বুড়ো জ্বালায় নুড়ো পান্তাভাতে লঙ্কাপোড়া খেতে!
তক্ষুণি তো সত্যি-হাঁচি মামার নাকে পড়্‌ল দু-দুবার!—
কেমন, সাধু, কইনি আমি?—হাতে হাতে ফল্‌ল তো ফল তার!'

সবাই কহে—'শুন্‌লে তো হে?—দেখ্‌লে কথা কইছি কিনা সাচা?
তোড়ং খুলে টঙ্কা ফ্যালো, ভড়ং-এ আর কাজ কি বলো, বাছা?'

গৌরী কহে—'হয় তো সেদিন বাবা আমার জ্বেলেছিলেন নুড়ো;
পুড়েছিলেন লঙ্কা অরন্ধনের দিনে,—বল্‌ছ যখন খুড়ো।
আগুন জ্বেলে ক্ষেতখামারে লঙ্কাপোড়ায় দোষটা হ'লো কিসে?
আকাশ থেকে বৃষ্টি প'লো—বাবার তাতে কি ঘাট, বলুন পিসে?'

সবাই বলে—'কলির ছেলে নেমকহারাম এই রকমই বটে!
বাবার কি দোষ—সুধোয় আবার!—শুন্‌লে কথা পিত্তি জ্বলে ওঠে!
অরন্ধনে আগুন জ্বালা—মহাপাতক কা'র না আছে জানা?—
সেদিন খাবি লঙ্কাপোড়া?—ক্যান্‌রে বাপু? দই-চিড়ে নয় খা না?
জ্বাল্‌লি নুড়ো, কর্‌লি ধূয়ো,—মেঘ হবে না অমন ধূয়ো হ'লে?
সেই মেঘে তো বৃষ্টি হ'লো, দেশটি গেল ভেসে বানের জলে!
পুকুর থেকে মাছ পালালো পাড়-তলানো নতুন স্রোত পেয়ে!
ঘরের ডোয়া ভেঙ্গে গেল, কেঁদে মরে হারু ঘোষের মেয়ে!

রাধুর ম'লো বেগুন-চারা, হরকিশোরের তল্‌তা-বাঁশের ঝাড় !
কলাই-ক্ষেতে কোমর ডোবে, দেশটি জুড়ে উঠ্‌ল হাহাকার !
সেই হ'তে যে বিপদ এত, চল্‌ছে আকাল মাসের পরে মাস—
মূলে তো তার বাপটি তোমার,—আগুন জ্বেলে কর্‌ল সর্ব্বনাশ !
গুণাগারীর দায় হবে না সবাই যদি ভোগে একের দোষে ?—
দায়িক তবে বল্‌ব কা'রে এতেও যদি দায়িক না হয় গো সে ?
বল্‌ছি ভালো, মোড়ল-ভায়া, ভদ্রভাবে শুন্‌চ না তো কথা !—
কাজীর কাছে বিচার হবে,—তখন দেখি এড়াও যেয়ে কোথা !'

নালিশ শুনে বলেন কাজী—'এ তো অতি ন্যায্য সবার দাবী।
হঠাৎ এমন রাজ্যভরা আকাল কেন, আমিও তাই ভাবি !—
পেঁয়াজ রসুন নেই বাজারে, আক্রা আলু—হ'লো ব্যাপার কি এ ?
খোরাক বিনে সেপাই কাবু, রাজ্য রাখি কিসের রসদ দিয়ে ?
এমন ক'রে মোড়ল-বুড়ো সবার যখন কর্‌ল ক্ষতি এত—
ন্যায্য বিচার আমার বাবা—ক্ষতিপূরণ করার দায়িক সে তো !'

সবাই কহে—'হুজুরালির সূক্ষ্ম বিচার,—কা'র না আছে জানা !—
হুকুম করুন বিচার ক'রে অপরাধীর কি হয় জরিমানা।'

ভাবেন কাজী আপন মনে ; খানিক পরে বলেন সবার কাছে—
'গৌরীসেনের ঘরে শুনি ড্যাক্সোভরা অনেক টাকা আছে।
আজ হ'তে তার টাকার উপর রাজ্যশুদ্ধ লোকের র'লো দাবী—
ড্যাক্সো থাকুক্ যেমন আছে, সরকারে তার থাক্‌বে জমা চাবি।
টাকার মালিক সবাই হ'লে, নগদ টাকা নাই-বা পেলে হাতে,—
গুণাগারীর ভাগ তো পেলে,—চৌদ্দপুরুষ থাক্‌বে দুধে-ভাতে !'

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

কি ও কেন?

পৃথিবী কি সত্যই ঘোরে?

এই কলিকাতা সহরে বসিয়াই আমরা রোজই দেখি সূর্য্যদেব সকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া বিকালে পশ্চিমাকাশে অস্ত যান, আবার পরের দিন ভোরে তিনি পূর্ব্বাকাশেই দেখা দেন। তা হ'লে তো আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া তাহার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব আমাদের পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে?—শুধু তাহাই নহে, এই ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও তাহার অক্ষের উপর প্রচণ্ড-বেগে আবর্ত্তন করিতেছে?

আমরা প্রত্যেক দিন যাহা দেখিতেছি তাহাতে ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইতেছে যে, হয় সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিতেছে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, আর না হয় তাহার বিপরীত কাণ্ড হইতেছে। ইহার কোন্‌টা ঠিক?

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

অঙ্ক কষিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ইহা স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ, সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩ লক্ষ গুণ বড় এবং সূর্য্য পৃথিবী হইতে সোয়া ৯ কোটি মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। সুতরাং সূর্য্যকে যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতে হইত, তবে তাহার গতিবেগ হইত কত—তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখ। উহা কল্পনাতীত। তাহা ভিন্ন অতবড় সূর্য্য—তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবে, তাহা কি বিজ্ঞান-সম্মত?

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত হইবার পর হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে ও হইতেছে। দেখা গিয়াছে—উহারা সকলেই নিজ নিজ অক্ষের উপর আবর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। সুতরাং সে-ই বা কেন আবর্ত্তন করিবে না?

সূর্য্য ও পৃথিবী দুইজনেই মহাশূন্যে অবস্থিত হইয়া একজন অন্যজনকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকার পথে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই ঘোরা সম্ভব দুইটি শক্তির সামঞ্জস্যে। একটি শক্তি ঘূর্ণ্যমান পদার্থটিকে কোলের দিকে টানিয়া রাখে, অন্যটি উহাকে সামনের দিকে চালিত করে। একগাছি সূতায় একটি ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাও, তোমাকে কেন্দ্র করিয়া ঢিলটি তোমার চারিদিকে ঘুরিবে, কিন্তু সূতাটি ছাড়িয়া দাও, ঢিলটি ছিট্‌কাইয়া বাহির

হইয়া যাইবে। সূর্য্যই যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তবে পৃথিবী সূর্য্যকে টানিয়া রাখিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ১৩ লক্ষগুণ বড় ও সোয়া ৯ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যকে নিজের দিকে টানিয়া রাখিবার প্রচণ্ড শক্তি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী কোথায় পাইবে?
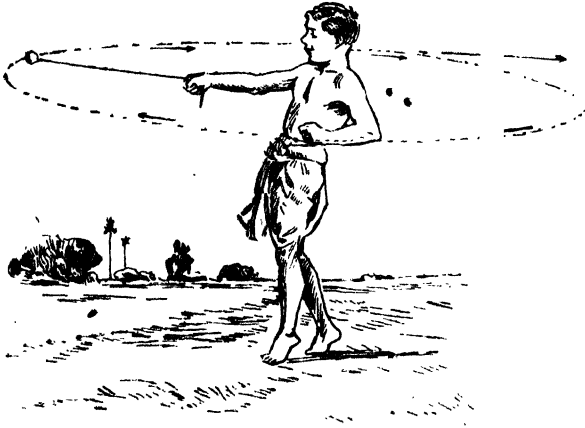
ফ্রান্সের বোলন ও জার্ম্মানির হামবুর্গ সহরে নিম্ন-বর্ণিত পরীক্ষাটি করা হইয়াছিল!—আমরা দেখি উপর হইতে কোন ভারি পদার্থ ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক সোজা ভাবে নীচে পড়ে। কিন্তু এই পরীক্ষাটিতে নিবাত অবস্থায় ২৫০′ ফিট উচ্চস্থান হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডটি মাটিতে পড়িলে দেখা গেল যেখানে পড়া উচিত ছিল সেখানে না পড়িয়া উহা ১/৩″ ইঞ্চি পূবে সরিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর গতির জন্যই উহা সম্ভব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—কোন স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইলে উহা হাল্কা হয়। তখন চারিদিকের ভারি শীতল বাতাস উহাকে ঠেলিয়া উপরে উঠাইয়া দেয়। শীতল বাতাসের গতির ফলে জোরে বাতাস বহিতে থাকে। বিষুব রেখার উপর ও নিকটবর্ত্তী স্থান উহাদের উত্তর ও দক্ষিণের স্থান হইতে গরম, কাজেই উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে শীতল বায়ু বিষুব রেখার দিকে এই অবস্থায় সোজা প্রবাহিত হওয়া উচিত; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখা যায় না। দেখা যায়—উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে বায়ু প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিকগতির ফলেই ইহা সম্ভব।
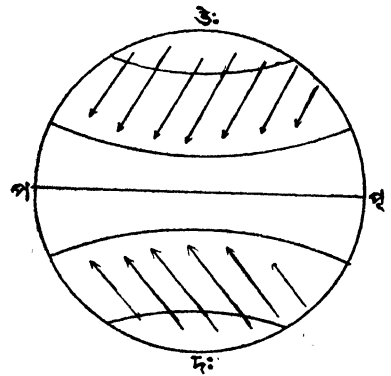
কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিকগতি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিলেন ফুকো সাহেব।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ সহরে তিনি তাঁহার পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। প্যানথিওন (Pantheon) নামক গির্জ্জার ছাদ হইতে ২০০ ফিটের অধিক লম্বা সূতা দিয়া প্রায় ১ ফুট ব্যাসের একটি লৌহ গোলক তিনি ঝুলাইয়া দিলেন। গোলকের নীচে ভূমির উপর বালুকা ছড়ান হইল এবং গোলকের নীচের দিকে একটা পিন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যাহাতে দুলিবার সময় দোলকটি বালির উপর প্রত্যেক বারেই একটি করিয়া দাগ অঙ্কিত করে। দোলকটি অতি সাবধানে উত্তর-দক্ষিণে দোলাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল—দাগগুলি ঘড়ির কাটার মত ক্রমশঃই পূবের দিকে বাঁকিয়া যাইতেছে।
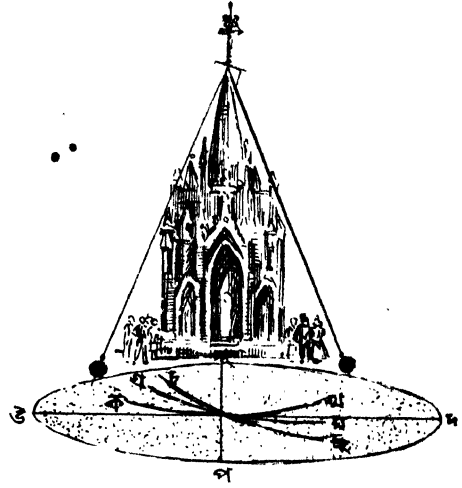
দাগগুলি বাঁকিয়া যাইতেছিল কেন?

সহজে ও আস্তে আস্তে ঘুরান যায় এমন একখানি গোল টেবিলের উপর বসান একটি শক্ত দণ্ডের উপর হইতে একটি ছোট লোহার বল ঝুলাইয়া দেও, এইবার বলটি দোলাইয়া দিলে ঘড়ির দোলকের মত বলটি এদিক ওদিক একই ভাবে ও একই পথে যাতায়াত করিবে। এ অবস্থায় টেবিলটি আস্তে আস্তে ঘুরাইলে দেখা যাইবে বলটি নিজের দুলিবার পূর্ব্ব পথেই দুলিতেছে—যদিও টেবিলটি এবং সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটিও ঘুরিয়া গিয়াছে। সুতরাং দণ্ডের গতির সহিত দোলকের গতিপথের কোন সম্বন্ধ নাই! পরীক্ষাটি করা অতি সহজ তোমরা নিজেরাও করিতে পার।
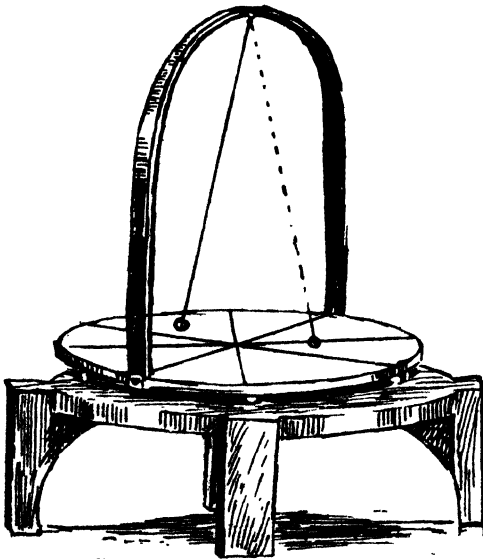
তাহা হইলে বুঝা গেল, কুকোর পরীক্ষায় বালির উপর দাগের দিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? দোলক একই পথে দুলিতেছিল; কিন্তু ঘুরিতেছিল পৃথিবী। সুতরাং বালির উপর দাগও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—পৃথিবী কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে? আমরা সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিকে উঠিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখি, তাহা হইলে পৃথিবী ঘুরিতেছে পশ্চিম হইতে পূবে। তোমরা যাহারা রেলগাড়ীতে চড়িয়াছ তাহারা জান—রেলগাড়ী যখন দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে পূর্ণগতিতে ছুটিয়া চলে, তখন মনে হয় মাঠের কোলে অচলগাছের সারি যেন গাড়ীর উল্টা দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যাইতেছে; আর তোমাদের গাড়ী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গতি-বিজ্ঞানের নিয়মই এই। সূর্য্য যখন স্থির, তখন পৃথিবীই সূর্য্যের আপাত-গতির বিপরীত দিকে ছুটিতেছে—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া। আর তাহারই ফলে হইতেছে রাত্রি ও দিন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম এস্‌-সি.

ঠাকুর্দ্দা

"চিট্‌জয়" (Cheat-joy) কোম্পানীর হ্যারিশ সাহেবের নিকট ঠাকুর্দ্দা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, যে কোন প্রকারেই হউক, তিনি একটা নাম করিয়া, বড় হইয়া হ্যারিশ সাহেবের দোকানের কাছ দিয়া মোটর হাকাইয়া যাইবেন। আর যাওয়ার সময় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিওর মোড়ে হ্যারিশ কোম্পানীর বাড়ীর মোড়ে বার বার 'হর্ণ' দিবেন। তাহাতে 'ডি হ্যারিশ' সাহেবএর বুকে জ্বলিয়া উঠিবে ঈর্ষ্যার আগুন। ঠাকুর্দ্দাও দেখাইবেন তিনি একটি 'কেউ কেটা' নন্।

কিন্তু?—কিন্তু? খুব একটা নাম করা যায় কি করিয়া? সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে প্রকারে জাঁকিয়া বসিয়া আছেন, সাধ্য কি যে সেখানে অন্য কেহ দন্তস্ফুট করে? দেশ-সেবক?—তায় কি কম হাঙ্গামা? তা'তে তো আর সব সময় তিন ডজন রুটি দিয়া 'সিক্‌ডায়েট' করা চলে না! অতএব কি করা যায়? ঠাকুর্দ্দার ভাবিতে ভাবিতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, ঝি ঝি করে—তবু কোনও উপায় খুঁজিয়া পান না। একটা নূতন কিছু করিতেই হইবে—অদ্ভুত, অসাধারণ, অলৌকিক, অপার্থিব, অপূর্ব্ব। কিন্তু সেটা কি? লোকে কত বড় বড় এক একটা

আবিষ্কার করিয়া ফেলে—আর ঠাকুর্দ্দা একটা কিছু গবেষণা করিয়া বাহির করিতে পারিবেন না? ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর্দ্দার মুখ আনন্দে, হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

(২)

হঠাৎ একদিন কলিকাতাবাসী—সমগ্র কলিকাতাবাসী— সভয়ে সাতঙ্কে দেখিল রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন :—

"শত্রু আসিয়াছে! শত্রু আসিয়াছে!! দমনকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, অগ্রসর হউন। দেশের শত্রু, মানবের শত্রু, মহামানবের শত্রু—সমবেত চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য সচেষ্ট হউন, সংহত চেষ্টার প্রয়োগ করুন। দেশের কতিপয় মহাপ্রাণ এই উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাই আজ ৩১শে ভাদ্র অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায়—পার্কে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হইবে। আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়!"

সেদিন সকল কলিকাতাবাসীর মুখে একই কথা—বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে! শত্রু আসিতেছে, তবে কি জর্ম্মণী আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে—তারই জন্য সভা? আর কি হইতে পারে? এ যেন সকলের এক মহাভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রামে আফিসের লোকেরা আজ বড়বাবুর সহিত মধুর সম্পর্কের কথা ভুলিয়াছে, বাড়ীর কর্ত্তারা আজ খরচের হিসাব করিতে ভুলিয়াছে, আর বাড়ীর গৃহিণীরা আজ গহনার ফর্দ্দ করার কথা বিস্মৃত হইয়াছে। সকলের মুখেই বিষাদের ভাবনার কালিমা। কী এমন বিপদ আসিয়া পড়িল!

বৈকাল চারিটা বাজিতে না বাজিতেই—পার্ক লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমিও কি কাজে সেদিন উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতা গিয়াছিলাম—আমিও সকলের পথ অনুসরণ করিয়া—পার্কে গমন করিলাম। ওঃ সে কী ভীড়! কোনও প্রকারে জনতার এক পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া দাঁড়াইলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সভাপতির স্থানের নিকট কয়েকটি ভদ্রলোক, মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি—গেরুয়া রংএর বস্ত্র পরিধানে দণ্ডায়মান।

অ—ক—স্মা—ৎ

সকলকে সচকিত করিয়া, ভীত করিয়া—সগর্জ্জনে শোনা গেল

"ছারপোকা" "ছারপোকা!!"

সমবেত জনতা ব্যস্ত হইয়া যার যার কাপড় জামায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিল—কই? কাহারও জামায় বা কাপড়ে তো দেখা গেল না!

আবার শোনা গেল

"মহাশয়গণ ব্যস্ত হইবেন না, ব্যস্ত হইবেন না। আপনাদের কাপড় জামায় এক্ষণি ছারপোকা

রহিয়াছে—এই কথা আমি বলিতেছি না। আপনাদের প্রধান শত্রু, দেশের প্রধান শত্রু ছারপোকা, এই কথাই আমি বলিতেছি। ছারপোকার কামড়ে কত লোকের যে রক্ত দূষিত হয় —তাহার ফলে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়—তাহাদের কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। জ্বরে আক্রান্ত হইলে লোকে পরিশ্রম করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। উপযুক্ত সময়ে পরিশ্রম করিতে পারে না বলিয়া জমির চাষ হয় না —যেখানে জমিতে বাঁধ দেওয়া দরকার সেখানে বাঁধ দেওয়া হয় না। ফলে বর্ষার সময় যখন চারিদিকে জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—বাঁধ না থাকায় দেশ জলে প্লাবিত হইয়া যায়। দেশে বন্যা আসে, শস্য নষ্ট হয়—তাহারই ফলে দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। অতএব হে সমবেত জনসাধারণ! আমার কথা প্রণিধান করুন, অবধান করুন, সকলে চেষ্টা করুন, যাহাতে সমবেত চেষ্টার ফলে দেশের এই শত্রুকে দূর করিতে পারেন।”
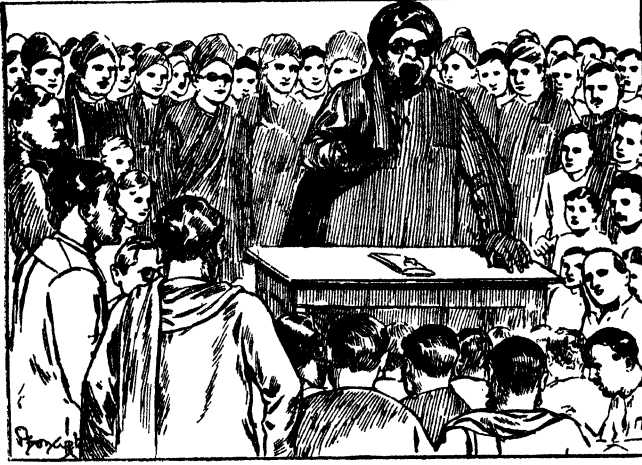
—পার্কে সভা—

ভদ্রলোক একটু থামিলেন। সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আমিও ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাইলাম—কিন্তু নীলবর্ণের চশমা, পাগড়ি সমস্তই যেন পরিচয়কে গোলমাল করিয়া দিল।

পুনরায় আরম্ভ হইল—

“দৈনন্দিন জীবনের কথাই বা আর কি বলিব? এমন যে পরম আরামের স্থান শ্বশুরবাড়ী, সেখানেও এই জীব-বিশেষের জন্য শান্তি নাই। বসিয়া আছি—মধুর সম্পর্কের একজন হয়তো আসিয়া রক্তচোষাকে ‘জামাই-বিজয়’ অভিযানের উদ্দেশ্যে গাত্রোপরি বসাইয়া দিল! রাত্তিরে ঘুমাইয়া আছি—‘কুটুস’-‘কুটুস’-এর অত্যাচারে জাগিয়া হয়তো দেখিলাম এক ঘণ্টার মধ্যে আমার শরীরের অনেক স্থান ‘ভাণ্ডো’ ‘গামার’ শরীর হইতে চলিয়াছে! তাই দেখুন আমার বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে—এমন যে মধুর আশ্রয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি আজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। আমি চাই ‘ছারপোকা নিবারণী সমিতি’ স্থাপন করিতে। সমিতির সভ্যগণকে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে—

(ক) সর্ব্বদা তাহারা তাহাদের সঙ্গে একটি দীর্ঘ ছুঁচ রাখিবেন।

(খ) কি গৃহে, কি ট্রেনে, কি ট্রামে, কি বাসে সর্ব্বত্রই তাহারা তাহা সঙ্গে নিবেন এবং যখন ছারপোকা তাহাদের নয়ন-পথে আসিবে, তখনই তাহাকে ছুঁচএর অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে।

(গ) তাহার পর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমিকার সাহায্যে উহাকে বধ করিতে হইবে।

(ঘ) সর্ব্বশেষ উহা সত্যই মরিয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া নিতে হইবে।

সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস—এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে—অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে—কোথাও আর ছারপোকা থাকিবে না। সভ্যদের কোনও চাঁদা দিতে হইবে না। এখন বলুন কে কে এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন।"

এতক্ষণে ভদ্রলোক থামিলেন। আমি ও দেবপ্রসাদ দুইজনেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম দলে দলে লোক অগ্রসর হইয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল :—

দামড়ি রাউথ।

মকর পাগল।

দলপৎ পাপড়ি।

গোপীজন-বল্লভ-পদরেণু কোলে।

ভাগপত খিচুড়ি।

গণপৎ ঘোড়ই—ইত্যাদি আরও কত শত লোক!

(৩)

পূজার ছুটি আসন্ন—স্বাস্থ্যকামী বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৩ নম্বর আপ দিল্লী এক্সপ্রেস্-খানা রাত্রিতে যথাসময়ে শিয়ালদহ হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। দেখা গেল একটা ইণ্টার ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে সকলেই ঘুমাইয়া আছেন—কেবলমাত্র একখানা দেহবিশেষ জাগ্রত অবস্থায় একটি সুঁচ হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ভদ্রলোক সেখানে বসিয়া যেখানেই ছারপোকা দেখিতেছেন সুঁচের অগ্রভাগে তখনই তাহাকে বিদ্ধ করিয়া, পিষিয়া মারিতেছেন। আবশ্যক হইলে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়াও ছারপোকা বাহির করিয়া নিতেছেন।

'ছারপোকারি' ভদ্রলোকের আড়াইমণী দেহখানা দেখিয়া নিদ্রিত আরোহিগণ বলি বলি করিয়াও কিছু বলিতে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু ঘুমের শত্রু নাকি সর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ শত্রু। মানুষের ঘুমের বিঘ্নকারীকে নাকি বেশীক্ষণ সহ্য করা চলে না। এক ভদ্রলোক বারংবার এই প্রকার বিরক্তিকর ব্যাপার অসহ্য বোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মশায়, থাকুক্, ছারপোকা থাকুক্—আপ্‌নার কি আইস্যা যায়—আপনি ক্যান্ চুপ কইরা থাকেন না?"

আর যায় কোথা! ছারপোকারি ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"মশায়, বল্‌তে লজ্জা হ'ল না?

মশায়, বল্‌তে লজ্জা হ'ল না?...

আপনারা সবাই ঘুমুচ্ছেন আমি জেগে ব'সে আপনাদের এই উপকার কচ্ছি। কোথায় আপনারা কৃতজ্ঞ থাক্‌বেন, না আমার উপরই উল্টো রাগ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন!"

গাড়ীতে যে কয়জনও বা নিদ্রিত ছিলেন সকলেই তখন জেগে গেলেন। এইবার পরোপকার-ব্রতী পুরুষ জলদগম্ভীর-নাদে গান ধরিলেন—

"নানাপ্রকার জীবে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তারই মাঝে আছে এক জীব
সকল জীবের সেরা—
ওগো, সকল জীবের সেরা।......"

সঙ্গে সঙ্গে হস্তের অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে সুঁচএর এক অপূর্ব্ব নৃত্য দেখাইয়া দিলেন। একটি ছোট ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একান্ত মনোযোগ দিয়া গান শুনিতেছিল—এইবার সে একেবারে "ভ্যা" করিয়া রাগিণীর সহিত অপূর্ব্ব ঐক্যতান যোজনা করিয়া দিল। আরোহীদের সুখ একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ হইল।

সকলে চটিয়া গেল—একজন চটিয়া গিয়া গাড়ীর চেন ধরিয়া টানিল। গাড়ী বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে মিলিয়া পুরুন-প্রবরটিকে রেল কোম্পানীর পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

(৪)

ভোর হইয়া গিয়াছে—আড়াইপ্ণী ভদ্রলোক নির্বিকার-চিত্তে বসিয়া ভাবিতেছেন—কেহই তো তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। সকালবেলা মানুষের একটু টোষ্ট্, বেশী না—একটি হাফ-বয়েল ডিম, এক পেয়ালা "বিছানা চা" না হ'লে কি ভাল লাগে?—না দেহ থাকে?

হঠাৎ ফাঁড়ির সকল লোক সচকিত হইয়া উঠিল—বড়বাবু আসিতেছেন।

বড়বাবু আসিয়াই রাত্রির বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়ের নাম?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী।"

—"মশায়ের পেশা?"

এবার প্রকাশবাবু চটিয়া অস্থির!—"হ্যাঁ মশায় কি করা হয়—এর পর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন 'বকেয়া' 'মুদাফৎ' মানে কি? আরও কত কী। আমি কিচ্ছু বল্‌ব না।" বলিয়া ভদ্রলোক একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কৰ্ম্মচারিটি লোক ভাল বলিতে হইবে। তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মশায়, আপনি না বল্লেই কি? আমরা পুলিশ, আমাদের সব খবর রাখ্‌তে হয়। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা কোনও প্রকারে উতরাইয়া গিয়াছেন। তারপর এম. এ, ল., বি. টি—সকলের কোর্শ কমপ্লিট ক'রেছেন, একটারও পরীক্ষা দেন নি। আপনি বিড়াল ও বিড়ালের সম্পর্কিত জাতি বিশেষকে সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন—আরও আরও শুন্‌বেন? আপনি হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুৰ্দ্দা—কমন ঠাকুৰ্দ্দা—অর্থাৎ বহুদিন আমলের কিনা!"

এইবার ঠাকুৰ্দ্দা দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইলেন—"কী মশায়, বন্দীর সঙ্গে এইপ্রকার অপমানজনক আচরণ। জানেন, আমার কত ক্লাসফ্রেণ্ড ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এস. পি আছেন? আপনার এসব কথা আমি তাদের কাছে বল্‌ব। আর আমি যৎকিঞ্চিৎ নিজেই দিয়ে যাচ্ছি।"

পুলিশের বড়বাবু বলিয়া উঠিলেন—"ঠাকুৰ্দ্দা, এই হচ্ছে কি? প্রণবের কথা কি একেবারেই ভুলে গেছেন। আপনি হচ্ছেন আমার ল. ক্লাসের ক্লাসমেট।"

—"ওঃ প্রণব! তাই বল্‌তে হয়। এতক্ষণ তা' হ'লে ঠাট্টা হচ্ছিল?"

বলিয়া ঠাকুৰ্দ্দা প্রণবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

খোকার ঘুম

বর্ষাশেষের নীল আকাশের হাল্‌কা শাদা মেঘে
কোন্ নিশীথের স্বপন জাগে চাঁদের ছোঁয়াচ্ লেগে ?
গল্পে শুনি—আকাশ-ছোঁয়া তেপান্তরের শেষে
মায়ানদীর বেড়া দেওয়া বিজনপুরীর দেশে
সাত-মহলা রাজার পুরী,—শ্বেতপাথরের ঘরে
রাজকন্যা একলা ঘুমায় সোনার পালং ’পরে,—
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি মরণ বাঁচন আনে,—
তারির ছায়া জাগে কি এ শাদা মেঘের প্রাণে ?

চাঁদের আলো পড়ে এসে রাজকন্যার মুখে,
নীল আকাশের মেঝেয় শুয়ে ঘুমায় মনের সুখে ;
সাগরপারের শীতল হাওয়া শিশির মেখে গায়
আল্‌গা বাঁধা চুলগুলিতে দোলা দিয়ে যায় ;
ঘুমসহরের পরীরা সব স্বপ্নগড়া বেশে
ঘুমে ভরা চোখের পাতায় ভিড় করেছে এসে ;
সেই স্বপনের ঝিলিক্ লেগে ঘুমন্ত তা’র ঠোঁটে
মন-মাতানো ঘুমপাড়ানী হাসির ফিনিক্ ফোটে।

খোকার চোখে এলো কি সেই ঘুমসহরের পরী ?
শাদা মেঘের ওড়্‌নাতে তার চাঁদের আলোর জরি।
ঘুমপরীদের আঁচল ভরা সোনার স্বপন কত
খোকার দুটি চোখের পাতায় ঝর্‌ছে অবিরত ;
মুখেতে তার আভাস জাগে—একটুখানি হাসি,
খোকা যেন স্বপ্নলোকের নিকট-প্রতিবাসী।
মেঘের দেশের স্বপন এলো আজ কি খোকার চোখে ?
তাই কি খোকা ঘুমিয়ে হাসে সেই স্বপনের ঝোঁকে ?

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ ; কাব্যসাংখ্যতীর্থ

পূজার ছুটি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছেলে দুইটির কাছে গিয়া দেখা গেল—তাহারা টেলিফোন খেলিতেছে। দুই জনের হাতে দুইটি টিনের কৌটা। কৌটা দুইটির ঢাকনা নাই। তলায় সরু পেরেক দিয়া একটি করিয়া ছেঁদা করা হইয়াছে। প্রায় ৪০।৫০ হাত লম্বা এক টুক্‌রা সুতার দুইটা খুঁট দুই ছেঁদায় লাগান। একটি ছেলে কৌটার মুখে মুখ দিয়া কথা বলিতেছে আর একজন দূরে দাঁড়াইয়া কৌটাটি কানের কাছে ধরিয়া বন্ধুর কথা শুনিতেছে।

অনুর মামাবাবু তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—"অনু, মণ্টু তোরা বাড়ী গিয়ে এই রকম টেলিফোন তৈরি করতে পারবি তো ?"

মণ্টু বলিল,—"খুব পারব বাবা, এ আর কঠিন কি ? কি বল অনুদা ?"

অনু বলিল,—"আমরা এর চেয়েও লম্বা সুতো দিয়ে তৈরি করব। তা হ'লে একেবারে সত্যিকারের টেলিফোনের মত অনেক দূর থেকে কথা বলা যাবে।"

মণ্টু জবাব দিল,—'ঠিক ব'লেছ অনুদা, তুমি থাকবে আমাদের ছাদে আর আমি থাকব রাস্তার ওপাশে মহিমের বাড়ীর ছাদে। ভারি মজা হবে—না ?"

মণ্টুর বাবা ছেলের কথায় হাসিয়া বলিলেন,—"আরে, অতদূর থেকে সুতোর ফোনে কি কথা শোনা যায় ?"

অনু বলিল,—"কেন যায় না মামাবাবু ? তা হ'লে তারের ফোনে যায় কেমন ক'রে ?"

—"জলে যদি একটা ব্যাঙ্‌ লাফায় তা হ'লে জলে ঢেউ ওঠে, দেখেছ ত ? তেমনি আমরা যখন কথা বলি বাতাসে ঠিক ঐ রকমের ঢেউ ওঠে। বাতাসের ঢেউ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কানে এসে ঠিক পৌঁছে।"

মণ্টু বলিল,—"আচ্ছা বাবা, আমি যদি এখান থেকে ডাক দি—আর তুমি যদি কলকাতার বাড়ীতে থাক, তা হ'লে বাতাসের ঢেউ তোমার কানে গিয়ে পৌছবে ?"

—"না তা পৌঁছবে না ; কারণ, বাতাসের ঢেউ খানিকদূর যেতে না যেতেই মিলিয়ে যায়। সেই জন্যেই তো টেলিফোনের দরকার।"

—"টেলিফোন কি ক'রে ঐ ঢেউ অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যায় ?

—"টেলিফোনের যন্ত্রে দু'টি পাতলা পাত আছে। যে মুখে কথা বলা হয় সেখানে একটি, যে মুখে শোনা যায় সেখানে আর একটি পাত থাকে। আমরা কথা বললে বাতাসে যে ঢেউ ওঠে তা'তে বলার পাতটা কাঁপে। পাতটা যেভাবে কাঁপে ঠিক সেইভাবে তারের ভিতরকার বিদ্যুৎটা কম-বেশি হ'তে থাকে। আবার তারের বিদ্যুৎ যে হিসেবে কম-বেশি হয়—অন্য প্রান্তে শোনার পাতে কাঁপন লাগে ঠিক সেই হিসেবে। ফলে এই হয় যে, আমি এখানে কথা বললে মুখের পাতটা যে ভাবে কাঁপবে, দু'শ' মাইল দূরে যে যন্ত্রটা কানে ধরেছে—তার কানের পাতটাও ঠিক সেই রকম কাঁপবে। তা'তে আমার কথাটা সে অবিকল শুনতে পাবে ! এখন বুঝতে পারছ বিদ্যুতের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। ধাতু-নির্ম্মিত তার এই বিদ্যুতের বাহন, তাই তারের দরকার।"

ব্যাঙ লাফায়—জলে ঢেউ ওঠে

অনেক দিন ধরিয়া অনুর মনে একটা প্রশ্ন কেবলই উঁকি মারিতেছিল—আজ সুযোগ পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু মামাবাবু রেডিওর সঙ্গে তো অন্য কোথারও তারের যোগ নেই শুনি, তা হ'লে তা'র গান বাতাসে ভেসে আসে কেমন ক'রে ?"

—"বৈজ্ঞানিকের এক অদ্ভুত আবিষ্কার এই রেডিও। রেডিও চলে বিনাতারে, আর টেলিফোনের জন্যে তারের দরকার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকে জানত যে, বিনাতারে কখনও বিদ্যুৎ যাতায়াত করতে পারে না। কিন্তু একজন বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন যে, বাতাসে ইথর ব'লে এমন একটা অদৃশ্য বস্তু আছে, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা করতে পারে। তারই ফলে বেতারে আজ রেডিওর গান শোনা যায়। বেতারে এখান থেকে দেশ-বিদেশে টেলিগ্রাফ করা যায়। বেশি কি, একজন

লোক আকাশে এরোপ্লেনে চ'ড়ে বাড়িতে তার মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে দিব্যি গল্প করতে পারে।"

কথায় কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল। কাহারও সেদিকে খেয়াল নাই। গল্প আরও কিছুক্ষণ চলিতে পারিত, কিন্তু রাস্তার দিক হইতে ডাক শোনা গেল—"বাবু……"

"ডাক শুনতে পাচ্ছ? ওঠো এবার, গাড়ি বোধ হয় সারান হ'য়ে গেছে।" বলিয়া মণ্টুর বাবা অনু ও মণ্টুকে লইয়া গাড়ির দিকে চলিলেন।

আবার শব্দ আসিল,—"বাবু……"

মণ্টু চেঁচাইয়া জবাব দিল,—"যাচ্ছি ঠাকুর, শুনতে পেয়েছি।"

অনু বলিল,—"ঠাকুর ডাকছে বুঝি? ডাকছে তো পাঁড়েজি?"

মণ্টুর বাবা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা পঞ্চাশ গজ দূরের আওয়াজ চিনতে পারলে না। আর সেদিন একটা কুকুর ন' হাজার মাইল দূর থেকে তার প্রভুর গলার আওয়াজ শুনে আনন্দে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠেছিল।"

"ন' হাজার মাইল দূর থেকে?" মণ্টু আর অনু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

—"হ্যাঁ, তাও আবার বেতার টেলিফোনে।"

—"বেতার টেলিফোনে?"

"হ্যাঁ, চল যেতে যেতে গল্পটা বলছি।"—বলিয়া মণ্টুর বাবা গল্প ধরিলেন,—"তোমরা ভূগোলে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরের কথা নিশ্চয় পড়েছ।"

—"হ্যাঁ বাবা, ফিলাডেল্‌ফিয়া আমেরিকার একটি শহর।"

—"আর মেলবোর্ণ?"

পাছে মণ্টু আগে বলিয়া ফেলে তাই, এবার অনু তাড়াতাড়ি বলিল,—"অস্‌ট্রেলিয়ায় মামাবাবু।"

—"মেলবোর্ণ থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া ন' হাজার মাইল। মেলবোর্ণে কেলভিন রোজার্স নামে একটি ছেলে থাকে—বয়স তার তোমাদেরই মত হবে। ছেলেটি এখন কেমন ক'রে একটি পেরেক খেয়ে ফেলেছিল। সেই পেরেক গিয়ে আটকেছিল তার ফুসফুসে। সাংঘাতিক কথা! পেরেক্ ফুটেছে ফুসফুসে। অস্ত্র ক'রে তাড়াতাড়ি বের করতে না পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। রোজার্সের বাবার ভারি ভাবনা হ'ল। শেষে তিনি

বন্ধুদের পরামর্শে ছেলেকে পাঠালেন ফিলাডেল্‌ফিয়ার একটা প্রসিদ্ধ হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তাররা নাকি কাটা ফোঁড়ায় খুব ওস্তাদ।”

মণ্টু বলিল,—“তা'র বাবাও সঙ্গে গেলেন তো?”

—“না, ছেলে একলাই গেল। তবে তার বাবা তাকে ব'লে দিলেন—অপারেসন হওয়ার পর একটু সুস্থ হ'লেই যেন সে টেলিফোনে খবর

দেয়। যতক্ষণ না তার আরোগ্য সংবাদ পাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি উদ্বিগ্ন থাক-বেন। সেখানে পৌঁছুতেই ডাক্তাররা কাটাকুটি ক'রে তার ফুসফুসের কাঁটা বের ক'রে দিলেন—কয়েকদিনের মধ্যেই রোজার্স সুস্থ হ'য়ে গেল।

যেদিন কথা বলতে পারলে—সেই দিনই সে বাবাকে টেলিফোনে খবর দিলে। ছেলে ভাল হয়েছে শুনে বাবা খুসি হ'লেন। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে আর এক বিপদ! রোজার্সের একটি আদরের কুকুর আছে, তাকে সে সঙ্গে নিতে পারে নি। কুকুরটার আবার এমনি অভ্যাস যে প্রভুর কাছ ছাড়া হ'য়ে একদণ্ডও থাকতে চায় না। ক'দিন রোজার্সকে না দেখে সে খাওয়া

দাওয়া বন্ধ ক'রে বসল। রোজার্স খবর পেয়ে বাবাকে বল্লে,—'বাবা, ফোনটা একবার ওর কানে ধর।'

ফোন ধরা হ'ল। রোজার্স বল্লে,—'হ্যাল্লো পাপি, কেমন আছিস রে?'

কুকুরটা এতদিন মন-মরা হ'য়ে ছিল। প্রভুর গলার আওয়াজ শুনে সে উৎফুল্ল হ'য়ে জবাব দিল,—'ঘেউ ঘেউ।'

রোজার্স বল্লে,—'আমি শিগগিরই যাচ্ছি, ভাবিস নে।'

পাপি জবাব দিল,—'ঘেউ ঘেউ।' ”

—“মামা বাবু ওদিকে নয়—এই যে এদিকে আমাদের গাড়ী।” প্রিয়ব্রতবাবু গল্প করিতে করিতে অন্য দিকে ফিরিতেছিলেন, অনুর কথা শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন গাড়ীর কাছেই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। ড্রাইভার তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই স্টার্ট দিল।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ৩২শে আষাঢ় শেষরাত্রে পাটনা ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে বিহিটার নিকট যে ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা অনেকেরই জানা আছে।

ছোট একটি পুলের উপর এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এঞ্জিন এবং কয়েকখানা গাড়ী একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কত যে মৃতদেহ পড়িয়া ছিল তার ঠিকানা নাই। এইস্থানে বহু গহনা, কাপড় ও টাকাপয়সা পাওয়া গিয়াছে। ধ্বংসস্তূপের নীচ হইতে মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া পাটনা ষ্টেশনে আনিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখনকার সে করুণ দৃশ্য দেখিয়া অনেকে অভিভূত হইয়াছিলেন।

কাহারও হাত-পা নাই, কাহারও মাথা নাই, কেবল দেহটি আছে—কাহারও হাত, মুখ থেৎলাইয়া গিয়াছে! কেহ ধূলি-ধূসরিত, রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে! মৃত মাতার বুকের উপর তাহার শিশু সন্তানও মরিয়া আছে। হয়ত ছোট শিশুটি বাঁচিয়া আছে, মাতাপিতা মারা গিয়াছে। আহতদের যখন পাটনায় চিকিৎসার জন্য আনা হয় তখন পাটনা সহর তাহাদের আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

এই দুর্ঘটনায় বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী মারা গিয়াছে। পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই সময় আহতদের শুশ্রূষা করা ও মৃতদেহ

দুর্ঘটনার পরের দৃশ্য

সৎকার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেন। এইরূপ ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা খুব কমই হইয়াছে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১২৬ জন এবং আহতদের সংখ্যাও বহু।

শ্রীমতী যূথিকা দাস

কান-কথা

আমরা যদি দুই কানে দুই হাত বেশ জোর ক'রে চাপা দি—যাতে বাইরের আর কোনও শব্দ শুন্‌তে না পাওয়া যায়—তা হ'লে সকলেই কানের ভিতর একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুন্‌তে পাই।

কানে চাপা দিলে তো বাইরের কোনও শব্দ শুন্‌তে না পাওয়ারই কথা। একেবারে নিঃশব্দ, নীরব, নিঝুম হওয়াই তো উচিত, কিন্তু তা না হ'য়ে হয় একটা অবিরাম সোঁ সোঁ শব্দ। তাও একঘেয়ে নয়, তারও মাঝে একটা অপরূপ সামঞ্জস্য আছে। তা কেমন ক'রে হয়?

সেই কথাই আজ কিছু কিছু বুঝাবার চেষ্টা করব। আমরা জানি যে, সর্দ্দি হ'লে নাক বন্ধ হয়—নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না; সঙ্গে সঙ্গে কানও বন্ধ হ'য়ে যায়—কোনও শব্দ, কথাবার্ত্তা ভাল রকম শুনতে পাওয়া যায় না। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের গালের কষ বরাবর একটি বায়ুপথ আছে, তা আমাদের কর্ণপটহের ভিতরের দিকে সংযুক্ত আছে, নাকের সঙ্গেও সে-পথের যোগ আছে।

যখন সর্দ্দি হয় তখন অতিরিক্ত শ্লেষ্মায় নাক বুজে থাকে। সেই সঙ্গে উপরি উক্ত বায়ুপথের মুখও শ্লেষ্মায় বুজে যায়। তাই দেহের অন্তঃস্থ উত্তাপে বায়ুপথের মধ্যে যে বায়ু থাকে তা প্রসারিত হ'য়ে যায়। সেজন্য তা'র চাপও বেড়ে যায়; কাজেই কর্ণপটহের বাইরের দিকের চাপ কম আর ভিতরের দিকের চাপ বেশী হ'য়ে থাকে। তাতেই কানের শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হ'য়ে থাকে।

যখন কানের উপর হাত চাপা দেওয়া যায়, তখন সেটা পর্দার মতই হ'য়ে থাকে। সেই পর্দা ভেদ ক'রে বাইরের কোনও শব্দ ভিতরে ঢুকতেই পারে না। আমরা জানি যে—শব্দ বায়ুর তরঙ্গ মাত্র। যখন কোনও বস্তুতে ঘা দেওয়া হয় তখন সেই বস্তুই আঘাতের ফলে দুলে দুলে উঠে; সেই দোলায় বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। ঐ তরঙ্গের কিয়দংশ যখন কর্ণপটহে ঘা দেয়, তখনই আমাদের সেই শব্দের অনুভূতি হয়।
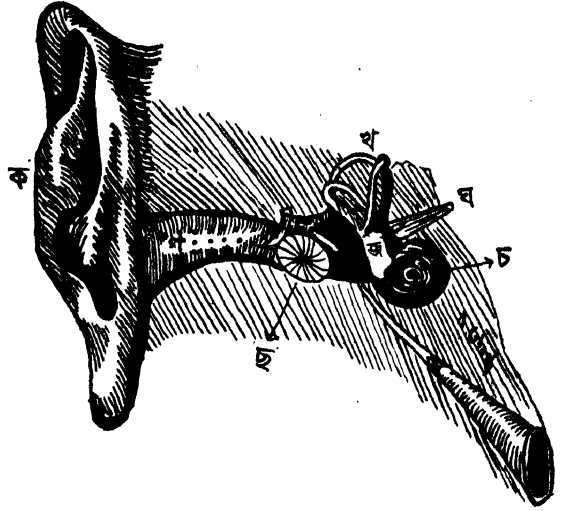
ক—কর্ণপুট; খ—ল্যাবিরিন্থ (Labirinth); গ—কর্ণকুহর; ঘ—নার্ভরজ্জু; চ—শঙ্খচক্র; ছ—কর্ণপটহ; জ—কর্ণমধ্যস্থ তরল পদার্থ; ঝ—বায়ুনলী।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য ক'রে দেখে থাকবেন যে, একটুকরা কোনও হাল্‌কা জিনিস,—যেমন শোলা কিংবা গাছের পাতা জলের উপরে ভাসছে; সেই জলে—খানিকটা দূরে—যদি একটা লাঠি ডুবিয়ে সেটাকে উপর থেকে নীচে আর নীচে থেকে উপরের দিকে নেড়ে ঢেউয়ের সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে গাছের পাতাটি ঢেউএর সঙ্গে দূরে চ'লে না

গিয়ে—একই জায়গায় থেকে একবার নীচ থেকে উপরের দিকে আবার উপর থেকে নীচের দিকে উঠা-নামা করতে থাক্‌বে। সেই রকম, শব্দ হ'লেও বায়ুরাশি শোলা বা পাতার মত দূরে চ'লে যায় না। কেবল বায়ু-মধ্যস্থ অণুর ঘনীভবন আর প্রসারণটাই পর পর চ'লে যায়, অর্থাৎ একটা ঘনীভবন (Compression) আর তার পাশেই একটা সম্প্রসারণ (rarification) পর পর চ'লে যায়। তা'তে একই স্থানের বায়ুর চাপ একবার বাড়ে আর তার পর মুহূর্তেই কমে। এইভাবেই শব্দ-তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে চ'লে যায়। তাই যখন বন্দুক ছোঁড়া বা অন্য কোনও বিস্ফোরণের জন্য কোনও প্রচণ্ড শব্দ হয় তখন কাছাকাছি হারিকেন বা অন্য কোনও কেরোসিনের আলো থাক্‌লে তা একবার উজ্জ্বল ভাবে জ্ব'লেই দপ ক'রে নিভে যায়।

এখন কানে হাত চাপা দিয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি এই ঢেউগুলোর পথ রোধ কর্‌লেও যে একটু-আধটু ফাঁক থাকে তা'র ভিতর দিয়ে সেই ঘনীভবন ও সম্প্রসারণের ক্রিয়া চল্‌তে থাকে; অর্থাৎ যখন বায়ুর চাপ বাড়ে তখন কিছু বায়ু যায় ভিতরের দিকে ঢুকে, আর যখন সম্প্রসারণের জন্য চাপ কমে তখন অতিরিক্ত বায়ু বাইরে চ'লে আসে। এদিকে হাতের চাপে কর্ণপটহের ভিতরের বায়ুচাপেরও তারতম্য ঘটে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে বোধ হয়, সকলেই দেখেছেন যে, খেলার পর যখন ফুটবলের ব্লাডারের নলের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, বা সাইকেলের ভাল্‌ভ্‌-টিউবের ঢাকনির প্যাঁচ খুলে দেওয়া হয়, তখন একটা সোঁ সোঁ শব্দ হয়। ঐরূপ হবার কারণ হচ্ছে যে, অতিরিক্ত চাপের বায়ু যখন ছাড়া পায় তখন উহা বেরোবার সময় বাইরের বায়ুর সঙ্গে একটা ঘষড়া খেয়ে যায়। তাতেই সোঁ সোঁ আওয়াজ হয়। আমাদের কানের উপর চাপা হাতের একটু-আধটু ফাঁক থাকে, তারই ভিতর দিয়ে বায়ু যাতায়াত কর্‌বার সময় ঠিক এই ভাবেই সোঁ সোঁ শব্দ হয়—আর তা নানান্‌ শব্দের সমবায় ব'লে এই শব্দেও একটা অপরূপ সুরের সৃষ্টি হয়।

যদি তুলো দিয়ে কানের বিঁধটা খুব ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে ঐ শব্দও শোনা যাবে না—একেবারে বদ্ধ কালার মতই হ'তে হবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র পাল, বি.এস্‌-সি

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

সারা ভারতে সব চেয়ে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে কলিকাতার আই, এফ, এ শীল্ড; তারপরই বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ আর সিমলার ডুরাণ্ড্ কাপ প্রতিযোগিতার স্থান। আই, এফ, এ শীল্ড খেলার সময় কলিকাতার মাঠে যে কি ভীড় হয় আর যে কি ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা যায়, তা তোমরা অনেকে হয়তো দেখেছ। আর যারা দেখ নি তা'রা খবরের কাগজে প'ড়েছ অথবা শুনেছ। আই, এফ্, এ শীল্ডের হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলে সারা জুলাই মাস ভ'রে। তারপর আগষ্ট মাসে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলার ধূম লেগে যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডুরাণ্ড্ খেলা চল্‌তে থাক্‌বে, তবে কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা যায়, সিমলায় ততটা হয় না।

তোমরা বোধ হয় জান যে, সৈনিকদের টীমগুলোকে ইংরাজীতে 'মিলিটারি টীম' বলে, অন্য দলগুলোকে 'সিভিল্ টীম' বলে। আই, এফ্, এ শীল্ড বহুবার সিভিল্ টীমের হস্তগত হ'য়েছে,—যেমন ক্যাল্‌কাটা, ডাল্‌হৌসি, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং; কিন্তু এতদিন রোভার্স কাপ শুধু মিলিটারি টীমগুলোই পেয়ে আসছিল। খুব জোরালো সিভিল টীম বহুবার খেলেছে এবং ভালই খেলেছে বটে, কিন্তু কাপ পাওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। ভারতীয় দলের মধ্যে মোহনবাগানই বোম্বাইয়ের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথমে ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু ডারহাম্‌সের কাছে হেরে গিয়ে আমাদের নিরাশ করে। তারপর থেকে ভারতীয় দল ফাইনালেই যেতে পারে নি।

এবারে রোভার্স কাপের খেলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। এবারের ফাইনাল অবধি কোন মিলিটারি টীমই যেতে পারে নি। এবারকার আই, এফ্, এ শীল্ড বিজয়ী ষষ্ঠ ব্রিগ্রেড দল কলিকাতার অল্ রেডস্ দলের কাছে হেরে যাওয়ায় সেমি-ফাইনালেও উঠতে পারে নি। কলিকাতা থেকে তিনটি দল বোম্বাইয়ে গিয়েছিল,—একটি মহামেডান স্পোর্টিং, আর একটি 'অল্ রেডস্' আর তৃতীয়টি 'অল্ ব্লুজ্'। শেষোক্ত দল দু'টি বেশীর ভাগ নানান্ দলের বাছাই করা সাহেবদের নিয়ে গঠিত, অবশ্য দু'-তিনজন

বাঙ্গালী খেলোয়াড়রাও ছিলেন। আর একটি বিখ্যাত সিভিল টীম এই খেলায় যোগ দিয়েছিল। এই টীমটির নাম 'বাঙ্গালোর মুস্‌লিম্‌স্‌'। এই মুস্‌লিম্‌ টীমটিতে কয়েকটি হিন্দু খেলোয়াড়ও ছিলেন। এবার মহামেডান স্পোর্টিং কয়েকটি বিশেষ জোরালো দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল—যেমন, সমার্‌সেট্‌ ও অল্‌ রেডস্‌। বাঙ্গালোরের দল 'চেশায়ার্‌' সৈনিক দলকে যখন হারিয়ে ফাইনালে উঠল, তখনই অনেকে ধারণা করেছিল যে, এই দলই হয়তো রোভার্স কাপ বিজয়ী হবে, কারণ সারা বছরে কোন খেলায় চেশায়ার্‌ আর হারে নি। এবার সর্ব্বপ্রথমে রোভার্সে দুইটি সিভিল্‌ টীম ফাইনালে খেল্‌লে এবং দুইটিই মুসলমান টীম। এ একটা অদ্ভুত রেকর্ড! ৩১শে আগষ্ট ফাইনাল খেলা হয়েছে এবং বাঙ্গালোরের দল মহামেডান স্পোর্টিংকে এক গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতা চল্‌ছে। এতকাল পরে একটি ভারতীয় সিভিল্‌ টীম এই অভূতপূর্ব্ব সম্মান লাভ কর্‌লে। মহামেডান স্পোর্টিং গেল বারে সেমি-ফাইনালে এবং এবারে ফাইনালে খেলেছে, সুতরাং তাঁদের গৌরব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাঙ্গালোর দলের দু'জন খেলোয়াড় তোমাদের পরিচিত। এই খেলোয়াড় দু'টি কলিকাতার প্রথম ডিভিসন লীগে ইষ্ট বেঙ্গল টীমে খেলে গেছেন; এদের নাম মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লীগ খেলায় মহামেডান স্পোর্টিংকে এঁরাই চার গোল দিয়েছিলেন। রোভার্স কাপ ফাইনালেও লক্ষ্মীনারায়ণ মহামেডান স্পোর্টিংকে একটি গোল দিয়ে তাঁর নিজের দলকে জয়ের মুকুট পরালেন।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

নীলাচল

উত্তরদাতাদিগের নাম

শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা; ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়, সিঙ্গারকোন; বিদ্যাদ্রিশেখর দে, ১৫৭০৪ নং গ্রাহক; তারক, মানু, উমা ও পাচু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামনগর; বৈদ্যনাথ দে, বর্দ্ধমান; অরুণা, সুবীর ও অমিতা মুখোপাধ্যায়, জামসেদপুর; রামকিঙ্কর, শিবকিঙ্কর, শ্যামাপদ, কালীপদ, সূর্য্যকান্ত ও সুধীর, মাহুলিয়া; সুবু, লীলু, গুচু ও নিলু, মধুপুর; সন্ধ্যা ও মহীতোষ সেন, রাঁচি; সমরেন্দ্র, মনা, ফণী, কালু, শিশির, কমলা, বিজলী, পরেশ ও তপন, চক্রধরপুর; সুনীলচন্দ্র সেন, কলিকাতা; হরিপদ, মুকুল, পীলু, বীণা, মীরা ও বিদ্যুৎ, স্বামীবাগ-ঢাকা; শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ, খুলনা; প্রজ্ঞা, প্রভা, প্রমা, পূরবী, পদ্মা, পরমা, প্রবীণ, প্রবুদ্ধ ও প্রকৃতি, বেতিয়া; আরতি, প্রণতি,

মিনতি, তৃপ্তি, নীলিমা, প্রতিমা, সপ্তম্ন ও অরুণ মজুমদার, কাঁথি; মিস্ মণীষা সরকার, পুরুলিয়া; অশনি, রণেশ, অমল, গণেশ ও শেফালি মন্দিরের সভ্যবৃন্দ, কুচবিহার; পলাশ, অমিতা, শিবানী, রাণু, মান্নু, সুরুচি, অমিয়া, ছবি, টুলু, সলিল, মীরা, মলয়, অনাদি, বীণা, ও খুকু, রাজসাহী; অরুণ, অমু, টগর, কালু, মেঘা, বিশু, ভুলন ও বিনয়, কুচবিহার; সুহাসচন্দ্র ঘোষ ও তকাই, কলিকাতা; হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেহালা; শ্রীমতী ছায়া গুপ্তা, শিলং; শম্ভু ও গৌরী, ১২০২৩ নং গ্রাহক; লক্ষ্মী, শ্যাম, বীরু ও মায়া, পাটনা; কল্যাণী ব্যানার্জ্জি, রঙ্গপুর; জীমুৎবাহন রায়, ধলভূমগড়; অজিৎ, সুজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, হরগৌরী, কামিনী, নগেন ও বিরাজ, কুচবিহার; মণ্টু, নাণ্টু ও তপু, ময়মনসিংহ; শান্তিপুর কাশ্যপপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাবৃন্দ; অরুণা মিত্র, মাগুরা; কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর; আশা, দুলালী, অজিৎ, ময়মনসিংহ; অসীমাসুন্দরী মিত্র, জব্বলপুর; রত্নমালা, ও জয়ন্ত পাল, পলাশস্থল কলিয়ারী; সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩৩৭৩ নং গ্রাহক; সত্যব্রত ঘোষ দস্তিদার, জলপাইগুড়ি; অচ্যুতানন্দ প্রামাণিক, ১৫৮৮৬ নং গ্রাহক; প্রকাশ, সুভাষ, ইন্দু, ধানবাদ; হারুগোপাল, মেপাল, রবীন, মন্মথ ও প্রফুল্ল, গারুলিয়া; অমিয়কুমার পাল, শ্রীরামপুর; রেণু, মুকুল, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দন, সাধন, গায়ত্রী, বিজন, পাপিয়া, কানন, বারহাট্টা; সত্যরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, রহমৎপুর; রথীন্দ্র, রমা, মীরা, খুকু ও রেখা, ডিব্রুগড়; নরেশচন্দ্র আচার্য্য-ভাদুড়ী, কলিকাতা; প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, রাজসাহী; ছোটন, রামু, পারুল, গীতা, গায়ত্রী, রাজা, খোকা ও সন্ন্যাসী, রঙ্গপুর; দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১৬৩১৭ নং গ্রাহক।

চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ, রবি ও লীলা, কল্যান্দী—নোয়াখালী; মধু, টুসি, বুড়ি, নেড়ু, বুটি, তৃপ্তি, সুনীল, অজয়, মৃগকল্যাণ; রাখাল, প্রমথেশ, মণ্টু, স্যাণ্ডো, রণ্টু, রঞ্জু, মঞ্জু ও অঞ্জু, ছাতক; রাণু, পিণ্টু, বুবু, ডিব্রুগড়; প্রবীরকুমার ও সুনীলবরণ রায়, ২৩ নং গ্রাহক; সুলতিকা পাল, করিমগঞ্জ; সুশান্তকুমার চৌধুরী, ফরিদপুর; অশোক, অঞ্জু, অর্চ্চনা, ও অতসী, পাবনা; শচীন, বরুণ, তরুণ ও মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত, ডিব্রুগড়; সমর ও লীলা দত্ত, গৌহাটী; বামাপ্রসাদ ও রাধারমণ ভট্টাচার্য্য, শিলং; আশীষ ও মণি, রাঁচি; মিস্ জেবুন্নেছা খাতুন, বগুড়া; অমলা ঘোষ, রাজসাহী; মনোজমোহন বক্সী, কুচবিহার; মনা, তারা, হেনা, মনসা ভদ্র, আলিপুরদুয়ার; শঙ্করী, প্রতিমা, অর্পণা, মিনু ও শক্তিপ্রসাদ, বাঁকিপুর; মোহাম্মদ আবদার রহিম, বাঁকুড়া; বিশ্বেশ্বর, সন্তোষ, অজিৎ, শৈলজা, সুধাংশু, সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ, মালদহ; বিনয়ভূষণ চন্দ্র, কটক; বীণাপাণি, পীযূষরাণী, শম্ভু, বাসু, ভোলা ও কল্যাণী, হাইলাকান্দি; গৌরকৃষ্ণ ও দীনবন্ধু প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ; গোপীচাঁদ, মানু, রমা, টুকী, কেষ্টা, লণ্টু, কিষণচাঁদ, ও সুধীরকুমার বর্ম্মন, ১৫৯৭৮ নং গ্রাহক; সুশান্ত ঘোষ, সম্বলপুর; ভোলানাথ জানা, মেদিনীপুর; রতুলচরণ ব্যানার্জ্জি, পাটনা; মোল্লা নাছিরুল হক্, বর্দ্ধমান; শান্তিরাণী, প্রীতিরাণী, অরুণ, বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, মহেশখুণ্ট; মণীন্দ্রনাথ গুহ, হুগলী; খুদু, দুলু, সোণা ও আদু, করকেন্দ কলিয়ারী; কল্যাণী ও অরুণা গুপ্ত, স্বর্ণাসন—পাটনা; কুমারী অনিমা ও আরতি ঘোষ, বীরভূম; গিনি, টুলি, বেলা, রুনী, কচি ও নবী, রাজারামপুর; রেণুকা, অশোকা, অনিমা, নীলিমা ও রমেন্দু, সাহাবাদ; কৃষ্ণা, অমূল্য, খুকু, নিভা ও মাষ্টার গুহ, নবগ্রাম; ভালু, ফেলু, খোকা, দীপালু, দিব্যেন্দু, কণা, মনা ও পচি, মুক্তাগাছা; সুনীলকুমার আঢ্য, ৭৯৬৬ নং গ্রাহক; নন্দদুলাল পাল, মেদিনীপুর; ধ্রুব, মাধুরী, কানু, সাম্য, খোকা, ও তুতু, ১৬১৪৯ নং গ্রাহক; সামসুদ্দিন মামুদ, সৈয়দ আব্দুল লতিফ, পাংসা।

বড় খোকা, গোপাল, বেলু, টুলু, কানু, গৌরী, মৌরী, পিণ্টে ও মিণ্টে, ডিব্রুগড়; সুনীল, সলিল, পুতুল, কামনা, মৃণাল, বরিশাল; কুমারী পার্ব্বতী, সর্ব্বাণী, শিবানী, সতীরাণী, বাণী, ছবিরাণী, খুকুমণি, গৌহাটী; দেবপ্রসাদ, জ্যোতিপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ, অনাথনাথ ও মদনমোহন, বেহালা; অজিৎ, অশোক, শোভা, নির্ম্মল, অনিল, সুধাংশু, পিনাক্, পরিতোষ, প্রীতি, শান্তিশ ও সুকুমার, যশোহর; রমেন্দ্র, ১১৭৮৬ নং গ্রাহক; গোবর্দ্ধন সঙ্গীত

ও সাহিত্য সমাজের সভ্যবৃন্দ, সালিখা : অমূল্য, বীণা, খুকী, গনি, যতীন, অতুল, বিমল, মতিয়ার, হামিদুর, মোজাফফর, গোলমুণ্ডা ; রাজসাহী, পি, এন, গার্লস্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ ; সাবি, লক্ষ্মী, সতী, দুর্গা, করুণা ও রেণু মৈত্র, রাজসাহী ; প্রফুল্লবন্ধু হালদার, ১৫২৪২ নং গ্রাহক ; নির্ম্মলকান্তি চাটার্জ্জি, নোয়াখালী ; প্রফুল্ল, রাজেন্দ্র, সর্ব্বানন্দ, মেদিনীপুর ; অরবিন্দ, শরৎ, গোবিন্দ, মুঙ্গের : তরুণকুমার দত্ত, নিউ দিল্লী, ভূপালপ্রসাদ, কলিকাতা ; কুমারী মুকুলা মুখার্জ্জি, ফরতাবাদ ; রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ডিব্রুগড় ; অশোকচন্দ্র মজুমদার, যাদবপুর কলোনি ; অসীমা বসু, কলিকাতা ; অরুণকুমার দাসগুপ্ত, কলিকাতা ; প্রমথ, মঙ্গল, সমু, দামু, আন্নু ও অনাদি, ধানবাদ ; অনিল, পতু, লীলা ও অরুণ, প্রিয়নগর—নদীয়া ; অমলেন্দু, বিমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু, মৃণালেন্দু, প্রবোধেন্দু, মিলনেন্দু, অরুণেন্দু, বীরেন ঘোষাল, বর্দ্ধমান ; বিশ্বরাণী, জয়া, ভবানী, কল্যাণী, বাণী, গৌরী, রেবা, মুকুল, সোমনাথ, ভোলানাথ ও নীলমণি ১১৫৪৩ নং গ্রাহক ; প্রণবেন্দু, অরবেন্দু, দিব্যেন্দু, কমলেন্দু, অমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু, অর্দ্ধেন্দু, বেলারাণী, নীলারাণী, বীণাপাণি, মিনুরাণী, দেবরাণী ও মাষ্টার সুশীল, হরিহরপুর ; কুমারী আরতি, অঞ্জলী, অনিমা ও অনিল সেন, ১৫৯১৩ নং গ্রাহক।

দ্বিজেন, সরযূ, অমল, অবন্তি, অজিৎ, ভূপেন, রাধা, বেনু ও টালু, কোড়কদী : সিতাংশু রায়, ১৪১৩১ নং গ্রাহক ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, শালিখা ; দাশরথি, বিজয় চাটার্জ্জি, নলহাটী ; কুমারী কমল দত্ত, কলিকাতা ; মনোমোহন দাশবর্ম্মা, সুভড্যা—ঢাকা ; সত্যেশচন্দ্র সান্যাল, কুষ্টিয়া ; গোপীচাঁদ মাড়োয়ারী, বর্দ্ধমান ; শৈলেন, অপূর্ব্ব, খুকু, ডলী ও মিলি, ডিব্রুগড় ; অনিল, অনিমা ও গীতা, শ্রীরামপুর ; নীলাদ্রিপতি বসু, কলিকাতা ; সুকুমার, করুণা, সত্য, কল্যাণ, বীণা, মাধুরী, রেণু, রেখা, রেবা, পূর্ণিমা ও জ্যোতির্ম্ময়ী, ডিব্রুগড় ; মনোজমোহন সান্যাল, পূর্ণিয়া ; পশুপতি, অনিল ও শান্তি, সেনগ্রাম ; বংশীধর ও মনোহরপ্রসাদ, কৃষ্ণনগর ; বদ্রু ও শম্ভু, কৃষ্ণনগর ; সলিলকুমার ও অরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নেত্রকোণা ; তৃপ্তি, পূর্ণিমা, পটল, শ্যাম, নীলিমা, জয়া, রমনা—ঢাকা ; মুকুট দত্ত, ঢাকা ; কমলা বসু, রাঁচি ; অবনীমোহন ঘোষ, চাঁদনীচক্, কটক ; কুমারী লিলি ও রেখা মুখোপাধ্যায়, যোধপুর ; কুমারী গীতা দেবী, মালদহ ; বৈদ্যনাথ দাস, ১৫৩৪৩ নং গ্রাহক ; শচী, অরুণা, বাসন্তী, মৈত্রেয়ী ও তৃপ্তি, ঢাকা ; অমিতা, ইলা, আরতি ও প্রণতি, আনিসাবাদ ; সুনীলকুমার, অনিলকুমার, সলিলকুমার, ছায়া, ইলা, মানসী, রবীন, সত্য, শ্যামা, রণজিৎ ও সাধু, চন্দননগর ; রবীন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র, আরতি ও বেকো, মধুবাণী ; গুরুদাস, প্রতাপ, গোবিন্দ, কমলা, কল্যাণী, শিবানী সরস্বতী দেবী, হাওড়া ; করুণাময়ী মল্লিক, কলিকাতা ; বকুল, মুকুল, রেবা, জুলু, বুলবুল, বাণী ও বেলু, ফরিদপুর ; নীলিমা, মেন্নী, বলু, ধলু, আলু ও তপু, মুঙ্গের ; মণিকা, ইলা, অবলা, কল্যাণ, অরুণ, শঙ্কর বসু, কলিকাতা ; প্রতাপ, পাঁচুগোপাল, ও কালীদাস, শ্যামনগর ; নুরুল ইস্‌লাম ও চিত্তরঞ্জন সাহা, হরিনারায়ণপুর ; কুমারী মণীষা গুপ্তা, কলিকাতা ; সুজাতা ও বাসন্তী, লক্ষ্মীকান্তপুর ; কুমারী গৌরী গোস্বামী, শ্রীরামপুর ; শৈলেন, শচীন, আরতি, দিলু, ডাকু, অমি, লীলু, সুধীন, কল্যাণী, বাণী, যূথিকা, শেফালি ও অলকা, ধানবাদ ; বনলতা গোস্বামী, বেতিয়া ; মণি, সুধীন, মৃণাল ও শান্তি, পুরুলিয়া ; রুবী মজুমদার, জামসেদপুর ; মঞ্জুরী সেন, দিল্লী ; কুমারী চামেলিকা ব্যানার্জ্জি, বারাকপুর ; ১৬০১৩ নং গ্রাহক ; প্রাণবন্ধু পাল ও সেখ মোহাম্মদ আলী, এনায়েৎপুর এম, ই, স্কুল ; বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাউড়া ; দেবপ্রসাদ চৌধুরী, নেপাল ; সুনীলেন্দু ঘোষ, ১৫৭৭১ নং গ্রাহক ; হরিশকুমার দত্ত, মাগুড়া ; শিবকালী রায়, খড়দহ ; অতুল, সংগ্রাম, অমলা ও খুকু, ডিব্রুগড় ; কল্যাণী, ননী ও নির্ম্মল গুপ্ত, ভোলা ; শান্তচরণ, বীণা, অনিমা, কানু, কলিকাতা ; মীরা ঘোষ ও সত্যব্রত ঘোষ, কালীঘাট—কলিকাতা ; মাধবী দত্ত, কলিকাতা ; সুনীলকুমার সাহা, বাজিতপুর ; প্রফুল্ল, শঙ্কর, বিশু, বুটু, যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, রাঁচি ; ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ভূতেশ্বর, রাধেশ, গীতা, বিষ্ণু, প্রহ্লাদ, বীরেন, দুর্গা, বিমলা, ইন্দু ও কিরণবালা দেবী, মাণিকচক্ ; জগন্নাথ বিশ্বাস, আলিপুরদুয়ার ; প্রিয়ব্রত ব্যানার্জ্জি, বালীচক্ ; সেখ আঞ্জু মিঞা, লাল মিয়া, ময়না, বসির, কনক, ছাতক ; কনক ও মানসী দেবী, আগরতলা ; নীলিমা মণিমোহন, মলিনা, নারাণ, শিতু, বলাই, সুন্তা ও তুনি, মেদিনীপুর ; রমাপতি, শান্তিরাম ও অমলেন্দু চাটার্জ্জি, বাটানগর।

দ্রষ্টব্য—কার্ত্তিক মাসের শিশুসাথী ১৫ই আশ্বিন বাহির হইবে।

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ অবশিষ্ট ছয় মাসের মূল্য ১৲ টাকা **৮ই আশ্বিনের** মধ্যে পাঠাইবেন।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press ;
5, College Square, Calcutta.

আবিষ্কার করা হ'ল—তাদের রঘুদা নাকি নিজে নিজে তৃতীয় ভাগ শেষ ক'রেছে! আর কি রঘুদার রক্ষা আছে! কেউ এসে বলে—"আমার খাতায় নাম লিখে দিতে হবে —রঘুদা।" কেউ বলে—"আমার বইয়ে।" সে এক বিরাট ব্যাপার। সেদিন সে বেচারী খুব মুস্কিলেই পড়েছিল।

তবু কি নিস্তার আছে রঘুদার। নাম লিখ্‌তে লিখ্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে—তখন সবাই যে যার বাড়ী ফিরেছে। যাদের নাম রঘুদা সেদিন লিখে দিতে পারে নি, পরের দিন আবার তা'রা সবাই এসে রঘুদাকে ধর্‌ল। রঘুরামের একটু অসুবিধে হ'লেও, এ-সবকে সে গ্রাহ্যের ভিতরেই আনে না। ছেলেদের সব আব্দারই রঘুদার কাছে মঞ্জুর। কোন দিন কোন ছেলে তা'র উপর রঘুদাকে একটুও রাগ কর্‌তে দেখে নি। ছেলেদের ঝগড়াঝাটি হ'লে তা'র মীমাংসা কর্‌ত তাদের রঘুদা। রঘুদা যেমন ছেলেদের আব্দার রাখ্‌ত, ছেলেরাও আবার তা'র সব কথাই মেনে চল্‌ত। রঘুরাম ছেলেদের যেমন ভালবাস্‌ত, তা'রাও তা'র চাইতে তা'কে কম ভালবাস্‌ত না।

রঘুরামকে সে-বার শ্রাবণ মাসে জ্বরে ধর্‌ল। বাদাম বিক্রী ক'রে ফের্‌বার পথে একদিন খুব বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সময় রঘুরাম এক মাঠ দিয়ে আস্‌ছিল। প্রকাণ্ড আধ-মাইল লম্বা মাঠ, তা'র মধ্যে কোন বাড়ী-ঘর নেই। কাজেই সারা মাঠ বৃষ্টিতে ভিজা ছাড়া তা'র আর কোন উপায় ছিল না—মাঠ পেরোলে তবে তো ঘর-দোর মিল্‌বে? বৃষ্টিতে ভিজার ফলে পরের দিনই রঘুরামকে রাক্ষুসে জ্বরে পেয়ে বস্‌ল। সে কি ভীষণ জ্বর!

রঘুদার জ্বর হ'য়েছে, সবাই ব্যস্ত। গাঁয়ের সব লোক চাঁদা ক'রে টাকা তুলে সহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সব চেষ্টাই হ'ল ব্যর্থ। তিন দিনের দিন সবাইকে ছেড়ে রঘুরাম স্বর্গে চ'লে গেল। গাঁয়ের লোকদের সেদিন আর দুঃখের সীমা নেই; পাঠশালার ছেলেরা তো সবাই কেঁদে কেঁদেই অস্থির।

রঘুরাম মারা যাবার পর তা'র জিনিস-পত্র ঘাট্‌তে ঘাট্‌তে, বাক্সে একটা উইল পাওয়া গিয়েছে—আর তা'র হাতের লেখা একটা চিঠি। উইলে রঘুদা তা'র সারা জীবনের বাদাম বিক্রী করা ছ' হাজার টাকা 'রাজপুর পাঠশালা'র নামে দিয়ে গিয়েছে।

আর একটা সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার—চিঠিটায় সে তা'র পরিচয় লিখে গিয়েছে—যে পরিচয় আগে সে কাউকে জান্‌তে দিত না।

রঘুদার চিঠিতে লেখা ছিল—"আমার বাড়ী মুঙ্গের সহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা গাঁয়ে। আমার এক ছেলে ছিল, ছু-বছর বয়সে তা'র মা মারা যায়। ছেলের লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। কিন্তু, আমি ছিলাম গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে গরীব। সকলের কাছে সাহায্য চেয়েও কিছু জোগাড় কর্‌তে পেতাম না। আমার ছেলে যে-বার পাঠশালা ছেড়ে বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, সে-বার কিছুতেই আমি তা'র বইয়ের টাকা জোগাড় কর্‌তে পারি নি। এর মধ্যে আমার এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ আসে। ছেলের হ'ল টাইফয়েড জ্বর। সে জ্বরের ভিতর বেহুঁস অবস্থায় 'বই দাও' 'বই কিনে দাও' ব'লে চীৎকার কর্‌ত। আমি গরীব, বই কিন্‌তেই পাই নি টাকা—এত বড় অসুখে ওষুধ জোগাবার টাকা পা'ব কোত্থেকে! ভাল চিকিৎসার অভাবে ছেলেটি মারা যায়। তখন আমার আর দেশ ভাল লাগ্‌ছিল না, চ'লে এলাম বাংলা মুলুকে। সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তার পর থেকেই এই রাজপুর গাঁয়েই এতদিন কাটিয়েছি। আমার ছেলে বইয়ের জন্য কত কেঁদেছে। তাই আমার ছ' হাজার টাকার ছু' হাজার টাকা রাখ্‌তে হবে জমানো। যদি কোন ছেলে বইয়ের অভাবে কষ্ট পায়, সেই টাকা থেকে তা'কে বই কিনে দিতে হবে। আর এই পাঠশালাকে যাতে আরও খুব ভাল করা হয় সেজন্য থাক্‌ল চার হাজার।"

বাদাম বিক্রী ক'রে অত টাকা জমিয়ে গিয়েছে তা'দের রঘুদা—সবাই তো একেবারে অবাক্! তার পর সবাই ঠিক কর্‌ল রঘুদাকে তা'রা কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বে না। সবাই মিলে ঠিক কর্‌ল যে, আজ থেকে 'রাজপুর পাঠশালা' নাম বদ্‌লে দিয়ে পাঠশালার নাম রাখা হবে **রঘুরাম-পাঠশালা**। গাঁয়ের লোকেরা রঘুদার টাকা দিয়ে পাঠশালার কত উন্নতি ক'রেছে। পাঠশালার দেওয়ালেও রঘুদার একটা বড় ফটো টাঙ্গিয়ে রেখেছে। যে এখন গাঁয়ে আসে সে-ই রঘুদার গুণের কথা শুনে ধন্য ধন্য করে!

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

কি ও কেন?

গাছে পাতা হয় কেন?

সবুজ পাতার শ্যামল শোভায় তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তোমরা জান কি সবুজ পাতা না থাকিলে জীব-জগতের আহার বন্ধ হইয়া যাইত—খাইতে না পাইয়া তুমি, আমি, সারা পৃথিবীর পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা সকলেই মরিয়া যাইত? পৃথিবী জীবশূন্য হইত? কথাটা তোমরা বিশ্বাস করিলে না!

আমাদের আহার্য্য চা'ল, দাল, আটা, ময়দা, তরিতরকারি প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষভাবে গাছ হইতে সংগ্রহ করি। দুধ, ঘি প্রভৃতি গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ হইতে পাই; কিন্তু তাহারা গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদিগকে ভুসি, ঘাস, খৈল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাওয়াইলে তবে দুধ দেয়। মাছ, মাংস প্রভৃতি যাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা আহার সংগ্রহ করি, তাহারাও হয় তৃণভোজী, আর না হয় মাংসাশী। মাংসাশী প্রাণীরাও আবার তৃণভোজী প্রাণী হত্যা করিয়াই তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। অন্যান্য জীবজন্তুর আহার সংগ্রহের বিষয়েও এই একই ব্যবস্থা। তাহা হইলে দেখা গেল—সমস্ত প্রাণি-জগৎ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গাছপালার নিকট হইতেই তাহাদের আহার্য্য বস্তু পাইয়া থাকে।

পাতা

গাছপালা এই খাদ্য কোথায় এবং কি প্রকারে তৈয়ার করে? তৈয়ার করে সবুজ পাতায়। গাছের খাদ্য-দ্রব্য মাটিতে ও বাতাসে থাকে। মাটি হইতে শিকড়ের সাহায্যে জলীয় অবস্থায় খাদ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া গাছ তাহাকে পাতায় আনে। গাছ বাতাস হইতে কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস শোষণ করিয়া পাতার ভিতর টানিয়া লয়। তাহার জন্য পাতার ত্বকে লক্ষ লক্ষ প্রবেশ-পথ আছে। প্রত্যেকটি প্রবেশ-পথে একটি করিয়া দরজা, দরজায় দুইটি পাল্লা। গাছ ইচ্ছা করিলেই পাল্লা দুইটি ভেজাইয়া প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রাত্রে পথগুলি সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে।

পাতার ভিতরে অসংখ্য কোষ (Cell) আছে; সেই কোষগুলি দ্বারা পাতা নির্ম্মিত। কোষের ভিতর থাকে অসংখ্য সবুজ-কণিকা। সবুজ-কণিকার সবুজবর্ণের জন্য পাতা দেখিতে সবুজ। কণিকাগুলি প্রাণবস্তুর (Protoplasm) অংশবিশেষ, আর সবুজবর্ণকে ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ বলে। পত্র-হরিতের ক্ষমতা অদ্ভুত। সূর্য্যকিরণ যখন সবুজ পাতার উপর পতিত হয়, তখন তাহার লোহিত-রশ্মি (red rays) পত্র-হরিৎ শোষণ করিয়া ধরিয়া রাখে। সূর্য্যকিরণের সাতটি রশ্মির প্রধানতঃ এই লোহিত-রশ্মির জন্যই আমরা রৌদ্রে উত্তাপ অনুভব করি। উত্তাপ, শক্তির (energy) একপ্রকার বিকাশ।

গাছ মাটি হইতে শোষিত জল ও বাতাস হইতে গৃহীত কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগ সংঘটিত করিয়া শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু এই রাসায়নিক সংযোগ করিতে যে শক্তির দরকার তাহা গাছ পায় কোথায়? ক্লোরোফিলের সাহায্যে সবুজ-কণিকা সূর্য্যকিরণ হইতে এই শক্তি আহরণ করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে অজৈব খাদ্যদ্রব্য হইতে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা একমাত্র সবুজ পাতারই আছে, অন্য কাহারও নাই। অবশ্য গাছের অন্যান্য সবুজ অংশেও কিয়ৎপরিমাণে এই খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনিক খাদ্য প্রস্তুতের সহিত তুলনা করিলে—
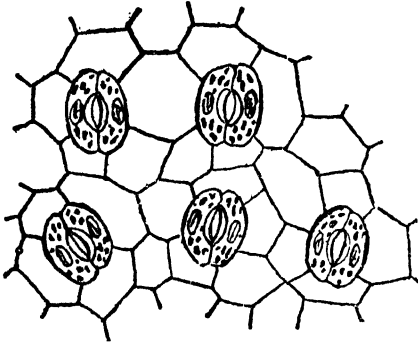
পাতায় গ্যাস প্রবেশের পথ

সবুজ পাতা—রান্নাঘর

সবুজ-কণিকা—পাচক ঠাকুর

ক্লোরোফিল—দেশলাই

সূর্য্যকিরণ—রান্নার আগুন

পত্র-ছিদ্র—রান্নাঘরের দরজা, যাহার ভিতর দিয়া কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড ও অক্সিজেন যাতায়াত করে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি.

নাসিকা-প্রদর্শনী

পড়্‌ল সাড়া জীব-জগতে প্রদর্শনী নাসিকার,
আকার এবং কাজে-কর্ম্মে নাকের হবে গুণ বিচার।
হস্তীভায়ার লম্বা নাক, পড়্‌ল তাহার প্রথম ডাক,
'সবার সেরা নাক কি হাতীর ?' তর্ক বিষম তীব্রতর,
সভাপতি কর্‌ল তা'রে অনেক ভোটাভোটির পর।
প্রদর্শনীর দ্বারে তখন ব'সে কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ,
দর্শনীয় নাকধারীকেই করেন শুধু আবাহন :—
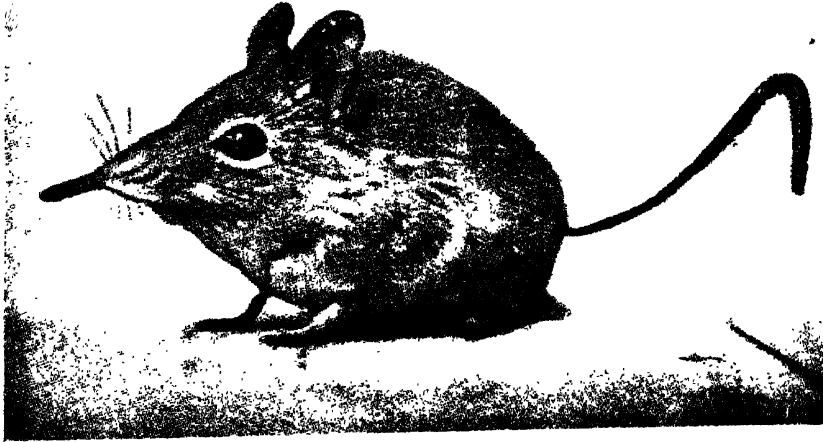
হাতীছুঁচো

"হেন নাক হেন দেহে কভু নাহি ভুলা যায়,
লাটিমের ফলা যেন লাটিমেতে শোভা পায়।
নাম ধাম মহাশয়, ব'লে যান নাহি ভয়,
হউক না আকার ছোট, তাতে কিবা আসে যায়,
এমন সুগন্ধ দেহে প্রাণ রাখা হ'ল দায় !"

"আফ্রিকাতে করি বাস মনেরি আনন্দে,
জগজনে চিনে মোরে আমারই সুগন্ধে।
হাতীছুঁচো (১) নাম ধরি, লাফে লাফে চলিফিরি,
তবে আমি ঢুকে পড়ি কি বলেন মহাশয় ?"
"যান যান ঢুকে যান কোন কিছু নাহি ভয়।

কোএলা

ঘাম দিয়ে জ্বর গেল শ্বাস নিয়ে বাঁচি হায়,
গাছের আগাতে থাকি ও আবার কে চেঁচায় ?"
"নাম মোর কোএলা (২) জেনে নাও পহেলা,
দেখে নাও বেশ ক'রে নাক মোর একবার,
অনুমতি দিয়ে দাও, নয় করি চীৎকার।"

(১) হাতীছুঁচো (Elephant shrew)। (২) কোএলা (Koala)—অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বাংশে বাস করে। সু-উচ্চ ইউকেলিপ্‌টাস্ গাছের আগাতেই উহাদিগকে বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। দিবাভাগের অধিকাংশ সময়েই উহারা ঘুমাইয়া কাটায়। উহারা কদাচিৎ ভূমিতে নামিয়া থাকে এবং একটু বিরক্ত হইলেই ভয়ানক চীৎকার করে।

"তাই ত দুঃখের কথা! কে আপনি কিবা চান?
সুগঠিত নাক বটে,—বাঁকা যেন ধনুখান!"
"তিব্বতের পূব দিকে বড় জোর চ্যায়না,
আমাদের মাঝে কেহ আর কোথা যায় না।
শুনি আমি যাকে তাকে, খাঁদানাক (১) বলি ডাকে,
পরিচিত এই নামে হ'য়ে গেছি আমি তাই।"
"যান যান ঢুকে যান আপনার হবে ঠাঁই।...

খাঁদানাক বানর

কে আপনি কোথা ঘর সিংহ-নাসা মহাশয়,
মুখ, তাও মানুষের—দর্শনীয় মোটেই নয়।"
"সাদামাথা (২) সাকি নাম, আমেরিকা মোর ধাম,
মানুষের মত মুখ—তাও নয় সুগঠন!
ভেবে দেখ একবার ভেবে দেখ সুধীগণ!"

(১) খাঁদানাক বানর (Snub-nosed monkey) তিব্বতের পূর্ব্বভাগে ও চীনদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।
(২) সাদামাথা সাকি (White-headed Saki) দক্ষিণ আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়।

হেনকালে গেল শোনা পশুরাজের হুঙ্কার,
গরজনে সারা বন হ'য়ে গেল তোলপাড়।
"পালা পালা নাক নিয়ে পালা তোরা সকলে
তা' না হ'লে নাক সাথে প্রাণ যাবে অকালে।"

সাদামাথা সাকি

"পালা পালা" উঠে রব চারিদিকে কোলাহল,
একি হ'ল অকস্মাৎ—ঘটিল কি অমঙ্গল!
ভল্লুক উঠিল গাছে,
শূকর ধাইল পাছে;
খুঁজিছে শূকর ভয়ে কোথা আছে কাদা-জল,
প্রদর্শনী ভেঙ্গে গেল—পলাইল পশুদল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

দক্ষিণা

বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে বেদ নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর এক ভক্তিমান্ ও সেবা-তৎপর শিষ্য ছিলেন—নাম উতঙ্ক।

দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে থেকে উতঙ্ক সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লেন। গুরু তাঁকে ডেকে বললেন—"বৎস, তোমার সকল বিদ্যা শেষ হয়েছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ে তুমি অসীম জ্ঞান লাভ করেছ। যাও, এবার তুমি গৃহস্থ হ'য়ে সৎপথে থেকে সংসারধর্ম পালন কর।"

উতঙ্ক গুরুকে প্রণাম ক'রে বললেন—"গুরুদেব, আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। গুরুগৃহ ত্যাগ করবার পূর্বে শ্রীচরণে কিছু দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বলুন কিসে আপনার তৃপ্তি হবে ?"

ব্রাহ্মণের তো কোন অভাবই ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কি যে চাইবেন কিছুই ভেবে পেলেন না—অথচ কিছু দক্ষিণা না নিলে উতঙ্ক খুশী হয় না। শিষ্যের মনে দুঃখ দেন কি ক'রে ?

শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে বললেন—"দেখ উতঙ্ক, আমার নিজের তো কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই। তবে ব্রাহ্মণীর হয়তো কিছু অভিলাষ থাকতে পারে। তুমি বরং তাঁর কাছেই যাও। তিনি যা চাইবেন তাই দিও। তাঁর সন্তোষেই আমার সন্তোষ।

গুরুপত্নীকে প্রণাম ক'রে…

উতঙ্ক তখন গিয়ে গুরুপত্নীকে প্রণাম ক'রে সব কথা জানালেন। তিনি সব শুনে বললেন—"বৎস, তুমি যদি নিতান্তই কিছু দিতে চাও তো বলি। আজ থেকে

তিন দিন পরে আমার একটি ব্রত আছে। ব্রতের দিন কয়েকজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে চাই। আমার ভারী ইচ্ছে হয় যে, রাজা পৌষ্যের মহিষীর কানে যে দুটি কুণ্ডল আছে সেই দুটি প'রে ব্রাহ্মণদের পাতে অন্ন পরিবেষণ করি।"

"জননীর অভিলাষ যা'তে অপূর্ণ না থাকে—সেবক তা'র চেষ্টার ত্রুটি করবে না।" এই ব'লে গুরুভক্ত শিষ্য সেই মুহূর্তেই পৌষ্যের রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন।

—২—

রাজা পৌষ্য প্রাতঃকালে পাত্রমিত্র নিয়ে রাজসভায় ব'সে রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। ছত্রধর মাথায় ধ'রে আছে রাজচ্ছত্র। সিংহাসনের দুই পাশে দণ্ডধর—তাদের হাতে স্বর্ণ-দণ্ড। সভার সাজসজ্জা দেখে মনে হয়—যেন ইন্দ্রসভা! সোনারূপায় মণি-মাণিক্যে চারদিক জ্বল-জ্বল করছে।

হঠাৎ প্রতিহারী প্রবেশ ক'রে জানালে—বেদ-শিষ্য উতঙ্ক মহারাজের দর্শন-প্রার্থী।

উপাধ্যায় বেদ পৌষ্যের পুরোহিত। তাঁর শিষ্য এসেছেন। আশ্রমের সব মঙ্গল তো! রাজা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন; পরক্ষণেই বললেন—"যাও, এই মুহূর্তেই তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস।"

উতঙ্ক রাজসভায় প্রবেশ ক'রে হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—"মহারাজের জয় হোক!"

রাজা করযোড়ে অভিবাদন ক'রে আশ্রমের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। উতঙ্ক বললেন—"মহারাজের সু-শাসনে আশ্রম এবং আশ্রমবাসীর সমূহ মঙ্গল। যাগ-যজ্ঞ নির্বিঘ্নে চলছে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় গুরু শিষ্য সকলেরই দিন কাটছে পরম আনন্দে।"

"আশ্রমের কুশল জেনে নিশ্চিন্ত হ'লাম; কিন্তু আপনার আগমনের কারণ তো এখনও জানতে পারলাম না। গুরুদেবের কোন আদেশ আছে কি?"—পৌষ্য উৎকণ্ঠিত-ভাবে প্রশ্ন করলেন।

—"না মহারাজ, গুরুদেবের কোন আদেশ নেই, তবে তাঁর শিষ্যের এক প্রার্থনা আছে। আশা করি, বিমুখ হ'ব না।"

—"পৌষ্য জীবিত থাকতে নয়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদই এ রাজ্যের অবলম্বন। বলুন,

কি আপনার প্রার্থনা। ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য, ভূসম্পত্তি—বলুন কি দিয়ে আপনার সন্তোষ বিধান করব!"

—"মহারাজ, ব্রাহ্মণের ভিক্ষা অতি সামান্য। তা'ও গুরুদক্ষিণার জন্য।"

—"আমার পরম সৌভাগ্য। দানের এমন সার্থকতা অল্পই ঘটে। বলুন, বলুন কি চাই আপনার? সমস্ত রাজকোষ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছি—যা চাই নিন আপনি।"—এই ব'লে পৌষ্য ধনাধ্যক্ষের দিকে চেয়ে ডাক দিলেন—"ভাণ্ডারী!"

উতঙ্ক ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"না মহারাজ, ভাণ্ডারীকে ডাকার প্রয়োজন নেই। আমার প্রার্থিত বস্তু আপনার ভাণ্ডারে তো নেই।"

"ভাণ্ডারে নেই! তবে, কোথায় আছে?"—রাজা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন উতঙ্ক সব কথা খুলে বললেন। রাজা শুনে বললেন—"ওঃ এই কথা! তা' এর জন্যে চিন্তা কি?"

তারপর প্রতিহারীকে ডেকে উতঙ্ককে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন—আর ব'লে দিলেন যে, উতঙ্ক যেন রাণীকে সব কথা ব'লে নিজেই তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রার্থনা করেন। রাণী এমন উপযুক্ত পাত্রকে কখনও বিফল-মনোরথ করবেন না!

রাণী ছিলেন বড় পুণ্যবতী। সকালে দেবপূজা না ক'রে তিনি অন্য কোন কাজ করতেন না। উতঙ্ক যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, রাণী তখন সবে পূজা সেরে উঠেছেন। তাঁর স্নিগ্ধ ললাটে সিঁদূরের টিপ নবোদিত সূর্যের মত অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। লাল পট্টবস্ত্রের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কয়েক গুচ্ছ এলোচুল; মনে হচ্ছিল যেন আলোয় আঁধারে মেশা উষা-লক্ষ্মী দেখা দিলেন উদয়াচলের চূড়ায়।

দেবার্চনার অবসানে ব্রাহ্মণকে দেখে রাণী প্রীত হ'লেন। এমন সময়ে, এমন অতিথি দৈবে মিলে। তিনি ব্রাহ্মণকে পরম-সমাদরে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত ক'রে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, উতঙ্ক গুরু-দক্ষিণা দেবেন ব'লে তাঁর কানের কুণ্ডল দুটির জন্যই এতদূর এসেছেন, তখন আনন্দের সঙ্গেই সে দুটি খুলে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

উতঙ্ক যখন আশীর্বাদ ক'রে রাণীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবেন তখন রাণীর একটা কথা মনে পড়ল। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন—"শুনুন ব্রাহ্মণ, একটা কথা ব'লে দি-

এই কুণ্ডল দুটির প্রতি অনেক দিন আগে থেকেই নাগরাজ তক্ষকের বড় লোভ আছে। পথে সাবধানে যাবেন।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাণী। এই কুণ্ডল দুটি এখন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। আমার প্রাণ না নিয়ে কেউ একে হরণ করতে পারবে না।" এই ব'লে ত্বরিত-পদে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

একদিন একরাত্রি ধ'রে চলেছেন উতঙ্ক। পথে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম করেন নি। গুরুপত্নীর ব্রতচর্যার দিন না পৌঁছতে পারলে এত পরিশ্রম সব নিষ্ফল হবে যে। উতঙ্কের মনে এখন এক চিন্তা—কখন তিনি আশ্রমে পৌঁছে গুরুপত্নীর হাতে কুণ্ডল দুটি দেন।

চলতে চলতে রাত্রি প্রভাত হ'ল। উতঙ্ক দেখলেন পথের পাশে এক সরোবর। দেখে তিনি ভাবলেন—এইখানেই স্নান-আহ্নিকটা সেরে নেওয়া যাক্। ব্রাহ্মণের ছেলে স্নান-আহ্নিক না ক'রে তো আর জল খেতে পারেন না। অথচ তৃষ্ণায় তাঁর গলা তখন শুকিয়ে এসেছিল। পরিশ্রমে তাঁর সমস্ত শরীর হ'য়ে পড়েছিল অবশ; স্নান করলে ক্লান্তি দূর হবে অনেকটা।

সরোবরের ঘাট পাথরে বাঁধান। তারই একটা সিঁড়ির উপরে কুণ্ডল দুটি এবং হাতের লাঠি গাছটি অতিসন্তর্পণে রেখে উতঙ্ক নামলেন জলে। কেউ কোথাও ছিল না, কেবল একজন সন্ন্যাসী স্নান সেরে ঘাটের এক পাশে ব'সে জপ করছিলেন। তাঁকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই ভেবে উতঙ্ক নিশ্চিন্ত-মনে জলে নেমে ডুব দিলেন। ডুব দিয়ে উঠেই দেখেন সন্ন্যাসী জপ তপ ছেড়ে কুণ্ডল দুটি নিয়ে পালাচ্ছে!

উতঙ্ক তো ব্যাপার দেখে অবাক্। তিনি ভেবেছিলেন লোকটা সত্যিই সাধু—এখন বুঝলেন একটা ভণ্ড। কিন্তু ভাবনা-চিন্তার সময় ছিল না। সন্ন্যাসী তখন রীতিমত দৌড়তে আরম্ভ করেছে। উতঙ্ক আর কি করেন? তিনিও আর কোন উপায় না দেখে জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে লাঠি গাছটি তুলে নিয়ে, ভিজে কাপড়েই তার পিছনে ছুটতে লাগলেন।

সন্ন্যাসীও ছোটে আর উতঙ্কও ছোটেন। ছুটতে ছুটতে অনেকখানি পথ গিয়ে সন্ন্যাসী শেষে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল—উতঙ্ক তখন তাকে ধ'রে ফেললেন। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। উতঙ্ক দেখলেন কোথায় বা সন্ন্যাসী আর কোথায়

বা কি—তাঁর হাতে ধরা রয়েছে প্রকাণ্ড এক সাপ! দেখেই অমনি ভয়ে দিলেন ছেড়ে। ছাড়া পেয়েই সাপটা ঢুকে পড়ল একটা গর্ত্তে।

উতঙ্কও তার পিছনে পিছনে গর্ত্তে ঢুকবেন ভাবলেন। কিন্তু গর্ত্তের মুখটা এত ছোট যে মানুষের পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। তাই দেখে হাতের লাঠি দিয়ে গর্ত্তের মুখটা খুঁড়ে চওড়া ক'রে ঢুকলেন তার মধ্যে। ঢুকে বুঝলেন সেটা একটা সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ ধ'রে ধ'রে চলতে চলতে শেষে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন এক নূতন রাজ্যে।

তেমন দেশ উতঙ্ক কখনও দেখেন নি। বড় বড় রাজপথ, হুপাশে সারি সারি অট্টালিকা, পণ্যশালায় রংবেরঙের রকমারি জিনিস রয়েছে সাজান। রূপার তৈরী বিচিত্র মন্দিরে সোনার চূড়া, রোদ লেগে চোখ যেন ঝলসে দিচ্ছে। কিন্তু সে-দেশের অধিবাসী শুধু সাপ! নাগরাজ তক্ষক—যা'র কথা উতঙ্ক রাণীর কাছে শুনে-ছিলেন—এটা তাঁরই দেশ। উতঙ্ক বুঝলেন তাঁর কুণ্ডল নিয়েছে যে সন্ন্যাসী—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং নাগরাজ তক্ষক।

হাতে ধরা রয়েছে প্রকাণ্ড এক সাপ!

উতঙ্ক নাগরাজ্যে গিয়ে হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। তক্ষক নিয়েছেন কুণ্ডল। কেমন ক'রে তার হাত থেকে তা উদ্ধার করেন—এই কথা ভাবছেন এমন সময় উতঙ্ক দেখলেন একজন লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঁ'র দিকে আসছে।

সে-রাজ্যে মানুষ এই তিনি প্রথম দেখলেন! দেখে তাঁর একটু আশা হ'ল। সেই অশ্বারোহী কাছে এলে উতঙ্ক ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে নিজের বিপদের কথা ব'লে তার সাহায্য ভিক্ষা করলেন। গুরুভক্ত ব্রাহ্মণের সকল কথা শুনে তার খুব দয়া হ'ল। উতঙ্ককে বললে—"মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর।"

উতঙ্ক পর মুহূর্তেই দেখলেন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ তার ঘোড়াটা মুখ তুলে ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল। তার হ্রেষাধ্বনির সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সমস্ত নাগলোকে লেগেছে আগুন! কালো ধোঁয়ায় আকাশ হ'য়ে গেল অন্ধকার। একি কোন মায়াবীর যাদুমন্ত্র? উতঙ্ক অবাক্ হ'য়ে সেই আগুনের মধ্যেই রইলেন দাঁড়িয়ে। তাঁর গায়ে কিন্তু তাপ লাগ্‌ল না একটুও।

অশ্বারোহী জলদগম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলে—

এমন সময় রাজপথ থেকে কে যেন আর্ত-কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে সেইদিকে ছুটে আস্‌ছে আর বলছে "বাঁচাও বাঁচাও—ওগো সব গেল পুড়ে ছারখার হ'য়ে, বাঁচাও।"

অশ্বারোহী জলদ-গম্ভীর-কণ্ঠে জবাব দিল—"তোমার নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই করলে নাগরাজ। গুরুভক্ত ব্রাহ্মণের কুণ্ডল অপহরণ ক'রে তুমি যে পাপ করেছ, এ তা'রই শাস্তি।"

"ফিরিয়ে দিচ্ছি, ফিরিয়ে দিচ্ছি সে কুণ্ডল। এখুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি ব্রাহ্মণকে।"—বলতে বলতে এলেন তক্ষক, হাতে তাঁর সেই কুণ্ডল।

অশ্বারোহী বললে—"আচ্ছা, ফিরিয়ে নিলাম আমি আমার ধুম আর অগ্নি। আবার শান্তি ফিরে আসুক তোমার রাজ্যে।"

অমনি যেই কে সেই—আগুন গেল নিভে। আকাশের ধোঁয়া আকাশে গেল

মিশিয়ে—চারিদিক হ'য়ে গেল পরিষ্কার। ব্রাহ্মণের হাতে কুণ্ডল ফিরিয়ে দিয়ে তক্ষক বললেন—"ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ।"

উতঙ্ক বললেন—"ক্ষমা চাওয়ার আগে যে ক্ষমা করতে না পারে সে ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য।" তারপর অশ্বারোহীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং তক্ষকের কাছে বিদায় নিয়ে উতঙ্ক তখনই বেরিয়ে পড়লেন গুরু-গৃহের উদ্দেশ্যে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

কন্যারত্ন

(১)

একটি মেয়ে **রতন**,—
পটের ছবির মতন।
নাই সাতে নাই পাঁচে কিছুর,
এক বিষয়ে চেতন—
মাছ না পেলে ভাতের পাতে
স্বামীর কাটে বেতন!

(২)

আর-এক মেয়ে **ভুষণ**,—
মেজাজখানি ভীষণ।
দৃষ্টিটুকু মিষ্টি এত—
'বাপ্!'—বলে খর-দূষণ!
বচনে হয় মা-মনসার
পেটের পিলে শোষণ!

(৩)

আর-এক মেয়ে **বাসনা**,—
নামটি শুধু যায় শোনা।
দেখাশুনার ধার ধারে না,
তাই তো করি কল্পনা—
কাকবরণী বিড়ালচোখী
কুঁজো পায়ে গোদ খোঁনা!

(৪)

বেশ মেয়েটি **রাধা**,—
দুই অক্ষরের ধাঁধা!
গড়ের মাঠের ব্যাঙের সুরে
স্বরটি গলার সাধা!
মন না ভুলায় এ মেয়ে যার,
আস্ত সে এক গাধা!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

আমাদের দুর্গোৎসব

আমাদের বাড়ীতে কত পুরুষ যাবত অবিচ্ছেদে দুর্গাপূজা চলিতেছে, বলা কঠিন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত কুলীন মধুমৈত্রেয়ের পুত্র গণপতি প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অগুরু-সিন্দুর নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র চতুর্ভুজ ন্যায়বাগীশের সময় হইতে দুর্গাপূজা চলিতেছে—বংশ-পরম্পরায় এরূপ কথা শুনা যায়। কেহ বলেন,—পুঠিয়ার রাজা রামচন্দ্রের সভাপণ্ডিত—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত ১৫৯০—১৬১০ শকের মধ্যে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত-লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের মত পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীর পূজাই আলোচনার যোগ্য। রাজা জমিদারের বাড়ীর পূজায় সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার নাই।

দুর্গাপূজার মত সার্ব্বজনীন আনন্দ-উৎসব বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। এই উৎসবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের আনন্দ, সকলের ব্যবসায়-বণিজ্য—সকলের মধ্যে এক বিরাট সাড়া। ইদানীং আমাদের দেশে সহর অঞ্চলে যে অসঙ্গত ভেদাভেদ, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, বা ছোট বড়র কথা উঠিয়াছে, তাহা কোন কালেও ছিল না, পল্লীগ্রামে এখনও নাই। দুর্গোৎসব, মহোৎসব, পুত্রোৎসব সকল উৎসবই সার্ব্বজনীন ছিল। কোন প্রশ্নও ছিল না,—কলহও ছিল না।

আমরা বাল্যকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত পূজার যে সার্ব্বজনীন আনন্দ দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

আষাঢ় মাস যাইতে যাইতেই দুর্গাপূজার কথা উঠে। যাঁহাদের বার্ষিকী পূজা—তাঁহারাও সেই সময় হইতেই আয়োজনে হস্তক্ষেপ করেন। বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজার অল্লাধিক যোগসূত্র রহিয়াছে।

কাঠামোর পাট তৈরী করে সূতার। নির্দ্দিষ্ট দিনে সূতার আসিয়া বাঁশ বা কাঠে খট্টা-বদ্ধ করিয়া গেল। পুরোহিত পূজা করিলেন,—দুর্গোৎসবের সূত্রপাত হইল।

হিন্দু মুসলমান—যাহার ঘরেই সম্ভব হয়—কলা, কাঁঠাল, মানকচু, কুমড়া প্রভৃতির ফরমাস পড়ে। পাঠা, মেষ, মহিষ প্রভৃতির বায়না হইয়া যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক ঢাক ঢোল বাজায়। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গ্রাম ও ব্যক্তি 'শাসন' আছে। তাহারা 'বায়না' লইয়া যায়। ঢুলী পাড়ায় রাত্রি-দিন বাজনার মহলা চলিতে থাকে।

নমঃশূদ্র পাড়ায় চাউল চিড়ার ফরমাস যায়। তাহাদের এত কাজের চাপ যে, রাত্রি ১১টা এবং শেষরাত্রি ৩টা হইতে আর তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না।

নমঃশূদ্রদের মধ্যে যাহারা তেলের ঘানি চালায় তাহারা তেলের বায়না পায়। কেহ কেহ ঢাক বাজায়—তাহারা ঢাক ঠিক ঠাক করে।

তিলি পাড়ায় তেলের ঘানি চলে। তাহারাও বায়না পায়। তখনও টিনের 'খাঁটী তৈল' আমাদের পাড়ায় পৌঁছায় নাই। কলুরাও বায়না লয়। তাহাদের ঘানি গরুতে টানে,—বড় বড় কারবার,—মস্ত মস্ত ব্যাপারী তা'রা।

যোগী পাড়ায় মাকুর ঠক্‌ঠকানি—সুতার কারবার, ছোট বড় কাপড়, গামোছা, সাড়ী প্রভৃতি পূজার বরাত ঢের। জোলাদেরও কাপড়ের বায়না চলে।

বাজারে বন্দরে বসাক ও সাহা মহাজনদের কাপড়ের দোকানই বেশী। তাহারা রকমারি কাপড় আনিয়া রাখে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও দোকান মালপত্রে ভর্ত্তি—পূজার বাজার!

পূজার বাড়ীতে কাঠামো বাঁধা হইতেছে। চাকর-বাকরেরা এ মাসে বেশ দু'পয়সা পায়। কেহ সুপারি গাছ কাটিয়া কাঠামোর কাঠি করিতেছে, কেহ বাঁশের বাখারি চাঁচিতেছে। পাটের সুতলী—কেহ বা বাড়ীতে করিতেছে, কেহ বাজারে "কপালী"দের নিকট সুত্‌লী, চট, থলে কিনিতেছে। কাঠামের চাটাই হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিক্রয় করে।

আচার্য্য অথবা কুমার মূর্ত্তি গড়িতেছে। উলুছন বা খড় দিয়া মূর্ত্তি বাঁধা হইল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনিমিষে সেই উলুখড়ের কাঠামো দেখিয়াই আনন্দে আটখানা এবং কোন্ কাঠামো কিরূপ হইয়াছে, তাহার দীর্ঘ বর্ণনা করিতে রত।

মালাকার-সম্প্রদায় ও আচার্য্যগণক-সম্প্রদায় শোলার সাজ, দেবীর হাতিয়ারপত্র (তখনও টিন দেশে আসে নাই) বানাইতেছে। সে সাজের কত বাহার—কত দাম! বহু সংখ্যক লোক সেই সাজ বিক্রী করিয়া পরিবার পালন করে। এখন অনেকে মাটির সাজ বানায়;—তাহাও অতি চমৎকার কারুকার্য্য-খচিত হয়।

প্রতিমার মাটি সংগ্রহ, মাটি ছানিয়া প্রস্তুত করা, তারপর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়ান। তখন ঘরে লোক আঁটে না। শুধু ছেলেমেয়েরা নয়—বুড়া-বুড়িরাও এসময় এক আধবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন।

এখন জার্ম্মেনী প্রতিমার রঙের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আগে আমরা পাটায় হরিতাল, নীল ঘসিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।

ধোপাদের কাজও বাড়িয়া যায়। পূজার বাড়ী নায়রী আসিয়া থাকে। পূজার আগে এক দফা ও পরে এক দফা কাপড় ধুইতে হয়। এসময় তা'রাও 'ইনাম বখ্‌শিশ্' পায়।

নাপিত, ধোপা, মালী, ঢুলীকে "গুয়া পান" দিয়া নিমন্ত্রণ জানাইতে হয়। ভূঁইমালী—বাড়ীঘর চাঁচিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করে; বলির হাঁড়িকাঠ পুঁতিয়া দেয়; বোধন অধিবাসের বেদী তৈরী করে। সে পায় বোধন অধিবাসের চাটাই বা মলুয়া, নৈবেদ্য, ঘট, গামোছা আর সপ্তমী পূজার বলির পাঠাটি।

দেবীর চৌকীর উপরে পাতা পাটী, সাড়ী, গালিচা, আসন—সেসব স্থতারের প্রাপ্য। দশমী দিন সে তা'র প্রাপ্য লইয়া যায়।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তের ভোজ্য (আমাদের দেশে সাড়ে বার সের চাউল ও বহু উপকরণ দেওয়ার রীতি *) প্রতিমা-নির্ম্মাতা প্রাপ্ত হন।

বারুইরা পান-ব্যবসায়ী। উহাদের পানের বায়না আগেই দেওয়া হয়। গোয়ালাগণ দই-এর বায়না লইয়া যায়।

তারপর **দুর্গাপূজার গ্রাম-সংস্কার**—পূজার বাড়ী—রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হইল। পুকুরের পানা তীরে জমায়েত হইল। সে সকল কাজে আগে পয়সা লাগিত না,—গায়ে মাখিবার তৈল, বার দুই জলপানির নারিকেল, চিড়ামুড়ি আর গুড় মাত্র দিতে হইত। চারিদিকের জঙ্গাল পরিষ্কার হইয়া যাইত।

গ্রামে পূজা,—পাড়ার সকল বাড়ীর ঘরের দেয়াল লেপা হইয়া গেল—ঘরের চাল ঝাড়া হইল। কাপড় চোপড় গরিবেরা সোডা সাজিমাটিতে এক রকম চলনসই করিয়া লইল। তারপর পূজার বাজারে অন্ততঃ ছেলেমেয়েদের কাপড় জামা জুতা না আনিলে হয় কি করিয়া! সকল বাড়ীতেই বিছানাপত্র একটু ফিটফাট করা হয়,—দু'জন আত্মীয়স্বজন বেড়াইতে আসিতে পারেন।

অন্দরেও তাই। পাড়ায় অনেক বাড়ীতেই নায়রীরা আসিয়া থাকেন। মেয়েরা বাপের বাড়ী আসিয়াছে—পূজা থাকুক আর না-ই থাকুক। নেয়েরা আসিয়া নায়ের ভাড়া সাব্যস্ত করিয়া নানা স্থানের নায়রী আনিতেছে। নদীতে খালে বিলে "নায়রীর শত নাও হয় ভাসমান।" মহা আনন্দ উৎসব।

দিনমজুরেরা রাত্রিদিনের চুক্তি লইয়াও কুলাইতে পারিতেছে না। এসকল ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের প্রশ্ন নাই। যে যাহা পারে, তা'র উপর সেই কাজের ভার। পুরাতন ঘর, ভাঙ্গা চাল, ভাঙ্গা বেড়া—এসকল চলনসই দুরস্ত করিতেই হয়।

আমাদের কথাই বলি,—গণপতি ঠাকুরের বংশ আজ অনেক অংশে বিভক্ত। তাই আমাদের বাড়ীতে বহুকাল পাঁচ হিস্যায় পাঁচ পূজা। কখন বা সাত আট পূজাও হয়। আমরা জ্ঞাতি গোষ্ঠিরা যে কোন জ্ঞাতিবাড়ী পূজা হউক তাহা—নিজের পূজা মনে করি। সকলে পরামর্শ করিয়া কে কোন্ বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিবে তাহা ঠিক করিয়া লই। বৌ-ঝি চাকর-বাকরও এ কয়দিন সে সকলের বাড়ী কাজ করে।

পূজার চাউল চিড়া যার-তার ঘরে হয়। এ সকল বড় নীতি-নিয়মে শুচিতা নিষ্ঠায় করিতে হয়। মুখে কাপড় বাঁধিয়া অনেকে চাউল চিড়া প্রস্তুত করেন, সে সময় শব্দ করা নিষেধ। পূজার

* ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে।

অন্যান্য সামগ্রী,—জলপানী—নাড়ু, তক্তি, গঙ্গাজলী, চিড়া, জিরা, সন্দেশ, বরফী—গ্রামের বিশিষ্ট প্রাচীনারা তৈয়ার করেন।

আমাদের পাশাপাশি কয়েকখানা গ্রামে বিশ-পঁচিশখানা পূজা। সুতরাং সব জিনিসেরই টানাটানি হইবার কথা। ভাঙ্গনীয়া গ্রামের দীননাথ নমঃদাসের পূজা খুব জাঁকালো; ঢাক ঢোল ইত্যাদির বেজায় আড়ম্বর। আমরা তাহার বাড়ী গিয়া সংবাদ লইতাম;—কি হয় না হয়,—কি বাকি ইত্যাদি। উমাকান্ত নাথ ও কালীকান্ত নাথের পূজার সব কিছু ষষ্ঠীর রাত্রিতে চোরে লইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া মস্থয়ার জমিদার নরেন্দ্রবাবু এবং আমাদের প্রাচীন কর্ত্তারা তা'র বাড়ী লোক পাঠাইয়া সব ঠিক করিয়া দিলেন। উমাকান্তের বরং বেশী ভালই হইল।

তায় তামাসার আয়োজনও তখন ছিল। জয়নাথ বহুরূপী—সপ্তমী দিন আসিয়া হাজির—এক সাজ লইয়া। সে লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশ-বারখানা গ্রামে "তামাসা" দেখাইয়া কিছু 'রুজি' করিত।

পরিচারক ব্রাহ্মণও কেহ কেহ রাখেন। সেই উপলক্ষ্যে তাহারাও কিছু পাইয়া যান। তা ছাড়া তাঁরা প্রত্যেক পূজার বাড়ীতে 'বার্ষিক' বিদায় আদায় করেন।

পূজার মাসেক আগেই দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজা-জমিদারগণের বাড়ীতে বার্ষিক আদায় করিতে যান। অনেক জমিদার বাড়ীতে বার্ষিক পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ বিদায়ের বিধান আছে।

শ্রীহট্টের চারণ কবি ভট্টেরা পাঞ্জাব মেইলের বেগে দেশ ভ্রমণ করিয়া কত ছড়া, কত গাথা, কত কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদের আনন্দ বিধান করেন। তাঁ'রা অতি নিরীহ, সুজন, মধুরভাষী; কিন্তু অসদ্ব্যবহার পাইলে উহাদের রচনায় 'শক্তিশেলে'র আবির্ভাব হয়। তাঁদের মুখে দেশের বহু সংবাদ পাওয়া যায়। উঁহারাও বার্ষিক বিদায় পাইয়া থাকেন।

প্রায় সকল বাড়ীতেই পূজার সময় উঠানে 'রচনা' ঝুলান হয়। নারিকেল, সুপারি, জম্বুরা (বাতাবীলেবু) তাল, কুমড়া, কলার কাঁদি পর্য্যন্ত এক বা দুই সারি করিয়া সাজান থাকে। নবমী পূজার পর সেগুলি প্রধানভাবে ঢুলীরা—তারপর অন্যান্য কর্ম্মীরা লুঠিয়া নেয়। সে অতি আনন্দ-জনক ব্যাপার হয়।

পূজার বাড়ীর ঘর-দুয়ার লেপা পোছা এক শ্রেণীর বৃদ্ধা মেয়েরাই করে। তা'রা সেজন্য কিছু বেতন পায় এবং এক একখানা কাপড় বখ্‌শিশ্‌ পায়।

তরিতরকারী কুটাও এক বিরাট ব্যাপার। দশ-বারখানা দা কাটারী লইয়া মেয়েরাই সে-কাজে লাগিয়া যান।

আলিপনা দেওয়া, জোকার দেওয়া, গীত গাওয়া প্রভৃতি আনন্দ উৎসবের কার্য্যও পাড়ার দশজনেই করিয়া থাকেন।

নবপত্রিকার নয়টি জিনিস, ফল-যুগল-শালিনী বিল্বশাখা, বিল্বপত্র সংগ্রহ আগের দিন চাইই। কেহ বা অতিরিক্ত সংগ্রহ রাখেন,—কি জানি যদি কেহ ঠেকে। বিলের পদ্মফুল সংগ্রহে কি

উৎসাহ! কেহ নৌকায় চড়িয়া, কেহ জলে দাঁড়াইয়া, কেহ কুঁদায় চড়িয়া, কেহ বা ভেলায় চড়িয়া—পদ্মফুল তুলিয়া থাকে।

বোধনের দিন সন্ধ্যাকালে দীননাথ লোক পাঠাইল, তাহার নবপত্রিকায় 'জয়ন্তী' পাওয়া যায় নাই। তাহাকে তখনই জয়ন্তী দেওয়া হইল।

সপ্তমীর সকালে চারিদিকে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে বিপুল উলুধ্বনি উঠিল। পূজা আরম্ভ হইল। গাঁ'য়ের, ভিন্ গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বৌ-ঝি দলে দলে আসিতেছে,—মণ্ডপ-দুয়ারে প্রণাম করিতেছে, প্রসাদ পাইতেছে,—যাইতেছে। যাহারা ভাগ্যবান—তাঁহারা সকলকেই ষোড়শ উপচারে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

সন্ধ্যার পর চারিদিকে আরতির বাদ্য ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল। আরতি শেষ হইবে রাত্রি ৯-১০টায়। তারপর গান বাজনা। বাবুদের বাড়ী কবিগান বেলা ৩টার সময় আরম্ভ হইয়া থাকে,—আরতির সময় কেবল বন্ধ থাকে ; আবার আরম্ভ হয়,—রাত্রি ১২টা-১টা পর্য্যন্ত চলে। কারও বাড়ী দুর্গাপুরাণ, কেহ বা যাত্রাগান দেন। বৈঠকী গান, সঙ্কীর্ত্তন—যার যেমন সুযোগ তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

নবমী পূজার তিথি লম্বা হইলে বলির আনন্দ—ঘটা করিয়া হয়। সকল বাড়ীর বাদ্যভাণ্ড একত্র জমায়েৎ করিয়া এক এক বাড়ীতে বলি হয়। শত শত লোক সে সময় আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইয়া উঠে।

দীননাথ জানাইল,—তাহার বাড়ী মহিষ বলি হইবে। সকলে সেখানে গেলেন। অমূল্য-বাবুদের হাঁড়িকাঠ ও খড়্গ আসিল। মহা হুলুস্থুল কাণ্ড—মহিষ বলি হইয়া গেল।

তারপর বসে গানের আসর। সেখানে আহূত, অনাহূত, রবাহূত, সকলের সমান অধিকার।

দশমী দিন পূজাশেষে সকলের পরামর্শ হইল—প্রতিমা নদীতে লইয়া যাইতে হইবে—কে কে কোন্ বাড়ীর প্রতিমা নিবে। নদীর তীরে বিরাট মেলা। বেতালের বিজয়া উৎসব দেশ-প্রসিদ্ধ।

বাড়ীর গৃহিণীরা প্রতিমার পায়ে ধান-দূর্ব্বা, টাকা, সোনা, ধান ছোঁয়াইলেন। দেবীর কপালে সিন্দুর দেওয়া হইল,—মুখে চিনি, দুধের সর—ছেঁচা পান দেওয়া হইল। ধানদূর্ব্বা, প্রদীপ, চামর, পাখার বাতাসে তাঁরা দেবীকে শুভযাত্রা করাইয়া দিলেন। ঢুলিরা 'চলন্ত' বাজনা বাজাইয়া চলিল,—সানাই করুণ গীতিকায় যাত্রামঙ্গল গায়িল,—মায়েরা জয়-জোকারে মা'কে উঠাইয়া দিলেন।

বেতালের নদীর ঘাটে কান পাতা দায়। ঢাক-ঢোলের সম্মিলিত বাদ্য, হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনি, বন্দুক, বোম্, হাউই, ঝাড়বাতির আলো—হৈ চৈ—সে এক বিপুল কাণ্ড কারখানা।

বিসর্জ্জনের পর যে যার ঘরে বিষাদের বাদ্য বাজাইয়া চলিলেন।

বাড়ীতে ধানদূর্ব্বা দিয়া গৃহলক্ষ্মীরা সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। যে যাহাকে পারে—পাদ-স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। কেহ মাথায়, কেহ বা মুখে চুম্বন করিল।

তারপর 'প্রশস্তি বন্দন'।

পূজা শেষ হইল। দীপান্বিতা পর্য্যন্ত জাতিবর্ণ ছোট বড় নির্ব্বিশেষে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ চলে; দোকানদারের বিজয়ার 'বৌনি' ইত্যাদি চলে।

পুরোহিতের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি,—কেহ ৪ দিন, কেহ ৯ দিন কেহ বা ১৩।১৪ দিন পরিশ্রম করেন। একবেলা চাট্টি আহার,—পূজা, চণ্ডীপাঠ, দুর্গানাম জপ—কত কিছু করিতে হয়। জগন্মাতা দেবীর আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া সকলে সম্বৎসরের জন্য পূজা শেষ করেন।

ইহাই আমাদের দুর্গোৎসব—পল্লীর আনন্দোৎসবের ধারা। হিন্দুর এই উৎসবে প্রত্যেক জাতি কোন না কোন প্রকারে উপকৃত—ইহাই যথার্থ জাতীয় এবং সার্ব্বজনীন উৎসব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাবিনোদ

নিয়তি

ফুটেছিল আজ সকালে যে ফুল
সাঁঝে সে পড়িল ঝ'রে,
রূপ রস গন্ধ ফুরা'ল সকলি,
কে বা তার খোঁজ করে?

শ্যামল ধরণী, সুনীল আকাশ,
উজ্জ্বল রবির কর,
প্রাতে ছিল সবই আপন তাহার—
দিন-শেষে হ'ল পর।

নিয়তির খেলা নিয়ত চ'লেছে
সমগ্র ধরণী জুড়ে,
বুঝি নে তা মোরা, বুঝিলে কি আর
মরি শোকানলে পুড়ে!

শ্রীমীরা বসু

আগমন

পড়িবার ঘরে বসিয়া মিণ্টু অঙ্ক কষিতেছিল, এমন সময় ননী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"বাবার চিঠি এসেছে,—হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় এবার তিনি পূজায় বাড়ী আস্‌তে পার্‌বেন না।"

মিণ্টু ননীর ছোট বোন্; বয়স—এই জ্যৈষ্ঠে নয় ছাড়াইয়া দশে পড়িয়াছে। ননী তা'র বড় ভাই—বয়স মাত্র বার।

কথাটা শুনিয়া মিণ্টুর মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। পূজার সময় কত কি করিবে বলিয়া সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া তা' এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গেল।

সংবাদটা ঠিক কিনা জানিবার জন্য শ্লেট পেন্‌সিল ফেলিয়া সে ছুটিয়া চলিল মায়ের কাছে। মা রান্নাঘরে ছিলেন। খবরটা পাইয়া অবধি তাঁহার মনও ভাল ছিল না। প্রথম স্বামীর অসুখের খবর—তারপর তাঁহার বাড়ী না আসার জন্য ছেলেমেয়ে দু'টোর আমোদ-আহ্লাদ সবই মাটি হইবে—সেই সব চিন্তায় তাঁহার মন ডুবিয়া ছিল। মিণ্টুর ডাকে চৈতন্য হইল। মিণ্টু বলিল—"মা, এবার নাকি বাবা বাড়ী আস্‌বেন না। তা হ'লে···!"

মিণ্টুর কথা শুনিয়া তাঁহার মা'র মন আরও খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"যাও এখন পড়্‌গে। তাঁর অসুখ, তিনি কি ক'রে আস্‌বেন?"

মিণ্টু বলিতে যাইতেছিল—'তা হ'লে আমাদের কাপড় জামা···।'

কথাটা শেষ হইতে পারিল না। শুধু 'কাপড় জামা' শুনিয়াই মা রুক্ষ মূর্ত্তি ধরিলেন; বলিলেন—"আদুরে মেয়েকে সোহাগ কর্‌তে তাঁকে অসুখ শরীরেও আস্‌তে হবে, না? এই ত তোমার কথা?"

বয়স অল্প হইলেও—ঐ বয়সেই সে অনেক কিছু বুঝিতে শিখিয়াছিল। সুতরাং সে আর কিছু না বলিয়া সরিয়া পড়িল; কিন্তু চোখ তাহার জলে ভরিয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার চোখেও জল আসিল, কিন্তু উপায় নাই।

মিণ্টু আর ননী ছু' ভাই বোনে সারাদিন খেলা-ধূলা ফেলিয়া শুধু ঐ এক কথারই আলোচনা করিল। সবার বাবা-ই বাড়ী আসিবে—শুধু তাহাদের বাবা এবার আসিবেন না। যাক্—বাবার অসুখ ভাল হইয়া ত যাক্ আগে। এই কথাটা বলিবার সময় তাহারা ছুইজনেই হাত যোড় করিয়া বলিল—"মা দুর্গা, বাবার অসুখ ভাল ক'রে দাও।" বলিতে বলিতে যুক্ত কর তাহারা মাথায় ঠেকাইল।

পরদিন ষষ্ঠী। ভোর হইতেই সোনার রোদে সমস্ত বাড়ী ভরিয়া গেল। মিণ্টুদের বাগানে এবার—গত পূজায় তাহার বাবার হাতে লাগান—স্থলপদ্মের গাছটায় ভারী সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছিল; শেফালীরা তলায় ঝরিয়া পড়িয়াও গন্ধ ছড়াইতেছিল; আর অপরাজিতা, অতসী ফুলের গাছগুলিও ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতেছিল। চারিদিকেই মায়ের আগমনীর সুর বাজিতেছে—আনন্দের প্রস্রবণ বহিতেছে। এক বৎসর পরে আজ মা আসিবেন। ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া বাবার কথা মনে পড়িতেই মিণ্টু ও ননীর মন আবার খারাপ হইয়া গেল।

ছুপুর কাটিয়া গেল। যাঁহাদের বাড়ী আসার কথা, তাঁহারা অনেকেই আসিয়া গিয়াছেন। ঘরে জানালার পাশে বসিয়া বসিয়াই তাহারা তাহা দেখিতে পাইয়াছে। নদীর ঘাট হইতে গ্রামে ঢুকিবার রাস্তা তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া। ঐ ত রমার বাবা পরেশবাবু আসিতেছেন—পিছনে কুলীর মাথায় ট্রাঙ্ক—উহার মধ্যেই বোধ হয় রমাদের জন্য সব জিনিসপত্র। আবার একটু পরেই আসিলেন গণেশের বাবা ও কাকা—এক-সঙ্গে। ছুই জনেই রংপুরে কাজ করেন। তাহারাও অনেক জিনিস লইয়া আসিলেন। সারাদিন জানালার পাশে বসিয়া বসিয়া তাহারা সেই সবই দেখিল। শুধু মন ভাল নহে—তাই আজ আর তাহারা ঘরের বাহির হয় নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। রায়েদের বাড়ী বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। একটু রাত্রি হইতেই আকাশে যেন দেবতা ও দানবের যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়, তেমনি বাজ পড়ার ভীষণ শব্দ। এই ভীষণ ছুর্য্যোগ—তাহারা মনে মনে ভাবিল—'না এর মধ্যে বাবা অসুখ শরীর লইয়া আর কি করিয়া আসিবেন?' খাওয়া-দাওয়ার পর তাহারা শুইয়া পড়িল। তাহাদের ঘরের টিনের চালের উপর বৃষ্টি পড়িয়া যে রিমিঝিমি বাজনার সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা শুনিতে শুনিতেই তাহারা নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাং মধ্যরাত্রে তীব্র অথচ স্নিগ্ধ আলোকে সমস্ত ঘর একেবারে ভরিয়া গেল—মিণ্টুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তখন সে বুঝিতে পারিল—কোথা হইতে আলো আসিতেছিল। অমন সুন্দর দেবীমূর্ত্তি মিণ্টু জীবনে কখনও দেখে নাই। ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—মিণ্টু ও ননীকে তাঁহার সহিত যাইতে ঈঙ্গিত করিলেন। তাহারাও কথাটি না বলিয়া দেবীর সহিত চলিল। সম্মুখে কতক দূর চলিবার পর হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহারা সকলেই শূন্যে উঠিতে লাগিল! উঠিতে উঠিতে মেঘের রাজ্য ছাড়াইয়া তাহারা তারার রাজ্যে যাইয়া পৌঁছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহাদের কাছে তারাগুলির কথা বলিতে বলিতে চলিলেন—ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ ধ্রুবলোক, ঐ কালপুরুষ। তারার রাজ্য ছাড়াইয়া তাহারা চন্দ্রলোকে, পরে আরও বহু গ্রহের রাজ্যের পাশ দিয়া সূর্য্যলোকে যাইয়া পৌঁছিল। সে লোক ছাড়াইতেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিলেন—"ঐ যে উত্তরে আমার বাড়ী।" তাহারা দেখিল দূরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ—সোনায় তৈরী। ক্রমে তাহারা প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিল। লোকজনের আনন্দ কোলাহলে সমস্ত প্রাসাদ একেবারে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। বাড়ীর প্রাঙ্গণে লোকারণ্য—তাহাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েই সব। সবারই পরণে নূতন জামা কাপড়। সবারই মুখে হাসি আর আনন্দ।

"তোমরা কে কি চাও বল। যে যা চাইবে—তাই আমি দিব।"—দেবী এই কথা বলিতেই কেহ কাপড় জামা, কেহ পুতুল চাহিল। মিণ্টুর বহুদিনের সখ একটা দম-দেওয়া কলের উড়ো জাহাজের। বাবাকে কলিকাতা হইতে সে কতবার তাহা আনিতে বলিয়াছে। দেবীর কথায় সে কাপড় জামার সঙ্গে একটা উড়ো জাহাজও চাহিল। যে যাহা চাহিল—দেবী তাহাকে তাহাই দিলেন। তারপর দেবী—মিণ্টু ও ননীকে বলিলেন—"তোমাদের কোন চিন্তা নেই। তোমাদের বাবা ভাল হ'য়ে যাবেন।"

হঠাৎ ভীষণ চীৎকারে মিণ্টুর চমক ভাঙ্গিল। ননী চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিয়া বলিতেছিল—"মিণ্টু, ওঠ, ওঠ, বাবা এসেছেন।"

তড়াক্ করিয়া মিণ্টু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সে ভাবিল—"উঃ ঘুমের ঘোরে কী আশ্চর্য্য স্বপ্নই না দেখেছি। একেবারে মা দুর্গার কাছেই চ'লে গিয়াছিলাম!"

বাহিরে আসিয়াই সে দেখিল—দাওয়ায় বসিয়া বাবা, মায়ের কাছে বলিতেছেন—"কাল বিকেলে শরীরটা একটু ভাল বোধ করতেই, ভাবলাম—বাড়ী যাই। ছেলেমেয়ে

ছুটোর কথা ভেবেই—আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। তাড়াতাড়ি বাজার ক'রে রাত্রি সাড়ে ন'টার গাড়ীতে রওয়ানা হ'লাম।"

মিণ্টুকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"মিণ্টু, এবারে তোর সেই দম-দেওয়া উড়ো জাহাজও এনেছি।"

শুনিয়া মিণ্টু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বাবা বাক্স খুলিয়া উড়ো জাহাজ বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। মিণ্টু দেখিল স্বপ্নে মা দুর্গা তাহাকে যে উড়ো জাহাজ দিয়াছিলেন—এটাও ঠিক সেই রকম। সে তাহাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভক্তিতে মা জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে তাহার মাথা আপনা হইতেই নুইয়া পড়িল।

রায়েদের বাড়ীতে তখন সপ্তমীপূজার ভোরের বাজনা বাজিতেছিল।

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

শিউলী ফোটার গান

সোনা শরত-ভোরে মোদের দোরে—শিউলি ফুটেছে—
ওরে শিউলি ফুটেছে!—
আকাশ-ভাঙা আলোটি ওর মুখে লুটেছে
ওরে শিউলি ফুটেছে!
যে দেশ থেকে বাজে বাঁশী খোকার ঠোঁটে আসে হাসি
তিন-ভুবনে সেই রূপেরি সাগর ছুটেছে—
ও ভাই শিউলি ফুটেছে!

আঁধার রাতের বেলা গন্ধ এলো বনের কিনারে—
যেন বাজিয়ে বীণা রে !—
ভোরের বেলা তা'র সাথে মোর হবে চিনা রে—
ওরে বনের কিনারে !
লাট্টু লাটাই রইল প'ড়ে— আকাশে মোর মন যে ওড়ে—
খুশিতে আজ মন নেচেছে তা-ধিন্-ধিনা রে—
ওরে বনের কিনারে !

খোকার সাথী এলো শিউলি ফুলের তরী বাহিয়া—
ধনে দেখে চাহিয়া,
রাঙা পাখী নীল আকাশে উঠ্‌ল গাহিয়া,
খুকুর মুখে চাহিয়া !
কমল-কুমার এলো ফিরে কুড়িয়ে মাণিক সাগর-তীরে
সোনার কাঠির পরশে গো উঠ্‌ল জাগিয়া—
এলো তরী বাহিয়া !

সে যে শিউলি হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটে শ্যামল ভুবনে—
দুলে ভোরের কিরণে—
ঝিকিমিকির জাগিয়ে ঝলক সোনার স্বপনে
আজি প্রভাত তপনে !
চিরদিনের ভালবাসা ওরি বুকে বাঁধ্‌ল বাসা,
গন্ধ হ'য়ে মাতায় ভুবন ভোরের পবনে
ফোটে সোনার ভুবনে !

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মজার ক্যালেণ্ডার গণনা

প্রিয় শিশুসাথীর ছোট্ট সাথীরা! তোমরা পূজার অবকাশটা নিশ্চয়ই আমোদ-প্রমোদে কাটাইতে ইচ্ছা কর। আমোদের সঙ্গে যদি কিছু শিক্ষা হয় তাহা হইলে সেই নির্দ্দোষ আমোদই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

তোমরা অনেকেই হয়ত এখনই যদি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের একখানি ক্যালেণ্ডার পাও তাহা হইলে বেশ আনন্দ অনুভব কর। আচ্ছা, তোমাদিগকে আমি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার তৈয়ার করিবার হদিস শিখাইতেছি, ইহাতে তোমরা সকলেই ইচ্ছা করিলে পূজার ছুটির মধ্যেই নিজে নিজে আগামী বছরের একখানি করিয়া ক্যালেণ্ডার তৈয়ার করিয়া পড়িবার টেবিলে রাখিয়া দিতে পারিবে।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি তোমরা মুখস্থ রাখিবে ঃ—

৬	২	২	৫
০	৩	৫	১
৪	৬	২	৪

উপরোক্ত ১২টি অঙ্ক ১২ মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট জানিবে; অর্থাৎ জানুয়ারীর জন্য ৬, ফেব্রুয়ারীর জন্য ২, মার্চ্চের জন্য ২ এইরূপ। যদি কেহ কোনও মাসের কোনও তারিখে কি বার হইবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে উক্ত তারিখের সংখ্যার সহিত সেই মাসের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগ করিয়া যাহা ভাগ-শেষ থাকিবে তাহা যদি ১ হয় তাহা হইলে রবি, ২ হইলে সোম, ৩ হইলে মঙ্গল; এইরূপে ৬ পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি ০ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে শনিবার হইবে। যদি উক্ত যোগফল ৭এর কম হয় তাহা হইলেও এইরূপে বার নির্ণীত হইবে।

উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর কোনও ব্যক্তি প্রশ্ন করিল—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট কি বার হইবে?

আগষ্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ১, তাহার সহিত তারিখের সংখ্যা ১৮ যোগ করিলে হইল ১৯, উহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকিল ৫—জানা গেল—বৃহস্পতিবার।

শ্রীযদুপতি দাস

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press;
5, College Square, Calcutta.

ষোড়শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ { ৮ম সংখ্যা

পরিচয়*

শিশু— বনের কুসুম, বনের কুসুম,
সুবাস মধু-ভরা,
কোথায় পেলে এমন হাসি
কানন আলো করা ?

ফুল— যাঁর দয়াতে শিশির ঝরে—
ঠাণ্ডা বাতাস বয়,
তাঁরি দয়ায় মুখটি আমার
অমল হাসিময় !

* পুরাতন রচনা।

শিশু— প্রজাপতি, প্রজাপতি,
শচী-বনের শোভা,
কোথায় পেলে টুক্‌টুকে রং
এমন মনোলোভা ?

প্রজাপতি— যাঁর দয়াতে হাওয়ায় উড়ি,
জীবন দেছেন যিনি ;
রামধনুর এ-সাতটি বরণ
পাখায় দেছেন তিনি !

শিশু— দোয়েল পাখি, দোয়েল পাখি,
বনের কলাবৎ !
শিখ্‌লে কোথা এমন স্বুরে
মিষ্টি গানের গৎ ?

পাখী— টুক্‌টুকে লাল বনের ফলে
মিটান যিনি ক্ষুধা ;
তিনিই দেছেন কণ্ঠে আমার
সপ্তস্বুরের স্বুধা !

শিশু— সবার প্রতি এমন স্নেহ,
এমন মায়া যাঁর,
ভাই-বোনেতে মিলে মোরা
চরণ চুমি তাঁর !

মরহুম্ শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ

দরদী

গ্রীষ্মকাল—বেলা দ্বিপ্রহর।

ছোট একটি মেয়ে রাস্তার এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একখানা ছেঁড়া অতিমলিন বস্ত্র তা'র কোমরে জড়ান, হাতে একটা বড় লিলিবিস্কুটের কৌটা।

মেয়েটি ঘুর্‌ছে একফোটা জলের আশায়। তৃষ্ণায় তা'র বুক ফেটে যেতে চাইছে—কাছে একটা পুকুরও দেখা যাচ্ছে না। ভিক্ষা কর্‌তে কর্‌তে সে কখন যে এতদূর এসে প'ড়েছে তা খেয়ালই নেই। তাদের গাঁ সেখান থেকে বহুদূরে—আর কেউ তা'র সঙ্গীও নেই—সে একলা।

কাছেই একটা বেশ বড় বাড়ী, লোকজনের সাড়া পাওয়া যায়। মেয়েটি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু বাড়ীতে ঢুক্‌তে সাহস হয় না।

অসহ্য পিপাসা তা'র—জল তা'কে খেতেই হবে। সে আরও একটু ঘুরে এক পা এক পা ক'রে অন্দর-প্রবেশের দরজার দিকে গেল।

গিন্নী কি প্রয়োজনে একবার দরজা খুলে আবার ওকে দেখেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

মেয়েটি সঙ্কুচিত হ'য়ে দরজার একপাশে ব'সে পড়্‌ল। মনে মনে ভাব্‌ল—এক ফোঁটা জল—তা কি আর দেবে না এরা ?

একটু দূরে ঝি বাসন মাজ্‌ছে—তা'র বোধ হয় জল ফুরিয়ে গেছে; মস্ত বড় একটা বাল্‌তি হাতে সে ভিখারীর মেয়ের পাশ কাটিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে তার-স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"তুপুর বেলায় এমনি দরজা বন্ধ কেন গো? কই খুকুমণি, দিদি, দরজা খুলে দাও না বাপু! ভাল লাগে না—"

ভিখারীর মেয়ের আশা সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল।

ফুট্‌ফুটে একটি আট বছরের মেয়ে, চোখতুটিতে স্বপ্ন মাখা, তর্‌তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে খটাং ক'রে দরজার খিল খুলে দিল; তারপর সমান কল-কণ্ঠে সেও উত্তর দিল—"তুমি-ই বা অত চেঁচাচ্ছ কেন রাধী, বাবা বই পড়তে পড়তে সবেমাত্র একটু ঘুমিয়েছেন,—আর তুমি এত চেঁচাচ্ছ—ভারী গল্পা··" বল্‌তে বল্‌তে তা'র চোখতুটি প'ড়ে গেল ভিখারীর মেয়ের উপর, তা'র আর কোন কথাই রাধীকে বলা হ'ল না।

শেফালী বাড়ীর সবার বড় আদরের মেয়ে। ঝি রাধী আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল জল আন্‌তে। শেফালীর বিস্মিত চাউনীতে, বেশভূষায় আর তা'র নির্ম্মলতায় ভরা মুখের ভাবে ভিখারীর মেয়ে বড় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ল।

"ওমা ভিক্ষেই দেইনি যে! যাই দুটো..."

আপন মনে ওকে কথা বল্‌তে দেখে করুণ-সুরে ধীরে ধীরে ভিখারীর মেয়ে চাইল শুধু একটু জল। খুব আস্তে কথা। শেফালীর কানে তা' ভালরূপে গেলও না, তবু ওর ঠোঁট নাড়া দেখে খুব কাছে এগিয়ে পাকাগিন্নীর মত শেফালী প্রশ্ন কর্‌ল—"কি বল্লে ভাই? বল না, লজ্জা কি?"

ভিখারীর মেয়ে চাইল একটু জল

তখন রাধী জল নিয়ে ফির্‌ছে, মেয়েটি শুধু তাই দেখিয়ে দিল।

"ওঃ জল!...এই রাধী, শীগ্গির আমার গ্লাস মেজে দে।" এই ব'লে সে অপটু-হস্তে নিজেই ছোট গ্লাস মাজ্‌তে বস্‌ল।

একগ্লাস জল খেয়েই ভিখারীর মেয়ে অসীম তৃপ্তি পেল। প্রাণের অসীম তৃপ্তি নিয়ে সে নীরবে চেয়ে রইল শেফালীর মুখের দিকে। শেফালীও চেয়ে দেখ্‌ছিল—প্রতি ঢোক জল ভিখারীর মেয়ে কি অসীম আগ্রহেই না খাচ্ছে!

—"তুমি আমার পুতুল নেবে—পুঁতির মালা? তোমার নেই—না রে?"

—"না—নেই। আমি যে ভিখারীর মেয়ে—..."

"নেই কেন রে! মাটির পুতুলও নেই?" শেফালীর প্রশ্ন বিস্ময়-ভরা। যেন সে এমন আশ্চর্য্য কথা আর কখনও শোনে নি, তা'র সমবয়সী মেয়ে—হ'লই বা ভিখারী, সে কি পুতুল খেলে না?

"আমার বাবা বলে, ও আমাদের খেল্‌তে নেই, আমাদের শুধু ভিক্ষে কর্‌তে

হয়, গালাগালি সইতে হয়, আর কোন কোন দিন না খেয়ে থাকার অভ্যেস কর্‌তে হয়”—বল্‌তে বল্‌তে ভিখারীর মেয়ের গলাটা ধ’রে এল।

চারদিকে একটা অসহ্য গুমোট ভাব। রোদের হল্কা এসে গায়ে যেন সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। শেফালীর গোলাপী গালদুটো রক্ত-রাঙা হ’য়ে উঠেছে; সে একমনে ভিখারীর মেয়ের কথাগুলো শুন্‌ছিল আর একটা অজ্ঞানা ব্যথায় বুকের ভিতর তা’র কেমন ক’রে উঠ্‌ছিল। পাড়ায় তার সমবয়সী মেয়ে একটিও নেই। সে ঠিক কর্‌ল ভিখারীর মেয়ের সঙ্গেই সে পুতুল খেল্‌বে। শেফালী বল্‌ল—“আয় না ভাই! খেল্‌বে আমার সঙ্গে। আমি এখানে পুতুল নিয়ে আসি?”

ভিখারীর মেয়ে শেফালীর চেয়ে একটু বড়, তাই বল্‌ল—“না খুকু, আমি তোমার সাথে খেল্‌ব না; আমি যে ভিখারীর মেয়ে, তোমাকে বক্‌বে···”

“এই ছেলেটাকে রথের মেলায় কিনে এনেছি”

বাধা দিয়ে চুপি চুপ শেফালী ব’লে উঠ্‌ল—“না রে না—সবাই ঘুমিয়েছে···” ব’লেই দৌড়ে যেয়ে একটা ছোট টিনের সুটকেস্ আন্‌ল; তা’র ভিতর সাজানো গোছানো পুতুলের রাশি। সব খুলে খুলে মাটিতেই রাখ্‌ল—মাটিতেই ব’সে পড়্‌ল; বস্‌বার সময় কেবল সোনালী রংয়ের ফ্রগ্‌টা একটু গুটিয়ে নিল।

কত পুতুল, কত রঙীন পুঁতির মালা, রং-বেরংএর কাপড়ের টুক্‌রো! ধীরে ধীরে ভিখারীর মেয়ের প্রাণে জেগে উঠ্‌ল একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা।.

শেফালী অনর্গল ব’কে চ’লেছে।

—“জানিস্ ভাই—এটা হচ্ছে বাবা, এটা হচ্ছে মা—আর ওটা হচ্ছে ছেলে। ‘মা’ পুতুলটা মা দিয়েছেন—তাই এটা মা; আর এই ছেলেটাকে আমি রথের মেলায় কিনে

এনেছি ; দেখ ভাই কি সুন্দর—না ?” এই ব'লে সে ভিখারীর মেয়ের দিকে উৎফুল্ল-দৃষ্টিতে তাকাতেই তা'র চোখ আর একজোড়া চোখের উপর গিয়ে পড়্‌ল।

পিছনের বাগানে তা'র দাদা অরুণ চশমা-পরা চোখে হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ;—সে লেখক। হয়ত মনে মনে এই বিষয়টা নিয়ে একটা গল্পের প্লট্ তৈরী কর্‌ছিল।

শেফালী ভিখারীর মেয়েকে ভিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ ভুলে গেছিল। দাদার হাসি দেখে সে নিজেও ফিক্ ক'রে হেসে উঠে সব ফেলে একছুটে দাদার কাছে চ'লে গেল ; কোমর জড়িয়ে আব্দার-ভরা সুরে বল্‌ল—“দাদা, দাওনা একটা কমলালেবু পেড়ে···”

একটু পরেই রাধী একরাশ মাজা বাসন নিয়ে হাফাতে হাফাতে সেখানে এল। খিড়কীর দরজা দিয়ে হয়ত সে চ'লেই যেত, কিন্তু যাওয়া তা'র হ'ল না। ভীষণ তার-স্বরে সে ব'লে উঠ্‌ল—“মাগো কি হবে গো—কি সাহস ছুঁড়ীর! ওগো তোমরা কি সব নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ না কি ?”

রাধী অনেকদিনের ঝি। বাড়ীর গিন্নী দিবা-নিদ্রা-সুখ উপভোগ ক'রে সবেমাত্র উঠে মেয়েটার খোঁজ কর্‌তে নাম্‌ছিলেন—হঠাৎ রাধীর চীৎকারে স্থূলদেহের গতি বাড়িয়ে প্রায় হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। এসেই চোখ একেবারে কপালে তুলে বল্লেন—

“অ্যাঁ—এইটুকু মেয়ের কি আস্পর্দ্ধা! সাধেই কি আর বলি এরা পেশাদার ভিকিরী! তা না হ'লে দিন দুপুরে এমনি ক'রে···হ্যাঁরে রাধী, ও ঘরে ঢুকেছিল ? ধর্‌ত ছুঁড়ীকে, খুকুর পুতুলের বাক্স ত নীচের বারাণ্ডায় ছিল।”

রাধী ততক্ষণে বাসনগুলো রেখে এসে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—“কি জানি বাপু—আমি ত দরজা খোলাই রেখেছিলাম নিজের কাজে, খুকুমণি আবার আদর ক'রে নিজের গ্লাসে জল খাওয়ালে, তারপর কোথায় গেল। আমি ত ঐ হোথা কূঁয়োতলায় বাসন মাজ্‌তে গেলাম, কি ক'রে এসব জান্‌ব ?”

—“খুকীটাই ত যত নষ্টের গোড়া। কোথায় গেল সে ? যাই ওঁকে বলি গিয়ে। দেখিস্ রাধী—ছুঁড়ী যেন না পালায়।”

ভিখারীর মেয়ে রাধীর চীৎকারে একেবারে থম্‌কে গেছিল ; এতক্ষণে ওদের সন্দেহের কারণ ভাল ক'রে বুঝতে পেরে বল্‌ল—“আমি ত চুরি করি নি মা—খুকু···”

ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই। গিন্নী চোখ রাঙা ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—“চুপ কর ছুঁড়ী, ওরকম সবাই বলে।”

গোলমালে চাকর বাকরও এসে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, একটি অসহায় মেয়ের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন তা'রা বেশ আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ কর্‌ছিল। বাবুর তোষামোদে' সখের চাকর কিষণ, কোন অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই—ভিখারীর মেয়ের একটা হাত ধ'রে হেঁচ্‌কা-টানে উঠিয়ে দিতেই সে কেঁদে উঠ্‌ল।

"এঃ আবার কান্না হচ্ছে! যা'র এই সয় না, তা'র আবার ভিক্ষা কর্‌তে আসা!" ব'লে গলাধাক্কা দিতে দিতে যখন রাস্তার প্রায় ধারে এনে ফেলেছে, তখন আর একটা ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে ভিখারীর মেয়ে একগাদা জড় করা পাথরের নুড়ির উপর মুখ

চোখ রাঙা ক'রে বল্‌লেন—"চুপ কর ছুঁড়ী"

থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল। দেখে কিষণ দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল; কারণ ভিখারীর মেয়ের মুখ নাক দিয়ে তখন রক্ত পড়্‌ছে।

শেফালী অরুণের পড়ার ঘরের টেবিলে ব'সে কমলালেবু ছাড়াচ্ছে আর অরুণ ঘাড় হেট ক'রে একমনে লিখে যাচ্ছে একটি গল্প, তা'র নাম—'ব্যথার ব্যথী'।

একটু পরে দেখা গেল—সেই রাস্তা দিয়ে অলস-মন্থর-গতিতে চ'লেছে একটা গরুর গাড়ী। বৃদ্ধ গাড়োয়ান দূর থেকেই ঠাহর ক'রে দেখ্‌ল, রাস্তায় নুড়ির উপর প'ড়ে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। কি জানি কি ভেবে সে সযত্নে তা'কে তুলে নিল। গাড়ী আবার চল্‌ল—ক্যাঁচোর কোঁচ্‌ শব্দে—ধীরে—অতিধীরে অলস-গতিতে।

*　*　*

হঠাৎ শেফালীর মনে হ'ল পুতুলের কথা ! চকিতে খেয়াল হ'ল—তাই ত ভিখারীর মেয়ের কথা ত তা'র মনেই নেই ! পুতুল উঠানো হয় নি—ভিক্ষে দেওয়া হয় নি···

কমলালেবু ফেলেই দৌড়ে চল্‌ল সে খিড়কীর দুয়ারে। যেয়ে দেখে সেখানে পুতুলের বাক্স, পুতুল কিছুই নেই, আছে শুধু সেই ভিক্ষাপাত্র—লিলিবিস্কুটের কৌটাটি।

মুখে আঙুল দিয়ে শেফালী মস্ত সমস্যায় দাঁড়িয়ে রইল। তাই ত কেন এরকম ভুল হ'ল ! উপর থেকে ডাক এল—"শেফী, শেফালী মা—"

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শেফালী বল্‌তে লাগ্‌ল—"বাবা, ভিখারীর মেয়েকে সব দিয়েছি ; পুতুল, পুঁতির মালা—মাকে কিন্তু ব'লো না বাবা—তবে···"

শেফালীর মা উপরের ঘরেই ছিলেন। মেয়ের সেই কথা শুনে তিনি যেন কেমন একটু হ'য়ে গেলেন—ব্যগ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন কর্‌লেন—"তুই পুতুল দিয়েছিলি রে খুকু ? তুই কোথায় ছিলি রে ?"

শেফালী দম্‌বার পাত্রী নয়। সে আগাগোড়া সবই জোরগলায় ব'লে ফেল্‌ল। শুন্‌তে শুন্‌তে গিন্নীর মুখ থেকে দুঃখিত-স্বরে বের হ'ল—"তবে শুধু শুধু কিষণ ওকে অমন কর্‌ল—আহা, কিষণের আবার সর্দ্দারী বেশী ; ব্যাপারটা না জেনেই মারা কেন বাপু !"

শেফালী সবেমাত্র এক চামচ দুধ আর ওট মুখে দিয়েছিল। মা'র কথা শুনেই সে তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে গেল।

বাবা প্রশ্ন কর্‌লেন—"না খেয়েই আবার দৌড়াচ্ছিস্‌ কোথায় ?"

বাবার প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বল্‌ল—"এক্ষুণি আস্‌চি বাবা।"

কিষণকে অনেক জেরা ক'রে সে জান্‌ল কোথায় ভিখারীর মেয়েকে সে রেখে এসেছে। কচিহাতে গোটা পাঁচ-ছয় আলু নিয়ে ঠিক সেই জায়গাতে গিয়েই দেখে—সেখানে পাঁচ-সাতটা সুন্দর সাদা নুড়ি কেমন লাল্‌চে হ'য়ে রয়েছে ; কিন্তু আর কেউই নেই। আলুগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে—এক পা এক পা ক'রে নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তে শেফালী বাড়ী ফিরে গেল। তা'র মনে দারুণ অভিমান হ'ল যে, ভিখারীর মেয়ে তা'কে না ব'লেই বাড়ী চ'লে গেল।

ততক্ষণে হয়ত ভিখারীর মেয়ে সত্যই বাড়ী পৌঁছেছে।

শ্রীমতী নিভাননী দেবী

বরাত ভায়া

পল্লীখানি চণ্ডী সেনের লাগ্‌লো না আর ভালো,
নাই বিজলী-সচল-পাখা, নাই বিজলীর আলো।
দিন ফুরাতে চারদিকেতে আঁধার এসে ভরে,
রাত বাড়ে আর মন যেন তা'র কেমন-কেমন করে।
গভীর রাতে হরির ধ্বনি কানে ভীষণ লাগে,
পেচকগুলি 'নিম' ডাকে ঐ বাদাম গাছের আগে।
নাই সিনেমা, নাই থিয়েটার, নাইকো কোন খেলা,
হাজার প্রজার হাজির, হুজুর সকাল বিকালবেলা।
কঠিন রোগে মরণ বিনা নাই কোন আর গতি,
পল্লীখানি মন্-জিভে তা'র টক লাগে আজ অতি।
'যাত্রা শুভ' দিন দেখে এক চল্‌লো সহর পানে,
কপাল ব'সে চোখের 'পরে ঈষৎ হাসি হানে।

রাসবিহারী এভ্‌নুতে সে তুল্‌লো বিরাট বাড়ী,
চাই যে তাহার ষ্টাইলে থাকা কিন্‌লো মোটর গাড়ী।
সেই 'মোটর' এক 'বাসের' হাতে এমনি মারই খেলো,
চণ্ডী সেনের জ্যেষ্ঠ ছেলের প্রাণটি তা'তে গেলো।
'চিন্‌চিনে' কি 'ঝিন্‌ঝিনে' এক নতুন ব্যামোর গ্রাসে
পড়্‌লো যখন আর এক ছেলে, মরেন পিতা ত্রাসে।
নিপুণ প্রবীণ চিকিৎসক এ সহর-মাঝে যত,
দেখ্‌লো রোগী, কম্‌লো না রোগ এমনি বিধি-হত।
চল্‌ছে ঘরে বিজলী বাতি মনটা আঁধার-ভরা,
ভাব্‌ছে চেয়ে আকাশ পানে—"যায় কি এখন করা।"
কান্না শোনে 'এভ্‌নু' 'লেকে', কান্না চারি পাশে,
কয় সে—"যা'ব শ্যামবাজারে"—কপাল শুনে হাসে।

শ্যামবাজারে বিরাট বাড়ী বাঁধ্‌লো এমন স্থানে,
দিন রাতি শব যেখান দিয়ে নে যায় শ্মশান পানে।
চণ্ডী সেনের শ্যামবাজারে বিপদ আরও জোটে,
ঢুক্‌লে কানে হরির ধ্বনি পরাণ কেঁপে ওঠে।
সেই বছরে কল্‌কাতাতে 'প্লেগ' লাগ্‌লো বড়,
হয় যদি, ত হ'তেই হবে গঙ্গা-তীরে জড়!
সহর হ'তে সেই রোগেতে অনেক মানুষ ম'লো,
হরি-ধ্বনির জ্বালায় বাবুর টেকাই কঠিন হ'লো।
দিন পনেরো তুই নয়নে ঘুম না এলো রাতে;
"থাক্‌বো না আর কল্‌কাতাতে"—বল্‌লো সে এক প্রাতে।
সব নিয়ে তা'র সেন জমিদার ফির্‌লো গাঁয়ের পানে,
বরাত ব'সে চোখের 'পরে ঈষৎ হাসি হানে।

সেন জমিদার দেশের বাড়ী আস্‌তে পুন ফিরে,
দুখ্‌ জানালো তাহার দুখে হাজার প্রজা ঘিরে।
ক'দিন বাদে বিজন ঘরে ভাব্‌ছিলো সে ব'সে,
"দুই ছেলেরে দিলাম যমে আপন ভুলের দোষে।
হেথায় মোরে রাজার মত শ্রদ্ধা সবাই করে,
কল্‌কাতাতে আমার মত ধনী অনেক ঘরে।
শান্ত শ্যামল পল্লী মা আজ স্নিগ্ধ-ভাষে মোরে,
বল্‌ছে যেন—ভাবিস্‌ নে তুই, শান্তি দেবো তোরে।
যেথাই আমি যাই না কেন, বরাত যাবে সাথে,
আজ থেকে তাই সব দিনু মোর পল্লী মায়ের হাতে।"
চিন্তা রেখে চণ্ডীবাবু আলবোলাটি টানে,
চোখের 'পরে বরাত ভায়া ঈষৎ হাসি হানে।

শ্রীদীপক গুপ্ত

কুমারহট্ট নামের ইতিহাস

এখন যা'র নাম হালিসহর, প্রায় পৌনে দু'শো বছর পূর্ব্বে সেখানে এত বড় বড় পণ্ডিত বাস কর্‌তেন যে, নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও অনেক সময় তাঁদের কাছে শাস্ত্র-বিচারে হার মান্‌তেন।

একবার হ'য়েছে কি! নবদ্বীপ থেকে ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি খুব বিখ্যাত পণ্ডিতগণ হালিসহরে গিয়েছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে একটা খুব ভাল বাড়ীতে থাক্‌তে দেওয়া হ'ল। চা'র-পাঁচ দিন তাঁ'রা থাক্‌বেন এবং হালিসহরের পণ্ডিতদের সঙ্গে এক একটা বিষয় নিয়ে এক এক দিন বিচার হবে, স্থির হ'ল।

হালিসহরের পণ্ডিতদের হ'ল ভারি ভয়। যদি নবদ্বীপের পণ্ডিতের কাছে বিচারে তাঁ'রা পরাজিত হন, তা হ'লে তো আর লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো থাক্‌বে না। কি করা যায়? তাঁ'রা সকলে মিলে দিনরাত কেবল তাই নিয়ে জট্‌লা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এখন—গ্রামে ছিল এক অতি চতুর কুমোর। পণ্ডিতদের আসন্ন বিপদ দেখে সে বল্‌লে—"দেখুন আমি এর একটা ব্যবস্থা কর্‌তে পারি; কিন্তু কাল্‌কে তা আপনাদের বল্‌ব, আজ বল্‌ব না।"

পণ্ডিতেরা নিরুপায় হ'য়ে ভাবনায় ডুবে গেছিলেন, এখন কুমোরের কথায় যেন একটা অতি বড় আশ্রয় পেলেন—তাঁ'রা কুমোরের কথায়ই রাজি হ'লেন।

বুড়ো কুমোর কর্‌লে কি, নিজে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেজে, সঙ্গে একটি ছেলে নিয়ে, নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বাসায় গিয়ে হাজির হ'ল, তারপর পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস কর্‌লে—"আপনাদের ঝিএর দরকার আছে, বাবাঠাকুররা?"

পণ্ডিতেরা ভাব্‌লেন—'চার-পাঁচ দিন থাক্‌তেই যখন হবে, তখন ঝি একজন থাক্‌লে ভালই হয়।' তাঁ'রা রাজী হ'লেন। ঝি তৎক্ষণাৎ তাঁদের গৃহকর্ম্মে মন দিল, ছেলেটি তামাক সাজার ভার পেল।

খাওয়া দাওয়া সেরে খুব বেশী রাত্রে পণ্ডিতগণ ঘুমে অচেতন হ'য়েছেন। সেই সময়ে বুড়ী ঝি ছেলেটিকে শিখিয়ে রাখ্‌লে,—"দেখ্, খুব ভোরে তোকে তুলে দেবো।

কাকের ডাক শুনেই তুই পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস কর্‌বি, 'কাক ভোরের আলো দেখেই অমন ডাকে কেন ?' বুঝলি ? তারপর পণ্ডিতরা যা বল্‌বে তা শুনে খুব জোরে জোরে কাঁদ্‌তে থাক্‌বি। পরে আমাকে—'কাক ভোর হ'তে দেখেই অমন ক'রে ডাকে কেন ?'—তা জিজ্ঞেস কর্‌বি। মনে থাক্‌বে তো ?"

"হাঁ" ব'লে ছেলেটি মাথা নাড়্‌লে।

ভোর হ'তে না-হ'তেই ছেলেটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। সে চীৎকারে পণ্ডিতদের গেল ঘুম ভেঙে। তাঁ'রা তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কি হ'ল ? তুই এত চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন ?"

ছেলেটি তখন পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস কর্‌লে—"ভোরের আলো দেখেই কাকেরা অমন ক'রে ডাকে কেন ?"

পণ্ডিতেরা বিরক্তির সহিত বল্‌লেন—"বেড়ে প্রশ্ন তো ! কাক কেন ডাকে তা আমরা কি ক'রে জান্‌ব ?"

একজন পণ্ডিত বল্‌লেন—"সারারাত ওরা বাসায় ছিল, বেরুতে পারে নি; এখন ভোর হ'য়েছে, বাসা থেকে উড়ে বেরিয়ে যাবে, সেইজন্যে ডাক্‌ছে, বুঝ্‌লি ?"

বালক সে উত্তরে সুখী হ'ল না। অত ভোরে ছেলের বিকট চীৎকার ও কান্না শুনে তা'র মা-ও সেখানে এসে হাজির হ'ল। সে তখন জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কাক ডাকে কেন ভোর হ'লেই ? আমায় ব'লে দাও মা।"

ঝি তখন রেগে বল্‌লে—"হতচ্ছাড়া ছেলে ! আমি কি পণ্ডিত ? আর তুই-ই কি সংস্কৃত জানিস্‌ যে, সে কথা বল্‌লে বুঝ্‌বি !"

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছেলে বল্‌লে—"তুমি বুঝিয়ে দিলে সংস্কৃত আমি বুঝ্‌ব।"

"তবে শোন্"—ব'লে ঝি বল্‌লে—

"তিমিরারি স্তমোহন্তি শঙ্কাতঙ্কিত-মানসাঃ।
বয়ং কাকাঃ বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

তিমিরারি হচ্ছেন অন্ধকারের শত্রু—সূর্য্য; তিনি পূবদিকে উঠেছেন অন্ধকার বা কালো সব বিনাশ ক'রে। কাকগুলো কালো—ঠিক অন্ধকারেরই মত। তাদের মনে আতঙ্ক হ'য়েছে—পাছে সূর্য্যদেব অন্ধকারের মত কালো দেখে তাদেরও বিনাশ করেন! সেই ভয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে তা'রা বল্‌ছে—'হে দেব, আমরা কাক, আমরা কাক—অন্ধকার নই, আমাদের বিনাশ ক'রো না।' "

ছেলেটি এবার খুশী হ'ল, কিন্তু ঝির কথায় পণ্ডিতদের তাক লেগে গেল! তাঁ'রা জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"মা, তুমি তো কুমোরের মেয়ে, লেখাপড়া কিছুই জান না; তবে এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক আর তা'র ব্যাখ্যা কি ক'রে জান্‌লে বল তো?"

ঝি বল্‌লে—"বাবাঠাকুর, আমাদের গাঁয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এত আছেন, আর শাস্ত্র নিয়ে এত আলোচনা হয় যে, আমাদের মত মুখ্যু মেয়েরাও শুনে শুনে অমন শত শত শ্লোক মুখস্থ বল্‌তে পারে আর বিশুদ্ধরূপে ব্যাখ্যা কর্‌তেও পারে।"

কথাটা শুনে তর্করত্ন তাকালেন ন্যায়রত্নের দিকে, আর ন্যায়রত্ন তাকালেন স্মৃতিরত্নের দিকে। তাঁদের চোখে চোখে একটা পরামর্শ খেলে গেল! ঘরে এসে অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁ'রা কি পরামর্শ কর্‌লেন। তারপর দেখা গেল সেইদিনই বিকেল-বেলা নৌকায় ক'রে তাঁ'রা হালিসহর থেকে নবদ্বীপের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন!

হালিসহরের পণ্ডিতেরা তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। কুমোরের বুদ্ধিতে তাঁ'রা অত বড় বিপদে বেঁচে গেলেন ব'লে—গাঁয়ের নাম করা হ'ল **কুমারহট্ট**।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

কি ও কেন ?

মরীচিকা কি ?

'মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে'

—মাইকেল

যাত্রী উটের পিঠে চড়িয়া মরুভূমি পাড়ি দিতেছে; পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। দূরে, বহুদূরে আকাশের কোলে সে দেখিল মরূদ্যান, নীচে পুকুর, তা'তে জল থৈ থৈ করিতেছে, খেজুর গাছের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। জল ও আশ্রয় পাইবার আশায় তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; কিন্তু হায়! সারাদিন চলিয়াও সে মরূদ্যানের নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। সে যত আগাইয়া চলিল মরূদ্যানও ততই পিছাইয়া গেল। অবশেষে সূর্য্য অস্ত-যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা অদৃশ্য হইয়া গেল, আশায় মুগ্ধ হইয়া যাহার পিছনে পথিক ছুটিয়াছিল তাহাই **মরীচিকা**।

মরীচিকার কারণ বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে দুইটি পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রথম একটি বাটি লইয়া তাহাতে একটি পয়সা কিংবা টাকা রাখ। বাটিটি টেবিলের উপর রাখিয়া—একটু দূর হইতে দেখ,—টাকাটি দেখিতে পাইবে না। এইবার সেইখানে দাঁড়াইয়াই কাহাকেও আস্তে আস্তে বাটিটিতে জল ঢালিতে বল। বাটি জলপূর্ণ হইবা মাত্র পূর্ব্বের অদৃশ্য টাকাটিকে এখন দেখিতে পাইবে। ইহার কারণ কি ?
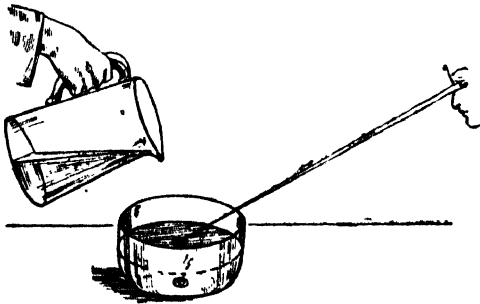
ঘর ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, বাতি জ্বাল সবই দেখিতে পাইবে। কোন জিনিসই বিনা আলোকে আমরা দেখিতে পাই না, আলোক হইতে রশ্মি জিনিসে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পৌঁছিলে আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই। টাকাটি যখন খালি বাটির ভিতর ছিল তখন তাহা হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি তোমার চোখে না পৌঁছায় টাকাটিকে দেখিতে পাও নাই। কিন্তু বাটিতে জল ঢালায় প্রতিফলিত রশ্মি জল হইতে বাহির হইবার সময় বাঁকিয়া তোমার চোখে লাগায় টাকাটিকে তুমি দেখিতে পাইলে।

একখানি সোজা লাঠি লইয়া চৌবাচ্চার স্বচ্ছ জলের মধ্যে উহার খানিকটা প্রবেশ করাও। লাঠিখানির জলের ভিতরের অংশ বাঁকা দেখা যাইবে। কেন? ওই একই কারণে। জল হইতে প্রতিফলিত রশ্মি বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাঁকিয়া যায়।

এক মিডিয়ম (medium) হইতে ভিন্ন মিডিয়মের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রশ্মির বাঁকিয়া যাওয়াকে আলোকের **প্রতিসরণ** (refraction) বলা হয়। আলোকের প্রতিসরণের জন্যই মরীচিকার সৃষ্টি হয়। খুব গরমের সময় বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (in different degrees) উত্তপ্ত হয়। কাজেই তাহাদের ঘনত্বও (density) পৃথক্ হয়। তখন তাহারা একই বায়ু হইলেও কার্য্যতঃ পৃথক্ মিডিয়মের মত ব্যবহার করে। প্রতিফলিত রশ্মি এই প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে প্রতিসরিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত গ্রীষ্মে কাঠফাটা রৌদ্রের সময় মাঠে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবে যেন মাটি হইতে বাষ্প উঠিতেছে। ইহাও একপ্রকার মরীচিকা বলিতে পার, কারণ ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তপ্ত স্তরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বাঁকিয়া চলার দরুণই এই রকম দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাষ্প বলিয়া কোন পদার্থ সেখানে মাটি হইতে উঠে না।
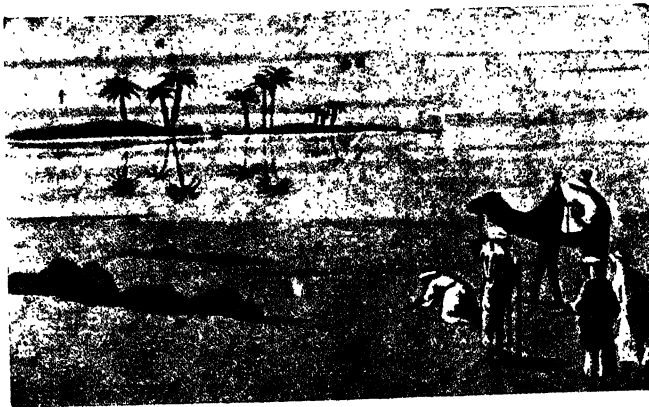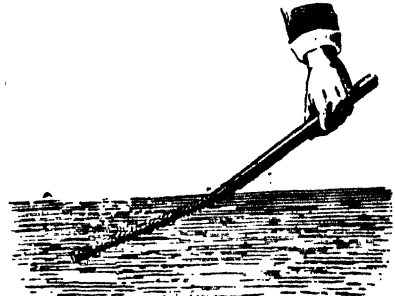
মরুভূমি—মরীচিকা

বহুদূরে দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত একটি মরূদ্যানে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঘোরা পথে চোখে আসিয়া পৌঁছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির সংস্পর্শে আসিয়া

বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বনিম্ন স্তর গরম হয়। তাহার উপরকার স্তর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তপ্ত হওয়ায় তাহাদের আলোক প্রতিসরণ-ইণ্ডেক্‌সও (refractive index) পৃথক্ হয়। সুতরাং মরূদ্যান হইতে প্রতিফলিত রশ্মি এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া চলিবার সময় ক্রমশঃ বাঁকিয়া উপরের ঠাণ্ডা স্তরে পৌঁছিয়া প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় নীচের দিকে প্রতিসরিত হইতে হইতে পথিকের চোখে আসিয়া পৌঁছায়। তখন সে মরূদ্যানটি দেখিতে পায়। মরূদ্যানের নীচে যে পুকুরের মত দেখায় তাহা নীল আকাশের প্রতিসারিত প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি.

খেলার মেলা

ছোট্ট খোকার দল !
ওরে, পাড়াগাঁয়ে চল।
দেখ্‌বি সেথা খুশীর মেলা,
মাঠে ঘাটে কতই খেলা—
মনের সুখে খেল্‌ছে সবাই
আনন্দে বিহ্বল !
ওরে, ছোট্ট খোকার দল।

ফুলের সাথে হাওয়ার খেলা
হাওয়ার সাথে আলো,
জ্যোছ্‌না সাথে মেঘের মেলা
দেখ্‌তে বড়ই ভালো।
নীল আকাশের বুকটি ছুঁয়ে
হাঁসের দলের খেলা,
শ্বেত-কুমুদের সাথে সেথায়
অলির মহামেলা !
তাদের সাথে খেল্‌বি যদি চল ;
ওরে, ছোট্ট খোকার দল।

পূব আকাশের অরুণরবি
খোলেন যখন দোর,
হাজার পাখীর মধুর রবে
রাত্রি হয় যে ভোর !
পল্লীমায়ের খেলা-ঘরে,
পুতুল রয় যে থরে-থরে,
আছে ব'সে তোদের তরে
অন্য ছেলের দল !
ওরে, ছোট্ট খোকার দল।

শ্রীদিলীপকুমার মজুমদার

ভাই-বোন্

দীপ্তিমান্ ও মাধুরী দুই ভাই-বোন্। ভাই বড়—বোন্ ছোট। দীপ্তিমান্ এক সময়ে কাজ কর্‌ত নারায়ণগঞ্জে পাটের আফিসে, এখন কাজ নেই। কয়েক বৎসর যাবৎ পাটের আফিসগুলোর অবস্থা শোচনীয়। দু'-তিন বৎসরের ভিতর অনেকগুলো আফিস 'পটল তুলেছে'। দীপ্তিমানের আফিসটিরও অস্তিত্ব নেই। পাখী যে-গাছটি আশ্রয় ক'রে এদ্দিন মনের আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে দিন কাটিয়েছে, সেই গাছটি ভেঙে যাওয়াতে পাখী এখন উড়্ছে মুক্ত আকাশে—আর খুঁজ্‌ছে অন্য একটি গাছ—যেখানে সে আবার বস্‌বে। দীপ্তিমান্ চেষ্টা কর্‌ছে কোথায় আবার কোন্ কাজ ধর্‌বে।

বিয়ে হ'বার পর মাধুরী আছে আসামের এক চা-বাগানে—ডিব্রুগড় জেলায়। লোকে বলে ভাই-বোনের ভালবাসা—তা নাকি ভোরের বেলায় ফুলকলির উপর দু'ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মত, বেলা বাড়্‌লেই শুকিয়ে যায়; বিয়ে হ'য়ে গেলেই ভাই-বোনের ভালবাসা আর থাকে না! কিন্তু দীপ্তিমান্ ও মাধুরীতে ঐ অপবাদটার দেখা গেল ব্যত্যয়। বিয়ের পরেও মাধুরী 'দাদা' বল্‌তে অজ্ঞান, আর দীপ্তিমান্ ছোট বোনের প্রতি স্নেহ-মমতার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ।

বর্ষা গেল, ভাদ্র গেল; কিন্তু পাটের আফিস আর বস্‌ল না। তারপর পূজা গেল, বিজয়া গেল, কিন্তু দীপ্তিমানের বিজয়যাত্রা জীবনপথে হ'য়ে রইল অচল। কাজ-কর্ম্ম কোথাও আর মিল্‌ল না।

এই সময়ে মাধুরীর একখানা চিঠি পেয়ে দীপ্তিমান্ গেল ডিব্রুগড়। অনেক দিন ভাই-বোনের দেখা নেই, কাজেই দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎও হবে আর চা-বাগানে যদি কোনও কাজ মিলে—সেই চেষ্টাও দেখা যাবে। আর দেখা যাবে—মাধুরীর হাতের তৈয়ারী লাড়ু, মিঠাই কচুরী! ছোট বোনটি যে চিঠির ভিতরে দাদাকে ভাইফোঁটা নেওয়ার কথাটাও লিখে দিয়েছিল, সেই লাইনটি না লিখ্‌লে—দীপ্তিমান্ হয়ত আসাম দেশটাকে বয়কটই (বর্জ্জন) কর্‌ত। তা' না হয়ত, চ'লে যেত রাণীগঞ্জের কয়লা-খনিতে কিংবা বর্ম্মা রাজ্যের অয়েল কোম্পানীতে।

অনেক দিন পর দাদাকে পেয়েছে, মাধুরীর আজ আনন্দ দেখে কে? সেইবার ভাইফোঁটার তারিখ প'ড়েছে অগ্রাণের প্রথম। শীতটা এসে প'ড়েছে একটু এগিয়ে;

শীতের দিনের মিষ্টি জিনিস দাদাকে স্বহস্তে তৈরী ক'রে খাওয়াবে এইটি হচ্ছে মাধুরীর অনেক দিনকার কামনা। আজ তাড়াতাড়ি সে চ'লেছে রান্না-ঘরে—আসামের শ্রেষ্ঠ জিনিস যেটি, সেইটি নিজের হাতে তৈরী ক'রে এনে দাদাকে দেওয়ার জন্যে। হাতে পয়লা নম্বরের চা এবং কেট্‌লি। সঙ্গে যাচ্ছিল খোকনমণি। মাধুরীর মনটা প'ড়ে আছে কতক দাদার দিকে, কতক এই অশান্ত ছেলেটার দিকে। ছেলেটা মামার কাছে না গিয়ে মায়ের আঁচল ধ'রে টান্‌ছিল, আর কচ্ছিল উৎপাত। আন্‌মনা মাধুরী যেইমাত্র ষ্টোভে আগুন দিয়েছে, অমনি আগুন ধ'রে গেল তার আঁচলে, তারপরেই কাপড়ে, পেটিকোটে, গরম জামায় এবং সর্ব্বদেহে! ছেলেটা তো আরম্ভ কর্‌ল বিকট চীৎকার!

আগুন ধ'রে গেল……

শুনে মাধুরীর স্বামী দৌড়ে' এল, দীপ্তিমান্ দৌড়ে গেল। মাধুরী মেঝেয় মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে আছে। ননীর মত কোমল দেহ পুড়ে লাল ডগ্‌ডগে হ'য়ে গেছে। সকলে একসঙ্গে 'হায় হায়' ক'রে উঠ্‌ল। মাধুরীর স্বামী চা-বাগানের ডাক্তার। তিনি যথাশক্তি প্রাথমিক চিকিৎসা কর্‌লেন, কিন্তু সেই ছোট্ট জায়গায় এত বড় ব্যাপারের চিকিৎসা তো চল্‌বে না, তাই দশ ক্রোশ দূরে ডিব্রুগড় হাসপাতালে রোগীকে নেওয়া হ'ল।

চিকিৎসা চল্‌ল। ডাক্তারদের প্রাণপাত পরিশ্রমে, আর করুণাময়ের অশেষ করুণায় রোগিণী আরোগ্যের পথে চল্‌ল। ক্ষীণ প্রাণবায়ুটিকে দেহের ভিতরে আবদ্ধ রাখ্‌তে, চাই শরীরের আবরণ তাজা চাম্‌ড়া। পাখীকে খাঁচার ভিতরে রাখ্‌তে হ'লে ভাঙা খাঁচায় তো চল্‌বে না, খাঁচার পর্দ্দাটি মেরামৎ করা প্রয়োজন। ডাক্তাররা বল্‌লেন—"কোনও সুস্থ সবল মানুষ যদি নিজের দেহ হ'তে খানিকটা তাজা চাম্‌ড়া দান কর্‌তে পারে, তবে হয়ত রোগিণী কিছুকাল বাঁচ্‌বে।"

চাম্‌ড়া দিবে কে? স্বামী বলেন—'আমি দেবো'; ভাই বলেন—'আমি দেবো'।

ডাক্তাররা পরীক্ষা কর্‌লেন উভয়ের স্বাস্থ্য,—উভয়ের রক্তের গতি। উভয়েই 'ফিট' (উপযুক্ত) হ'লেন। কিন্তু ব্যাপার তো বড় সোজা নয়! পাত্‌লা ছালের মত চাম্‌ড়ার পাত গা থেকে চেঁছে তুল্‌তে হবে। দীপ্তিমান্ অটল; স্বামীও অটল বটে, কিন্তু তা'র মনটি ক্ষণকালের জন্যে টল্‌মল্ কর্‌ছিল সেই শিশু ছেলেটির জন্য। বৃক্ষ ও লতা দুই-ই যদি হারিয়ে ফেলে, তবে ফুলের হাসি তো ফুট্‌বে না। মা ও বাপ দুই অবলম্বনই যদি হারায়, তবে কি শিশু বাঁচ্‌বে? পিতার স্নেহরস টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে হৃদয়ের ভিতরে করুণ কান্না উঠ্‌ছে—"খোকা, খোকা, প্রাণের খোকা।" পরক্ষণে আবার নীরব আর্ত্তনাদ—"মাধুরী, মাধুরী, ···।"

মন-ঘোড়ার রাশে দু'দিক থেকে পড়্‌ছে টান। ডাক্তারগণ দীপ্তিমান্‌কেই মনোনীত কর্‌লেন। আশে-পাশের কেউ কেউ তা'কে একটু ভাব্‌তে বল্‌ল বটে, কিন্তু সে হট্‌বার ভাই নয়। টেলিগ্রাম পেয়ে দীপ্তিমানের স্ত্রীও গিয়ে পড়েছিল চা-বাগানে। সজল চক্ষে স্ত্রী বল্‌লে—"ওগো—চাম্‌ড়া কি তুমি সত্যি দেবে?"

দীপ্তিমান্ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। একই উদরে আমাদের জন্ম, একই রক্তে, একই মাংসে গড়া আমরা। স্নেহের দুলালী, মমতার পুতুলী মাধুরী। আমার চামড়াই মাধুরীর দেহে লাগ্‌বে ভাল। তুমি আমাকে কিছু ব'লো না, ব'লো না—আমি মর্‌ব না—ভয় নেই।"

সে হাসপাতালে চল্‌ল। কম্পাউণ্ডারগণ তা'র দুই পায় ষ্ট্র্যাপ্ বেঁধে দিয়ে অপারেশন ঘরে আন্‌লেন। বাঁকা একখানা তক্তায় বহন ক'রে মাধুরীকেও আনা হ'ল সেখানে। উভয়কে পাশাপাশি উপুড় ক'রে শোয়ানো হ'ল। সার্জ্জন, সিষ্টার, নার্স ও কম্পাউণ্ডারগণ বিস্মিত। তখনও কেউ কেউ তা'কে বারণ কর্‌লে, কিন্তু দীপ্তিমান্ অচঞ্চল—নিষেধ শুন্‌বার মানুষ সে নয়। অকম্পিত-বুকে, প্রদীপ্ত-মুখে সে শুয়ে আছে। সে জানালে যে ক্লোরোফর্ম্ কর্‌বারও প্রয়োজন নেই!

সার্জ্জন ধারালো ছুরি হাতে নিলেন, খানিক পুরু চাম্‌ড়া তা'র উরুদেশ থেকে কাট্‌লেন। সেই চাম্‌ড়া মাধুরীর পিঠে বসাতে হবে, সেলাই কর্‌তে হবে। এক ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার দীপ্তিমানের উরুদেশ ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলেন। পরে সবাই গেল মাধুরীর দিকে। ছোট বোনের দুঃখ যন্ত্রণা, করুণ ক্রন্দন এখনই আবার নূতন-ভাবে দেখা দিবে। পিঠের ঘা এখনও কাঁচা ডগ্‌ডগে। দীপ্তিমানের চক্ষু জলে ভ'রে গেল।

সে এই ফাঁকে বেরিয়ে গেল,—দশ ক্রোশ পথ যেতে হবে। যে সাইকেলে চ'ড়ে সে এসেছিল, সেই সাইকেলেই চ'লে গেল। কেউ সেদিকে লক্ষ্য কর্‌লে না।

কয়েক দিন পর সংবাদ এল, আরও খানিক চাম্‌ড়া দরকার। কুছ্ পরোয়া নেই। আবার দীপ্তিমান্ চল্‌ল হাসপাতালে, আবার অপারেশন! আবার বাইক্! এইবার লোকের দৃষ্টি গেল দীপ্তিমানের দিকে। সে কেবল সাইকেলে চেপেছে—এম্‌নি সময় সিভিল সার্জ্জন তা'কে থামালেন। বিস্মিত জনতা অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছে দীপ্তিমান্ নির্ভীক্। দেহ অবসন্ন যদিও, মুখ কিন্তু সুপ্রসন্ন। তা'কে সাইকেল থেকে নামানো হ'ল। সিভিল সার্জ্জন ব্যবস্থা কর্‌লেন এম্বুলেন্‌স্ গাড়ী।

সিভিল সার্জ্জনের মারফৎ সংবাদটা পৌঁছল আসামের চীফ্ কমিশনার মিষ্টার মেক্‌কলের (Mr. Mc. Call) কানে। তিন দিনের ভিতরেই তিনি একটি স্বর্ণ-পদক উপহার পাঠালেন। কিন্তু দীপ্তিমান্ তো সুবর্ণ-পদকের কাঙাল নয়, সে যে কাঙাল সুবর্ণ-প্রতিমার; সে কাঙাল—এক রক্তমাংসে গড়া মাধুরীর সোনার দেহের।

ডাক্তারদের আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস ক'রে এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে দীপ্তিমান্ সেই মেডেল গ্রহণ কর্‌লে। তা'তে লেখা র'য়েছে—To Diptiman Roy for his bravery and self-sacrifice. (সাহসিকতা ও স্বার্থত্যাগের জন্য দীপ্তিমান্ রায়কে এই সোনার মেডেল উপহার প্রদত্ত হইল।)

এইখানেই গল্পের শেষ নয়। মাধুরী যে এখনও হাসপাতালে। রোগিণী এখন ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে। মাধুরীর স্বামী মাঝে মাঝে হাসপাতালে যান। ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় এবং নার্সদের অক্লান্ত শুশ্রূষায় স্বর্গের মাধুরী আবার মর্ত্ত্যে ফিরে এল। মা ছেলেকে কোলে নিলেন,—বহু দিনের সঞ্চিত অজস্র চুম্বন ছেলের কপোলে, গণ্ডস্থলে বর্ষিত হ'ল। স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, ননদ ভাই-বৌ এবং মা ও ছেলের মিলনে সেই ক্ষুদ্র চা-বাগান নন্দন-কাননের রূপ ধারণ কর্‌ল।

সবাই এখন বিশ্বাস কর্‌লেন ভগবান্ আছেন। সেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়—মানবে মানবে ভালবাসায়। মানুষের মাঝেই ভগবানের আবাস। জীবে জীবে শিব, নরে নরে নারায়ণ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী

এয়ার্‌শিপ্‌

তোমরা সকলেই খুব সম্ভব এরোপ্লেন দেখেছ—এরোপ্লেন জিনিসটি কি তা'ও বোধ হয় তোমাদের জানা আছে। যাদের বাড়ী সহরে তাদের কেহ কেহ হয়তো এরোপ্লেনে চ'ড়ে আকাশে বেড়িয়েও এসেছ। কিন্তু এরোপ্লেনের মত আর এক রকম বিমান অথবা উড়োজাহাজ আজকাল আকাশপথে চলাফেরা কর্‌ছে তা' হয়তো তোমাদের জানা নেই। সেই উড়োজাহাজের নাম **এয়ার্‌শিপ্‌** (Air-Ship)। উহা জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। তোমরা যে সকল উড়োজাহাজ দেখ্‌তে পাও—তা' সকলই এরোপ্লেন। এখন এয়ার্‌শিপ্‌ জিনিসটি কি এবং কি উপায়ে, কোথায় প্রস্তুত হয় সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

প্রথমে এয়ার্‌শিপ্‌ কি ক'রে আবিষ্কার হ'ল তা জানা দরকার। কালীপূজা বা দুর্গাপূজা অথবা কোনও উৎসবের সময়ে অনেক ফানুস্‌ উড়ে; তোমরা নিজেরাও সম্ভবতঃ দু-চার্‌টে ফানুস্‌ উড়িয়ে থাক। এই ফানুস্‌ উড়া থেকেই এয়ার্‌শিপ্‌ বা উড়োজাহাজের উৎপত্তি হ'য়েছে। ফানুস্‌ ছাড়ার সময়ে তোমরা ফানুসের মুখের গোল তারের মালার সম্মুখে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে তা'তে কেরোসিন তেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে থাক। এই আগুন জ্বালানের সঙ্গেই ফানুসের মধ্যের হাওয়া গরম হয় এবং তা' চারদিকের বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্কা হয়; তখন সেটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠ্‌তে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আগুন জ্ল্‌তে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফানুসের ভিতরের হাওয়া গরম থাকে ব'লে আকাশে উড়ে বেড়ায়; কিন্তু আগুন নিভে গেলে ফানুসের ভিতরের হাওয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হয়, তখন ফানুস্‌ আর আকাশে থাক্‌তে না পেরে নীচে নেমে আসে। এই হ'ল ফানুস্‌ আকাশে উড়ে বেড়ানোর রহস্য। তাই দেখে আকাশপথে ঘুরে বেড়াতে পারা যায় কিনা সেই খেয়াল ক্রমশঃ মানুষের মাথায় এল।

প্রায় দেড়শ' বছর পূর্ব্বে ফ্রান্সের এক কাগজ-ব্যবসায়ীর দুই পুত্র **জোসেফ্‌ মাইকেল্‌ মঁগোফিয়ে** এবং **জ্যাক্‌ এতিএঁ মঁগোফিয়ে**—ফানুস্‌ জাতীয় এক প্রকার বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওড়া যায় কিনা—সেই সম্বন্ধে কয়েক বছর ধ'রে চেষ্টা কর্‌ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা সফলও হ'য়েছিলেন। তাঁরা এক রকম কাপড়ের বেলুন তৈরী ক'রে সেটি গরম ধোঁয়া বা হাওয়া ভর্ত্তি ক'রে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আকাশে ছেড়ে দেন। সেই বেলুনে তিনজন যাত্রী ছিল—যাত্রী তিনটির নাম শুনলে তোমরা হয়তো হাস্‌বে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে তা'রাই সর্ব্বপ্রথম আকাশে বেড়ানোর সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিল। যাত্রী তিনটির মধ্যে একটি হ'ল ভেড়া, একটি কুকুর এবং তৃতীয়টি হ'ল হাঁস! এই তিনজন যাত্রিসহ বেলুনটি ৭।৮ মিনিট আকাশে থেকে ক্রমশঃ নীচে নেমে আসে এবং যাত্রী তিনজনও সম্পূর্ণ অক্ষত এবং সুস্থ দেহে আবার পৃথিবীতে এসে পৌছে। সেই ঘটনাতে ফ্রান্সে মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল এবং কি ক'রে আকাশে ওড়া যায় সেই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা এবং চেষ্টাও চল্‌তে থাকে।

উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক **ক্যাভেণ্ডিস** (Cavendish) পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ ক'রেছিলেন যে, হাইড্রোজেন নামক এক রকম গ্যাস্ আছে—যা' বাতাস থেকে প্রায় ১৪ গুণ হাল্কা ; সুতরাং এই হাইড্রোজেন্ গ্যাসও বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দিলে তা' গরম হাওয়ার মত উপরে উঠ্‌তে থাক্‌বে। ক্যাভেণ্ডিসের সেই প্রমাণ কাজে লাগানোর চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে **চার্লস্** এবং **রবার্ট** নামক দু'জন ইংরাজ হাইড্রোজেন-পূর্ণ বেলুনের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম আকাশে উঠেন। তারপর বিখ্যাত **ভিন্সেণ্ট লুনার্ডি** (Vincent Lunardi) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড সহরে হাইড্রোজেন-পূর্ণ বেলুনে চ'ড়ে উপরে উঠেন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখে **ব্ল্যাঙ্কার্ড** (Blanchard) এবং **জেফেরিজ** (Jefferies) নামক দু'জন ইংরাজ বেলুনের সাহায্যে ইংলিশ চ্যানেল পার হ'ন। সেই সকল বেলুন—হাওয়া যখন যেদিকে যেত সেইদিকেই শুধু যেতে পার্‌ত ; ইচ্ছামত এদিক-ওদিক চালানোর যন্ত্র তখন কিছুই ছিল না। পরিচালক-যন্ত্র-বিশিষ্ট বেলুন **নদর** (Nadar) নামক একজন ইংরাজ প্রথম তৈরী করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর সেই বেলুন ১৪ জন লোক নিয়ে আকাশে উঠেছিল। কিন্তু সেই পরিচালক-যন্ত্র মোটেই সন্তোষজনক বা উপযুক্ত ছিল না।

উন্নত ধরণের পরিচালক-যন্ত্র-বিশিষ্ট বেলুন **কাউণ্ট জেপেলীন্** নামক একজন জার্ম্মাণ প্রথম আবিষ্কার ক'রেছিলেন ; কাজেই তাঁ'কেই এয়ার্‌শিপ্ বা উড়োজাহাজের জন্মদাতা বলা যায়। এই জার্ম্মাণ-ধনী ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম **কাউণ্ট ফার্দ্দিনান্দ ভন্ জেপেলীন্** (Count Ferdinand Von Zeppelin)।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব চল্‌ছিল। সেই সময়ে জেপেলীন্ জার্ম্মেণীর সামরিক বিভাগে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি জার্ম্মেণী হ'তে আমেরিকা যান এবং সেই ঘরোয়া বিবাদে যোগ দেন। সেই সময়ে আমেরিকাতে বেলুনের সাহায্যে আকাশ হ'তে শত্রুপক্ষের সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত এবং তা'তে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যেত দেখে, কাউণ্ট জেপেলীন্ অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে যান। তিনি জার্ম্মেণীতে ফিরে বেলুনের সাহায্যে যুদ্ধকালে কি সুবিধা হয়, তা জার্ম্মাণকর্ত্তৃপক্ষকে বলেন—তারপর যুদ্ধের সময়ে যা'তে বেলুন ব্যবহার করা যায় সেই সম্বন্ধে নিজেই চেষ্টা কর্‌তে থাকেন।

জেপেলীন্ লক্ষ্য ক'রেছিলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বেলুন ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেইগুলো সবই আবদ্ধ বেলুন, অর্থাৎ সেই বেলুনগুলো শক্ত মোটা দড়ি বেঁধে ছাড়া হ'ত, যেন টেনে প্রয়োজনমত নীচে নামান যায় ; নতুবা উহা বাতাসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় চ'লে যাবে তা'র ঠিক নেই। ঐ রকম আবদ্ধ বেলুনের সাহায্যে খুব বেশী দূর দেখাও সম্ভব নহে। সেই অসুবিধা লক্ষ্য ক'রে তিনি স্থির কর্‌লেন—এমন এক রকম বেলুন তৈরী কর্‌তে হবে—যা' বাতাসের গতি উপেক্ষা ক'রে যেদিকে ইচ্ছা চালান যেতে পারে।

তিনি প্রথমে একখানা খুব বড় এবং বহুমূল্য উড়োজাহাজ তৈরী কর্‌লেন, কিন্তু উহা ভাল চল্‌ল না। নিরুৎসাহ না হ'য়ে আবার একখানা তৈরী কর্‌লেন এবং তা'রপরে একটির পর একটি উড়োজাহাজ তৈরী কর্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু একটিও সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হ'ল না। ফলে তিনি খুব শীঘ্রই দেউলিয়া হ'য়ে গেলেন; সকলে তাঁ'কে পাগল ব'লে ঠাট্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তিনি লোকের কোন কথায় কান না দিয়ে, এক মনে নিজের কাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং শেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি সুন্দর ও নিরাপদ্ পরিচালক-যন্ত্র-বিশিষ্ট উড়োজাহাজ তৈরী কর্‌তে সমর্থ হ'লেন। তাহা আকাশপথে প্রায় তিনশ' মাইল ঘুরে নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে পৌঁছল। এই অসামান্য সফলতা দেখে ইউরোপময় প্রবল সাড়া প'ড়ে গেল এবং জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁ'কে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য কর্‌তে লাগলেন। কাউণ্ট জেপেলীন্ নিজের

R. 100 নামক উড়োজাহাজ

নামানুসারে তাঁ'র তৈরী উড়োজাহাজের নাম রাখ্‌লেন, **জেপেলীন্** (Zeppelin)। ঐ রকম পরিচালক-যন্ত্র-বিশিষ্ট উড়োজাহাজের আর একটি নাম "ডিরিজিবল্" (Dirigible)।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে কাউণ্ট জেপেলীন্ বহু জেপেলীন্ তৈরী ক'রেছিলেন। সেই জেপেলীন্-বাহিনী ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অনেক ক্ষতি ক'রেছিল। জেপেলীনের দেখাদেখি মিত্র-শক্তিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে **এরোপ্লেন** তৈরী ক'রে ফেল্‌লেন। এরোপ্লেনের দ্বারা জেপেলীন্‌গুলো একেবারে বিধ্বস্ত হ'তে লাগ্‌ল। কারণ—প্রথমতঃ এরোপ্লেন, জেপেলীন্ অপেক্ষা অনেক ছোট এবং হাল্কা ব'লে খুব দ্রুত চলাফেরা কর্‌তে পারে; দ্বিতীয়তঃ জেপেলীন্ হাইড্রোজেন্ গ্যাসের সাহায্যে চলে; হাইড্রোজেন্ দাহ্য গ্যাস্—আগুনের ছোঁয়াচ লাগা মাত্রই জ্বলে' উঠে।

শত্রুরা সে খবর জান্‌ত, কাজেই জেপেলীন্ দেখামাত্রই কামান ছুড়্‌ত! সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথেই জেপেলীন্‌গুলো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে' একেবারে ছাই হ'য়ে যেত।

যুদ্ধাবসানে জার্ম্মেণী সামরিক কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য জেপেলীন্ অপেক্ষা আরও সুদৃঢ় এবং উন্নত প্রকারের উড়োজাহাজ তৈরী কর্‌তে লাগ্‌ল। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র এরোপ্লেন নিয়েই মেতেছিলেন। পরে জার্ম্মেণীর দেখাদেখি ঐ দুই দেশেও জেপেলীনের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ হ'ল।

সেই চেষ্টার ফলে জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—এয়ার্‌শিপের অনেক উৎকর্ষ সাধন হ'ল বটে, কিন্তু জার্ম্মেণীর মত একটি দোষের জন্য একটির পর একটি ক'রে মহামূল্য এয়ার-

জার্ম্মেণীর প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ 'হিণ্ডেনবুর্গ'
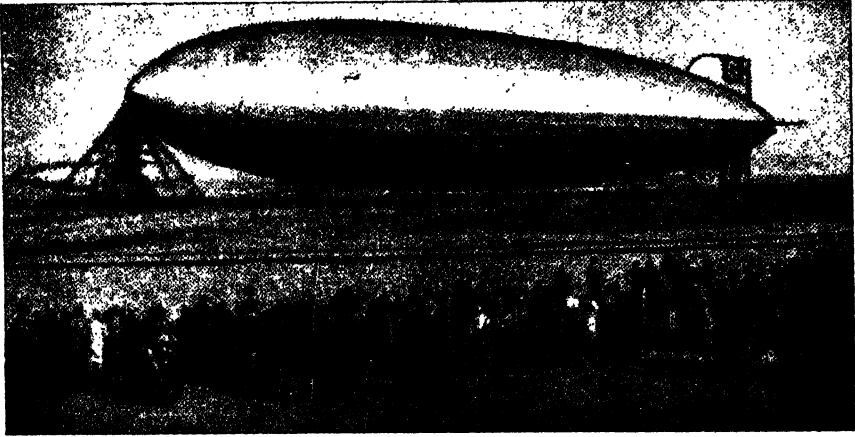
শিপ্‌গুলো নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। শেষে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় হিলিয়ম্ (Helium) নামক অদাহ্য গ্যাস্ আবিষ্কৃত হ'ল। তাহা প্রায় হাইড্রোজেনের মতই হাল্কা; অথচ তা'তে মোটেই আগুন লাগে না। কিন্তু হিলিয়ম্ গ্যাস্ মহা মূল্যবান্। অত দাম দিয়ে গ্যস্ কিনে এয়ার্‌শিপ্ চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব। তা' ছাড়া উহা কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোথাও মিলে না। সেই কারণে এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মেণী এবং ইংলণ্ডে হিলিয়ম্ গ্যাস-পূর্ণ এয়ার্‌শিপ্ তৈরী করা সম্ভবপর হয় নি—কেবল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দু'-একখানা এয়ার্‌শিপে হিলিয়ম্ ব্যবহার করা হচ্ছে।

পূর্ব্বেকার জেপেলীনের তুলনায় এখনকার এয়ার্‌শিপ্ বহুগুণ আরামপ্রদ এবং স্বচ্ছন্দ-দায়ক। এমন কি কোনও কোনও এয়ারশিপে এখনকার এরোপ্লেন অপেক্ষাও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকতর

সুব্যবস্থা আছে ; কিন্তু একটি মাত্র দোষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ এবং কত লোকের প্রাণ নষ্ট হ'য়েছে সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

'R—33', 'R—34', 'R—38', 'R—100' প্রভৃতি কয়েকখানা ব্রিটিশ এয়ার্‌শিপ্ তৈরী কর্‌তে প্রায় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড (দুইশ' কোটি টাকা) ব্যয় হ'য়েছিল, কিন্তু ঐ ক'টিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর যে ব্রিটিশ উড়োজাহাজখানা তৈরী করা হ'ল তা'র নাম 'R—101'। এই এয়ার্‌শিপ্‌খানা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের মনে হ'ল—এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হবে। কিন্তু বহু পরীক্ষা সত্ত্বেও

আগুন লাগিয়া হিণ্ডেনবুর্গ্ ধ্বংস হইতেছে (রেডিও ফটো)

সকলের আশা নির্মূল হ'য়ে গেল—ইংলণ্ড হ'তে ভারতবর্ষের দিকে আসার সময়ে ফ্রান্সের অন্তর্গত **বুঁভে** (Beauvais) নামক পার্ব্বত্য স্থানে উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল এবং বহু লোকের মৃত্যু হ'ল। সেই সঙ্গেই এয়ার্‌শিপ্ তৈরী করার সকল কাজই ইংলণ্ডে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

শেনান্‌ডোয়া (Shenandoah) নামক একটি এয়ার্‌শিপ্ বহু অর্থব্যয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত করা হয়—উহা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তা'র পর **লস্ এঞ্জেলস্** (Los Angeles) নামক একখানা উৎকৃষ্ট এয়ার্‌শিপ্ তৈরী হ'য়েছিল ; কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ওটিকে ব্যবহার করা বন্ধ করা হয়। অতঃপর প্রায় ১১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে **অ্যাকরন্** (Akron)

নামক আর একখানা এয়ারশিপ্ তৈরী করা হয়, কিন্তু তাহাও **নিউজারসীর** (New Jersey) সমুদ্রোপকূলে সমাধিলাভ করে এবং ৭৪ জন লোক মারা যায়। ঐ দুর্ঘটনার দু' সপ্তাহ পরে **মেকন্** (**Macon**) নামক একখানা এয়ারশিপ্ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম যাত্রা সুরু করে এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যানফ্রান্সিসকোর (San Francisco) নিকটে উহা প্রশান্ত মহাসাগরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে, এয়ারশিপ্‌খানা হিলিয়মগ্যাস্-পূর্ণ থাকাতে আগুন লাগ্‌তে পারে নি; কেবল দু'জন যাত্রী ভিন্ন আর সকল যাত্রীই বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত জার্ম্মেণীতে অত বেশী এয়ারশিপ্ নষ্ট হয় নি এবং সেই জন্যই এখন পর্য্যন্তও জার্ম্মেণীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এয়ারশিপ্ তৈরী হচ্ছে এবং এয়ারশিপের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিরও চেষ্টা চল্‌ছে। জার্ম্মেণীর এয়ারশিপ্‌গুলোর মধ্যে **গ্রাফ্ জেপেলীন্** (Graf Zeppelin) এবং **হিণ্ডেনবুর্গ্** (Hindenburg) নামক এয়ারশিপ্ দু'খানাই প্রকাণ্ড—আবার হিণ্ডেনবুর্গ্ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এয়ারশিপ্।

'R—101' নামক ব্রিটিশ এয়ারশিপ্‌খানা নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার পরে তা'র ধাতুনির্ম্মিত কাঠামখানা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট কিনে নিয়ে সেই কাঠামেই হিণ্ডেনবুর্গ্ তৈরী করেন। হিণ্ডেনবুর্গের কাঠাম ডুর‍্যালুমিনিয়ম্ (Duraluminium) নামক একপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত ছিল। "হেভি অয়েল" (Heavy Oil) নামক একপ্রকার অদাহ্য তেলে হিণ্ডেনবুর্গ্ চল্‌ত। আরামের দিক থেকেও হিণ্ডেনবুর্গ্ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আরামদায়ক উড়োজাহাজ। ঐ 'এয়ারশিপের' সকল কেবিনে ঠাণ্ডা এবং গরম জলের ব্যবস্থা ছিল এবং চলন্ত জাহাজে সকল খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহারও ছিল। তা' ছাড়া, মদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা, সিগারেট খাওয়ার জন্য পৃথক্ ঘর, খাবার ঘর এবং ড্রইংরুম্ও ছিল। হিণ্ডেনবুর্গ্ প্রায় হাজার ফুট অর্থাৎ ৬৬৭ হাত লম্বা ছিল, একশ' যাত্রী নিয়ে উহা ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে যেতে পারত। ঐ এয়ারশিপ্‌খানা বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার **একনার** (Dr. Ecuner) তৈরী ক'রেছিলেন। সকলরকম সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩৪ জন যাত্রীর মৃত্যু হ'ল। হিণ্ডেনবুর্গ্ ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, জার্ম্মাণীতে এয়ারশিপ্ চালান বন্ধ আছে। বিখ্যাত জার্ম্মাণ এয়ারশিপ্ গ্রাফ্ জেপেলীন্‌খানাই বর্ত্তমানে একমাত্র প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ অবশিষ্ট থাক্‌ল। এই এয়ারশিপ্‌খানা বহু সহস্র যাত্রী নিয়ে বহুলক্ষ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসেছে এবং এখন পর্য্যন্ত উহাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি।

যতদিন **হাইড্রোজেন্ গ্যাস্** ব্যবহার করা হবে, ততদিন এয়ারশিপ্‌গুলো যতই আরামদায়ক এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হোক না কেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম্. এ., বি. এস্-সি., বি. কম্.

মাটির ছেলে

অই যে মাটি-মায়ের ছেলে, অই যে মোদের গাঁয়ের চাষা,
মাটির বুকে ঢাল্‌লো ওরা প্রাণের নিবিড় ভালবাসা !
ওরাই ধরায় আন্‌লো লক্ষ্মী অধ্যবসায়-আসন পেতে,
মাটির বুকের গোপন-সুধা ভ'রে দিল শ্যামল-ক্ষেতে !

মাটির তীর্থ মাটির স্বর্গ গড়্‌লো ওরা জীবন দিয়ে,
ওরাই মায়ের কর্‌লো বোধন হৃদয়-ফুলের অর্ঘ্য নিয়ে !
দেখ্‌লো ওরা বিশ্বময়ী মায়ের ছবি মাটির মাঝে,
ওদের ঘরে অন্নপূর্ণা এলো মূর্ত্তিমতী সাজে !

চায় নি ওরা অর্থ-বিলাস, চায় নি ওরা কীর্ত্তি-মান,
ইট-পাথরের প্রাসাদ-মায়া ভুলায় নিকো ওদের প্রাণ ।
জীবনভরা উচ্চ আশা, বড় হওয়ার স্বপ্ন যত,
ওদের মনে দেয় নি সাড়া, নেয় নি ওরা মহৎ ব্রত !

এত বড় জগৎখানার রাত্রি-দিনের খবরগুলি
দাঁড়ায় নিকো ওদের কাছে অন্ধকারের আড়াল তুলি' ।
ওরা শুধু চষ্‌ছে জমি, লাঙ্গল আর কাস্তে হাতে,
সারা জীবন মাটি-মায়ের স্নেহের আশিস্‌ বইছে মাথে !

সহর-মায়ায় আমরা ভুলে গেছি ভিটা শূন্য ক'রে,
তাই ত মাটি-মায়ের ঘরে শ্মশান-ছবি উঠ্‌ছে ভ'রে ।
ওরাই তবু আছে প'ড়ে মাটি-মায়ের চরণ-তলে,
কখনও বা সইছে মারী অন্নকষ্ট অশ্রু-জলে !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ঠাকুর্দ্দা

(টুইশান অনুসন্ধান পর্ব্ব)

প্রণব ঠাকুর্দ্দাকে ধ'রেছে গল্প বলার জন্য। ঠাকুর্দ্দা বল্লেন—"ওরে, সে কি হয়? আমরা হচ্ছি মোহরের আমলের—আর তোরা হচ্ছিস্ আধুলির আমলের! আমাদের সময়কার গল্প তোদের ভালই লাগ্‌বে না। তোরা ঠাট্টা ক'রে কত কি বল্‌বি!"

প্রমোদ, প্রণবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গল্পের কথা শুনে সেও ঠাকুর্দ্দার সাম্‌নে এসে বস্‌ল।

প্রণব বল্লে—"তা, আধুনিক আমলের গল্পই বলুন না কেন?—আপনি তো ক'লকাতা চাকুরির চেষ্টায় কত ঘুরেছেন। তা'রই একটা গল্প বলুন।"

ঠাকুর্দ্দা বল্লেন—"তুই দেখ্‌চি নেহাৎ নাছোড়বান্দা। আচ্ছা তা' হ'লে আমার টুইশান খোঁজার গল্পই বল্‌ব। ক'লকাতা নেহাৎ বেকার অবস্থায় দিন যাচ্ছে—কোনও প্রকারে দিন কাটে না। অনেক খুঁজে খুঁজে টুইশান পাওয়া গেল না। হতাশ হ'য়ে বিখ্যাত দৈনিক ··· পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিলুম।···

প্রমোদ ঠাকুর্দ্দার সাম্‌নে এসে বস্‌ল

'পড়াইতে চাই। অভিজ্ঞ, এম. এ., বি. টি.-পড়া শিক্ষক। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী উভয়ই পড়াইতে প্রস্তুত আছি। অনুসন্ধান করুন। বক্স নম্বর··· c/o···পত্রিকা, কলিকাতা।'

আমার বন্ধু সুধীন বল্‌ল, 'দেখ্‌বি ঠিক ঠিক জবাব এসে যাবে; এত উত্তর আস্‌বে যে, তুইহাতে টুইশান ক'রে সার্‌তে পার্‌বি নি।' আমার কিন্তু তা'তে যথেষ্ট সন্দেহ র'য়ে গেল; কিন্তু জবাব এলো সত্যি সত্যি বহু। অনেক বেছে তিনখানা বের কর্‌লাম—একখানা বেহালা, একখানা শ্যামবাজার আর একখানা উত্তরপাড়া হ'তে। জায়গাগুলো দূরে দূরে হ'য়ে গেল—তা' আর কি করা? আমি তখন থাকি কালীঘাট—আর কোথায় শ্যামবাজার, কোথায় বেহালা, আর কোথায় উত্তরপাড়া!' শুনেছিলাম পেটে খেলে পিঠে

সয় ; তাই মনে হ'ল—হাতে পেলে হয়তো পায়েও সয়ে যাবে। তাই একদিন 'দুর্গা, শ্রীহরি, বাবা ঠন্ঠনিয়ার কালী' ব'লে রওয়ানা হ'য়ে গেলুম।

প্রথমেই গেলাম শ্যামবাজারের দিকে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে একখানা রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি বন্ধু সুধীন অপর দিক থেকে আস্ছেন। বন্ধুপ্রবর আমার কাজের কথা শুনে রিক্সওয়ালার সঙ্গে দর কশাকশি আরম্ভ ক'রে দিলেন—

'আরে তোম্ শ্যামবাজার চিন্তা হ্যায়—অল্প দূর লাগ্তা হ্যায়, বাবু ঐ জায়গায় যেতে চাতা হ্যায়। ছয় পয়সা তোমার মিলেগা হ্যায়।'

আমি বন্ধুপ্রবরের হিন্দী শুনে আর হাসি সাম্লাতে পারি নি। তা হোক, বন্ধুর কশাকশিতেই কাজ হ'ল ; গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত ছয় পয়সায় ঠিক হ'য়ে গেল।

যেতে যেতেই প্রায় সন্ধ্যা—তারপর সেই লেন-এর খোঁজ কর্তে কর্তে প্রায় রাত্রি হ'য়ে গেল। মস্ত বড় তেতলা বাড়ী—কিন্তু ঘরে একটুও আলো নেই। মনে হ'ল একটা পোড়ো বাড়ী। বাড়ীর বারান্দার দিকে দেখা গেল তখনও অধিবাসীদের তোষক-বালিশ রৌদ্র উপভোগ কচ্ছে! একবার মনে করি—ফিরে যাই ; আবার ভাবি—না ; পয়সা খরচ ক'রে যখন এসেছি, শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক্ না! ভাগ্যক্রমে রাস্তা দিয়ে রেমিংটন কোম্পানীতে চাকরি ক'রে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে সমস্ত জেনে নিলেন। তারপরই ডাক সুরু হ'ল—'অ মুখুয্যে মশাই, মুখুয্যে মশাই, বল্লি এখনই কি মধ্য-রাত্রি হ'য়ে গেল? দেখুন আপনাকে কে খুঁজ্ছে।'

তারপরই শোনা গেল চটর্-চটর্। একমিনিটের মধ্যেই দেখ্লুম দোতলার বারান্দায় এক ভদ্রলোক এসে তোষক-বালিশগুলোর পাশেই দাঁড়ালেন। উপর থেকেই প্রশ্ন হ'ল, 'মশাই বুঝি টুইশানের খোঁজে এসেছেন? তা মশাই, কত হ'লে পার্বেন?'

আমি তো অবাক্! ছাত্র কোন্ ক্লাশে পড়ে, তা'কে কি পড়াতে হ'বে, বলা নেই কওয়া নেই—শুধু প্রশ্ন হ'ল, 'কত হ'লে পার্বেন?' আর তাও কি দোতলা থেকেই কাজ সারা! আমারও রাগ হ'ল ; বল্লাম—'২০৲ টাকার কমে আমি কোনও প্রকারেই রাজি নই! আর একবেলা পড়া'ব।' ভদ্রলোক চ'টে উঠে' উপর থেকেই বল্লেন—'মশাই—২০৲ টাকা! জানেন রাস্তায় পাঁচ টাকায় কত টিউটার আছে? মশাই আমার বাড়ীতে—মশাই ক্লাশ এইট্-এর ছাত্রকে দু'বেলা পড়িয়ে যাচ্ছে—মশাই তা'কে দিচ্ছি সাত টাকা! পার্বেন মশাই আপনি?'

আমার তখন রাগ হ'য়ে গেছে বেজায়,—জবাব দিলাম—'৭৲ টাকায় whitewash হয় না, limewash হয় ; কম টাকার শিক্ষক লক্ষ্মীপূজা সেরে—তাড়াতাড়ি চূণকাম করার ইংরাজকে limewash শিখিয়ে দেয়। যে ঠিকানা দিয়েছেন তা'তে দেখা যায় মশাই লাইফ ইন্শূরেন্সের একজন কর্ত্তা, তা সাত টাকা দিয়ে তো আপনারাই অতি শীঘ্র 'লাইফ'কে নষ্ট ক'রে দেন। দুঃখ হয় না, দয়া হয় না ?—নিজে এত বড় বাড়ীতে থাকেন, আর ছেলের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষককে মাত্র সাত টাকা দিচ্ছেন ? আবার তা'র গর্ব্ব করেন !—ভদ্রলোক এসেছে—চিঠি দিয়েছেন দেখা করার জন্য। বড়লোকের অভিমান নিয়ে দোতলা থেকেই কথা বল্ছেন !!—আপনার মত লোকের বাড়ীতে যে টুইশান করে, সেও মশায় ছোট হ'য়ে যায়—তা'রও বাড়ীতে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত তোষক-বালিশ রৌদ্রের অপেক্ষায় থাকে—' ব'লেই আমি সেখান থেকে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়—আবার পেছন ফিরে তাকাই—দেখি কেউ লাঠি টাঠি নিয়ে আসে কি না !"

এখানে ঠাকুর্দ্দা একটু থাম্লেন—ভাবটা হচ্ছে—দৌড় যে দিয়েছিলাম—তা'র ক্লান্তিটা এখনও মনে আছে। আবার সুরু হ'ল—

"এবার বেহালা অভিযান-পর্ব্ব বল্ব। সেদিন যে আর কোথাও যাওয়া হ'ল না তা সহজেই বুঝ্লে। মনটা একেবারে বিরক্তিতে ভরা। তাই পরদিন আবার বৈকালে যা'ব ঠিক কর্লাম। চিন্তা ক'রে, গবেষণা ক'রে দেখ্লাম—শ্যামবাজার গিয়েছিলাম রবিবার অর্থাৎ কিনা মহানিষ্ফলার দিন। তায় আবার পাঁজি খুলে দেখি রিক্তা নক্ষত্র ছিল তাইতে। ছোটকালে পিসিমা ব'লেছিলেন—কি জানি কি, 'রিক্তায়াং মরণং ধ্রুবং'—দূর ছাই মনেও পড়ে না। তা হোক—তাড়াতাড়ি পরের দিনটা দেখি ত্রয়োদশী—একেবারে সর্ব্বসিদ্ধি। এবার আর ঠন্ঠনিয়া নয়, একেবারে কালীঘাটের কালী জাগ্রতা স্বয়ং-এর নাম নিয়ে রওয়ানা হওয়া গেল।

ঠিকানা মত পৌঁছে দেখি বাড়ীর দরজায় মস্ত বড় এক 'ভুঁণ্ডিরাজে'র ছবি—আর তা'র নীচে লেখা—'সর্ব্বচূর্ণ সালসা—সেবনে অশান্তি দূর হয়, পরীক্ষায় পাশ হয়, মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, হারান জিনিস ফিরে পাওয়া যায়, বিনা পয়সায় মোটরে যাওয়া চলে ; আর সর্ব্বোপরি এর ঘ্রাণ মাত্রেই এক মুহূর্ত্তে আমার মত মোটা হওয়া যায়।' তোমরা তো জানই আমার শরীরখানা ডজন তিনেক 'সিক্ডাইটে'র রুটির দেহ। তা' আমারও মনে হ'ল—ছবির তুলনায় আমি শিশু—একেবারে শিশু !

বাড়ীর লোককে খবর পাঠিয়ে দিলাম। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন যে ভদ্রলোক, তা'কে দেখে মনে হ'ল—তিনি সর্ব্বচূর্ণ সালসাই প্রচুরপরিমাণে সেবন ক'রেছেন! দেহখানা একটি—যাকে ভাল বাংলায় বলে 'শুষ্ক কাষ্ঠ বিশেষ'। নেহাৎ প্রলোভন সামলান কষ্ট মনে ক'রে তা'কে জিজ্ঞেস কর্‌লাম—'আপনিই বুঝি সর্ব্বচূর্ণের বিক্রেতা?'

ভদ্রলোক 'খুক্' ক'রে একটু কেসে ব'লে উঠ্‌লেন, 'বিক্রেতা কি—আবিষ্কারক! বুঝ্‌লেন কিনা—আপনি একটু খেয়ে দেখুন না—বুঝ্‌লেন কিনা আরও কত ভাল স্বাস্থ্য হ'য়ে যাবে আপনার! বুঝ্‌লেন কিনা দরজায় ছবি দেখেছেন তো?'

'আপনিই বুঝি সর্ব্বচূর্ণের বিক্রেতা?'

আমি আবার জিজ্ঞেস কর্‌লাম—'তা' হ'লে মশায় কি নিজে সর্ব্বচূর্ণ সালসা খেয়েছেন?—যাতে আপনার শরীরের ব্যাধি আর চূর্ণ হচ্ছে না, সব আস্ত থেকে যাচ্ছে? তা যা হোক, এই একটা বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনিই কি চিঠি দিয়েছিলেন? দেখুন, আমি তাই দেখা কর্‌তে এসেছি।'

ভদ্রলোক একটু তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, 'তা—বুঝ্‌লেন কিনা আপনাকে আমরা ৮৲ টাকা দি'—বুঝ্‌লেন কিনা—তুবেলা এসে পড়াবেন। কিন্তু একটা কথা, বুঝ্‌লেন কিনা আপনার কোয়ালিফিকেশ্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন তো? বুঝ্‌লেন কিনা—আপনার প্রশংসাপত্র সব দেখান, আমাদের তো জানা দরকার!'

প্রণব, তুমি তো জানই আমার মেজাজ এসব ক্ষেত্রে স্থির থাকে না। দিবে ৮৲ টাকা, তু'বেলা পড়াবে—ক্লাশ ফোর্‌-এর ছাত্র, তায় আবার অভিভাবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র আরও কত কী দেখিয়ে নিয়ে তবে টুইশান পাওয়া যাবে!

চাই না এ রকম আত্মসম্মান ছোট ক'রে টুইশান। তা 'সর্ব্বচূর্ণকে' ছাড়্‌ব কেন সহজে? একচোট ভাল রকমে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলাম—মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে যা'রা ব্যবসা চালায়—তা'রা কি বুঝবে শিক্ষকের মর্ম্ম?—শিক্ষকতা করা অর্থ—অসাধুতা নয়। অতএব সে-স্থান হ'তেও বিদায় হ'লাম। আমার আর বেশী বুঝার দরকার হ'ল না।

এখন বাকি মাত্র উত্তরপাড়ায় যাওয়া। বালি ব্রীজের নাম শুনেছিলাম বহুদিন—মনে মনে ঠিক ক'রে নিলাম—এইবার শিয়ালদহ থেকে বালি ব্রীজ দিয়ে উত্তরপাড়া ব্রীজটাও দেখে আস্‌ব। এবার আর 'দুর্গা কালী' কিছু নয়—একেবারে অদৃষ্ট ব'লেই মঙ্গলবার শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে পাড়ি দিলাম।

তোমাকে মিথ্যা বল্‌ব না, বালি ব্রীজের উপর দিয়ে ট্রেনটা যখন যাচ্ছিল, যেন দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম না জানিয়ে পারি নাই। শত হ'লেও মন যে বুঝ মানে না—অত বড় সাধকের পীঠস্থান—তাঁর উদ্দেশ্যেও তো একটা প্রণতি জানাতে হয়।

উত্তরপাড়ায় আমার দেখা করার কথা কলেজ লেনের ১০।২৯।১৫ নম্বর বাড়ীতে। বাড়ীর ঠিকানা আন্দাজ ক'রে পৌছে দেখি একদল শিক্ষক সেখানে 'জিয়ান' র'য়েছে। জিয়ান কি বুঝ্‌লে তো?—লোকে যেমন জ্যান্ত মাছকে জিইয়ে রাখে, তেমনি আমার পূর্ব্ব থেকেই বেশী নয়—জন পনের বসেছিলেন প্রার্থী হ'য়ে। কেষ্টর জীব আমি অচল দুর্ব্বল নিঃসহায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হ'লাম। গিয়ে দেখি একটা মহাগাম্ভীর্য্যের রাজত্বের মধ্যে প'ড়ে গেছি। সকলেরই যেন জমিদারি নিলামে চ'ড়েছে—নয় তো পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় আসন্ন। সকলেই চুপ ক'রে ব'সে আছে। আবার কেউ কা'রও সঙ্গে কথা বলেন না—পাছে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়!

এক এক ক'রে ভদ্রলোকেরা যেতে আরম্ভ কর্‌লেন; আমার আরম্ভ হ'য়ে গেল প্যালপিটেশন! এক বুড়ো ভদ্রলোকই—সম্ভবতঃ তাঁর বয়সের অগ্রগণ্যতা প্রমাণ করার জন্য—সবার আগে গেলেন। তিনি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে এসেছেন যে, এবারকার টোপ তাঁরই অদৃষ্টে গাঁথ্‌ল। তিনি যেন আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লেন—'তা মশায়, টুইশান করা কি সহজ! এই তো আমি পঁচিশ বছর ধ'রে মাষ্টারি কচ্ছি, আমাকেও এই ছেলের অভিভাবক ভদ্রলোক বল্লেন কি না—একদিন তাঁর সাম্‌নে পড়িয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখাতে হবে! তাই তো

ভাবি, কত ডান, গান, ম্যাকডোনাল্ড, সার্প, বটমলি, জেঙ্কিন্‌স্‌ পড়া দেখে গেল—এখন আবার এই ক্লাশ এইট্‌-এর ছাত্রের জন্য পড়া দেখিয়ে তবে টুইশান ঠিক হবে !! তা' মশায়, স্কুলের মাইনে পাই মাত্র ৫০৲ টাকা, ছেলে দুটি কলেজে পড়ে—পড়ার খরচ তো চালান দরকার ! তাই সমস্তই স্বীকার ক'রে আস্‌তে হ'ল।'

'ট্রায়াল' নাম শুনেই আমার যেটুকু আশা ছিল তাও উবে গেল। ভাব্‌লাম, এসেছি যখন, এম্‌নি ফিরে যা'ব ? তাই আমার 'টার্ণ' আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হ'ল। যাওয়া মাত্রই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস কর্‌লেন —আমি কদ্দূর পর্য্যন্ত প'ড়েছি। তখন আমাকে সত্য কথাই বল্‌তে হ'ল যে, আমি এম. এ. কোর্স কম্‌প্লিট ক'রেছি মাত্র। আশ্চর্য্যের কথা এই—ভদ্রলোক আমাকেও 'ট্রায়াল' দেওয়ার কথা বল্লেন। আমি একবার ভাবি কড়া জবাব দেই—আবার ভাবি থাক্‌, শত হ'লেও মাসান্তে ২০৲ টাকা পাওয়া যাবে ; ২০৲

'টুইশান করা কি সহজ ! ...'

টাকার যথেষ্ট মূল্য আছে। দরিদ্রের আবার সম্মান কি ? তা'তেই স্বীকৃত হ'লাম। ভদ্রলোক বল্লেন—পরের সপ্তাহে তিনি আমাকে একখানা চিঠি দিবেন। চিঠি যে আর আসে নি' এটা বলাই বাহুল্য। আমি এই টুইশান-অভিজ্ঞতা, আর চিট্‌জয় কোম্পানির অভিজ্ঞতা থেকে—এটা ঠিক ক'রেছি, একটা নূতন কিছু ক'রে দেশ-যোড়া নাম না হ'লে আর আজকাল কিছু সুবিধা হয় না ! তাই না অনেক গবেষণা ক'রে, অনেক বুদ্ধি খরচ

ক'রে এই ছারপোকা আন্দোলন আরম্ভ করি ! তাই বা সুবিধা কোথায় ?—তোমাদের যন্ত্রণায় সেই আন্দোলন ক'রে একটু নাম কিনব, তা'রও সুযোগ নষ্ট হ'য়ে গেল। কয়েকজন ভদ্রলোকের একটি রাত্রের ঘুম নষ্ট হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু তা'র ফলে আমার যথেষ্টই লাভ হ'য়েছে। দেখ গিয়ে আজ বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকায় আমার নাম বড় বড় অক্ষরে উঠে গেছে—আমি আজ বিখ্যাত পুরুষ।"

এই খানেই ঠাকুর্দ্দা থাম্‌লেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

প্রভাত-বর্ণনা

(সহুরে সংস্করণ)

ষ্টেশনে থামিল গাড়ী, রাতি পোহাইল,
সুট্‌কেশ লোভে কুলি আসিয়া জুটিল।
উষাচর পালে পালে চলে ফুট্‌পাথে,
'ডিস্পেপ্‌টিক্‌' বাবুগণ দেয় মন চা-তে।
ঘোলাটে কলের ধোঁয়া আট্‌কায় শ্বাস,
রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকারের 'রাস্‌'।
রেস্তোরাঁ হইতে আসে ঘ্রাণ পরোটার,
(সেথা) চা-চপাশী ছেলে-বুড়ো করে গুলজার।
কপালে চস্‌মা গুঁজে কাগজে মগন—
চারি গোলে গোরা কাবু—পুলকিত মন।
পার্কে ধাইছে গিন্নী জুড়াতে শরীর,
(এদিকে) খোকার ভাঙ্গিল ঘুম—চীৎকারে অস্থির।
'মাস্থ্‌লী' রেখেছ কোথা, খুঁজে লও ভাই,
'ডবল-ডেকারে' চল ঘুরপাক্‌ খাই।

শ্রীকরুণাময় ঘোষ

বীরত্বে বাঙ্গালী

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে কিংবা ঐশ্বর্য্যে, বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব-খ্যাতি মহামহিমান্বিত দিল্লীশ্বরকেও চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের নিপুণ তুলিকায়, বাঙ্গালী বীরের কীর্ত্তি-কাহিনী উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"যশোর নগরধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ,
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥"

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাতে অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও সৈন্যবল সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাঙ্গালার পাঠান রাজসরকারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতা শ্রীহরি ও খুল্লতাত বসন্তরায়, বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান কররাণী ও দায়ুদখাঁর সময়ে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কার্য্যকুশলতাগুণে প্রভুদের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। দায়ুদখাঁ রাজ্য লাভ করিয়া শ্রীহরিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন ও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে বিক্রমাদিত্য, দায়ুদখাঁর নিকট হইতে সুন্দরবন অঞ্চলের জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া ল'ন এবং যশোর ঈশ্বরীপুরে নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করেন।

এই সময়ে পাঠানগণকে পরাভূত করিয়া মোগলগণ দ্বিতীয় বার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তখনও পাঠান সর্দ্দারগণ নানাস্থানে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। বাঙ্গালার সুলতান দায়ুদখাঁও দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া

স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বারজন প্রতাপান্বিত ভৌমিক জমিদার ছিলেন। তাঁহারা 'বারভূঁয়া' নামে অভিহিত হইতেন। যদিও তাঁহারা পাঠান সুলতানদের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু সুযোগ সুবিধা পাইলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেও কালবিলম্ব করিতেন না। মোগল-পাঠানের গোলযোগের অবসরে এই জমিদারগণও স্বাধীন নৃপতির মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর আকবর, পাঠান সুলতান দায়ুদখাঁ ও ভৌমিকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পাটনার নিকটে দায়ুদখাঁর সঙ্গে মোগলদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। দায়ুদখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। ভৌমিক জমিদারগণও ক্রমে ক্রমে মোগল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

দায়ুদের ভাগ্যবিপর্য্যয়কালে বিক্রমাদিত্য সুলতানের সমস্ত ধনরত্ন নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নৌকা পূর্ণ করিয়া যশোরে প্রেরণ করেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর সেই অগণিত ধন-সম্পদ বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। মোগল-রাজস্বসচিব টোডরমল্ল বঙ্গের ব্যবস্থা করিতে আসিলে বিক্রমাদিত্য নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া যশোরের জমিদারি পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া ল'ন ও চতুর্দ্দিকের অরণ্য পরিষ্কার করাইয়া এক সুন্দর নগরের পত্তন করেন।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য বিশেষরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। বীরোচিত কর্ম্মে তাঁহার অসীম আনন্দ হইত। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতকে দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। মোগলের ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে বিবেচনা করিয়া বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায়ের পরামর্শে প্রতাপকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। প্রতাপ, মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। খুল্লতাত বসন্তরায় তাঁহার পিতার পরামর্শদাতা ও তাঁহার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় বিবেচনা করিয়া প্রতাপ বসন্তরায়ের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। বিক্রমাদিত্য, প্রতাপের মনোগত ভাব অনুভব করিয়া—ভবিষ্যৎ গৃহ-বিবাদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত, প্রতাপ ও বসন্তরায়ের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া সংসার-ধর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর প্রতাপ তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূমঘাটে এক নূতন নগর স্থাপন করেন। এই নূতন নগরে মহাধূমধামে প্রতাপ তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ও স্বাধীন নৃপতির ন্যায় বাদশাহের নিকট রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। প্রতাপের এই ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার মোগল-সুবাদার, অবরমখাঁ নামক একজন পাঁচহাজারী মন্‌সবদারকে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অবরমখাঁ প্রতাপের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। তখন সুবাদার আজিমখাঁ স্বয়ং বহুতর সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এইবার পরাজয় অনিবার্য্য আশঙ্কা করিয়া, শক্তিসঞ্চয়ের অবকাশ লাভের নিমিত্ত প্রতাপ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন।

প্রতাপ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আবার মোগল-পাঠানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোগল-সেনাপতি শাহবাজখাঁ ও মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতাপের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাঁহাদের অবসর রহিল না। এই সুযোগে প্রতাপ নানাস্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার রাজ্য ও রাজধানী সুরক্ষিত করিলেন এবং বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সেনানীদ্বারা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্যও তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ সেনানী রডার অধিনায়কত্বে, প্রতাপের নৌ-সৈন্যগণ সমুদ্রের দিকে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিত। এইরূপে বলসঞ্চয় করিয়া প্রতাপাদিত্য পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। খুল্লতাত বসন্তরায় তাঁহার স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করেন অনুমান করিয়া, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে ও তাঁহার দুই পুত্রকে নিহত করেন। বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপের মহিষীর সহায়তায়, কচুবনে আত্মগোপন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই জন্য উত্তরকালে তিনি কচুরায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বসন্তরায়ের হত্যার পর সমস্ত যশোর প্রতাপাদিত্যের করতলগত হওয়ায় তাঁহার শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহ অধিকার করিয়া প্রতাপ তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃততর করিলেন।

এদিকে কচুরায়, তাঁহার পিতৃহত্যা ও রাজ্যচ্যুতির জন্য দিল্লীর বাদশাহ-দরবারে প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর, বাঙ্গালার এক ক্ষুদ্র ভৌমিকের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কচুরায়ের অভিযোগে বাদশাহের ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল।

তিনি মোগল-সেনাপতি মানসিংহকে অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্র সেই সকল ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

> "তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
> রাজা তাঁরে সবংশে কাটিল।
> তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
> জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
> ক্রোধ হইল পাতশায় বাঁধিয়া আনিতে তায়
> রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
> বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় চলে রঙ্গে
> মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলা॥"

মানসিংহ যশোরে উপস্থিত হইলে, ধূমঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজপুত ও মোগল সৈন্যদলের সহিত প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী সৈন্যগণের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সেকালের বাঙ্গালীরা ভীরু কিংবা কাপুরুষ ছিল না। দেশ-শত্রুকে দূর করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ যুদ্ধে নিহত হইলেন ও অপর পুত্র জগৎসিংহ সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। যখন বহু চেষ্টা করিয়াও মোগল-সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী অধিকার করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গৃহ-শত্রু কচুরায়ের নিকট হইতে গুপ্তপথের সন্ধান পাইয়া এবং যশোরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষমতাসম্পন্ন তালুকদারদিগকে উৎকোচ ও প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, তাহাদের সহায়তায় মানসিংহ প্রতাপের রাজধানী অধিকার করিলেন। অগণিত সুশিক্ষিত ও বহু যুদ্ধজয়ী মোগলবাহিনীর সম্মুখে প্রতাপের ক্ষুদ্র সৈন্যদল তিষ্ঠিতে পারিল না। প্রতাপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত ও আহত হইলেন। বিজয়ী মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বীরোচিত উদার ব্যবহার করিলেন না। তিনি আহত শূরসিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীধামে, বিশ্বনাথ এই বীর দেশপ্রেমিকের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিয়া, পরাজয়ের লাঞ্ছনা হইতে মুক্তিদান করিলেন।

বসন্তরায়ের হত্যা, প্রতাপের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে এই হীন কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের চরিত্র দোষ-গুণে সৃষ্ট হয়। সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ চরিত্র পৃথিবীতে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি থাকে বলিয়া মহত্তের গৌরবের লাঘব হয় না। তাই প্রতাপাদিত্যের কলঙ্ককাহিনী বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য আজীবন তপস্যা ও প্রাণপণ চেষ্টার কথা, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে এবং এই দেশপ্রেমিক বীরশ্রেষ্ঠকে সশ্রদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ চক্রবর্ত্তী

পূজার ছুটি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আজ দেওয়ালি। কলিকাতা সহরটা রংবেরঙের আলোর মালায় সাজিয়াছে। অমাবস্যার রাত্রি হইলে কি হইবে, আকাশের দিকে তাকাইলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। হুশ্ হাশ্ করিয়া হাউই উড়িয়া আকাশকে আর অন্ধকার থাকিতে দিতেছে না। ছাদে ছাদে শাদা আলোর ফুলঝুরি উড়াইয়া তুবড়ি জ্বলিতেছে।

অনু, মণ্টু, মীনা, মীনার দিদি, জামাইবাবু, ত্রিদিবেশ, এমন কি মণ্টুর মা বাবাও ছাদে উঠিয়াছেন। ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের হাতেই কোন না কোন রকমের পট্‌কা। মীনার হাতে এক বাণ্ডিল রংমশাল। ত্রিদিবেশ আর জামাইবাবু একটা ফানুস উড়াইবার আয়োজন করিতেছিলেন।

ফানুসের নিচে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাগজটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। অনুর ছুঁচো বাজি জ্বালান আর হইল না, মণ্টু ভুঁইপট্‌কার কথা ভুলিয়া গেল—মীনার হাতের রংমশাল হাতেই রহিয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি ফানুসের দিকে।

ফানুসটা এবার জোর পাইতেছে। ত্রিদিবেশ বলিল,—"এবার ছাড়া যাক্।"

জামাইবাবু বলিলেন,—"না, আর একটু পরে। আর একটু টান পেলেই—হ্যাঁ, এইবার। ওয়ান্, টু, থ্রি।"

যেই হাত ছাড়া—অমনি কাগজের ফানুস দুলিতে দুলিতে উপরের দিকে উঠিয়া চলিল।

মীনা তো আনন্দে হাততালি দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে বলিল,—"আচ্ছা জামাইবাবু আপনাদের ফানুসটায় একটা দড়ি বেঁধে দিলে তো বেশ হ'ত। আমি দড়িটা ধ'রে থাকতাম—আর ফানুসটা আমাকে নিয়েই উঠত। বেশ বেড়িয়ে আসা যেত! তা হ'লে ভারি মজা হ'ত! কেমন—না?"

ফানুস উপরের দিকে উঠিয়া চলিল

পরে মায়ের দিকে ফিরিয়া সে বলিল,—"আচ্ছা মা, আমি যদি আকাশে উঠি তুমি আমায় ছেড়ে দাও?"

আকাশে উঠিবার নামেই মায়ের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"কি দস্যি মেয়ে তুই, এ্যাঁ! আচ্ছা তোর ওকথা ভাবতে একটু ভয়ও করে না?"

মীনার বাবা বলিলেন,—"না না ভয় করবে কেন? আমার মেয়ে কি ভীরু? দেখ না, ও একটু বড় হোক্, ওকে এরোপ্লেনের পাইলট্ ক'রে দেব। এরোপ্লেন চালিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবে। কেমন রে মীনা, পারবি তো?"

—"খুব পারব বাবা, তোমাদের সুদ্ধ সঙ্গে নেব। আমি চালাব—তোমরা কিন্তু চুপটি ক'রে ব'সে থেক। মাকে নিয়েই যত ভয়—হয়ত এরোপ্লেনে ব'সে কাঁদতেই সুরু করবেন! তখনই বিপদ।"

মীনার কথায় সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মা বলিলেন,—"আচ্ছা বাবু, আমি ভীতু মানুষ তো, নিস্‌নে আমায় তোর এরোপ্লেনে। আমি কি সাধতে গেছি তোকে ?"

ফানুসটা ততক্ষণে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মণ্টু সেই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতেছিল ;—একটুখানি আগুনের তাপে এত বড় কাগজের থলেটা এত উচুতে উঠে কি করিয়া ? মণ্টুর এত কৌতূহল হইয়াছিল যে—সে বাবাকে তা' জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না।

তাহার বাবা বলিলেন,—"এটা খুব সহজ কথা, তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে পারবে। তোমরা দেখেছ তো, জলে তেলে মিশিয়ে দিলে তেলটা জলের উপরে ওঠে ?"

—"হ্যাঁ, তা তো উঠবেই, তেল যে জলের চেয়ে হাল্‌কা।"

—"গরম বাতাসও ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা। আগুনের তাপে কাগজের ভিতরের বাতাসটা বাইরের বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা হ'য়ে যায়। তাই খোলটা সুদ্ধ নিয়ে গরম বাতাস উপরে উঠে যায়। আগুন নিভলে যেই ভিতরের বাতাসটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, অমনি আবার কাগজটা নেমে আসে।"

অনু জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু মামাবাবু, এ বুদ্ধিটা প্রথম এল কার মাথায় ?"

"সে এক মজার গল্প" বলিয়া অনুর মামা গল্প আরম্ভ করিলেন,—"সে প্রায় দেড়শ বছর আগেকার কথা! ফ্রান্স দেশের একটা ছোট সহরে স্টিফেন আর জোসেফ্ নামে দুটি ভাই থাকত। তাহাদের একটি দোকান ছিল—তা'রা ব্যবসা করত কাগজের। লেখাপড়া তা'রা যে খুব বেশি কিছু জানত তা' নয়। তবে মোটামুটি বিদ্যেবুদ্ধি দুজনেরই ছিল। ফানুস প্রথম আবিষ্কার করে সেই দুই ভাই।"

—"কেমন ক'রে করলে ?"

—"জান তো ওদেশে ভারি শীত। আমাদের দেশের মত কেবল চাদর জড়ালেই সেখানে চলে না। তাই ওদেশে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। স্টিফেন আর জোসেফ্ একদিন এমনি আগুন জ্বালিয়ে দোকানে ব'সে আছে। দোকানে খদ্দের

ছিল না, তাই দু ভাই ব'সে ব'সে গল্প করছিল। অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়া উঠ্‌ছিল কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। স্টিফেনের হঠাৎ মনে হ'ল—এই যে রাশি রাশি ধোঁয়া উপরের দিকে উঠছে, এগুলোকে একসঙ্গে জড় করতে পারলে নিশ্চয়ই আকাশে ওঠা যাবে। স্টিফেন ভাইকে তার মনের কথা জানাতে জোসেফও সায় দিল। তখন দু ভাই মিলে করলে কি? না—একটা মস্ত বড় কাগজের থলে তৈরি ক'রে ফেললে। কাগজের তো আর অভাব নেই তাদের।"

—"তারপর?"

—"তারপর একটা হাঁড়ির মধ্যে আগুন জ্বেলে, থলেটা ধরলে হাঁড়ির মুখের উপর উপুড় ক'রে। ধোঁয়ায় থলেটা ফুলে এপাশ ওপাশ ক'রে নড়তে লাগল। এমন সময় একটি বুড়ী ঢুক্‌ল দোকানে কাগজ কেনার জন্যে। বুড়ী ঢুকেই দেখে দোকানঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়—ভাবলে দোকানে আগুন লেগেছে নাকি? কিন্তু তখনিই তার ভুল ভাঙ্গল। স্টিফেন তাকে দেখে বললে,—'কেও?'

বুড়ী বললে,—'আমি তোমাদের খদ্দের—কাগজ নেব।'

জোসেফ্ বললে,—'আমরা দুই জনে ভারি ব্যস্ত আছি। দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন।'"

মীনা বলিল,—"বেশ দোকানদার ত! ধোঁয়ায় ব'সে ব'সে খদ্দেরের চোখ জ্বলুক, আর তা'রা মজা ক'রে—ফানুস ওড়ান!"

—"তা'রা একদিন উড়িয়েছিল ব'লেই তো আকাশে বেলুন উঠ্‌ল—মানুষ বেলুনে চ'ড়ে আকাশপথে ঘুরতে পেল। এরোপ্লেন তো হয়েছে তা'র অনেক পরে।"

—"বাবা, তুমি বল, তারপর কি হ'ল ?"—মণ্টু তাড়া দিলে।

—"বুড়ী অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে আর থাকতে পারলে না। শেষে তাদের কাছে গিয়ে দেখলে তাদের কাণ্ডকারখানা। দেখে জিজ্ঞেস করল,—'কি করছ বল তো তোমরা ?' তা'রা বললে,—'এই থলেটাকে আমরা আকাশে ওড়াতে চাই।' বুড়ী বললে,—'তা বেশ তো! এক কাজ কর না। থলের মুখটা হাঁড়ির মুখে বেঁধে দিলেই তো হয়!' এই বুদ্ধিটা মাথায় এতক্ষণ কেন আসে নি ভেবে তা'রা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।"

অনু বললে,—"বাঁধলে তা'রা ?"

—"হ্যাঁ বাঁধল বৈ কি! যেই বাঁধা অমনি হাঁড়ি সুদ্ধ থলে উঠ্‌ল উপরে। ভাগ্যিস্ ছাদ ছিল তাই রক্ষে—আকাশে আর উঠতে পেলে না। নইলে আগুনের হাঁড়ি কারও বাড়ীতে পড়লে একটা অগ্নিকাণ্ড বাধত।"

—"তারপর ?"

—"তারপর আর কি ? সেই থেকেই বেলুনের সূত্রপাত হ'ল। তারপর তা'রা কাপড় ও কাগজ দিয়ে আরও বড় বড় থলে তৈরি ক'রে ওড়াতে লাগলে, লোকে দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল। কিন্তু তাদের সেই ফানুসগুলি আকাশে বেশিক্ষণ উড়ল না। ধোঁয়া আর গরম বাতাস কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেই ফানুস নেমে আসত।"

—"বাতাসকে অনেকক্ষণ গরম রাখার কোন বন্দোবস্ত করলে না কেন ?"

—"তার অসুবিধা অনেক—বিপদও খুব বেশি। তা ছাড়া গরম বাতাসের আর দরকারও হ'ল না।"

—"তবে ওড়াত কিসে ?"

—"ঐ সময়ে চার্ল্‌স্ নামে একজন লোক লোহা আর এ্যাসিড মিলিয়ে এমন একটা গ্যাস তৈরি করলে—যে গ্যাস ঠাণ্ডা অবস্থাতেও বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্‌কা। তখন থেকে সেই গ্যাসেই বেলুন উড়তে লাগল।"

ততক্ষণ ইহাদের ফানুসটা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। আগুনটা নিভিতে আর দেরি নাই। আগুন নিভিলেই ভিতরের বাতাসটা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে—তখন ফানুসটা আবার নিচের দিকে নামিতে থাকিবে।

মণ্টুর মা বলিলেন,—"চল্‌রে তোরা নিচে, আর বেশিক্ষণ ছাদে থেকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই।"

মীনা বলিল,—"তুমি চল মা, আমরা যাচ্ছি। ফানুসটা কোথায় পড়ে দেখে যাব।"

মীনার বাবা বলিলেন,—"কোথায় পড়বে তা কি আর এখান থেকে দেখা যাবে রে? যে জোরে বাতাস বইছে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাবে 'খন। এখনই তো আমাদের কাছ থেকে দেড় মাইল কি দু' মাইল দূরে উড়ছে। ফানুস তো আর নিজের ইচ্ছে মত উড়তে পারে না।"
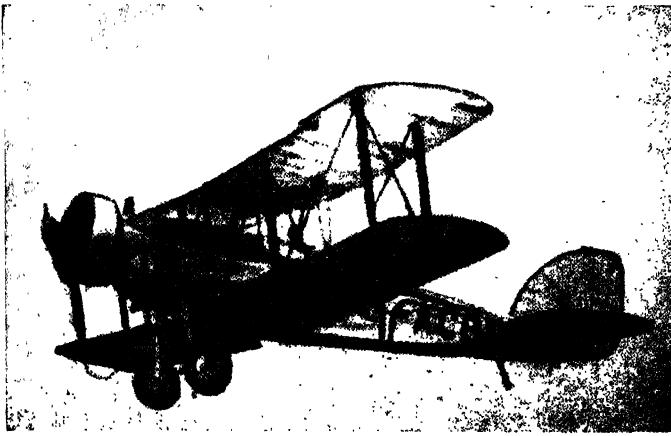
এরোপ্লেন

—"কিন্তু এরোপ্লেনে ক'রে যে লোক এখান থেকে বিলাত যায়, তা'রা ইচ্ছে মত নামে ওঠে কি ক'রে?"

—"এরোপ্লেন আর বেলুন তো এক জিনিস নয়। স্টিমার যেমন পাখনা দিয়ে জল কেটে নদীতে চলে, এরোপ্লেন তেমনি পাখনা দিয়ে বাতাস কেটে আকাশে ওড়ে। আবার নৌকা বা স্টিমারের হাল ঘুরিয়ে যেমন মুখ ফেরান যায়, এরোপ্লেনেরও ঠিক তেমনই। এরোপ্লেন ও এক রকমের জাহাজ আর কি! তবে জাহাজ চলে জলে স্টিমের জোরে, আর উড়োজাহাজ চলে বাতাসে পেট্রলের গ্যাসে—যা দিয়ে মোটর গাড়ী চলে।"

এমন সময় নিচে হইতে ডাক আসিল,—"এ দাদাবাবু দিদিমঁড়ি—চঞ্চল নামি আস, ভাত থণ্ডা হেই গলা।"

জগবন্ধুর আহ্বান অমান্য করা গেল না। কারণ······তা' আর বলিয়া দিতে হইবে?

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

দুইটি আধলার ইতিহাস

যামিনীপ্রকাশ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, বয়স ১৩ বৎসর। তাহার একখানা ইংরাজী ব্যাকরণ না কিনিলেই নয়; কারণ উহার অভাবে ক্লাসের পড়া ভাল হইতেছিল না।

পয়সা জমাইবার কোটাটি খুলিয়া সে দেখিল—পাঁচ আনা জমিয়াছে,—চারিটি আনি, তিনটি পয়সা ও দুইটি আধলা। পয়সাগুলি সে পকেটে ফেলিল; তাহার কলিকাতা যাতায়াতের রেলভাড়া দশ পয়সা লাগিবে, আর বাকী পয়সায় কলিকাতায় সরব ও অন্য কিছু কিনিয়া খাইবে বলিয়া স্থির করিল। ব্যাকরণের দাম ১৷৹ পূর্ব্বেই সে তাহার মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া রাখিয়াছিল।

সে নিজে কলিকাতা গিয়া বইখানা কিনিয়া আনিবে, কি কলিকাতা আফিসের কোন কেরানীর মারফৎ কিনিবে, তাহা—আজ কয়েকদিন হইতে সে চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে নিজেই ১৷৶৹ লইয়া গ্রামের ষ্টেশনে ট্রেনে চাপিল। তাহার গ্রাম হইতে কলিকাতা ৫ মাইল দূরে।

যামিনীপ্রকাশ হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহির হইল। বাসের কণ্ডাক্টার হাঁকিতেছে—'কলেজ ষ্ট্রীট,······শেয়ালদা,···পার্ক সার্কাস্।' একবার লোভ হইল—বাসে চড়িয়া যাইবার; তারপরই ভাবিল—নাঃ, বাস্ওয়ালাদের পয়সা দেওয়া ঠিক নয়। তার চেয়ে সেই পয়সায় কিছু খাইলে কাজ হইবে। ঐ যে একজন গোলাপী রেওরী বিক্রয় করিতেছে—লওয়া যা'ক দুই পয়সার। অমনি সে একটু অগ্রসর হইয়া গোলাপী রেওরী কিনিল।

গোলাপী রেওরী খাইতে খাইতে যামিনীপ্রকাশ হাওড়া পুল পার হইয়া গেল। গোলাপী রেওরী ফুরাইয়া গেলে তাহার মনে হইল—নাঃ, গোলাপী রেওরী একেবারে অসার পদার্থ, উহা খাইলে পেট ভরে না।

হ্যারিসন রোডের মোড় পার হইয়া সে দেখিল একজায়গায় দোকানে সিঙাড়া সাজান রহিয়াছে। সে উহাই কিনিল। ছয় পয়সার সিঙাড়া খাইয়া এবার শরীরটা বেশ তাজা হইল। তখন সে দ্রুত হাঁটিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পৌঁছিল। তারপর বই কিনিয়া হাওড়া পুলের নিকট ফিরিয়া আসিল। পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দেখিল—

তখনও সাত পয়সা আছে। রেলভাড়া পাঁচ পয়সা লাগিবে—কাজেই দু'পয়সার এক ভাঁড় সরবৎ খাওয়া যেতে পারে। এই ভাবিয়া সে দু'পয়সার সরবৎ কিনিয়া খাইল। ইচ্ছামত কাজ করিয়া মনটাতে তার বেশ আনন্দ হইল।

হাওড়া ষ্টেশনে যখন সে টিকিটের জন্য পয়সা দিল তখন টিকিট-ক্লার্ক বলিল,—"বাবু রেল-আফিসে তো আধলা চলে না। আধলা দুটির বদলে একটি পয়সা দাও।"

যামিনীপ্রকাশ তখন আধলা দুটি লইয়া একটি পয়সা দিবার জন্য দুই-তিন জন ভদ্রলোক—যাহারা ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনুরোধ করিল। সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকায় আর বলে—"নেই।"

তাঁহাদের মনে যেন সন্দেহ হইল এ আবার একটা নূতন জুয়াচুরীর ফন্দী। বুদ্ধিমান যামিনীপ্রকাশের কথাটা বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না। সে তখন একজনকে বলিল,—"যা ভাব্‌ছেন মশাই, তা নয়, আমি জোচ্চোর নই।"

যখন কাহারও কাছে আধলা দুটির বদলে একটি পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিল না, অথচ পয়সা দিতে না পারিলে রেলের টিকিট কিনিতে পাওয়া যাইবে না, তখন তাহার মনে কেবল অভিমান হইল না—রাগও হইল। সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গ্রামের দিকে হাঁটিয়া রওনা হইল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে সে গ্রামে পৌঁছিল।

সেই জীবনের প্রারম্ভে দুইটা আধলা তাহাকে শিক্ষা দিল—(১) সব জায়গার নিয়ম কানুন, প্রত্যেক লোকেরই পাঠ্যপুস্তকের মত জানা উচিত; (২) কাহারও ভরসায় থাকা উচিত নয়।

আজ যামিনীপ্রকাশ ঘোষাল ভারত সরকারের সহকারী প্রধান হিসাব-পরীক্ষক। তাঁহার বৈঠকখানার টেবিলে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত ক্যালেণ্ডার দাঁড় করান আছে, তাহার দুই কোণে দুইটি আধলা লাগান আছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—'রূপার জিনিসে দুটি তামার আধলা কেন?'—তাহা হইলে যামিনীবাবু ঐ দুটি আধলার ইতিহাস সাগ্রহে সকলকে শুনাইয়া থাকেন।

শ্রীলক্ষ্মীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

খেলা-ধূলা

আবার ফুটবল

সারা ভারতে যত ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় সবই পূজার পূর্ব্বে শেষ হ'য়ে যায়। শীতকালে ফুটবল খেলা হয় না। কিন্তু এবার শীতকালেই এমন জোর ফুটবল খেলা হবে যা এর আগে আর কোন দিনই হয় নি। এবার বিলাত থেকে একটি খুব শক্তিশালী নামজাদা ফুটবল টীম এই শীতকালেই ভারতবর্ষে ফুটবল খেল্‌তে আস্‌ছে। এই টীমের নাম ইস্‌লিংটন্ কোরিন্থিয়ান্। এঁদের সঙ্গে খেল্‌বার জন্যে কলিকাতায় খুব তোড়জোড় চল্‌ছে। ১০ই নবেম্বর বোম্বেতে পৌছেই টীমটি কলিকাতা যাত্রা ক'রেছে। কাজেই এখন কলিকাতায় খেলার ধুম লেগে গেছে। কলিকাতায় মহামডান্ স্পোর্টিংএর সঙ্গে একটি, মোহনবাগানের সঙ্গে একটি এবং আই, এফ্, এ-র নির্ব্বাচিত দলের সঙ্গে একটি ম্যাচ্ খেলা হবে। সারা ভারতের মধ্যে কলিকাতায়ই ফুটবল খেলা হয় সব চেয়ে ভাল। যদি এখানেও কোরিন্থিয়ান্ দল বিজয়ী থাকে তবে ভারতের আর কোথাও তাঁরা খুব সম্ভব পরাজয় স্বীকার করবেন না। ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে আজ অবধি যত খেলা এই দলটি খেলেছে, তার সবগুলোতেই জিত অথবা ড্র হয়েছে। নীচের তালিকা থেকেই তা বেশ বুঝতে পারা যাবে।

হল্যাণ্ডে কোরিন্থিয়ান্ টীম প্রথম খেলায় জিতেছে ৪—৩ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় ২—০ গোলে, তৃতীয় খেলায় ড্র ক'রেছে ০—০ গোলে এবং চতুর্থ খেলায় ড্র ক'রেছে ১—১ গোলে।

সুইজারল্যাণ্ডে জিতেছে প্রথম খেলায় ৩—০, এবং দ্বিতীয় খেলায় ৪—১ গোলে।

ইজিপ্টে জিতেছে প্রথম খেলায় ২—১ এবং দ্বিতীয় খেলায়ও ২—১ গোলে।

দেখা যাক কলিকাতার খেলায় কি হয়!

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম

নভেম্বর মাসটা ফুটবলের হিড়িকে কাটতে না কাটতেই ডিসেম্বর মাসে লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত ক্রিকেট টীম এসে হাজির হবে কলিকাতায়। এই বিখ্যাত টীমে ইংলণ্ডের বাছাই-করা সব বাঘা খেলোয়াড় আছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যে টেষ্ট্ ম্যাচ হয় তা'র খেলোয়াড় আছেন এই দলে ৭ জন। এত বড় শক্তিশালী ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে এর পূর্ব্বে আর আসে নি।

এই দলটি গত ২৫শে অক্টোবর বোম্বেতে এসেই প্রথম খেলা খেল্‌তে গিয়েছিল বরোদায়। খেলাটি ড্র হ'লেও টেনিসনের টীম যে অত্যন্ত শক্তিশালী তা'র পরিচয় পাওয়া গেছে। টেনিসনের দলের রান হয়েছে প্রথম ইনিংসে ৩৯৯, আর বরোদার মাত্র ১৭৭; টেনিসনের দলের দ্বিতীয় ইনিংসে একজন আউট হ'য়ে ৫১ রান হয়। সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলাটি ড্র হ'য়ে যায়। ইংলণ্ডের দলের গিব্ এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন।

দ্বিতীয় খেলা হয়েছে করাচীতে সিন্ধুদেশের বাছাই দলের সঙ্গে। সিন্ধুর খেলোয়াড়গণ এই খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই দলের কোমোরুদ্দীন ৯০ রান ক'রে দুর্ভাগ্যক্রমে আউট হ'য়ে যান, নইলে তাঁর সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই হ'ত। সিন্ধুদলের প্রথম ইনিংসে রান হয়েছে ৩৪৮, আর টেনিসনের দলের ৩০৩; এতেই সময় বেশীর ভাগ কেটে যাওয়ায় খেলাটি যে ড্র হবে তা আগেই জানা গিয়েছিল, হয়েছেও তাই। এই খেলায় টেনিসন্ ও এড্রিক—প্রত্যেকেই একটি ক'রে সেঞ্চুরি করেছেন।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে এই দলের তৃতীয় খেলা হ'য়ে গেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ১৫ মিনিট বেশী খেলা হওয়ায় টেনিসনের টীম এই খেলায় ৮ উইকেটে জয় লাভ করেছেন। টেনিসনের টীমের রান হয়েছে প্রথম ইনিংসে ২২৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুইজন আউট হ'য়ে ২৩, আর সীমান্ত প্রদেশের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৭ রান।

পরের খেলাগুলোর বিবরণ আস্‌ছে মাসে বিশেষ ভাবে দেওয়া হবে।

ধাঁধা

আদ্যভাগে সৃষ্টি করি অন্ত্যেতে সংহার,
মধ্যভাগে পালি সবে—কি নাম আমার ?

দ্রষ্টব্য—ধাঁধার উত্তর ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।
গ্রাহকগণ সকল পত্রেই **স্ব স্ব গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ করিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার

বিজ্ঞানের অ আ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩এ মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ১০০ পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা।

বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ছোটদের উপযোগী করিয়া বলা হইয়াছে। এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ শিশুসাথীতেও বাহির হইয়াছিল।

মৃত্যুর কবলে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ. প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৵০ আনা। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press;
5, College Square, Calcutta.
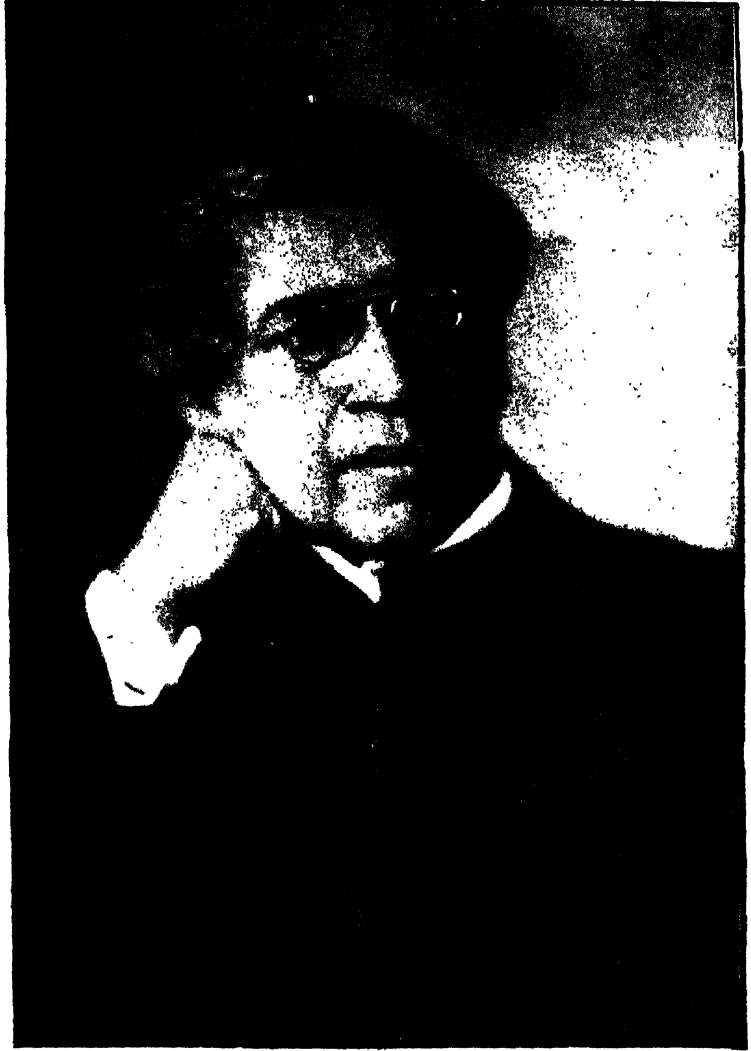
বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র

ষোড়শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৪ { ৯ম সংখ্যা

পউষ

পউষ এলো
হিমের হাওয়ার
মুসড়ে এলো
গোলাপ গাঁদার
সায়র দীঘির
ধানের ক্ষেতে
সর্ষে ফুলে
হর্ষ ভরে
জোড়টি বেড়ায়
জলের ধারে

পউষ এলো
পড়লো সাড়া,
শিউলি-কলি
বাড়্‌লো গরব
জল শুকালো,
সোনার রঙে

ভরুসা ক'রে
মিষ্টি লাগে
হাত দিতে গে[illegible]

শ্যামল বনের অন্তরে,
ঝরলো পাতা মন্তরে।
কন্‌কনে এই ঠাণ্ডাতে;
শিশির-ধোয়া ঝাণ্ডাতে।
কমল-কলি ফুট্‌ল না;
লক্ষ্মী দেবীর আল্‌পনা
বেড়ায় ঘুরে মৌমাছি,
সবার কাছে মৌ যাচি'
গরম কেমন [illegible],
শিউরে উঠি [illegible]।

নলেন গুড়ের গন্ধ মধুর,— প্রচুর পিঠে পার্ব্বণে
গরম গরম মনের সাধে কতই না সুখ চর্ব্বণে।
শরৎ শেষে শীত এসেছেন কুয়াসাতে বন ঘিরে ;
হিমের ঘোরে ঝাপ্‌সা আকাশ দেখ্‌ছে চেয়ে গম্ভীরে।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.,
কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

বাঘের কবলে

আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে কখন যে কোন্‌টা খ'সে পড়্‌বে তা' যেমন কেউ বল্‌তে পারে না, তেমনই মানুষের জীবনে কখন যে কোন্ ঘটনা ঘট্‌বে, তারও কেউ সঠিক খবর দিতে পারে না। তা না হ'লে আমাদের পাড়ার নিতাইবাবু, যিনি চিরটা কাল ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে আর তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ঘুরেই কাটিয়ে দিলেন—তাঁর জীবনে যে ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় কাণ্ড ঘট্‌তে পারে, একথা তাঁর মুখে শুনেও বিশ্বাস হ'তে চায় না।

গল্প বলায় পাড়ার মধ্যে নিতাইবাবুর খ্যাতি ছিল। আর সত্যিই তিনি দেশ-বিদেশের কথা এত সুন্দর ক'রে বল্‌তেন যে, নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমরা ব'সে থাক্‌তুম। ঐ রকম একদিন যেতেই তিনি বল্লেন—'আজ তোমাদের একটা সত্যি ঘটনা বল্‌ব ভাবচি, ঘটনাটা আমারই জীবনে ঘটেছিল—বহুদিন পূর্ব্বে'—পরে একটু থেমে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন ঃ—

'একবার বেড়াতে বেরিয়ে পথে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। সেটা বোধ হয় তেরশ' একুশ সালের মাঘমাস। ভাব্‌লুম শীতকালে পশ্চিম দেশটার স্বাস্থ্য ভাল, যাই একটু ঘুরে আসি। সেইদিন রাত্রের গাড়ীতেই রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লুম।···

যাচ্ছিলুম রাঁচি। রাত্রের অন্ধকার ভেদ ক'রে যাত্রীবাহী গাড়ীখানা যেন বিরাট দৈত্যের মতই গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুটেছিল। গাড়ীর মধ্যে আবার সেদিন ছিল অসম্ভব ভীড়—অতিকষ্টে পাশের ভদ্রলোকের দয়ায় বেঞ্চিতে একটু স্থান পেলুম। বেডিং থেকে

কম্বলখানা বা'র ক'রে স্যুটকেশ শুদ্ধ তা' বেঞ্চির তলায় চালান ক'রে দিলুম। কম্বল জড়িয়ে সেই অল্প পরিসরের মধ্যেই 'কুকুর-কুণ্ডলী' হ'য়ে শুয়ে দিলুম লম্বা ঘুম।

একঘুমেই রাত কাবার। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লুম উত্তর দিকের আকাশময় আবীর ছড়িয়ে কে যেন সব লালে লাল ক'রে দিয়েছে! বুঝ্‌লুম গাড়ী টাটানগর পৌঁচেছে—ওটা টাটার লোহার কারখানার আগুনের হল্‌কা। বেশ ভালই লাগ্‌ছিল দৃশ্যটা—কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে চোখ মুখ কস্‌কস্‌ ক'রে উঠ্‌তেই—জানালা তুলে দিয়ে আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম।

সকাল আটটা-নটার সময়ে 'মুরি'তে ট্রেন বদল ক'রে, আরও ঘণ্টা পাঁচেক ছোট্ট গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে—গাড়ী লেট্ হওয়ায়—রাঁচি যখন পৌঁছলুম, শীতকালের ছোট বেলা শেষ হ'য়ে সন্ধ্যে তখন প্রায় নেমে এসেছে। গাড়ীর কামরার মধ্যে তবু ভালই ছিলুম,—হঠাৎ খোলা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নেমেই ঠাণ্ডায় গা, হাত-পা যেন জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল! উঃ সে কী শীত! আর কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা সে হাওয়া!!

তাড়াতাড়ি কম্বলটা মুড়ি দিয়ে 'জড়ভরত' অবস্থায় একটা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লুম। ম্যানেজার রুম দেখিয়ে খাবার কথা বল্‌তেই আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"দোহাই মশায়, ওসব কথা কাল রদ্দুর উঠ্‌বার পূর্ব্বে আর বল্‌বেন না; আপাততঃ গা-টা একটু গরম ক'রে ধাতস্থ হ'তে দিন—" ব'লেই বিছানায় প'ড়ে কম্বলখানা সারা গায়ে ঢাকা দিয়ে নিলুম।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার পর ঘুম ভাঙতে দেখি—আমার রুমে আরও একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। আগের দিন রাত্রে শীতের চোটে তাঁকে আর দেখ্‌বার সময় হয় নি। যাই হোক, দু'এক দিনের মধ্যেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'য়ে গেল। বেশ চমৎকার লোকটি, খুব আমুদে। পরিচয়ে জান্‌লুম, তাঁর নাম হচ্ছে তেওয়ারী, পাটনা জিলার ওধারে তাঁর 'মুল্লুক'; রাঁচিতে তিনি কাপড়ের কারবার করেন।

অত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও রাঁচি জায়গাটা আমার বড়ই ভাল লাগ্‌ছিল। প্রত্যহ দু'বেলাই অনেকখানি ক'রে হেঁটে সেখানকার 'পার্ব্বত্যপ্রকৃতির' মনোরম শোভা উপভোগ ক'রে বেড়াতুম। কোন কোন দিন আবার দূরে দূরে গিয়ে সে তল্লাটের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোও দেখে আস্‌তুম। ঐভাবে একদিন হড্রু প্রপাত এলুম দেখে, সত্যি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, ভয়ঙ্করও বটে; সেখানে একলাটি গেলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে। তা ছাড়া পা ফস্কে কোন রকমে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল—একেবারে পাতাল-প্রবেশ! আর একদিন

গেলুম 'কাঁকের পাগ্‌লা গারদ' দেখ্‌তে, সে ভারী মজার। হাজার রকমের পাগল রকমারী ভঙ্গীতে পাগলামি কর্‌ছে—সে একটি দেখ্‌বার জিনিস।

ইতিমধ্যে তেওয়ারী হঠাৎ একদিন বল্লেন—"বাবুজী, চলুন না পাটনা ঘুরে আসি কয়েকদিনের জন্যে। সেখানে কারবার সংক্রান্ত আমার একটু কাজ প'ড়েছে, তা সেরে কিছুদিন একসঙ্গেই থেকে আসা যাবে'খন। সেখানে আমার একটা বাড়ীও রয়েছে—আরামে থাকা যাবে।"

তেওয়ারীর প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়ে বল্লুম—"বেশ ত, ভালকথা তেওয়ারিজী, চলুন। বেড়াতেই ত আমি বেরিয়েছি; আর একটা নূতন স্থান দেখা হবে—তা কি আর কম লাভের না লোভের?"

* * * *

পরদিন খুব ভোরে আমরা পাটনা যাবার 'বাসে' চ'ড়ে বস্‌লুম। বাস্‌টা সেদিন বিকেলে পৌঁছুবে হাজারিবাগ, পরে গয়া হ'য়ে পাটনা যাবে। গাড়ী ঠিক সময়েই হাজারিবাগে পৌঁছুল, তারপর সন্ধ্যে সাতটার সময়ে আবার ছাড়্‌ল পাটনা মুখে। এইবার সুরু হ'ল ঘন নিবিড় জঙ্গল। ড্রাইভার শুধু অভ্যাসের জোরেই সেই অন্ধকার সরু পথে, সামান্য আলোর সাহায্যে গাড়ী চালিয়ে দিলে উল্কার বেগে। বাইরে হাত দেখিয়ে তেওয়ারী এইবার বল্লেন—"এই যে দেখ্‌ছেন বাবুজী, একে বলে টুটুপালুর জঙ্গল। এখানে এত বাঘ ও অন্য হিংস্র জন্তুর বাস যে—তা আর বল্‌বার নয়। ভারতের অন্য সব জঙ্গলের তুলনায় এটা ঢের বেশী ভয়ঙ্কর।"

আমি সভয়ে বল্লুম—"যাত্রীদের কোন বিপদ্ আপদ্ ঘট্‌বে না তো?"

বোধ হয় আমার মুখে উৎকণ্ঠার ভাব দেখে তেওয়ারী একটু হেসে তাচ্ছল্যভাবে ব'লে উঠ্‌লেন—"আরে, ও ত হামেসাই হচ্ছে। এখানে চুয়া (ইঁদুর), বিল্লির মত বাঘ হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে ···ওকি! আপনি ঘাবড়ান কেন? ভয় কিসের?"

ভয়টা যে কিসের তা আর তাঁকে খুলে বল্লুম না, শুধু মুখ ভার ক'রে গুম হ'য়ে ব'সে রইলুম। মনে মনে খালি মা কালীকে ডাক্‌ছিলুম—বিপদ্ উদ্ধার ক'রে দিতে।······

খানিকটা পরে সাম্‌নে থেকে হঠাৎ বিকট একটা সম্মিলিত চীৎকারে চম্‌কে উঠ্‌লুম। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক করা সত্ত্বেও গাড়ীখানা খানিকটা এগিয়ে থেমে পড়্‌ল। আসল ব্যাপারটা এই:—পাটনা থেকে একটা বাস্ আস্‌তে আস্‌তে এইখানটায় পৌঁছেই দেখে,

যে প্রকাণ্ড একটা বাঘ হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার উপরেই পথ জুড়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত-মনে শুয়ে রয়েছে! খানিক দূরে গাড়ী বেঁধে ঐবাসের লোকেরা সকলে মিলে তখন ক্যানাস্তারা পিটিয়ে হৈ হৈ ক'রে বাঘটাকে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা কর্‌ছে। ফল হ'ল এই যে, বাঘটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে রাস্তা ছেড়ে দিলে বটে—কিন্তু আশ্রয় নিলে বাসের চালের উপর! তারপর থেকেই বাসের চালে বাঘটার দাপাদাপি, আর বাসের মধ্যে যাত্রীদের ক্যানাস্তারা সহযোগে ঐক্যতান চীৎকার সমানেই চল্‌ছিল!

হঠাৎ বাঘটার কী খেয়াল হ'ল বাস্‌টার চাল থেকে নেমে সে পাশের ছোট পাহাড়টার উপর উঠে গেল এবং পরক্ষণেই বিকট হুঙ্কারে এসে পড়্‌ল আমাদের বাস্‌টার মাথায়! সঙ্গে সঙ্গে দুটো বাসের লোকই ভীষণ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল! আমাদের বাসের চালটা মজবুত ছিল না, তাই বিরাট বাঘটা লাফিয়ে পড়ায় তা'র পায়ের চাপে ভট্‌ ক'রে চালের খানিকটা খ'সে পড়্‌ল বাসের মধ্যে; বিভীষিকায় সকলে তো ভগবানের নাম নিতে লাগ্‌লুম।
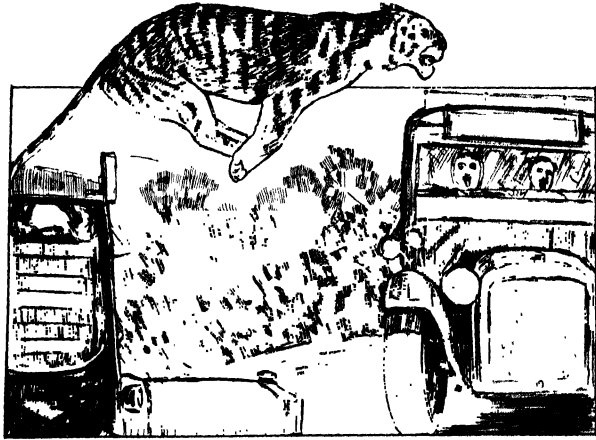
বিকট হুঙ্কারে এসে পড়্‌ল আমাদের বাস্‌টার মাথায়

এর মধ্যেই আবার ঘ'টে গেল আরও এক গুরুতর কাণ্ড। চালের উপর চলাফেরা কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ বাঘটার সাম্‌নের পা সেই ফুটো দিয়ে গ'লে বাসের মধ্যে ঠিক তেওয়ারীর মুখের সাম্‌নে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল!! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ বা'রকরা বাঘের সেই বীভৎস থাবাটাকে নিজের নাকের অত কাছে দেখেই ত তেওয়ারী হাঁউমাঁউ ক'রে, খানিক চেঁচামেচির পর—অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়্‌লেন। ব্যাপারটা দেখে প্রথমটায় আমিও কেমনতর হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলুম; কিন্তু তারপর যে কী চিন্তা আমার মনে এসেছিল তা স্মরণ নেই, হঠাৎ গা থেকে কম্বল নিয়ে দু'হাতে বাঘের পা'টা জড়িয়ে ধ'রে যে ঝুলে প'ড়েছিলুম সেটুকু আজও ভুলি নি। তারপর কি যে হ'ল সে সব আর স্মরণ নেই।

জ্ঞান হ'লে দেখি আমি একটা বিছানায় শুয়ে আর তেওয়ারিজী পাশে ব'সে আমার শুশ্রূষা করছেন। পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলুম—"আমি কোথায় তেওয়ারিজী?"

তিনি বল্লেন—"রাঁচিতে ডেপুটি সাহেবের বাংলোয়।"

বল্লুম—"বাঘটার কী হ'ল? যাত্রীরা সব নিরাপদ্ ত?"

"হ্যাঁ, কারুরই কোন অনিষ্ট হয় নি বাবু জী।" তেওয়ারী বল্লেন।

পরে জানতে পেরেছিলুম যে, বাঘের পা-টা ধ'রে ঝুলে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম। বাঘটা অনেক টানাটানি, অনেক চীৎকার ক'রেও নাকি আমার হাত ছাড়াতে পারে নি। ওই সময়ে হঠাৎ ডেপুটি সাহেব স্বয়ং সেখানে গিয়ে গুলী ক'রে বাঘটাকে সাবাড় ক'রেছিলেন। তিনিই আমাকে রাঁচি নিয়ে শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

দু'হাতে বাঘের পা-টা জড়িয়ে ধ'রে

জ্ঞান যেদিন ফিরে পাই—সেই দিন বিকেলে ডেপুটি সাহেব এসে করমর্দ্দন ক'রে বল্লেন—"বীর বটে তুমি বাবু, ওই 'কানা' বাঘটাকে আজ কম ক'রে ছ'মাস ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, কিন্তু কখনও বাগে পাই নি। ওটা অনেক দিন ধ'রে আশপাশের দশ-বিশ মাইলের মধ্যে অনেক অত্যাচারই ক'রে আসছিল।"

সুস্থ হ'য়ে হোটেলে ফেরবার সময়ে ডেপুটি সাহেব একটা বন্দুক দিয়ে বল্লেন—"বাবু, তুমি দুর্জ্জয় সাহসী, শিকার অভ্যাস করো, খুব কাজের লোক হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" বন্দুক নিয়ে সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে হোটেলে চ'লে এলুম।'

শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

(সত্য ঘটনার ছায়া হইতে)

খোক্কা বাবু

খাঁদু নামে যে ছেলেটি এ বাড়ীতে আছেন, সে-টি
আমাদের সব ভাবেন অতি ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ।
কিন্তু কেন নামটি তা'র খাঁদা হ'ল বুঝাই ভার;
যেহেতু তা'র নাসিকাটি বাঁশীর মতই উচ্চ!

পাঁচটি বছর বয়স বটে, আত্মজ্ঞানটা সর্ব্বঘটে;
সবার দ্রব্য লয়েন টেনে, ভাবেন সবই নিজের।
কাপড় পরার ঘোর বিরোধী, উলঙ্গ তাই জন্মাবধি
অঙ্গে কভু ওঠে না তা'র জামা কিম্বা ইজের।

শীতকালে তা'র স্নানের ঘটা, গ্রীষ্মকালে জলে চটা;
নাইতে তখন নিত্য কেঁদে বাঁধান্ কুরুক্ষেত্র।
সারাদিনই মত্ত খেলায়, জব্দ শুধু পড়ার বেলায়,
অ-আ-ক-খ লিখ্‌তে হ'লেই সজল দুটি নেত্র!

ভূত-পেত্নী, বেহ্মদত্যি— ভয় নেই তা'র এক রত্তি,
বলেন—"বুকে রাম-লক্ষ্মণ, কী করবে তা'রা?"
জগতে তা'র ভয়ের জিনিস একটিমাত্র—সেটি 'পুলিস'।
লাল পাগড়ী দেখ্‌লে খাঁদু ভয়ে কেঁপে সারা!

এ-হেন যে খাঁদু বাবু,— পাহারা'লার ভয়ে কাবু,
সেদিন দেখি তা'রি সনে আলাপ জুড়ে দেছে!
দু'জনাতে কতই কথা, গল্প, হাসি, রসিকতা!
কোন্ সুযোগে দু'জনাতে ভাবটি হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসিনু—"হ্যাঁরে খাঁদু, কিসের বলে—কোন্ সে যাদু
ভাঙ্গলো রে ভয় হঠাৎ এমন—লাগ্‌ল যে মোর ধাঁধা!"
একটুখানি নীরব থেকে, বল্লে খাঁদু বেজায় হেঁকে—
"আমি হই ওর 'খোক্কা বাবু'—ও হয় আমার 'দাদা'।"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শিকড়ের গুণ

রামলাল বলিল—"মস্ত এক সাধুর খোঁজ পেয়েছি দাদা—ইয়া লম্বা চওড়া তাঁর চেহারা, পরনে কৌপীন, সারা দেহে ছাই, আর মাথার জটাখানাও তাঁর শরীরের চাইতে বড় কম মোটা নয়! দেখ্‌লে বুকটা কেমনধারা কেঁপে উঠে। কি অদ্ভুত ক্ষমতা জানো দাদা? দুনিয়ায় যতরকম অসুখ আছে সব শুধু ফুঁ দিয়েই সারিয়ে দিতে পারেন!"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত শ্যামলাল বলিল—"তাই তো! বড় ভাবনায় ফেল্লি রামু। আমাদের যে কোন অসুখই নেই, এখন ওঁকে দিয়ে কি সারাব বল্ তো!"

রামলাল বলিল—"ঠাট্টা নয় দাদা। তোমার তো ঐ একটা অভ্যেস্—সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চাও না। বিশ্বাস না হয়, চল আমার সঙ্গে নদীর ওপারে, নিজের চোখে দেখ্‌বে'খন। আমি নিজের চোখে দেখেছি—তিনি কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ডেলা নিয়ে সবগুলোকেই বাতাসা ক'রে ফেল্লেন!"

"বাতাসা খাবার জন্যে নদীর ওপারে গিয়ে আমার দরকার নেই; ইচ্ছে হয় তুমি যাও।"

রামলাল বুঝিল—দাদা বিশ্বাস করিতেছে না। ইহাতে সে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিল, 'দাদা এখন ঠাট্টা করে করুক—কাল সাধুজীর কাছে নিয়ে গেলেই অবাক্ হ'য়ে যাবে'খন।' তারপর সে বলিল—"আচ্ছা দাদা, তোমার বিশ্বাস হোক বা নাই হোক, তুমি কাল খুব ভোরে চলো সাধুবাবার কাছে। তখন তাঁকে নিরালায় পাওয়া যাবে।...যাবে তো দাদা? উনি আবার কালই এখান থেকে চ'লে যাবেন।"

—"বেশ্। তোর যদি এত গরজ হ'য়ে থাকে আমাকে সাধু দর্শন করাবার, তা' হ'লে যাবো'খন। সাধু ফাধুতে আমি বিশ্বাস করি না। ওরা সব ভণ্ড, ফাঁকিবাজ, বোকা লোকদের ঠকায়।"

রামলাল পরদিন খুব ভোরে শ্যামলালকে জাগাইয়া খেয়া নৌকায় নদীর ওপারের উদ্দেশে রওনা হইল। রামলাল বলিল—"কাল যখন এসেছিলুম তখন অনেক লোক ছিল ব'লে সুবিধে পাই নি। আজ বর চাইব—দুজনের জন্যে দুটো। কি বল দাদা?"

শ্যামলাল বলিল—"বর চাওয়া কঠিন কি? দেওয়াও সোজা; কিন্তু কতটা ফল্‌বে সেটাই হচ্ছে কথা।"

—"আচ্ছা, কি বর চাওয়া যায় বলো তো দাদা! টাকা কড়ি, চাকরী—এসব বিষয়ে বর চাইলে উনি তো তা' দেনই না—বরং ভয়ানক চটে উঠেন।"

—"মানে, লাভের বর উনি দিতে চান্ না—সমস্তই ওঁর লোকসানের বর!"

একথার উত্তর না দিয়াই রামলাল একটু ভাবিয়া বলিল—"আমি নেবো একটা মজার বর—অদৃশ্য হ'য়ে যাবার বর। আমি আছি, অথচ আমাকে কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না। কি মজা—বলো তো! খাসা মজা হবে! তুমি কি বর নেবে দাদা?"

—"যদি ওঁর বরের বাস্তবিকই জোর থাকে তা' হ'লে আমি বর নেবো পালোয়ান হবার। অবশ্য শরীরটা আমার দেখ্‌তে ঠিক এম্নি থাক্‌বে, যেন বাইরে কিচ্ছু বুঝা না যায়। সবাই দেখে ভাব্‌বে রোগা, শ্যামলালের গায়ে জোর নেই—অথচ আমার গায়ে হবে সাত পালোয়ানের জোর! বেড়ে মজা হবে—রেধো ব্যাটাকে তখন দেখে নেবো। ব্যাটা সেদিন অতগুলো লোকের সাম্‌নে আমায় অপমান ক'রেছিল, তা'র শোধ তুল্‌ব আচ্ছা ক'রে!" বলিয়া শ্যামলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নদীর ওপারে পৌঁছিয়া কিছুদুর হাঁটিয়া দু'ভাই সাধুর আস্তানায় পৌঁছিল। সাধুর দেহটি বিশাল, জটাও বিশাল। শ্যামলাল দেখিল যে, সাধুর চেহারার বর্ণনায় রামলাল মোটেই অতিরঞ্জন করে নাই। প্রথমে ভয়ে বুকটা একটু যেন কাঁপিয়াই উঠিল।

সাধু যোগাসনে বসিয়া—ধ্যানমগ্ন। দুটি চক্ষুই মুদ্রিত। চেলাটি ধুনীর তদারক করিতেছে। রামলাল ও শ্যামলাল বসিয়া পড়িল। শ্যামলালের কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। যেন সাধু তাহার উপর ভয়ানক রাগ করিয়াছেন, চক্ষু খুলিয়াই হয়তো ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। শ্যামলালের পলাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে যেন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, পলাইতে দিতেছে না।

একটু পরে চোখ্‌ না খুলিয়াই সাধু কহিলেন—"কি রে! তুই যে আবার এলি—এত ভোরে! তোর ভাইও সঙ্গে আছে বুঝি? ওকে যেতে ব'লে দে আমার কাছ থেকে। ওর বিশ্বাস নেই। ওর কিচ্ছু হবে না। শীগ্‌গির স'রে যেতে বল।"

শ্যামলাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাধু কি চোখ্‌ বন্ধ থাকিলেও দেখিতে পায় নাকি? ভারী আশ্চর্য্য তো! আর তাহার যে বিশ্বাস নাই তাহাই বা কি করিয়া জানিল? আর সে যে রামলালের ভাই তাহাই বা বুঝিল কি রূপে? এক মুহূর্ত্তে শ্যামলালের গভীর বিশ্বাস জন্মিয়া গেল—সাধুর উপর। ইচ্ছা হইল সাধুর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে; কিন্তু ভরসা হইল না। কারণ সাধু যদি হঠাৎ চটিয়া গিয়া ঐ বিশাল পায়ের একটি লাথি লাগান! শ্যামলাল যে এখনও যাইতেছে না, তাই সাধু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওরে ব্যাটা, শীগ্‌গির যেতে ব'লে দে তোর দাদাকে। তা নইলে—"

'তা নইলে' শুনিয়াই শ্যাম ছুটিয়া পলাইল এবং প্রায় পোয়া মাইল দূরে গিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শ্যামলাল চলিয়া গেলে সাধু চোখ্‌ খুলিয়া রামলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কি রে ছোঁড়া! তুই যে সকাল হ'তেই এসে পাকড়াও কর্‌লি—ব্যাপার কি! কি চাস্‌ তুই?"

রামলাল বুঝিল সাধু ছলনা করিতেছেন মাত্র। কারণ তিনি অলৌকিক ক্ষমতাশালী লোক—তাঁহাকে অন্তর্য্যামী বলিলেই হয়। তিনি তো রামলালের মনের কথা সকলি জানেন। তবু যেন কিছু জানেন না এমন ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন রামলাল কি চায়। ভাবিয়া অসীম ভক্তিতে রামলালের দুটি চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। সে পরম ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিল—"বর চাই বাবা। দুটো বর চাই।"

—"আমার কি বরের কারখানা আছে নাকি? বর টর আমি দিতে পার্‌ব না—যা।"

সাধুর হাস্যময় মুখের পানে তাকাইয়া রামলাল ভরসা পাইল। সে একটু আব্‌দারের সুরে বলিল—

—"না সাধুবাবা, বড় আশা ক'রে এসেছি। দুটো বর দিতেই হবে। আপনি এত ব্যামো সারান্ ঝট্ ঝট্ ক'রে, আর বর দিতে পারেন না?"

—"আচ্ছা বর না হয় নিলি। কিন্তু দুটো কেন?"

—"আজ্ঞে, একলার জন্যে তো নয়। একটা আমার, একটা দাদার জন্যে। দু'জনের জন্য দুটো চাই।"

—"তোকে একটা বর বরং দিতে পারি। কিন্তু তোর দাদাকে দেবো না,—ওর বিশ্বাস নেই।"

রামলাল একবার ভাবিল, 'আচ্ছা, একটা বরই লই—দাদার নাই বা হ'ল।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সাধুবাবা তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। তাই সে বলিল—"না, তা হবে না সাধুবাবা, আমি অত স্বার্থপর নই। বর চাই আমাদের দু' ভায়ের জন্যেই। দাদার নাই বা থাকল বিশ্বাস।"

—"আচ্ছা, কি বর চাস্ বল্ দেখি!"

ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া রামলাল বলিল—"আমি চাই অদৃশ্য মানুষ হ'তে। একেবারে কাপড়-চোপড় সুদ্ধ অদৃশ্য। আমি আছি, অথচ কেউ আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না। আর দাদা চায় সাত পালোয়ানের মত জোয়ান হ'তে। অথচ দেখ্‌তে এখন যেমন আছে ঠিক তেম্নি থাকবে।"

"এই নে।...আমি মন্ত্র প'ড়ে দিয়েছি"

"আচ্ছা বেশ। বর আমি দেবো। তার ফল থাকবে সন্ধ্যার পর থেকে মাঝ্‌রাত্রি পর্য্যন্ত। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। এই বর নিয়ে আবার কোন অনর্থ না ঘটাস্। তা' হ'লে কিন্তু আমি দায়ী থাকব না।" বলিয়া তিনি চেলাকে আদেশ করিলেন তাঁহার কমণ্ডলুটি দিতে। তারপর কমণ্ডলু হইতে দুটি শিকড় বাহির করিলেন—একটি লাল ও একটি কালো।

খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া কি যেন মন্ত্র পড়িয়া সাধু বলিলেন—"এই নে। দুটো শিকড়ই আমি মন্ত্র প'ড়ে দিয়েছি। লাল শিকড়টা খেলে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবি; আর কালো শিকড়টা যে খাবে সে সাত পালোয়ানের মত জোয়ান হ'য়ে যাবে, অথচ দেখ্‌তে সে যেমন ছিল তেম্নি থাকবে।"

শিকড় দুটি হাতে নিয়া রামলাল বলিল—এ শিকড়গুলো কেমন ক'রে খেতে হবে?"

—চিবিয়ে গিলে ফেল্‌বি। খেতে খুব নরম আর মিষ্টি লাগ্‌বে। কিন্তু মনে থাকে যেন—লাল শিকড়টা খেলে অদৃশ্য, আর কালোটা খেলে পালোয়ান। ভুলিস্ নে।"

—"না সাধুবাবা! সে আমি ভুল্‌ব না।"—রামলাল গদগদস্বরে বলিল।

সাধুবাবা বলিলেন—"তবু মনে রাখ্‌বার একটা সোজা উপায় বাৎলে দি। রক্তের রং কি?—লাল। রক্ত থাকে শরীরের ভিতরে, কাজেই অদৃশ্য। একথাটা মনে রাখ্‌তে খুব সোজা, আর এটা মনে রাখ্‌লেই একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে থাক্‌বে যে লাল শিকড়টা যে খাবে সেও হবে অদৃশ্য—রক্তের মতন। বাকী রইল কালো শিকড়। ওটা খাবে যে—সে হবে পালোয়ান।"

বাঃ! এমন নইলে সাধু! মহাপুরুষ ছাড়া এমন চমৎকার বুদ্ধি অন্য কাহারও মাথায় আসিতেই পারে না। মনে রাখিবার যে এমন চমৎকার সহজ উপায় থাকিতে পারে তাহা কোন দিন রামলাল স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। সে কহিল—"সত্যি সাধুবাবা! আপ্‌নি যে কায়দা বাৎলে দিলেন, তা'তে ভুল্‌বার আর কোন পথ রইল না।"

কৃতজ্ঞ অন্তরে, পরম ভক্তিভরে, আর একবার সাধু বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শিকড় দুটিকে পকেটে ভরিয়া রামলাল—দাদা শ্যামলালের সঙ্গে যাইয়া মিলিল।

শ্যামলাল শুধাইল—"কি হ'ল রে রামু?"

রামলাল রহস্যটা অত সহজে ভাঙিতে চাহিল না; কহিল—"আগে বাড়ী চলো দাদা। বাড়ী ফিরে সব বল্‌ব 'খন।"

বাড়ী ফিরিয়া শ্যামলাল বলিল—"বর পেয়েছিস্?"

"পেয়েছি বই কি? এক জোড়া। এই দেখ!" বলিয়া রামলাল শিকড় দুইটি বাহির করিল।

শ্যামলাল বলিল—"এ শিকড় দুটো দিয়ে কি হবে রে?"

"এই দুটো দিয়েই তো সব হবে দাদা। একটা তোমার, একটা আমার।" কিন্তু কোন্‌টি কার তাহা রামলাল ভুলিয়া গিয়াছিল। আনন্দে সাধুবাবার কথাগুলি সে ভাল করিয়া খেয়াল করে নাই—শুনিয়া হাঁ হাঁ করিয়াছে মাত্র। একবার ভাবিল—আর একবার সাধুর কাছে গিয়া জানিয়া লইবে কোন্‌টি কিসের জন্য। আবার ভাবিল—নাঃ, একটু ভেবেই দেখি না—মনে কর্‌তে পারি কি না।

খানিক ভাবিয়াই তাহার রক্তের কথা মনে পড়িল। সে বলিয়া উঠিল—"ঠিক মনে পড়েছে দাদা! রক্তের রং কি? লাল। রক্ত শরীরে থাক্‌লেই শরীরে জোর থাকে। তা' হ'লেই বোঝা যাচ্ছে—এই লাল শিকড়টা খেলে গায়ে জোর হবে। এই নাও দাদা তোমার লাল শিকড়।"

কালো শিকড়টা নিজে রাখিয়া লাল শিকড়টা শ্যামলালকে দিতে শ্যামলাল বলিল—"বাঃ! সাধুজীর ভিতর কবিত্ব আছে দেখছি। তোর ঐ কালো শিকড়টা সম্বন্ধেও ঐ রকম একটা ব্যাখ্যা করা যায়। অন্ধকারের রং কালো, অন্ধকারে সব জিনিস অদৃশ্য। তেম্নি ঐ শিকড়টা খেলেই তুই অদৃশ্য হ'য়ে যাবি। কিন্তু কথা হচ্ছে—এই শিকড় খাওয়া তো সোজা কথা নয়।"

—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না দাদা। এগুলো খেতে খুব নরম আর মিষ্টি—সাধুবাবা বলেছেন।"

দুভায়ের কেহই জানিল না যে, অদৃশ্য হইবার শিকড় রহিল শ্যামলালের কাছে, যে চায় পালোয়ান হইতে এবং পালোয়ান হইবার শিকড় রহিল রামলালের কাছে, যে চায় অদৃশ্য হইতে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ.

শীত

শীতকাল ভালবাসি গ্রীষ্মের চাইতে,
পথে নাই কাদা-জল ;—দুখ শুধু নাইতে !
আগুন ও রোদ্দুর দুই বড় মিষ্টি,
খেতে শুতে মজা ;—নাই বাদ্‌লা ও বিষ্টি।
খেজুরের গুড় আর পিঠে নাড়ু মুড়্‌কি,
এই সব খেতে পেলে আর কিছু চাই কি ?
কোন্ ফাঁকে চ'লে যায় দিনগুলো চট্‌পট্,
লেপ মুড়ে শুয়ে পড়—শীতে নাই সঙ্কট !
শণ মূলো মসিনার ফুলে মাঠ দীপ্ত,
সরিষার ফুলে ঘ্রাণে সকলেই তৃপ্ত !
গাঁদা ও গোলাপ যেন ফড়িঙ্‌এরই বিত্ত,
ফুলে ফুলে দলে দলে তাহাদের নৃত্য !
দিল খোস্ পড়ুয়ার বড়দিন বন্ধে,
পথে মাঠে হাসি খেলা সকালে ও সন্ধ্যে !

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

কি ও কেন ?

প্রতিধ্বনি কি ?

ডাকেন জননী	নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে	নাই নাই নাই ;
ডাকিছেন যত	শোকসিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে !	কোথা রে নিমাই !
গভীর নিশীথে	দূর গ্রামান্তরে
সেই **প্রতিধ্বনি**	যাই, যাই করে।

প্রতিধ্বনি (echo) কি ? বড় একটি দেওয়ালের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া, কিংবা একটা খাড়া পাহাড় কি গুহার মুখে দাঁড়াইয়া সজোরে চীৎকার করিলে তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নির্জ্জন প্রান্তরে, কিংবা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া কাহারও নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলে মনে হইবে—পরপার হইতে কেহ পরক্ষণেই সেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া তোমাকে অনুকরণ করিতেছে। সত্যই তো আর কেহ তোমায় মুখ ভেঙ্গাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে না, তবে কেন এমন হয় ?

আলোকরশ্মির মত শব্দতরঙ্গও চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত শব্দকেই আমরা প্রতিধ্বনি বলি। শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট গতিতে চলিয়া থাকে। সুতরাং কোন দেওয়াল হইতে ৫৫০ ফুট দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে ঠিক এক সেকেণ্ড পরে সেই নামের প্রতিধ্বনি তোমার কানে পৌঁছিবে।

যখন loud speaker কিংবা শব্দকে সজোরে করিবার কোন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখন বক্তৃতামঞ্চের ঠিক পিছনে একটা বেশ বড় রকমের কাঠের প্রতিফলক (reflector) বসান থাকিত। আর সেটা হিসাব করিয়া এমন স্থানে বসান হইত যে, বক্তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই কথাটিকে জোরাল করিয়া দিত, ফলে বক্তৃতাগৃহের শেষ পর্য্যন্ত সে কথাটি পৌঁছিত। তোমাদের যাহাদের সুবিধা আছে তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বক্তৃতামঞ্চের পিছনের প্রতিফলকটি দেখিয়া আসিও।

প্রতিধ্বনিকেও মানুষ তাহার কাজে লাগাইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট গতিতে চলিয়া থাকে, প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাহা কতদূর হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সহজ। শব্দ করা ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে যদি এক সেকেণ্ড ব্যবধান হয়, তবে জানিতে হইবে প্রতিফলক ৫৫০ ফুট দূরে আছে। রাত্রে কিংবা ঘনকুয়াশার মধ্যে সমুদ্রের কিনারা দিয়া যখন জাহাজ চলে, সেই সময়, চড়ায় অথবা জলমগ্ন পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া যাহাতে জাহাজ বানচাল না হয়, তাহার জন্য, প্রতিধ্বনির দূরত্ব মাপিবার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি.

এক জোড়া জুতা

গ্রামের নাম সোনার গাঁও।

নাম শুনে তোমাদের মনে হবে গ্রামখানি বুঝি মা কমলার অক্ষয় পীঠস্থান! —মাঠে মাঠে সোনার ফসল ঝিকিমিকি রৌদ্রকিরণে ওড়াচ্ছে সবুজ ওড়না; গ্রামবাসীদের বড় বড় গোলাগুলি কানায় কানায় ভরা ধানে! অভাবের ছায়া নেই কোথাও—সবার চিত্তে সরস আনন্দ!

কোনও সময় হয়ত ছিল ঐরূপ। কিন্তু আজ যদি তোমরা সে-গ্রামে পদার্পণ কর—দেখ্‌বে সর্ব্বত্রই শুধু বিষাদের ছায়া। গ্রামবাসীদের পেটে নাই অন্ন, পরিধানে নাই বস্ত্র; ছেলে থেকে বুড়োদের পর্য্যন্ত বুকের পাঁজর গেছে বেরিয়ে, হাত-পাগুলো শীর্ণ হ'য়ে গেছে কাঠির মত। সবাই শঙ্কিত—আসন্ন মৃত্যুভয়ে।

সোনার গাঁ'র আজ এই দুরবস্থা পর পর দু' বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা যাদের—স্বর্গগত পরাণ নমঃশূদ্রের পরিবার তাদের একটি। অজন্মার মাত্র পূর্ব্ব বৎসর বেচারা পরাণ ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ইহ সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিল। এখন তা'র বিধবা স্ত্রী, আঠার-উনিশ বৎসরের একটি ছেলে আর পাঁচ-ছ' বৎসরের মেয়ে বর্ত্তমান। ছেলেটির নাম হরিপদ।

সকালবেলা কুঁড়েঘরের দাওয়ায় ব'সে মা কতকগুলি পুঁইশাকের ডাঁটা কাট্‌ছিলেন। মেয়েটি ছোট ছোট শীর্ণ হাত দু'টি দিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছিল ডাঁটা থেকে পাতাগুলো। এগুলোই সিদ্ধ ক'রে আজ তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌তে হবে। যা-কিছু ধান তাদের সঞ্চিত ছিল, অনেক আগেই তা' শেষ হ'য়ে গেছে। তারপর ভিক্ষে ক'রে কিছুদিন কেটেছিল; এখন ভিক্ষেও আর মিলে না। বিষণ্ণচিত্তে দাওয়ার একপ্রান্তে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছিল হরিপদ। হঠাৎ সে মুখ তুলে ডাক্‌লে—"মা!"

পুঁইশাকের ডাঁটা কাট্‌ছিলেন

মা জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখ তুলে চাইলেন।

"আমি কলিকাতা যা'ব। এখানে থাক্‌লে মরণ ছাড়া গতি নাই। তোমাদের দিকে আর তাকাতে পারি না।" হরিপদর দু'চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল।
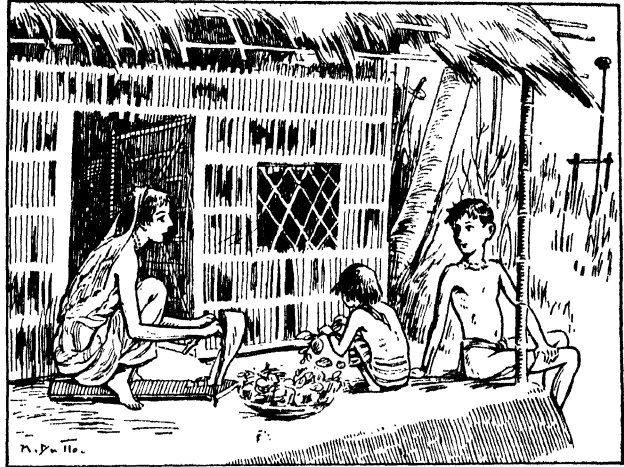
মা'র মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। বেদনায় তাঁরও মুখখানি কেমন করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল! ছেলেকে বিদেশে ছেড়ে দিতে তাঁর মন চায় না।

"কি হবে?"—মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন শেষে।

—"কেন? রোজগার কর্‌ব। কত লোক সেখানে রোজগার কচ্ছে। তা' ছাড়া সূয্যিকাকা যে গেল মাসে বলেছেন কলিকাতায় গেলে তাঁর দোকানে চাকুরী দেবেন!"

সূর্য্যকুমার হালদারের কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে মস্তবড় ছাতার দোকান। বাড়ী তাঁর সোনার গাঁয়েই, তবে চিরকাল সপরিবারে কলিকাতায় আছেন,—কালেভদ্রে কখনও বাড়ী আসেন। গত মাসে একবার বাড়ী এসেছিলেন। হরিপদ তখন দেখা ক'রে পিতার মৃত্যু-সংবাদ থেকে তাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা ক'রেছিল। হালদার লোকটি খুবই ভাল। গ্রামের দুঃস্থ লোকদের যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে গেছেন, হরিপদকে আশ্বাস দিয়ে গেছেন—দোকানে চাকরী দেবেন।

সুতরাং স্থির হ'ল—হরিপদ পরদিনই কলিকাতা যাত্রা করবে। কলিকাতা তাদের গ্রাম থেকে মাইল পঁচিশ হবে—সেই রাস্তাটুকু হেঁটেই যাবে।

জিনিসপত্রের মধ্যে সে নিলে বহু পুরাণো ছেঁড়া একখানা ধুতি, গামোছা একখানা, আর নিলে তা'র নূতন জুতাজোড়াটি। এই জুতাজোড়ার একটুখানি ছোটখাট ইতিহাস আছে।

হরিপদ স্কুলে পড়ত; পড়াশুনায় সে বেশ ভাল ছিল। বরাবরই তা'র মনে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। পাঠশালার পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে গ্রামের মধ্য-ইংরেজি স্কুলে সে ভর্ত্তি হ'য়েছিল। পুত্রের কৃতিত্বে পরাণ গর্ব্বে ও আনন্দে এত আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিল যে, দশ সের ধান বিক্রি ক'রে ছেলেকে এই জুতাজোড়া কিনে দিয়েছিল। সঙ্কোচ ও অনভ্যাসের দরুণ হরিপদ জুতাজোড়া পায়ে দেয় নাই কোন-দিনই। আজ বিদেশের পথে পা বাড়িয়ে জুতাজোড়াটি সঙ্গে নিবার লোভ সে সাম্‌লাতে পার্‌লে না।

যাত্রার প্রাক্কালে হরিপদ মাকে প্রণাম কর্‌ল।

মা কেঁদে উঠ্‌লেন। ঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ি খুঁজে একটা পয়সা তিনি পেয়েছিলেন। সেটি ছেলের হাতে দিয়ে বল্লেন—"ওরে, ভালোয় ভালোয় আবার আসিস্"—আর কিছু তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরুল না। তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সারা বুক নিংড়িয়ে দু'টি আঁখিতারায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল!

অবুঝ ছোট বোনটিও দাঁড়িয়ে রইল ছল-ছল চোখে। হরিপদ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর কর্‌ল তা'কে। চোখের জল সে-ও গোপন রাখ্‌তে পার্‌লে না।

বিকেলের দিকে হরিপদ কলিকাতায় গিয়ে পৌঁছল।

মনে তা'র কত আশা, কত হর্ষ;—মা বোনের দুঃখ সে দূর করবে!

অনেক খোঁজাখুঁজি ও হাঁটাহাঁটির পর সন্ধ্যার সময়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে সূর্য্যকুমার হালদারের ছাতার দোকানে সে পৌঁছল। আনন্দে তা'র হৃদয় নেচে উঠ্‌ল।

"কি চাই তোমার?"—একজন কর্ম্মচারী শুধালে।

"সূর্য্যিকাকা দোকানে আছেন?"—কুণ্ঠিতভাবে হরিপদ জবাব দিল।

কর্ম্মচারীটি তা'র মুখের দিকে একবার চেয়ে বল্‌লে—"সূর্য্যিকাকা!—কে সে?"

"দোকানের যিনি মালিক।"—হরিপদর কণ্ঠে ভয় জ'মে উঠেছে।

"তিনি হরিদ্বারে গেছেন।"—কর্ম্মচারীটি এই ব'লে নিজের কাজে মন দিল।

হরিপদর মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। কোন কথাই সে বল্‌তে পার্‌ল না কতক্ষণ; শেষে কোন মতে বল্‌লে যে, সূর্য্যকুমার হালদারের এক গ্রামেই তা'র বাড়ী। গেল মাসে বাড়ী গিয়ে তিনি ব'লে এসেছেন—তাঁর দোকানে চাকুরী দেবেন। তাই সে এসেছে।

তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক নাকে চশমা এঁটে হিসেব দেখ্‌ছিল। এবার মুখ তুলে সে বল্‌লে—"তিনি এলে পর এসো। অপরিচিত লোককে আমরা ঠাঁই দিতে পারি না। দিনকাল বড্ড খারাপ।"—লোকটি পুনরায় হিসেবে মনোনিবেশ কর্‌ল।

হরিপদর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। এই বিরাট কলিকাতা সহরে কোথায় সে এখন আশ্রয় নিবে? দুই চোখ ফেটে কান্না এল। তা'র কান্নাকাটিতে কারুরই মন গল্‌ল না। ব'লে ক'য়ে রাত্রিটা তাদেরই বারান্দায় শুয়ে থাক্‌তে সে অনুমতি পেল।

পরদিন ভোরে ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর শব্দ জাগিয়ে দিল তা'কে।

ক্রমে বেলা বাড়্‌ল, রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল সে। একে একে যতগুলি দোকানের সাম্‌নে পড়্‌তে লাগ্‌ল—ছোট বড় সবগুলিতেই চাকুরীর প্রার্থনা জানালে; কিন্তু চাকুরী দিতে কেউই চায় না।

হরিপদ কাতর হ'য়ে পড়্‌ল। মা-বোনের মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল তা'র চোখের সাম্‌নে। মা হয়ত কাঁদ্‌ছেন দিনরাত—বোনটি ক্ষুধার জ্বালায় কর্‌ছে ছট্‌ফট্! হায়! কত আশা সে করেছিল তিন-চারদিনের মধ্যে অন্ততঃ আট আনা পয়সাও মা'র কাছে পাঠাতে পার্‌বে।

ক্লান্ত হ'য়ে এ্যাস্‌প্লেনেডে সে পোঁছল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও অভিভূত কর্‌লে তা'কে। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা সহ্য কর্‌তে অনেকটা অভ্যস্ত সে। অবশেষে একটা বেঞ্চে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল; জেগে উঠে দেখ্‌ল সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। আলোয় আলোময় চারদিক —আর বায়ুসেবীদের বিপুল ভীড়।

পুঁট্‌লিটি নিয়ে আবার চল্‌লে সে। কতক্ষণ হেঁটেই বুঝতে পার্‌ল—পা তা'র আর চল্‌ছে না। তবু সে চল্‌ল—কোথায় যাবে কিচ্ছু ঠিক নেই। বেশ রাত্রি হ'য়ে এসেছে। বড়বাজারে সে দেখ্‌ল একটা হোটেলে লোকজন খাচ্ছে। মা'র দেওয়া একটা পয়সা কাছে ছিল। সেটা সম্বল ক'রে হোটেলে ঢুকে সে বল্‌ল—"এক পয়সায় ভাত দেবেন?" ক্ষুধায় তা'র গলার স্বর পর্য্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে গেছে।

"পাঁচ পয়সার কম খাওয়া নেই"—জবাব এল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বের হ'য়ে এল। এতক্ষণে জুতাজোড়ার কথা তা'র মনে পড়্ল। জুতায় তা'র কোন কাজ নেই। বেচ্তে পার্লে আজ সে খেয়ে বাঁচ্তে পারে, কাল অর্থোপার্জ্জনের একটা ফিকির করতে পার্বে।

পুঁট্লি থেকে জুতা বের ক'রে হোটেলের একটু দূরে ফুটপাথের উপর সে দাঁড়ালে; তারপর সাধ্যমত চেঁচিয়ে বল্তে লাগ্ল—"জুতা চাই এক জোড়া—নূতন জুতা, সস্তা খুব।"

একটা লোক তা'র ঘাড়ে ধর্ল

ইতিমধ্যে হোটেলে একটা সোরগোল উঠ্ল। একটা লোক ছুটে এসে তা'র ঘাড়ে ধর্ল। লোকটা গর্জ্জে উঠ্ল—"বেটা চোর।" তারপর এক্ষেত্রে যা' প্রযোজ্য—ঘুষি ও চড় মার্তে মার্তে জুতাসহ বেচারাকে হোটেলে নিয়ে গেল। হরিপদ বুঝ্তেও পার্ল না ব্যাপার কি!

ব্যাপার হ'য়েছিল এই—ভদ্রলোক খেয়ে উঠে দেখেন তাঁর জুতাজোড়া নেই—নূতন জুতা। আর সবাই বুঝে ফেল্ল হরিপদ ছাড়া আর কারও এ কাজ নয়; কারণ তা'র পায়ে জুতা ছিল না।

হরিপদ ক্ষীণকণ্ঠে বুঝাতে চাইল এই জুতাজোড়া তা'রই; তা'র বাবা তা'কে পুরস্কার দিয়েছিলেন। কিন্তু কে বিশ্বাস করে তা'র কথা? সবাই বল্লে—"যে খেতে পায় না, তা'র মত লোক জুতা পাবে কোথায়—চুরি না করলে?"

হরিপদর মাথায় ও পিঠে ব'য়ে গেল প্রহার-বৃষ্টি। কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে সে বেশীক্ষণ তা' সহ্য করতে পার্ল না—মাটিতে লুটিয়ে পড়্ল। একজন দয়ালু

ভদ্রলোক বল্লেন—"ওহে, ওকে আর মেরো না। শেষে উল্টে খুনের দায়ে পড়্বে। ওর যথাযোগ্য স্থানে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

পুলিশ এল। হাত-কড়া পরিয়ে তা'কে থানায় নিয়ে হাজির করা হ'ল।

তারপর?—তারপর ধর্ম্মাধিকরণের কাঠগড়ায় তা'কে তোলা হ'ল। বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে সাজা দিলেন তা'কে—তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড!

শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

ঘুষির দাম

দর্জিপাড়ার মর্জি মিঞা
ষণ্ডা ব'লে সবাই জানে।
রাজার কাছে তা'র নামে এক
নালিশ হ'ল কা'ল বিহানে।
মুদিখানার মংরু কাজী
বল্লে এসে—"রাজা মশায়,
বিচার করুন—মর্জি কেন
আমার নাকে ঘুষি বসায়?"
হুকুম পেয়ে এক পেয়াদা
মর্জিকে যায় আন্তে ধ'রে,
মর্জি তখন খোশ-মেজাজে
মুগুর নিয়ে কুস্তি করে।
পেয়াদা তায় বল্লে—"বাপু
ও সব রেখে চল এবার।
মংরুকে যে ঘুষিয়েছিলে
বিচার হবে এক্ষুণি তার।"

তা'র পরে সে নীচু স্বরে
বল্লে, "দেখ মর্জি ভায়া,
সত্যি তোমার এই বিপদে
আমার ভারি হচ্ছে মায়া;
বল্‌ব গিয়ে রাজার কাছে—
পাই নি তা'কে খুঁজে পেতে,
শুধু মুখেই ফির্‌ব কি তা
আনা আটেক দে ভাই খেতে
মর্জি বলে—"একটা ঘুষির
দাম যদি হয় আষ্ট আনা—
একটি টাকা এই ধর ভাই,
ঘুষিও নেও আর একখানা!!"
এই ব'লে সে ঘুষির চোটে
ঘুষ খাওয়াটা দেখিয়ে দিলে,
"বাপ্‌রে!" ব'লে দুষ্ট পে'দা
দৌড়ে বাঁচার পথটি নিলে!

—হাবীব

ঠাকুর্দ্দা

ঠাকুর্দ্দা প্রণবের নিকট একে একে তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়াছেন। প্রণব ঠাকুর্দ্দাকে নিয়া বর্দ্ধমানের একজন বড় কয়লা-ব্যবসায়ীর নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি কিন্তু মার্চ্চেন্ট শুনিয়াই পশ্চাৎপদ; বলেন—"নেহাৎ ভাগ্য ভাল ছিল, তাই 'চিট্‌জয়' (Cheatjoy) থেকে অল্পে সেরে এসেছি, এবার আবার কি 'কিল্‌জয়' (Killjoy) কোম্পানীর কাছে নিয়ে যাবে? শেষটায় প্রাণ নিয়েই টানাটানি হবে? থাক্ রে বাবা—নেহাৎ ঘি-ভাতের প্রাণটা থেকেই যাক্।"

প্রণব ঠাকুর্দ্দাকে বুঝায়—"দেখুন, প্রতারণা ক'রে চাকরি নিয়েছিলেন ব'লেই ত চিট্‌জয় কোম্পানীতে আপনার সেই দুর্ভোগ। যদি আপনি মিঃ হ্যারিস্‌কে স্পষ্ট বল্‌তেন আপনার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ের কথা, আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা, তা হ'লে হয়তো হ্যারিস্ সাহেবের নিকট আপনার সেই দুর্ভোগ হ'ত না। হ্যারিস্ আপনাকে একটা চাকরি দিত এবং আপনাকে তাড়িয়ে দিত না। তারপর—আপনি যে টুইশ্যান্ ছেড়ে দিলেন—তাও ত মিথ্যার উপরেই ভিত্তি করা ছিল ব'লেই। দেখুন কতদূর পর্য্যন্ত মিথ্যার জয় হয়। সৎপথে চলাই ছিল আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। আপনি চিরদিন—কি কলেজ জীবনে, কি চাকরি জীবনে তা' উপেক্ষা ক'রে এসেছেন। তাই মিথ্যার সাথে আপনার যে বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল, তা' একদিনে ভেঙ্গে গেছে। এবার সত্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন।"

(২)

প্রণব অনেক বলিয়া ঠাকুর্দ্দাকে বর্দ্ধমানের একজন কয়লার ব্যবসায়ীর নিকট নিয়ে গেল। কয়লার বাবুটি ঠাকুর্দ্দার বড় ভাই কি ছোট ভাই—"ষ্টোন" না মেপে বলা কষ্ট। বাবুটির নাম—গয়ারাম ঘোড়ুই—ডাকনাম গোবর। ঐ নামের একটু ইতিহাস আছে। উনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ওজনে ছিলেন মাত্র ২৫ পাউণ্ড! পাড়ার লোকেরা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "এবার একটি ছেলে পৃথিবীতে এসেছেন—যিনি শীঘ্রই কংস-বধে নেমে যাবেন।" গোবরবাবুর ঠাকুরমা তাই তাড়াতাড়ি তাহার বাবাকে ডাকিয়া বলেন—"ওরে বিষ্টু (গোবরবাবুর বাবার নাম। আগের দিনের লোকেরা ঠাকুরের

নাম ক'রে ছেলের নাম রাখ্‌তেন, যাতে মরার সময় অন্ততঃ ছেলের নাম ও ঠাকুরের নাম দুইটাই একসঙ্গে সারা যায়।) পাড়ার বদ্ ছেলেগুলোর নজর তোর এই কচিটির উপর লেগেছে রে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। কাজেই ওর ডাকনাম এমন কিছু রাখ্‌তে হবে যাকে লোকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করে।" গোবরবাবুর বাবা তাতে একে একে 'থুতু, বমি ও গোবর' বলাতে—শেষটাই ঠাকুরমার খুব বেশী পছন্দ হইয়া গেল। গোবরবাবুর ঠাকুরমা নাকি এখন বহুদূরে কোন জায়গায় উঠিয়া সকলকে ভুলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু গোবরবাবুর নাম এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার দেহখানা দিন দিন ঠাকুরমার অক্ষয় কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

গোবরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার দেখা এক মহাযজ্ঞের কাণ্ড আর কি? দুই মহাপুরুষের—প্রথমে হাসির সহিত করমর্দ্দন—তাহার পরে আলিঙ্গন। দুষ্ট লোকেরা বলে—প্রণববাবুর ন্যায় লোকেরাও নাকি এসময় দুইখানা ইস্পাতের আলিঙ্গনে বর্দ্ধমান সহরে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার আশঙ্কা করিতেছিলেন!

দুই মহাপুরুষের···আলিঙ্গন

যাহাহউক, প্রথম পর্ব্ব তো কোনও প্রকারে সমাপন হইল। বাংলায় একটা কথা আছে—"রতনে রতন চিনে"—তাই আমাদের প্রণববাবুর বেশী কষ্ট করিতে হয় নাই। একটু আলাপের পরই নাকি গোবরবাবু বলিয়াছিলেন—"হাঁ, ঠিক; এইরকম লোকই আমি খুঁজ্‌ছি। তালপাতার শিপাই আমি কোনও দিনই পছন্দ করি না, আর লম্বা গাট্টা চেহারা গুণ্ডামাফিক লোকও আমি পছন্দ করি না। বেশ দিব্যি নাদুস্ নুদুস্ চেহারা—শ্রী, অশোক এই সব ঘি-এর বিজ্ঞাপনের চেহারাই আমার পছন্দ। হাঁ প্রণববাবু এঁকে দিয়েই আমার বেশ চল্‌বে।···কাজের কথা বল্‌ছেন?—দেখুন, আমার রাণীগঞ্জ,

আসান্‌সোল, গিরিডি এই কয়টা জায়গায় কয়লার ডিপো আছে। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় কয়লা চালান হয়। আপনি সেই সমস্ত জায়গা পরিদর্শন ক'রে বেড়াবেন। কয়েকমাস ধ'রে আমি খবর পাচ্ছি, চালান-দেওয়া কয়লার মধ্যে কিছু কিছু ঘাট্‌তি হচ্ছে। আপনি এটা অনুসন্ধান ক'রে বের ক'রে দেবেন। আপনার দ্বারা এসব সম্ভব হবে তো ?"

ঠাকুর্দ্দা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এখন হইতে তিনি আর কখনও মিথ্যা কথা বলিবেন না এবং কোনও প্রকার অন্যায় অসত্যের মধ্যেও যাইবেন না। তাই এইবার জবাব দিলেন—"দেখুন, আমি কোনও দিন এসব কাজ করি নি, আমাকে দিয়ে এসব কাজ ভাল ক'রে চল্‌বে কিনা বল্‌তে পারিনে। তবে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।"

গোবরবাবু এই উত্তরে আরও সন্তুষ্ট হইলেন। "এই হচ্ছে কর্ম্মী পুরুষের কথা। আপনি যদি বল্‌তেন—'হাঁ আমি খুব ভাল ক'রে পার্‌ব'—তা হ'লে আমি বুঝে নিতুম—আপনাকে দিয়ে আমার এসব কাজ ভাল ক'রে চল্‌বে না। আমি বুঝেছি আপনি ঠিক পার্‌বেন। তা' হ'লে কাল থেকে আপনি কাজে লেগে যান।"

ঠাকুর্দ্দা ও প্রণব উভয়েই তখন ফাঁড়ির দিকে রওয়ানা হইলেন। এতদিনে ঠাকুর্দ্দার মুখে সত্যই একটু হাসি দেখা দিয়াছে। হয়ত সত্য কথার জন্যই তাঁহার অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা আসিবে।

প্রণব বলিল—"ঠাকুর্দ্দা, উপরে থেকে যিনি পৃথিবী চালাচ্ছেন তিনি যে কি ক'রে, কি দিয়ে—কা'কে সুবিধা ক'রে দেন, বলা যায় না। আপনার সেই দুর্দ্দৈব থেকেই আপনার সুবিধা হ'ল। একেই কি ইংরাজীতে বলে না—Out of evil cometh good—মন্দ হইতেই ভাল আসে ?"

ঠাকুর্দ্দা হাসিলেন। আজ তাঁহার ভাবনার ভাব যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। প্রণবের কাছে সমস্ত কথা বলিয়া অনেকটা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছেন।

(৩)

দুর্জ্জয় শীত পড়িয়াছে। বৃদ্ধেরা সবাই বলিতেছেন—"এবারের মত শীত আর পড়ে নি।" স্কুল কলেজের দুষ্ট ছেলেরা তাহার উত্তরে বলিতেছে—"তা আমরা জানি, প্রত্যেক বছরই বুড়োরা বলে—এবারের মত শীত আর পড়ে নি।" আবার তাহাদের মধ্যে একটু বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেরা বলিতেছে—"ওরে তা নয়, তা নয় ; শুনিস্ নি

—কে যেন বলেছে—হিমালয় পাহাড় ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে নেমে আস্‌ছেন, একেবারে সমুদ্রের দিকে। মহাভাবনার কথাই বটে!"

এই দুর্জ্জয় শীতে রাত্রি দশটার সময় একটা ওভার-কোট গায়ে দিয়া আমাদের ঠাকুর্দ্দা একটা টর্চ্চ হাতে রাণীগঞ্জের একটা রাস্তা ধরিয়া যাইতেছেন। কয়েক মাসে ঠাকুর্দ্দা যেন একটু কমিয়াছেন—নানা জায়গায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার দেহখানা যেন একটু কৃশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাইতে যাইতে কতদূর গিয়া একটা জায়গায় হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। কাছেই একটা কয়লার ডিপো ছিল, তাহার উপর টর্চ্চের আলো ফেলিয়া একটু দেখিয়া আপন মনেই বলিলেন—"হাঁ, ঠিক এসে গেছি।" পরক্ষণেই টর্চ্চের সাহায্যে ঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন—"রাত বারটা বাজে। এখনও আধঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে। একটু আগে এসে গেছি—তা' আগে আসা ভাল, পরে ভাল নয়।"

সেই শীতে কোনও প্রকারে ঠাকুর্দ্দা একটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠিক সাড়ে বারোটা! গুম্ গুম্ শব্দে একখানা মোটরলরি আসিয়া কয়লার ডিপোর কাছে থামিয়া গেল। ঠাকুর্দ্দা মোটরলরির হেড্‌লাইটের সাহায্যে সময়টা দেখিয়া লইলেন।

লরি হইতে একজন লোক বলিল, "আরে ভাই, এবার যে শীত পড়েছে বেশীদিন এ রকম শীতে মোটর চালান চল্‌বে না। তার উপর তোমরা যা মজুরি দিচ্ছ এতে পোষায় না মোটেই।" মোটরের অপর আরোহী বলিলেন, "দেখ ভাই, দিনকাল বড় খারাপ প'ড়েছে। কয়েকদিন হ'ল—আমাদের গোবরবাবু একজন ইন্সপেক্টার নিযুক্ত ক'রেছেন। তা'র সঙ্গে থাকে গাট্টা এক জোয়ান—আর সে নিজেও একজন গোবরবাবুর প্রথম সংস্করণ। লোকটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ নাকি এক এক জায়গায় উপস্থিত হচ্ছে।"

"আরে, রেখে দাও তোমার উপস্থিত হওয়া। আমি জানি নেহাৎ দায় না ঠেক্‌লে কেউ এ শীতে বের হ'তে পারে না! চাকরি—পরের চাকরি—তার আবার দায় কি?"

দ্বিতীয় লোকটি এইবার চাবি দিয়া ডিপোর সদর দরজা খুলিয়া ফেলিল। ডিপোর কয়েকজন চাকর ঘরের মধ্য ঘুমাইতেছিল। সকলে জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডিপোর পুরাতন ভৃত্য মঙ্গলরাম বলিল—"বাবু, বারবার এসব ঝামেলা কেন করেন? আপনার কি ধরম নেই?—আমাদের বড়বাবু বিশওয়াস ক'রে আপনাকে ভার

দিয়া, আর হাপ্‌নি নিমক হারামি—” বেচারাকে আর শেষ করিতে হইল না। ডিপোর বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“আমি তোর কাছে কর্ত্তব্য শিখ্‌তে পার্‌ব না বাপু। বুরবক্‌ কাহাকা—চিল্লাও মৎ।”

অগ্রসর হইয়া এই সময় ঠাকুর্দ্দা ডিপোর বাবুর মুখের উপর টর্চ্চ ফেলিলেন। বাবুটির মুখ শুকাইয়া গেল, এতদিনে বুঝি পুলিশ সংবাদ পাইয়া ধরিতে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর্দ্দা ততক্ষণে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলরামকে বলিলেন—“মঙ্গল, তুমি ঠিক ব’লেছ—নিমক খেয়ে নিমকের কাজ করে নি। তুমি দেখেছ সবই—আমিও সব শুনেছি। শীগ্‌গির আমি গোবরবাবুকে সব জানাচ্ছি—তিনি বলেছেন—চোর ধর্‌তে পার্‌লে, জেলে দেবেন।”

মুখের উপর টর্চ্চ ফেলিলেন

ডিপোর বাবুটির নাম মাণিকবাবু। তিনি এইবার ঠাকুর্দ্দার পায়ে পড়িয়া বলিলেন—“স্যার, স্যার, এই বারের মত মাপ করুন। আপনি যত টাকা চান আমি তাই দিব। আমায় পুলিশে দিবেন না। আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে—জেলে মৃত্যু। আমি জেলে গেলে আর বাঁচ্‌ব না।”

ঠাকুর্দ্দা ধীর, স্থিরভাবে বলিলেন—“দেখুন মাণিকবাবু, জীবনে যথেষ্ট অন্যায় ক’রেছি, মিথ্যা ব’লে চাকরি নিয়েছি; কিন্তু রাখ্‌তে পারি নি। ঠেকে শিখেছি—অন্যায় অধর্ম্ম কর্‌লে শেষ পর্য্যন্ত জয় হয় না। আর অন্যায় কর্‌ব না, অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দিব না। আপনি ক্ষমা চাইতে হয় গোবরবাবুর কাছে চাইবেন। তিনি হয়ত কাল পরশু পর্য্যন্ত আমাদের তার পেয়ে এসে যাবেন।”

“এই যে আমি এসেই গেছি প্রকাশবাবু। অবাক্‌ হ’য়ে গেলেন—না? যখন

আপনার মুখে শুন্‌লুম একটা হদিস্ পেয়েছেন এবং আজ রাত্রে ঠিক চোর এসে যাবে, তখনই আমি কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম। আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত হই নি, পাছে আপনি একা কোন বিপদে পড়েন—তাই আমার আরও দুইজন সশস্ত্র প্রহরীকে নিয়ে এসে বাগানে ঢুকে পড়েছি। কি ভাবে এলাম ?—বাগানের পিছন দিকে আর একটা গেট আছে, আপনি লক্ষ্য ক'রেছেন ?—সেই গেটটা সর্ব্বদা চাবি বন্ধ থাকে এবং সেই গেটের একমাত্র চাবিটা থাকে আমার কাছে। রাত্রি ৯টার সময় আমি নিঃশব্দে রোলস্ রয়েস্ ক'রে এখানে এসে বাগানের দরজা খুলে ঢুকে পড়ি। তখনই আমি লক্ষ্য করি যে, ডিপোর সদর দরজা বন্ধ। এই বন্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে যে আমি সন্দেহ ক'রেছিলাম তা' বলাই বাহুল্য। আর একটা কথাও এই সঙ্গে অস্বীকার কর্‌ব না প্রকাশ-বাবু। এই সঙ্গে আপনাকে একটু পরীক্ষা ক'রে নিবারও আমার ইচ্ছা ছিল, আপনি প্রলোভন জয় কর্‌তে পারেন কি না। আপনাকে আমি এখন থেকে আমার ব্যবসায়ের এক-চতুর্থাংশের অংশীদার ক'রে দিচ্ছি। এই ব্যবসায় এখন থেকে **গয়া-প্রকাশ** এণ্ড কোম্পানী নামে চল্‌বে।"

তারপর মাণিকবাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"মাণিক—তুমি চোর, তোমাকে আমি জেলে দিতে পারি, কিন্তু কোর্টে গেলে অনেক টাকা খরচ কর্‌তে হবে ; তা' ছাড়া ফার্ম্মের সুনাম সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহও হ'তে পারে। সকলের উপর তোমার ঘরেও তো ছেলে-মেয়ে আছে—তাদের কথা মনে ক'রে তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে আজই—এই মুহূর্ত্তেই—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। যাও—ঐ তোমার বাক্স পেটরা—সব ফার্ম্মের মুটেরাই ষ্টেশনে দিয়ে আসবে।—যাও এক্ষুণি চ'লে যাও।"

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

প্রেমের পরশ

পাহাড় দেখিতেছিল উচ্চে তুলি' শির,
কোথায় অভাব, দুখ আছে ধরণীর।

মেঘ কহে, "বড় তোর বাড়িয়াছে বাড়,
তুলিবারে চাহ মাথা উপরে আমার?
এতই শকতি যদি কর তবে রণ।"
এত বলি' স-গরবে করে আক্রমণ।
কহিল পাহাড় ধীরে, "শুন মেঘ-ভাই,
বিবাদের অবসর এবে কোথা পাই!
দেখ চেয়ে রবি-তাপে ধরণীর প্রাণ
গুমরিছে সকাতরে হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
জলাভাবে কৃষকের চাষ নাহি চলে;
না হ'লে ফসল, হায়! মরিবে সকলে।
হেনকালে আমাদের বিবাদ কি সাজে?
এস ভাই লেগে যাই জগতের কাজে।"—
এত কহি' প্রেম-ভরে দিল আলিঙ্গন।
গলিয়া মেঘের প্রাণ হইল সৃজন—
বরষা ও নদীরূপা সুধার আসার—
রূপ-রসে, ফুল-ফলে ভরিল সংসার।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নেড়ুদা

'নেড়ুদা'কে চিনিত না এমন ছেলে আশেপাশের কয়েকখানা গাঁয়ে একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। গায়ের জোরে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, অসম সাহসে, তাহার সম-কক্ষ একজনও ছিল না। পরের আপদে বিপদে অমন করিয়া বুক পাতিয়া দিতে কেহই পারিত না। গাঁয়ের 'সৎসঙ্গ' হইতে সুরু করিয়া 'সৎকার-সমিতি' পর্য্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানেরই পাণ্ডা ছিল নেড়ুদা। তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করে যে নেড়ুদা ছিল বখাটে—শুধু মোড়লি করিয়া আর পাড়া বেড়াইয়াই দিন কাটাইত, তবে সে মস্ত ভুল করিবে! ক্লাসে সে ছিল 'ফার্ষ্ট বয়'। ক্লাসের সময় ও পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাড়া সারাদিন বইয়ের সাথে তা'র কোন সংশ্রব কাহারও চোখে পড়িত না—অথচ কেহ ভাবিয়াই পাইত না—কি করিয়া সে বছরের পর বছর ফার্ষ্ট হইয়া প্রমোশন পাইত, আর সকলের চোখের উপর দিয়া গাদাগাদা চক্‌চকে প্রাইজের বইগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিত! নেড়ুদা ভোর চারিটায় উঠিয়া পড়িতে বসিত—দুঘণ্টা গভীর মনোযোগে পড়িত—এই ছিল তা'র

রোজকার অভ্যাস। ভোররাত্রে নিরিবিলিতে ও দেহমনের তাজা অবস্থায় যাহা পড়া যায় তাহাই মনের মধ্যে ভালভাবে গাঁথিয়া যায়; এ সত্যটা পরে অবশ্য আমরা বুঝিয়াছিলাম—কিন্তু বড়ই বিলম্বে, সময় হারাইয়া!

'নেড়ুদা' নামটার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। তার পোষাকি নাম হইল 'জ্যোতির্ম্ময়'। ওর বাবা ছিলেন ডুয়াসে এক চা-বাগানের ম্যানেজার। সপরিবারে সেখানেই বাসকরিতেন—গ্রামে বড় একটা আসিতেন না। নেড়ুদার বয়স যখন বছর সাত-আট, তখন তিনি হঠাৎ মারা যান। তখন নেড়ুদাকে নিয়া তা'র মা গাঁয়ে বাস করিতে আসিলেন। কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল—তাহাতেই মা ও ছেলের দিন মোটামুটি ভাবে চলিয়া যাইত। নেড়ুদার মামার ইচ্ছা ছিল উহাদেরে নিজের বাড়ীতেই রাখে; কিন্তু তা'র মা, অবশিষ্ট জীবন 'শ্বশুরের ভিটা' ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই রাজি হ'ন নাই।

নেড়ু প্রথম যেদিন ক্লাসে উপস্থিত হইল—সেদিন সর্ব্বাগ্রে ক্লাসশুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার খুবই পাতলা চুলওয়ালা বড় মাথাটা আর বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটির উপর। সেই দিন হইতেই ক্লাসে তাহার নাম হইয়া গেল 'নেড়া'! নেড়া বলিয়া ডাকিলেও সে কিন্তু মোটেই চটিত না—বরং দুই-চারি দিনের মধ্যেই সে ক্লাসে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিল—ফলে 'নেড়া' পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইল 'নেড়ুদা'। তাহার পোষাকি নামটা চাপাই পড়িয়া গেল!

ছেলেবেলাকার একটা তুচ্ছ ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নেড়ুর হৃদয়টা ছিল কত বড়—আর তাহার বুদ্ধিটাও ছিল কেমন প্রখর!

নেড়ুর বয়স তখন হইবে দশ-এগার বছর! সে বাড়ীর সাম্‌নেই তাহার নিজস্ব ছোট্ট শাকসব্‌জির বাগানে বসিয়া কাজ করিতেছিল। পরীক্ষার পড়া তৈয়ারী করিবার জন্য স্কুল কয়েক দিনের জন্য ছুটি; কাজেই নাওয়া খাওয়ার বিশেষ তাড়া ছিল না।

মা ডাকিয়া বলিলেন—"নেড়ু, যা না বাবা দৌড়ে—ডাকঘর থেকে একখানা 'খাম' কিনে নিয়ে আয়! এক ছুটে যাবি—আর এক ছুটে আস্‌বি—কোথাও দেরী করিস্‌নে যেন! এসে স্নান কর্‌বি—খাবি!"

"না গো না—দেরী কর্‌ব কেন?—এই এলুম ব'লে। তুমি ভাত বাড়তে থাক না—আমি আস্‌বার সময় জমীদার বাড়ীর পুকুরটায় একটা ডুব দিয়ে চ'লে আস্‌ব'খন!" এই বলিয়া মায়ের হাত হইতে পয়সা লইয়াই নেড়ু ছুটিল ডাকঘরের দিকে। বেলা তখন দুপুর!

পুঁটেদের বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই পুঁটে ডাকিয়া বলিল—"এই, শোন্ না ভাই নেড়ুদা! এই অঙ্ক ক'টা আমায় বুঝিয়ে দে! পরীক্ষার আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে—অথচ এই অঙ্কটা কিচ্ছুতেই হ'ল না ভাই এখনো! কি যে হবে!" পুঁটে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

নেড়ু প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল—তাহার চোখে তখন হয়তো ভাসিয়া উঠিয়াছিল মায়ের রুদ্রমূর্ত্তি! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পুঁটের মলিন মুখখানার দিকে চাহিয়াই
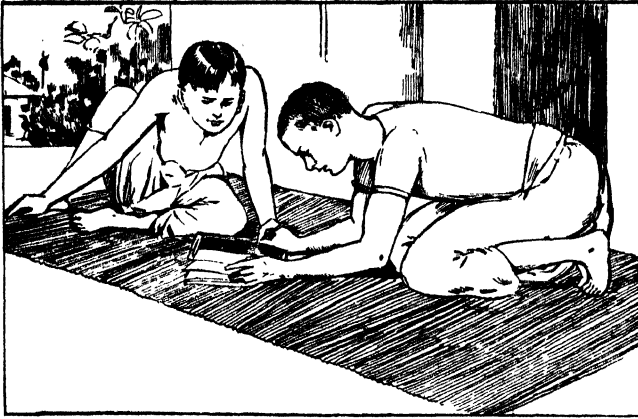
সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল—আহা! সত্যই তো বেচারি অঙ্কে বড় কাঁচা! —ব্যস্, নেড়ু অমনি বসিয়া গেল পুঁটেকে অঙ্ক বুঝাইতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিতে লাগিল—সেদিকে কাহারও হুঁস নাই!—এমনি সুন্দরভাবেই নেড়ু অঙ্ক বুঝাইতে পারিত। মাঝে পুঁটে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"নেড়ুদা, তোমার খাওয়াদাওয়া হ'য়েছে তো?"

নেড়ু উত্তর দিয়াছিল—"হা।"—ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই।

এদিকে নেড়ুর মা ভাতের হাঁড়ি আগলাইয়া ঠায় বসিয়া আছেন—নেড়ুর অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় নেড়ু—তাহার দেখাই নাই! ওদিকে মাথার সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল! মায়ের রাগটাও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ঘণ্টা দুই-তিন থাকিয়াও যখন নেড়ুর টিকিটিও দেখা গেল না—তখন তিনি রাগে গজ্‌গজ্ করিয়া—"আসুক হতভাগা আজ বাড়ীতে—পিঠের চামড়া তুলে নেব! দিন দিন বড় বাড় বাড়ছে! আজ বাদে কাল পরীক্ষা—পড়াশুনার নাম নেই—খাওয়াদাওয়ার কথা পর্য্যন্ত খেয়াল নেই!" বলিতে বলিতে রান্নাঘরের শিকল আঁটিয়া দাওয়ার উপরেই আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময় বাহিরে বাহির হইয়াই নেড়ু চমকাইয়া গেল—বেলা যে

অনেকখানি গড়াইয়া গিয়াছে! ডাকঘর তো বন্ধ হইয়া যাইবে—খাম কিনিবার কথা সে এতক্ষণ তো বেমালুম ভুলিয়াই গিয়াছিল! সে ছুটিয়া চলিল ডাকঘরের দিকে।

পিছন হইতে পুঁটে ডাকিয়া বলিল—"নেড়ুদা, কাল দুপুরে আস্‌বে তো ভাই?"

ছুটিতে ছুটিতেই নেড়ু উত্তর করিল—"হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।"

খাম কিনিয়া বাড়ী ফেরার পথে নেড়ু ভাবিতে লাগিল—"মা তো নিশ্চয়ই রেগে 'টং' হ'য়ে আছেন—বাড়ী গেলেই রাগের জ্বালায় হাড় ক'খানা আস্ত রাখ্‌বেন না। —মায়ের রাগটা যা'তে পড়ে, তেমন একটা ফন্দী না বের কর্‌তে পার্‌লে তো আর চল্‌ছে না!"

নেড়ুর উর্ব্বর মস্তিষ্কে ফন্দী জোগাইতে বিলম্ব হইল না। সে কোথায় যেন শুনিয়াছিল খুব রাগের সময় কোন একটা হাসির কথা মনে করিলেই চট্ করিয়া রাগটা পড়িয়া যায়! মাকে একবার হাসাইতে পারিলেই তাঁর সব রাগ 'জল' হইয়া যাইবে!—ফন্দীটার কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া সে নিজে নিজেই খানিকটা হাসিয়া লইল। ফন্দীটার অনিবার্য্য সাফল্য সে যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল!

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই নেড়ু ছুটিতে লাগিল। দরজার বাহিরে থাকিতেই সে চীৎকার জুড়িয়া দিল—"মা, মাগো!—শীগ্‌গির ধর, বড্ডো গরম—উহুহুঃ—গেল, গেল—হাতটা পুড়ে গেল!" বলিতে বলিতে সে হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল বাড়ীর ভিতর!

দাওয়ায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে মায়ের রাগটা আপনা হইতেই 'পড়ি পড়ি' করিতেছিল। হঠাৎ ছেলের সাড়া পাইয়াই সেটা আবার 'দপ্' করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দাওয়ার এক পাশেই রান্নার জন্য চেলা কাঠের গাদা ছিল—সেখান হইতে একটা চেলা কাঠ তুলিয়া—"হতচ্ছাড়া ছেলে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—আজ তোকে মেরেই খুন কর্‌ব—তারপর না হয় নিজে 'আত্মহত্যে' হ'ব—এমনি ক'রে জ্বালিয়ে খাবি রোজ।" বলিতে বলিতে তিনি নেড়ুকে তেড়ে গেলেন।

"আঃ—আগে এইটে ধরই না ছাই! উহুহুঃ—হাত যে পুড়েই গেল—উঃ-মাগো!" বলিতে বলিতে নেড়ুর মুখখানা কাঁদ-কাঁদ হইয়া গেল।

হাজার হোক—মায়ের প্রাণ তো! ছেলের কষ্ট দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারে না। রাগটা পূরামাত্রায় থাকিলেও তিনি নেড়ুর হাত হইতে কলাপাতার ঠোঙাটা টানিয়া নিলেন।

"কৈ রে, এটা তো ঠাণ্ডা—হিম—গরম কোথায়?—কি আছে এর ভেতর?" বলিতে বলিতে মা সেটা খুলিতে লাগিলেন। নেড়ু 'আড়চোখে' দেখিতে লাগিল।

ঠোঙাটা খুলিতেই একখানা খাম 'টুপ' করিয়া মাটিতে পড়িল! মা প্রথমটা অবাক্ হইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"একি রে?—'বড্ডো গরম' 'হাত পুড়ে গেল' ব'লে এতক্ষণ ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলি কেন?—এটা তো একখানা খাম!—শয়তানির আর জায়গা পাস্‌নি, না রে নেড়ু?" বলিতে বলিতেই মায়ের মুখখানা আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

ঠোঙাটা টানিয়া নিলেন

নেড়ু এবার কাঁদ কাঁদ-ভাবে বলিল—"হ্যাঁগো হ্যাঁ! তা তো বল্‌বেই! ঘরের বের তো হও না, কাজেই বাইরের কোন খবরও তো রাখ না! তাইতেই তো কথায় কথায় কাঠের চেলা নিয়ে মার্‌তে ধেয়ে আস! ডাকঘরে খাম ফুরিয়ে গিয়েছিল যে! মাষ্টারবাবু বল্লেন,—'নেড়ু, একটু দেরী হবে বাবা—খাম ফুরিয়ে গেছে—ভেতরে তৈরী হচ্ছে—একটু বস—একেবারে টাট্‌কা তৈরী খাম নিয়ে যাবে।'—তাইতেই তো আমি সেখানে ব'সে রইলুম। যেইমাত্র খাম তৈরী হ'য়ে এল—অমনি গরম গরম একখানা কলাপাতায় জড়িয়ে নিয়েই ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি। তাইতেই তো এত দেরী হ'ল!"—নেড়ুর মুখখানা যেন অভিমানে ফাটিয়া পড়িতেছিল।

ছেলের কৈফিয়ৎ শুনিয়া আর মুখের চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মা তো হাসিয়াই আকুল—রাগ কোথায় ভাসিয়া গেল!

তারপর খাওয়াদাওয়া সারিয়া নেড়ু লক্ষ্মীছেলের মত বই লইয়া বসিল। কিন্তু পড়ায় তাহার মন বসিল না। মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া মনটা ভাল লাগিতেছিল

না; তা' ছাড়া পুঁটেকে কথা দিয়েছে কাল দুপুরে আবার অঙ্ক শিখাইতে যাইবে। মায়ের অনুমতি পাওয়া চাই। সারা বিকেলটাই তা'র মনটা খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল।

রাত্রে মায়ের পাশে শুইয়া নেড়ু অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া কাটাইল। তারপর একবার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ডাকিল—"মা!"

—"কি, বাবা?'

—"একটা কথা বল্‌ব '—বল রাগ কর্‌বে না?"

—"না রে, পাগল, না! কি বল্‌বি বল না।"

—"আজ দুপুরে তোমার কাছে মিথ্যা কথা ব'লেছি। খাম আন্‌তে সত্যি সত্যি কেন দেরী হয়েছিল জান?"—তারপর একে একে দুপুরবেলার ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া বলিল —"মা, পুঁটে অঙ্কে বড্ডো কাঁচা। আর সব বিষয়ে ও পাশ কর্‌বে নিশ্চয়ই—কেবল অঙ্কটাতেই ওর যা ভয়। অথচ একজন মাষ্টার রেখে যে পরীক্ষার আগে অঙ্কটা ঠিক ক'রে নেবে, সে পয়সাও ওদের নেই। প্রমোশন না পেলে হয়তো ওর আর পড়াই হবে না।—তাই ও আমাকে ধ'রেছে এ কটা দিন দুপুরবেলাটা ওকে আমি অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়ে আসি। বল, তুমি মানা কর্‌বে না মা।—আমার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা— পাশ আমি নিশ্চয়ই কর্‌ব—ফার্ষ্ট সেকেণ্ড না হয় নাই হ'ব!"

মায়ের মুখ হইতে কোন উত্তর আসিল না বটে—কিন্তু দুইখানি স্নেহকোমল হস্ত নিবিড়-ভাবে জড়াইয়া ধরিতেই নেড়ু বুঝিল যে, মায়ের সম্মতি ও অজস্র আশীর্ব্বাদ সে পাইয়াছে। সে পরম স্বস্তিতে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

অলঙ্কারের শোভা

নীহার বলিল—"দূর্ব্বে! আমি অলঙ্কার—
কত না অঙ্গের শোভা বাড়াই তোমার।"
দূর্ব্বা বলে—"ক্ষণপরে তোমার মরণ,
আমার শাশ্বত শোভা শ্যামল বরণ।"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বেদান্তশাস্ত্রী

পূজার ছুটি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দোরে পড়ল কাঁটা॥"

মন্ত্র বলিয়া রাণু ও মীনু দুই বোন ভায়েদের কপালে ফোঁটা দিতেছে। আজ ভাইফোঁটা। বাঙালীর আজ বড় আনন্দের দিন।

পূর্বদিন রাত্রি হইতে ছাদের উপর কলার পাতা পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। মীনু ভোর না হইতেই উঠিয়া সেই পাতা হইতে শিশির সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—রাণু সেই শিশির দিয়া চন্দন ঘষিয়াছে। ছোটরা সবাই উঠিয়াছে—ঘুম ভাঙে নাই কেবল অজয় আর ত্রিদিবেশের।

রাণু আজ নিজের হাতে রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইবে। কিন্তু ফোঁটা না দিয়া তো আর রান্না ঘরে ঢোকা যায় না,—অথচ দিবেশদা'র ঘুম ভাঙিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তাই মীনুকে বলিল,—"যা না ভাই দিবেশদা'কে তুলে দে না।"

—"তুমি নিজে যাও না ভাই। আমার হাতে এখন অনেক কাজ।"

—"কি কাজটা শুনি?"

—"যাই জামাইবাবুকে তুলি।"

—"ওঃ এই তোমার কাজ!"

—"কাজটা কি কম হ'ল দিদি? তাঁরও তো ফোঁটা পরার সখ আছে।"

—"সখ থাকতে পারে, কিন্তু বোন তো আর এখানে নেই।"

"যা না ভাই দিবেশদা'কে তুলে দে"

—"তাঁর বোন না থাক, তোমার বোন তো আছে। আমাকেই দিতে হবে ফোঁটা। নইলে দাদা, অনুদা, দিবেশদার কপালে ফোঁটা দেখে বেচারির মনে কি সুখ থাকবে?"

—"যাহোক ভাগ্যিস্ তুই ছিলি, তাই জামাইবাবুর দুঃখ বুঝলি। কিন্তু খবরদার্, বিনু ঘুমুচ্ছে, সে যেন না জাগে। তা হ'লে আর কোন কাজ করতে দেবে না আমাকে।"

—"না গো না, সে আমি জানি"—বলিয়া মীনু জামাইবাবুর ঘরের দিকে দৌড়িল।

রাণু অনেক ডাকাডাকি করিয়া দিবেশদা'কে উঠাইল বটে, কিন্তু অজয়কে মীনু কিছুতেই তুলিতে পারিল না। যে সত্যই ঘুমায় তাহার ঘুম ভাঙান যায়, কিন্তু যে জাগিয়া ঘুমায় তা'কে উঠান তো সহজ নয়! সরল উপায়ে জামাইবাবুকে তুলিতে না পারিয়া মীনু শুধু "আচ্ছা!" বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

অনু মণ্টু দরজায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। মীনুর চলিয়া যাওয়ার কারণ তাহাদের বুঝিতে দেরী হইল না। তাহারা জানিত মীনু ঘুম ভাঙাইবার খুব ভাল ওষুধই জানে। তাহারা আড়িপাতিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মীনু ফিরিল—হাতে একটি ছোট কৌটা। অনু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল। মীনু ঠোঁটের উপর আঙুল ধরিয়া ইসারা করিল—চুপ্!

"কি বাবা সর্দি টর্দি হ'ল না কি?"

তাহার পর এক বিষম কাণ্ড—জামাইবাবুর ভীষণভাবে হাঁচি; সে হাঁচি আর থামে না! হাঁচির শব্দে রাণু দৌড়িয়া আসিল। রাণুর মাও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ইতিমধ্যে মীনু খাটের নিচে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। সব শুনিলে মা আর আস্ত রাখিবেন না।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বাবা সর্দি টর্দি হ'ল না কি?"

—"না এই এমনি একটু ইয়ে—হ্যাঁচ্চো। মানে কাল রাত্রে একটু ঠাণ্ডা—হ্যাঁচ্চো। ও সেরে যাবে এক্ষুণি—হ্যাঁচ্চো!"

অনু, মণ্টু তো হাসিয়াই অস্থির। রাণুও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। শাশুড়ী ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"এ ঠিক মীনার কাণ্ড! ঘুমন্ত মানুষের নাকে এক রাশ নস্যি গুঁজে—ধিঙ্গি মেয়ে! দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি মজাখানা"—বলিতে বলিতে তিনি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

তখনও অজয়ের নাকের জ্বালা কমে নাই। রাণু বলিল,—"উঠে নাকটা ধুয়ে ফেল না। যেমন ঘুম,—ঠিক হয়েছে।"

অজয় বলিল,—"হ্যাঁ তা'তো বলবেই। চোরে চোরে—হ্যাঁচ্চো!—"

খাটের নিচে হইতে পাদপূরণ হইল,—"মাসতুতো ভাই—হ্যাঁচ্চো।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অজয়ও না হাসিয়া পারিল না। তাহার হাসি ও হাঁচি মিলিয়া নাক ও গলা দিয়া এমন শব্দ বাহির হইতে লাগিল যে, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সকলের পেটে খিল ধরিবার উপক্রম হইল।

রাণু বলিল,—"মীনা, আর কেন—এবার বেরিয়ে পড়।"

—"মা কোথায়?" মীনু নিচু গলায় প্রশ্ন করিল।

—"মা রান্নাঘরে।"

—"মা রান্নাঘরে—কিন্তু জামাইবাবু খাটের উপরে। এটা মনে থাকে যেন। আজ সহজে ছাড়ান পাচ্ছ না শ্রীমতী মীনা দেবী। অনেক দুঃখ আছে তোমার কপালে।" বলিয়া অজয় শাসাইল।

—"মানুষের ভালো করতে নেই। আমি এলাম ওঁর কপালে ফোঁটা দিতে। তার বদলে উনি দেবেন আমার কপালে দুঃখ। কলিকাল আর কা'কে বলে?"—বলিয়া মীনু খাটের নিচু হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাণু বলিল,—"সত্যি, কিন্তু তোমারই দোষ। ও সকাল থেকে তোমার কপালে ফোঁটা দেওয়ার জন্যে একেবারে অস্থির। বলে—বেচারি জামাইবাবুর বোন তো আর কাছে নেই—আমাকেই তা'র ভারটা নিতে হবে। নইলে জামাইবাবু দুঃখু করবেন।"

অজয় অমনি মীনুর দিকে তাকাইয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল,—"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে, রঘুরাজ?" তাহার পর রাণুর দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল,—"কিন্তু দাসী, নীচকুলোদ্ভবা—থুড়ি—কিন্তু রাণী উচ্চকুলোদ্ভবা।"

মীনু বলিল,—"ঠাট্টা না, দিদি সত্যিই তো রাণী। দাসী বললেই অমনি আপনার দাসী হবে কি না!"

এমন সময় রান্নাঘর হইতে মা ডাকিলেন,—"রাণু—"

"যাই মা" বলিয়া রাণু তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মীনা সুড়্সুড়্ করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া আশ্রয় লইল। অগত্যা অজয়কে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইল।

অজয়ের জন্য রাণুর মা রেকাবিতে জলখাবার সাজাইয়া চা তৈয়ার করিতেছিলেন। রাণু আসিলে তাহার হাতে রেকাবিটি তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"তুই যা খাবার নিয়ে—আমি মীনার হাতে চা পাঠাচ্ছি।" বলিয়াই ডাকিতে লাগিলেন,—"মীনা—অ মীনা—"

মীনার সাড়া-শব্দ মিলিল না। রাণু বলিল,—"আমিই নিয়ে যাচ্ছি মা। বাঁ হাতে খাবার—চা-টা তুমি ডান হাতে তুলে দাও।"

মীনা ইচ্ছা করিয়াই সাড়া দেয় নাই। কি জানি মায়ের রাগ যদি এখনও না পড়িয়া থাকে ?

রাণু খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। অজয় ততক্ষণে মুখ হাত ধুইয়া আসিয়াছে। খাবার রেকাবিটি টেবিলে রাখিয়া রাণু জল আনিতে বাহিরে যাইতেছিল।

অজয় একটি কচুরি তুলিয়া যেই মুখের কাছে উঠাইয়াছে, অমনি মীনা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"আহা হা করেন কি, করেন কি ?"

মীনার ব্যস্ততা দেখিয়া অজয় থতমত খাইয়া গেল ; বলিল,—"কেন, কি আবার করলাম ?"

মীনা বলিল,—"বেশ তো! আমি সকাল থেকে উপোস দিচ্ছি ওঁর কপালে ফোঁটা দেবার জন্যে, আর উনি দিব্যি খেতে ব'সে গেলেন !"

অজয় থিয়েটারি কায়দায় বলিয়া উঠিল,—

"অপরাধ যদি ক'রে থাকি দেবী,
নিজগুণে করহ মার্জনা!
এই আমি সরাইয়া রাখিনু রেকাবি;
রাখিনু পেয়ালা ডিশ্।
শীতল যদ্যপি হয় বরফ শর্‌বত সম
জুড়ায়ে চা-পানি,
জাপানি নিয়মে সখি,
তাহাই করিব পান
আনন্দে দু' চোখ বুজি'।
কর ত্বরা!
আন বাটি, দেহ ফোঁটা।
বিলম্ব না সহে আর।
ক্ষমা কর অয়ি ক্ষমাময়ী,
জঠরে জ্বলিছে মোর হুতাশন-শিখা!"

বক্তৃতা শুনিয়া মীনু হাসিয়া বলিল,—"হয়েছে হয়েছে, এটা আপনার শ্বশুর-বাড়ি, নাট্যমন্দির নয়। বাবা বোধ হয় এইদিকে আসছিলেন। আপনার বক্তৃতা শুনে হাসতে হাসতে ফিরে গেলেন।"

—"সত্যি?" বলিয়া অজয় লজ্জিত হইয়া পড়িল।

—"সত্যি না তো কি বানিয়ে বলছি? এখন নিন দেখি, চট্ ক'রে ফোঁটাটা দিয়ে নিই। এক্ষুণি আবার মা এসে পড়বেন।"

—"ফোঁটা নেব, কিন্তু আগে বল তুমি রাগ কর নি তো?"

—"নিশ্চয় করেছি।"

—"যাবে কিসে?"

—"সিনেমায় নিয়ে গেলে।"

—"তথাস্তু।"

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

জগতের জগদীশ

পল্লীগ্রাম—পাঠশালা। সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠশালা দেখিতে আসিতেছেন। কাজেই ছাত্র অপেক্ষা পাঠশালার গুরুমহাশয় সঙ্কোচে ও ভয়ে অতিমাত্র ত্রস্ত।

ছাত্রেরা বৃদ্ধ গুরুমহাশযের উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শনে নীরব নিস্পন্দ থাকিবার জন্য চেষ্টিত; কিন্তু শিশু-স্বভাব জয়ী হইতেছিল, ছাত্রেরা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করিয়া—ফিস্‌ফিস্ কথা কহিয়া, গুরুমহাশয়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতেছিল।

সাহেব উপস্থিত হইলেন এবং ছাত্রদের পাঠ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেরা পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত 'বোধোদয়'। শিক্ষক দেখাইয়া দিলেন কতটা পড়া হইয়াছে। কয়েক পাতা উলটাইয়াই—তিনি একস্থানে পাইলেন হাতীর কথা। উহাতে একস্থানে 'হাতীর হাড়ে···চিরুণী প্রস্তুত হয়' দেখিয়া সাহেব একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিরুণী অর্থ কি?"

ছেলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া—সাহেব এবং গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সাহেব সহাস্য-মুখে পরবর্ত্তী ছেলেকে—তা'র পরেরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহারাও নীরবই রহিল।

শ্রেণীর বালকদের মধ্যে একটি ছেলে দেখিতে বেশ—সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে পড়ে বটে; কিন্তু সে বড় চঞ্চল। দাঁড়াইয়াও সে ডাইনে বাঁয়ে, সাম্‌নে পেছনে ফিরিতে-ছিল, নিমেষের জন্যও স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে গেল—তিনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিরুণী অর্থ কি?"

প্রশ্ন করা মাত্রই ছেলেটি বেশ নির্ভয়ে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—"ফারুণী।"

ছাত্রের উত্তর শুনিয়া গুরুমহাশয় তো ঘাবড়াইয়া গেলেন—ভাবী বিপদের ভয়ে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে ছাত্রের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব সহাস্যমুখে গুরুমহাশয়কে থামাইয়া বলিলেন—"আপনি ওকে ধমকাইবেন না। ওর উত্তর ঠিক না হইলেও—উত্তরে উহার স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় আছে। শুদ্ধ উত্তর যাহারা দিত, তাহারা কেবল মুখস্থ করা কথাই বলিত; এ কিন্তু তাহা বলে নাই—'চেরা' ও 'ফারা' একই ব্যাপার তাহা এ জানে; সেই জ্ঞানবলেই এ 'চিরুণী' অর্থ 'ফারুণী' বলিয়াছে। এ প্রতিভাসম্পন্ন ছেলে।"

গুরুমহাশয় স্বস্তি পাইলেন—সাহেব ছেলেটির পরিচয় লইয়া—আদর করিয়া পরিদর্শন শেষ করিলেন। এই শিশুই—ভাবী **'স্যর জগদীশচন্দ্র বসু'**।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেই তাহার বিষয় লেখা আছে। সেই সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরেই—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ৩০শে তারিখে জগদীশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হ'ন—ময়মনসিংহ সহরে। তাঁহার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু—তিনি ছিলেন সেখানে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মাতার নাম বামাসুন্দরী।

জগদীশচন্দ্রের জনক-জননী

এক কথায় বলিতে গেলে অমন মাতাপিতা ছাড়া জগদীশের জন্ম হয় না। তাঁহার পৈতৃকবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাড়ীখাল গ্রামে।

দেশবাসী তাঁহার অশীতিতম জন্মোৎসবের উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু সেই উৎসবের মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে—গত ২৩শে নবেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জন্মোৎসবের দিনে সকলে সজল-নেত্রে তাঁহার চিতাভস্ম রক্ষার অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

দুরদর্শী ভগবান বসু মহাশয় স্বয়ং ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইলেও ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে না দিয়া—দিলেন গ্রাম্য পাঠশালায়। পাঠশালা ছিল একটু দূরে, কাজেই ছেলেকে পাঠশালায় পৌছান ও বাড়ী আনার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই ভৃত্যটির ইতিহাসও চমৎকার। ভগবানবাবুর বুদ্ধিকৌশলে একটা ডাকাত-

সর্দ্দার ধরা পড়ে এবং তাঁহারই কাছে বিচার হয়। তিনি তাহাকে জেলে দেন। শাস্তিভোগের পর মুক্তি পাইয়া সেই সর্দ্দার—ভগবানবাবুর কাছেই চাকরীর প্রার্থী হয়। সে তখন অকপটে বলে যে, "বাবু, আমি ডাকাতি করিয়া জেল খাটিয়াছি, কাজেই আমাকে কেহ বিশ্বাস করে না—করিবেও না—কোথাও আমার কোন কাজ পাওয়ার উপায় নাই।" লোকটার কথায় ও মুখ-চোখের ভাবে ভগবানবাবু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে—সাজার আগুনে পুড়িয়া এ খাঁটি সোনা হইয়াছে। তিনি উহাকে
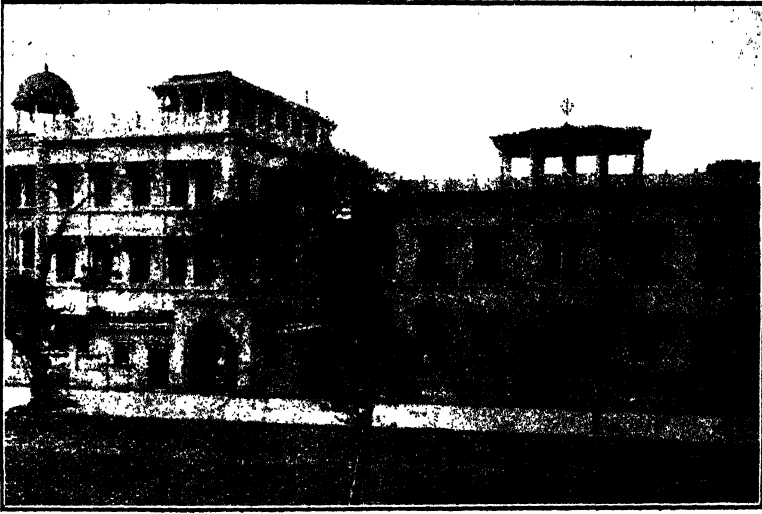
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

নিজের বাড়ীতে—জগদীশচন্দ্রের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। ভগবানবাবুর অনুমান সত্য হইয়াছিল—সে পরম বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছে।

একবার নৌকাপথে ভগবানবাবু ডাকাতের হাতে পড়েন। নৌকায় তিনি সপরিবারে চলিয়াছিলেন—সঙ্গে জগদীশচন্দ্র এবং ঐ ভৃত্যও ছিল। যখন ডাকাতের নৌকাগুলি তীরের মত ছুটিয়া ভগবানবাবুর নৌকার কাছে আসিয়া পড়িল—তখন ভৃত্যটি ছৈয়ের উপর দাঁড়াইয়া এক হাঁক্ দিল। ঐ হাঁক ছিল ডাকাতদেরই সঙ্কেত—কাজেই ডাকাতের নৌকাগুলি চক্ষের পলকে চলিয়া গেল; ভগবানবাবু রক্ষা পাইলেন। যে একদিন নরহন্তা ছিল—সে-ই সেদিন নরহন্তার কবল হইতে নর-নারী-শিশুর জীবন রক্ষা করিল!

সেই ভৃত্যটি অক্ষর-জ্ঞান-বর্জ্জিত ছিল বটে—কিন্তু মূর্খ বা নির্ব্বোধ ছিল না। সে মনিবের কাছে অকপট বিশ্বাসী ছিল—সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল বটে; কিন্তু তাহার দস্যুজীবনের ক্রিয়াকলাপের স্মৃতি সে মোটেই ভুলিতে পারে নাই। সে জগদীশচন্দ্রের কাছে যে সকল লোমহর্ষণ অতীত ডাকাতী, খুন, দুঃসাহস ও সঙ্গীদের মরণের এবং নিজের বিপন্ন জীবনের গল্প বলিত, সে সকল কাহিনী শুনিয়া তাহার শিশু সাথীটির হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে ভয় জিনিসটা দূর হইয়া গিয়াছিল।

পাঠশালায় তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে একটি বসিত তাঁহার ডানদিকে—সেটি ভগবানবাবুর চাপরাশীর ছেলে—মুসলমান; অপরটি বসিত তাঁহার বাঁদিকে, সে ধীবরের ছেলে। উহারা ছিল জগদীশচন্দ্রের নিত্যসাথী। উহাদের মুখে তিনি পশুপক্ষী এবং মাছ, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতির কথা—পরম কৌতূহল ও মনোযোগের সহিত শুনিতেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল শিক্ষা হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অনুসন্ধানের অনুরাগ জন্মে।

পাঠশালায় শিক্ষার ফলে মাতৃভাষায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ জন্মে—জীবনের বহু শিক্ষাই তিনি তাহার ফলে লাভকরেন। পিতার আদর্শ তাঁহাকে চিরজীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি যতটুকু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মাতৃভাষা জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিবে। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কতকগুলি উত্তর প্রত্যুত্তরের পত্র মাসিক পত্রে ছাপা হইয়াছিল। সেগুলি পড়িলে মনে হয়—'কাহার লেখা ভাল? জগদীশচন্দ্রের না—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের?'

বিদ্যালয়ে পুঁথিগত শিক্ষাই এক্ষণে বালক-বালিকার একমাত্র শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের শিক্ষার গোড়া পত্তন কিন্তু পুঁথিতে নহে—তখনকার দিনে দেশে যে যাত্রাগান, কথকতা, মেলা প্রভৃতি হইত—তাহা হইতে; তিনি সে সকল হইতে জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারতের—বীর-চরিত, একাগ্রতা ও সাধনার ধারা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া, যাত্রা কথকতা শুনিয়া তাঁহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র তাঁহার অতিশয় আদরণীয় ছিল। তিনি ভীষ্মদেবের প্রতিযোদ্ধা পার্থ হইতেও কর্ণকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহার বীরত্বের শ্রেষ্ঠত্ব

স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত নাট্যকার—অশ্বত্থামা, কর্ণকে কুলের খোটা দিলে, মহাবীর কর্ণের মুখে সগর্ব্বে বলাইয়াছেন—

দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মমায়ত্ত তু পৌরুষম্

—'জন্ম তো দৈব ব্যাপার—কিন্তু পুরুষকার আমার নিজের।'

কর্ণের বীরত্ব বা পুরুষকার সম্বন্ধে সংস্কৃত নাট্যকারের ন্যায় মনীষী জগদীশচন্দ্রের হৃদয়েও অত্যুচ্চ ধারণার উদয় হইয়াছিল। ঐ একটু ব্যাপারেই বুঝা যায়, তিনি পুঁথি পড়িয়াই শুধু কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না—প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিচার করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন।

নিবেদিতা সরঃ

পাঠশালার পড়ায় কি উপকার হইয়াছিল—জগদীশচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সেও সে বিষয়ে লিখিয়াছেন যে—"সেখানে আমি নিজের মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়াছি, নিজের ভাষায় ভাবিতে শিখিয়াছি, আর জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয় সভ্যতাকে পাইয়াছি।"

আজকাল সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটরকার প্রভৃতির দিন পড়িয়াছে এবং উহা সভ্যতা ও সম্মানের বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র কিন্তু অল্পবয়সেই ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াছিলেন। একটি টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়াই তিনি পাঠশালায় যাইতেন। একবার
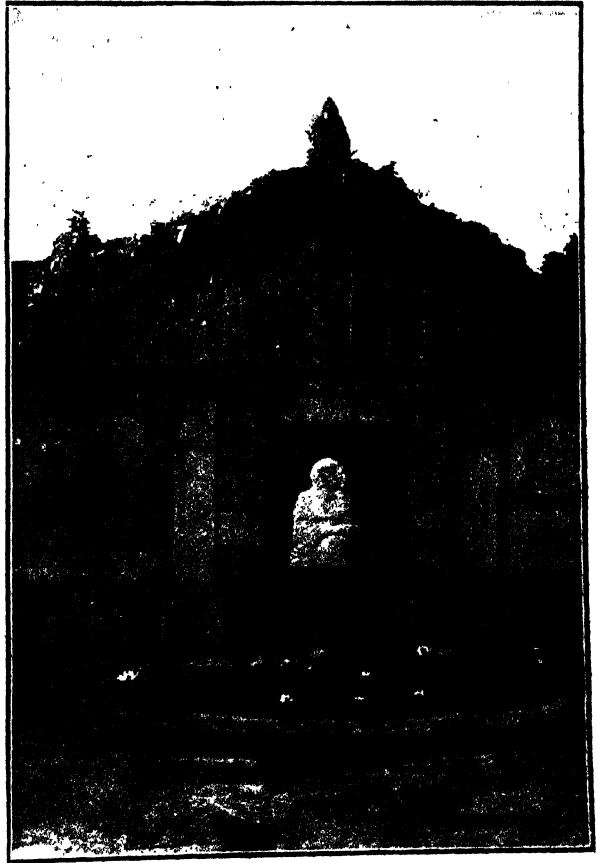
ফরিদপুরের মেলায়—কোন দিন ঘোড়ায় না দৌড়াইলেও—ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে নিজ ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়িয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার বয়স বছর দশেক মাত্র!

এগার-বার বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতার সহিত কৃষ্ণনগরে যান। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় হইতেই তাঁহার ইংরেজী পড়া আরম্ভ হয়। অতঃপর তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন—সেখানে মাত্র তিন মাস পড়েন। কলিকাতায় তাঁহার থাকিবার স্থান ছিল 'মেসে'। মেসে তিনিই ছিলেন বয়সে সকলের ছোট—সুতরাং নিজের মনে খেলিতেন পড়িতেন—বড়রা তাঁহার বড় খোঁজ লইত না।

বৈজ্ঞানিকের ভাবী জীবনের ও ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত সেই মেসেই হয়। মেসের বাড়ীর এক কোণে একটুখানি জমিতে একটা ছোট বাগান, তাহাতে একটি নদী, নদীতে পুল তৈয়ার করিয়াছিলেন—সেইগুলি অবশ্য শিশুর খেলাঘরেরই যোগ্য; কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যের সেই অঙ্কুর ভাবীকালে মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে পরিণত বয়সে তিনি ঐরূপ বাগান, নদী ও তাহাতে পুল তৈরী করিয়াছেন। তা' ছাড়া পায়রা, খরগোস প্রভৃতি কিনিয়া তাহাদের জন্য নানা কৌশলপূর্ণ ঘর তৈরী করাও মেসে তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল।

তিনমাস হেয়ার স্কুলে পড়ার পর তাঁহাকে সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজের স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল। উহাতে সাধারণতঃ ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান্ ছেলেরাই পড়ে—বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। জগদীশচন্দ্র একে বাঙালী, তা'র উপর বয়সে ছোট; কাজেই কথাবার্ত্তা, চালচল্তি, ওঠা বসা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই তাঁহাকে নানারূপ নির্য্যাতন—কখন কখন প্রহার পর্য্যন্ত সহিতে হইত। প্রথম প্রথম অশেষ ধৈর্য্যের সহিত তিনি ঐ সকল অত্যাচার সহিয়াছিলেন; কিন্তু একদিন অত্যাচার অসহ্য হইলে জগদীশচন্দ্র একটি বয়স্ক ছেলেকে এমন 'কাবুলী দাওয়াই' দিলেন যে, তাহা দেখিয়া অন্যান্য ছেলেরা তাঁহাকে 'বিজয়ী বীর' বলিয়া সম্মানিত করিল। সেই একদিনের ঔষধেই সব ব্যারাম কাটিয়া গিয়াছিল—জগদীশচন্দ্রকে অতঃপর স্কুলের ছেলেদের কোন অত্যাচার সহিতে হয় নাই।

ইংরেজ বালকগণের সহিত পড়ার ফলে তিনি উত্তম ইংরেজী শিখিতে পারিলেন—বিজ্ঞান শিক্ষাও ঐখানেই সুরু হইল। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া—তথাকার কলেজেই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ্-এ পাশ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ

বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁ তখন সর্ব্বত্র বিখ্যাত ; তাঁহার বক্তৃতা ও গবেষণা জগদীশচন্দ্রকে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় আকৃষ্ট করিয়া লইল।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানবাবু সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও—দেশে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উপর ছিল তাঁহার অসীম আকর্ষণ। কাজেই বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি জগদীশচন্দ্রকে ঐ বিষয়ে অনুমতি দেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—ছেলে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী হউক।

নানা কারণে—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির অকালমৃত্যুতে জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাওয়ার আশা বিফল হইল। প্রথমে জগদীশচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণীও ছেলেকে বহুদূরে

বসু-দম্পতি

পাঠাইতে রাজী ছিলেন না—শেষে কিন্তু তিনিই ছেলের বিলাত গমনের জন্য অগ্রসর হইলেন ; ভগবানবাবুও আর বাধা দিলেন না। তথাপি পুত্রকে আইন বা সিভিল সার্ভিস্ পড়িতে মত দিলেন না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।

জগদীশচন্দ্র শিকারে দক্ষ হইয়াছিলেন। বি. এ. পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি আসামের জঙ্গলে শিকার করিতে যাইয়া জ্বরে আক্রান্ত হ'ন—জ্বর লইয়াই পরীক্ষা দেন। বিলাতযাত্রা-কালেও তাঁহার অসুখ সারে নাই—সমুদ্রযাত্রায়ও সারিল না। লণ্ডনে যাইয়া তিনি ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পর তাহা ছাড়িয়া কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান পড়া আরম্ভ

করেন। সেখান হইতেই তিনি পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যার পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'ন। সেই সময়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও বি. এস্‌-সি উপাধি লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র। দেশে ফিরিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদ লাভ করেন—সেখানেই তাঁহার বিজ্ঞানালোচনা আরম্ভ হয়। কলেজের ক্ষুদ্র একটি পরীক্ষাগার লইয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন।

উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের কন্যা ব্যারিষ্টার এস্. আর. দাশের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী 'লেডী অবলা বসু' নামে পরিচিত। কিছুকাল পরে জগদীশচন্দ্রের পিতা পরলোক গমন করেন; পিতৃবিয়োগের দুই বৎসর পরে মাতাও পরলোক গমন করেন।

ভগবানবাবু দেশ ও দেশবাসীর উপকার করিতে যাইয়া আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র কার্য্যারম্ভ হইতেই পিতৃঋণ শোধের জন্য চেষ্টিত হ'ন। তাহাতে সুদমাত্র শোধ হয় দেখিয়া তিনি বিক্রমপুরের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ও মাতার যাহা কিছু টাকা ছিল তাহাদ্বারা ঋণের বারো আনা অংশ শোধ করেন। পাওনাদারেরা উহাতেই ষোল আনা শোধ হইল বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু নয় বৎসর পরে তিনি পিতার অবশিষ্ট দেনাও পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া শোধ করিয়া দেন। সেই সময়ের বছর দুই পরে—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। তিনি যেদিন ঐ শপথ গ্রহণ করেন—তাহা ছিল তাঁহারই জন্ম তারিখ ৩০শে নবেম্বর। বয়স তখন তাঁহার পূর্ণ পয়ত্রিশ বৎসর।

বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটিতে নিজ গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেন এবং পর বৎসর কলিকাতার এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে অভিনব গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ফলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস্‌-সি উপাধি দান করেন আর ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহার গবেষণার কার্য্য পরিচালনার জন্য বাৎসরিক পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন।

এখন ঘরে ঘরে বেতারের কথা শুনা যায়; উহারও প্রথম আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র। তিনিই 'গেলেনা-রিসিভার' নামক যন্ত্রটির আবিষ্কারক। উহা একচেটিয়া করিবার জন্য বহু কোটীপতি ব্যবসায়ী তখন জগদীশচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন; তিনি সে ফাঁদে পা দেন নাই। দিলে তিনিও মার্কনী প্রভৃতির মত ধনবান হইতে পারিতেন।

অপূর্ব্ব আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁহার ডাক পড়ে, তিনিও নিজের তৈরী সু-সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিদ্বারা আপন আবিষ্কার প্রমাণিত করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করেন। তদবধি তাঁহার গবেষণা অবিচ্ছিন্নধারায় চলিয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া—বিজ্ঞানালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বনাম-প্রসিদ্ধ ভগিনী নিবেদিতা—তাঁহার মনে বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের বীজ অঙ্কুরিত করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আপন ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন—কলিকাতায় 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়। জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বিজ্ঞান-মন্দিরের একদিকে 'নিবেদিতা সরঃ' নামে একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। ছবি দেখিলেই সকলে উহার ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

এই মন্দিরে চিতাভস্ম রাখা হইয়াছে

তিনি রসময় ভাবুক বৈজ্ঞানিক—তাঁহার সকল ব্যাপারে সেই রস ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মত স্বদেশ-প্রাণ, মাতৃভাষানুরাগী, নিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী বিরল। বেতার একচেটিয়া ব্যাপারে তিনি যে সংযমের ও নির্লোভের পরিচয় দিয়াছিলেন ঐ সকল সম্বন্ধেও তিনি তেমনি নির্লোভ ছিলেন—নামের কাঙাল ছিলেন না।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের একাংশে একটু খোলা জায়গায় তিনি একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—উদ্দেশ্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী যেন সেখানে উপাসনা করিতে পারেন। সেই মন্দিরেই তিনি তাঁহার মাতাপিতার চিতাভস্ম রাখিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত, পিতৃপরায়ণ পুত্রের চিতাভস্মও সেই মন্দিরেই—গত ৩০শে নবেম্বর—তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার তারিখে—রাখা হইয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা বহুদিন পূর্ব্বে ভারতের রক্তবর্ণ জাতীয় পতাকা নিজহস্তে তৈরী করিয়া জগদীশচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। উহাতে বজ্রচিহ্ন ও 'বন্দে মাতরম্' লেখা অঙ্কিত ছিল। সেই পতাকাদ্বারাই জগদীশচন্দ্রের দেহাবশেষের মৃৎপাত্রটি ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে।

পৌষালি

পৌষালি পৌষালি পৌষ্ মাস শেষ আজ্,
বাংলার ঘর ঘর নেই তাই আন্ কাজ।
পোষ্-পিঠে কর্‌ছে যে আজ সব্ প্রস্তুত ;
ছেলে পিলে সবে মিলে খেতে বেশ মজ্‌বুত।
কেউ করে গুড়্‌পিঠে কেউ করে আস্‌কে,
মুচ্ মুচ্ ভাজাপুলি কেউ করে আজ্‌কে ;
সব্বাই করে আজ পায়স কি পিষ্টক—
ভরপূর খায় তাই ছেলে বুড়ো ইস্তক।
পৌষালি আজ ভাই কাজ নাই পড়্‌বার,
তার চেয়ে রান্নার ঘরে দাও দরবার।
যত পাও পিঠে খাও—নয় তবে পৃষ্ঠে,
আজ কেন পড়ছিস্—ওরে ওই ছিষ্টে।
নারকেল কোরা আর গুড় দিয়ে মাখা ছেঁই
চুরি ক'রে খাস্ যদি তায় কিছু দোষ নেই।
একান্ত মা'র কাছে ধরা যদি প'ড়ে যাস্—
সেও হবে পিঠে খাওয়া—যদি কিছু বেশী খাস্ !
পৌষালি পৌষ্ শেষ আজ পৌষ-পার্ব্বণ—
পৌষ মাস নাও মোর বিদায়-অভিনন্দন ॥

শ্রীহরিপ্রসাদ রায়

খেলা-ধূলা

কোরিন্থিয়ান্ দলের ফুটবল খেলা

বিলাতের এই বিখ্যাত দলটি সম্বন্ধে গেলবারে তোমাদের কিছু কিছু ব'লেছি। এই একমাসের মধ্যে তাদের বাংলাদেশের সকল খেলা শেষ হ'য়ে গেছে। এই খেলোয়াড় দলটিকে সখের দল বলা হয়। বিলাতে দুই শ্রেণীর খেলোয়াড় আছে; এক শ্রেণীর খেলোয়াড় টাকা নিয়ে এক একটা ক্লাবে খেলে, আর এক শ্রেণীর খেলোয়াড় টাকা না নিয়ে খেলে। যারা খেলাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন না ক'রে—খেল্‌তে ভালবাসে ব'লেই খেলে, তাদের বলা হয় সখের খেলোয়াড়, ইংরাজীতে বলে এমেচার (Amateur)। যারা টাকা নেয় তাদের বলা হয় পেশাদার, ইংরাজীতে বলে প্রোফেসনাল্ (Professional)। কোরিন্থিয়ান্ দলটি সখের দল।

ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে ভারতের পথে কোরিন্থিয়ান্ দল হলাণ্ড, সুইজারলণ্ড এবং ইজিপ্টের খুব শক্তিশালী সম্মিলিত দলগুলিকে হারিয়ে এসেছে, গত সংখ্যা প'ড়েই তোমরা সে খবর বিশেষভাবে জান্‌তে পেরেছ। তা'রা বাংলাদেশে এসে কলিকাতায় চারদিন খেলেছে চারটি সব চেয়ে ভাল দলের সঙ্গে। শেষ দু'দিন তা'রা খেলেছে আই. এফ্. এ.র বাছাই-করা দুইটি বিশেষ শক্তিশালী দলের সঙ্গে, এবং তা'রা জয়লাভও ক'রেছে। এই দলটিকে সকলেই তখন ফুটবলে দিগ্বিজয়ী ব'লে মনে ক'রেছিল; কিন্তু কলিকাতা থেকে ঢাকায় খেল্‌তে গিয়ে কোরিন্থিয়ান্ দল এমন জব্দ হ'য়ে গেছে, যা তা'রা জীবনে ভুল্‌বে না, আর বাঙালী এবং ভারতবাসীরও ফুটবলের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। ঢাকার স্থানীয় বাছাই খেলোয়াড়ের দল এই দিগ্বিজয়ী দলকে পরাজিত ক'রে অপূর্ব্ব গৌরব অর্জ্জন ক'রেছে। প্রথমদিনের পরাজয়ের পর দ্বিতীয় দিনের খেলায় কোরিন্থিয়ান্ দল ঢাকাকে এক গোলে হারিয়েছে বটে, কিন্তু তা'তে ঢাকার গৌরব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। গোলটি কি ক'রে হ'ল শোন, তবেই সব বুঝতে পারবে। রেফারীর মুখে ছিল বাঁশী, হঠাৎ সেই বাঁশী বেজে ওঠে, তাই শুনে ঢাকার খেলোয়াড়রা থেমে গেল, আর সেই সময়েই কোরিন্থিয়ান্ দলের ফরোয়ার্ড খুব জোর্‌সে বল মার্‌লে ঢাকার গোলে; ব্যস্, গোল হ'য়ে গেল। রেফারী বল্‌লেন যে তিনি বাঁশী বাজান নি, কি রকম ক'রে বাঁশী বেজে গিয়েছিল!

কলিকাতা আর ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও বহরমপুরে কোরিন্থিয়ান্ দল খেলেছে এবং জয়লাভও ক'রেছে। চট্টগ্রামও ঢাকার দ্বিতীয় দিনের খেলার মত দুর্ভাগ্যক্রমে এক গোলে হেরে গেছে। দূর থেকে বল আস্‌ছে দেখেও গোলকিপার নড়ে নি। শুধু গোলকিপারের দোষেই চট্টগ্রামের পরাজয় হ'য়েছে। তা ছাড়া এই খেলাটি একটু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কোরিন্থিয়ান্ দল যেমন গায়ের জোর দেখিয়েছিল, চাটগাঁয়ের খেলোয়াড়রাও তেমনি গায়ের জোর দেখিয়ে দিয়েছে পুরামাত্রায়। বাংলাদেশের খেলা শেষ ক'রে কোরিন্থিয়ান্ দল বাংলার বাইরে এখন খেল্‌ছে। সে-সব খেলার কথা তোমাদের শোনাব আস্‌ছে বারে।

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম

ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে যত ক্রিকেট টীম এসেছে সবগুলির মধ্যেই লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম বেশী শক্তিশালী। কি ব্যাট্ করায়, কি বল দেওয়া ও ফিল্ড্ করায়—সব দিক দিয়েই এই টীমটিকে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীম বলা যেতে পারে। অবশ্য ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত ক্রিকেট-বীর হ্যামণ্ড এই দলে নেই, তিনি থাকলে এই দলই অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট খেল্‌তে পারে। কাজেই এরকম দলের বিরুদ্ধে ভারতের নানা জায়গায় ভারতীয় টীমগুলি যে হেরে যাবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? লাহোরে অল্ ইণ্ডিয়া টীম নয় উইকেটে হেরে গেছে। অল্ ইণ্ডিয়ার টীমও ভাল ছিল না, অনেক বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হ'য়েছিল, তা ছাড়া বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, অমরনাথ প্রভৃতি ভাল খেল্‌তেও পারেন নি। নিসারের বাপ মারা যাওয়ায় এবং এস্, ব্যানার্জির কোমরে বাত হওয়ায় তাঁরা এই খেলায় যোগ্ দিতে পারেন নি, সুতরাং বোলারের অভাবও অল্ ইণ্ডিয়ার পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

আশার কথা এই যে, বিলাতের এই বিশেষ শক্তিশালী টীমকে দুই জায়গায় ইতিমধ্যে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হ'য়েছে। একটি—আজমীরে রাজপুতানা ষ্টেট্‌স্ এর সঙ্গে, আর একটি—জামনগরে জামনগর দলের সঙ্গে। জামনগরে একা অমর সিং দু ইনিংসে দশজনকে আউট্ করেন এবং প্রথম ইনিংসে ২৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৮১ রান করেন; আর মানকদ প্রথম ইনিংসে ৬৭ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৯ রান ক'রেও নট আউট্ থাকেন; তার পরে পুনায় মহারাষ্ট্র দলের সহিত খেলায় টেনিসনের দল প্রথম ইনিংসে ৩১৯ রান করেন বটে, কিন্তু ভারতীয় দলও ২৭৩ রান ক'রে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়, তা ছাড়া প্রফেসর দেওধর ১১৮ রান ক'রে এই দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সেঞ্চুরী করেন। খেলাটি 'ড্র' হ'য়েছে। অল্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বোম্বাই ও কলিকাতায় এই মাসেই ঐ দলের খেলা হবে, তা'র বিবরণ তোমাদের বিশেষ ভাবে যথাসময়ে জানাব।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ব্রহ্মাহরি রুদ্র

উত্তরদাতাদিগের নাম

শ্রীচিত্তরঞ্জন, শান্তিলতা, স্মৃতিকণা সাহা, জামনগর (রাজসাহী); নেড়া ও দাদু, কলিকাতা; চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ, রবি ও লীলা, কল্যাণী; জীবন ও হেলেনা, বেলগাছিয়া; সন্তোষ, কুকুটীয়া; বিশু ও ছোটকা, শান্তিনিকেতন; অঞ্জলী, আরতি, আশীর্ব্বাদ, সাভার; হাস্যবালা, রেণুবালা, আশুরবালা, নিভা, চিত্ত, শেফালি, ধূমগ্রাম; তারাকিশোর, ঢাকা; বীরেশ্বর, কমলনয়ন, লক্ষ্মী-ননী, কলিকাতা।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press;
5, College Square, Calcutta.

শ্রীসরস্বতী

ষোড়শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৪ { ১০ম সংখ্যা

সরস্বতী

শীতের শেষেতে শুভ্র ঊষায় বিমল জ্যোতিটি ছড়ায়ে তাঁ'র,
কে আসিল আজি ধরার মাঝারে, চরণ-ধ্বনিটি জাগিল কা'র ?
আলোকে পুলকে উঠিল দুলিয়া, মুগ্ধ ধরণী আপন ভুলিয়া,
কলুষ-বিহীন মনের ভাষায় আগমনী গান গাইল কা'র ?
শীতের শুভ্র কুয়াশা ভেদিয়া অমল জ্যোতিটি ফুটিল তাঁ'র।

আকাশ বাতাস ভরিল কি সুরে বীণাটি বাজিল আজিকে কা'র ?
ফুটিল কুন্দ গাঁদা ও বাসক, গোলাপ ছড়া'ল গন্ধ-ভার।
জাগিয়াছে সাড়া ছাত্র-সমাজে, সাজিয়াছে তা'রা নিজ নিজ সাজে,
বরণ করিয়া লইল তাঁহারে খুলিয়া আপন বন্ধ দ্বার।
আকাশ বাতাস ভরিল কি সুরে, বীণাটি বাজিল আজিকে কা'র ?

শুভ্র কোমল কমল উপরি রাতুল চরণ শোভিছে তাঁ'র,
চরণে শোভিত কনক-নূপুর, গলায় রাজিছে মুকুতা-হার।
বীণা ও গ্রন্থ করেতে ধরিয়া, অমল শুক্ল বসন পরিয়া,
শুভ্র হংস-বাহিনী জননী, উজল শুভ্র বরণী আর ;—
শুভ্র অমল কমল উপরি চরণ-যুগল শোভিত তাঁ'র।

জননী মোদের কলুষ-নাশিনী বিদ্যা-দায়িনী সরস্বতী,
এসেছে আজিকে ধরার মাঝারে জানাই আমরা শতেক নতি।
অধরে মধুর হাসিটি হাসিয়ে, দিয়াছে সকল জ্বালা যে জুড়ায়ে,
স্নেহ করুণায় ভরা ও বয়ান, চাহনি মায়ের স্নিগ্ধ অতি ;—
জননী মোদের করুণা-রূপিণী বিদ্যা-দায়িনী সরস্বতী।

নির্ব্বোধ পাপী কে আজ কোথায়, জ্ঞান-হীন তোরা ছুটিয়া আয়,
জ্ঞানের আলোকে ধুয়ে মুছে ফেল অজ্ঞান যত অবিদ্যায়।
অভিমান ক'রে থেকো নাক' গুণী, এসেছে আজিকে বাণী বীণাপাণি,
মিটাও তোমার জ্ঞানের পিপাসা লুঠিয়া আজিকে মায়ের পায় ;
পূজিতা ভারতী বেদের জননী প্রণতি জানাও আজিকে মায়।

অবোধ আমরা সন্তান তব, জননি তোমার বন্দনা করি,
হৃদয়-আঁধার দূর করি দাও, জ্ঞান-কণা-ঝুলি দাও মা ভরি।
উপহার দিব নাহি মা শকতি, হৃদে আছে শুধু প্রীতি ও ভকতি,
তাই ঢালি দিনু রাতুল চরণে, আশিস্ তোমার পড়ুক ঝরি' ;—
অবোধ আমরা সবাই মিলিয়া জননি তোমার অর্চ্চনা করি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ

রাখি-বন্ধ ভাই

মোগল বাদশাহ হুমায়ুন যখন দিল্লীর অধিপতি, তখন গুজরাটের অধীশ্বর ছিলেন বাহাদুর শাহ। দিল্লী ও গুজরাট্ এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থলে রাজপুত জাতির বাস। বাহাদুর শাহ বিপুল সৈন্য-বল লইয়া চিতোর অধিকারের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—রাজপুতগণ জন্মভূমি রক্ষার জন্য দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাঠোর রাজপুত্রী **জওহর বাই** তখন চিতোরের রাজ-মহিষী। চিতোর রক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি স্বয়ং অস্ত্র ধারণকরিলেন; সুদৃঢ় বর্ম্মে কোমল কলেবর আবৃত করিয়া, একদল সৈন্যসহ সমর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজপুত রমণীর প্রচণ্ড বাহুবলে বহু শত্রুর মুণ্ড ধরাতল চুম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের বিপুল বল সামান্যই ক্ষয় পাইল। বরং জওহর বাই স-দল-বলে সম্মুখ-সমরে বীর শয্যায় শয়ন করিলেন।

সেই ঘোরতর বিপদের সময়, দেবলের রাজা **বাঘজী** চিতোর রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি চিতোরের রাজমুকুট মস্তকে ধারণকরিলেন—হতাবশিষ্ট রাজপুতদিগকে লইয়া যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। চিতোরের দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—রাজপুতবীরগণ প্রচণ্ড সাগর-তরঙ্গের ন্যায় যুগপৎ শত্রুপরি আপতিত হইলেন। কিন্তু অগণিত শত্রুসেনার অস্ত্রাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে বাঘজী-সহ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র রাজপুতবীর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চিতোরের ভাবী বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া রাজমাতা **কর্ণবতী দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের** নিকট 'রাখি' প্রেরণ করিয়াছিলেন। উদার-হৃদয় দিল্লীপতি পরম সমাদরে 'রাখি' গ্রহণ করিলেন—রাজমাতা কর্ণবতীকে ভগিনী-রূপে গ্রহণ করিয়া বিপদে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। ধর্ম্মভগিনীকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার আশায় তিনি সসৈন্যে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দিল্লীপতি যথাকালে চিতোরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহ চিতোর অধিকার করিলেন। রাজপুতবীরগণ জন্মভূমি রক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন করিলে চিতোর রক্ষক-শূন্য হইল। তথায় ভয়াবহ **জহর ব্রতের** অনুষ্ঠান হইল। রাজমাতা

কর্ণবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত মহিলার সহিত অনল-কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। চিতোর শ্মশানে পরিণত হইল।

পথিমধ্যেই বাদশাহ হুমায়ুনের কর্ণে সেই শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ শুনিয়া উদার-হৃদয় হুমায়ুনের চক্ষে জল-ধারা বহিল, ধর্ম্ম-ভগিনীর ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না ভাবিয়া, হৃদয়ে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে হুমায়ুনের বীর-হৃদয়ে নিদারুণ জিঘাংসা জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বাহাদুরকে শাস্তি প্রদানের আকাঙ্ক্ষায় তিনি গুজরাটের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দিল্লীশ্বরের গুজরাট আক্রমণের সংবাদ চিতোরে বাহাদুরের সমীপে পৌছিলে, তিনি তড়িদ্‌বেগে স্বরাজ্যে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মোগল-সৈন্যের পদভরে ও হুঙ্কারে গুজরাট্ কম্পিত হইয়া উঠিল।

অপরদিকে মান্দুরাজ্যের অধিপতি বাহাদুর শাহের সহায় হইলেন। হুমায়ুন ধর্ম্ম-ভগিনীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই সুদূর দিল্লী হইতে গুজরাট্ আসিয়াছেন। ধর্ম্ম-ভগিনীর কাজে ধর্ম্মই দিল্লীপতির সহায় হইলেন, বাহাদুর শাহের সৈন্যদল মোগল-সেনার আক্রমণে অচিরে পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সিংহ-তাড়িত শৃগালের ন্যায় গুজরাট্‌রাজ স্বীয় রাজ্য ত্যাগকরিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার সহায়তাকারী মান্দুরাজও হুমায়ুনের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। মহানুভব দিল্লীর সম্রাট্ এইভাবে দুষ্কৃতের দমন করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন—'রাখি-বন্ধ ভাইয়ের' মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

মান্দু অধিকার করিয়া মহামতি হুমায়ুন, চিতোরপতি **বিক্রমজিৎকে** সেই সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। শরণাগত-রক্ষণ ও প্রতিজ্ঞা-পালনের উহা চরম উদাহরণ। সহৃদয়তা ও ন্যায় যে জাতিধর্ম্ম বিচার করে না, দিল্লীপতি তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ভাসমান তুষারখণ্ড

অনেকেই টাইটানিক (Titanic) জাহাজের নাম শুনেছ। টাইটানিক যে কত বড় জাহাজ ছিল, তা' সহজে কল্পনা করা যায় না! উহার উপরে টেনিস্ প্রভৃতি খেলাধুলা এবং আরও অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। ঠিক রূপকথার জাহাজের মত মনে হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, টাইটানিক যখন প্রথম আমেরিকার অভিমুখে সমুদ্র-যাত্রা করে, তখন আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরে ভাসমান তুষারখণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, সে জলমগ্ন হ'য়ে যায়। টাইটানিকের মত বড় জাহাজ ডুবে যাওয়াতে, কত প্রাণ যে বিনষ্ট হ'য়েছিল, তা' সহজেই অনুমান কর্‌তে পারা যায়।

ভাসমান তুষারখণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতে টাইটানিকের মত বড় জাহাজের ডুবে যাওয়াটা অসম্ভব ব'লে ভাব্‌ছ কি? কিন্তু মোটেই তা' অসম্ভব নয়! ভারতের মত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাস ক'রে বড় বড় তুষারখণ্ডের কথা ধারণা করাও অসম্ভব। একটা বড় তুষারখণ্ড যে দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং পুরুতে হাজার ফুট্ হ'তে পারে, সে ধারণাও আমরা কর্‌তে পারি না! ভারতে বছরের কোন সময়েই আমরা বরফ দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার পথে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরে যে নাবিকেরা জাহাজ চালায়, তা'রা জানে যে, এক একটা তুষারখণ্ড কত বড় হ'তে পারে এবং জাহাজের পক্ষে সেই সব ভাসমান বা নিমজ্জিত তুষারখণ্ড কত বিপজ্জনক! সমুদ্রের বুকে ভীষণ কুয়াসা হ'লে জাহাজ চালান কষ্টকর এবং অনেক সময় সামুদ্রিক কুয়াসা জাহাজের ধ্বংসের কারণ হয়। সেই কুয়াসাকে নাবিকেরা ভীষণ ভয় করে। কিন্তু কুয়াসার চেয়েও নাবিকেরা বেশী ভয় করে—দৈত্যাকৃতি ঐ সব তুষারখণ্ডকে। পরপৃষ্ঠায় যে ছবি দেওয়া হ'ল তা' থেকে তোমরা অনায়াসেই ধারণা কর্‌তে পার্‌বে যে, এক একটা তুষারখণ্ড কত বড় হ'তে পারে!

পর্ব্বতপ্রমাণ তুষারখণ্ডগুলি কিন্তু সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করে না। গ্রীণল্যাণ্ড্ (Greenland) এবং উত্তর-পূর্ব্ব কানাডা হ'চ্ছে সেই সব তুষারখণ্ডের জন্মভূমি; সেখান থেকে ঐ সব বরফখণ্ডের যাত্রা সুরু হয় এবং সমুদ্রের বুক বেয়ে চল্‌তে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সমুদ্রের জল যেখানে কম, সেখানে সে-সব বরফখণ্ড মাটি স্পর্শ করে এবং মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ভাঙ্গ্‌লে কি হয়? তা'র এক একটি টুক্‌রোর শক্তিও বড় কম নয়! এক একটি টুক্‌রোর আঘাত লেগেই এক একটা বড় জাহাজ

ভেঙ্গে যেতে পারে। সময় সময় ঐ সব বরফখণ্ড জলে ডুবে থাকে, তখন দ্রুতগামী জাহাজের পক্ষে হয় আরও সঙ্কট। আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরের নাবিকদিগকে সব সময় ঐ বিপদের দিকে নজর রাখ্‌তে হয়। সময় সময় আবার কুয়াসার জন্য তুষারখণ্ড দৃষ্টি-গোচর হয় না। সে আবার এক মহা ফ্যাসাদ্। পূর্ব্বেই ব'লেছি—সমুদ্রের ঘনান্ধকার কুয়াসা হ'চ্ছে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে এক মস্ত বিপদের কারণ।

উত্তর আট্‌লান্টিক্ মহাসাগরে বছরের বেশীর ভাগ সময়েই তুষারখণ্ড অল্পবিস্তর
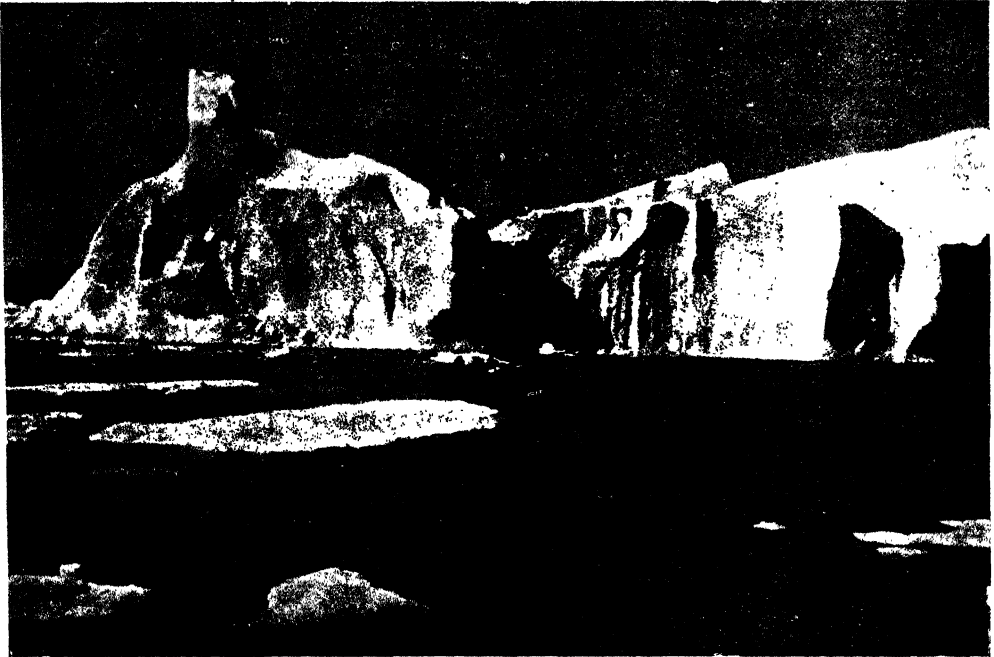
সামুদ্রিক দৈত্য—ভাসমান তুষারখণ্ড

দেখা যায়। তবে খুব বেশী দেখা যায়—জানুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে। সেই সময়ই জাহাজের পক্ষে অত্যন্ত বেশী ভয়ের সময়।

ইউরোপ থেকে আমেরিকার পথে, এই বিপদ্ থাকায়, অনেকেই তা'র হাত থেকে উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হ'ন। অবশেষে টাইটানিকের ধ্বংসের পর, কয়েকটি জাতি মিলে একটি উপায় উদ্ভাবন করেন; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজজাতিই প্রথমে

এই উপায় নির্দ্দেশ করেন। সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথে জাহাজকে চল্‌তে হয়। কয়েকটি 'রক্ষী' জাহাজ (ice patrol) আছে; সেই সব 'রক্ষী' জাহাজের কাজ হ'ল অনবরত সমুদ্রে ভ্রমণ ক'রে দেখা—কোথাও কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে কি না! 'রক্ষী' জাহাজগুলি জানুয়ারী থেকে আগষ্টমাস পর্য্যন্ত অনবরত সমুদ্রের যে-সব স্থানে ভয়ের কারণ আছে, সে-সব স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং বেতারের সাহায্যে দরকারী সংবাদ আদান-প্রদান করে। সেই ব্যবস্থার ফলে, বর্ত্তমানে অনেক জাহাজ, ঐ সব প্রাণহীন সামুদ্রিক দৈত্য তুষারখণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার লাভ ক'রেছে!

শ্রীগোপাল ভৌমিক

ভোর হ'ল

ভোর হ'ল রে ভোর হ'ল,
খোকা-খুকু ঘুম ভোল,—
পাপ্‌ড়ি-কোমল চোখ মেল,
　আলোর দোলায় দোল দোল!
বাইরে দেখ সব দিকে
রোদ উঠেছে ঝিক্‌মিকে;
কাট্‌ল আঁধার বিল্‌কুলই,
গাইছে পাখী দিল খুলি';
সব দিকে ওই সোর জাগে,
　আলোর ধাঁধাঁ জোর লাগে।
ফুলবালারা দোর খোলে,
ভোমরা অলির মন ভোলে,
গুন্‌গুনিয়ে গান তোলে
　ভাই গান তোলে!

মুক্ত মাঠে আয় ছুটি'
সকল আগল বাঁধ টুটি',
রস্‌নে ঘরে 'ঘুম-চেতন'—
　দোর খুলে দেখ সব চেতন!
সূয্যিমামার উজল ভায়
ভয় ভাবনা সব পালায়।
ভয় পালায় ওই দূর মাঠে,
　বন বাদারে, দূর বাটে।
খোকা-খুকু আল্‌সে নয়,
জাগ্‌বে তা'রা সুনিশ্চয়;
জাগ্‌বে তা'রা বিল্‌কুলই
স্বপন পুরীর দ্বার খুলি'—
　ভাই দ্বার খুলি'!

শ্রীহরিপদ দাস

শিকড়ের গুণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন রাত্রের খাওয়া দু'ভাই সন্ধ্যার আগেই সারিল। অদৃশ্য হওয়ার শিকড় খাওয়ার পর কি মজার ব্যাপারই হইবে ভাবিয়া, রামলালের স্বাভাবিক হাস্যময় মুখ আরও হাস্যময় হইল। তাহা দেখিয়া শ্যামলালের কেমন খট্‌কা লাগিল। কিন্তু রেধোকে ঠেঙাইবার লোভ সোজা নয়। শ্যামলালকে সে কয়েকবার দস্তুরমত অপমান করিয়াছে। এখন এই শিকড়ের গুণে যদি সাত পালোয়ানের মত জোয়ান হওয়া যায়, তাহা হইলে রেধোকে ঠেঙাইয়া এতদিনের জমানো রাগের ঝাল মিটাইয়া লওয়া যায়।

এমন সময় রামলাল আসিয়া বলিল—"চলো দাদা, একসঙ্গে শিকড় খাই গে, বেড়ে মজা—"

শ্যামলাল গর্জ্জিয়া উঠিল—"যা যা! আমাকে তোর সমানবয়সী পেয়েছিস্ আর কি! যতো সব—!" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ দাদার এত রাগ দেখিয়া রামলাল অবাক্ হইয়া গেল। দু'জনে বয়সে সমান না হইলেও একসঙ্গে শিকড় খাইতে কি দোষ? ব্যথিত হইয়া রামলাল ভাবিল—উপকার কর্‌লে লোকে অম্নি করে বটে; প্রবাদই তো আছে—'উপকারীকে বাঘে খায়'।

আয়নার সাম্নে দাঁড়াইয়া রামলাল শিকড় চিবাইতে লাগিল। সাধু সত্যই বলিয়াছিলেন—শিকড়টি খাইতে ভারী নরম আর মিষ্টি। সমস্তটা শিকড় খাইতেই তাহার সারা দেহে কেমন একটা উত্তেজনা আসিল, দেহ বেশ সতেজ বোধ হইতে লাগিল। সে হইল সাত পালোয়ানের মত জোয়ান—কিন্তু মনে করিল সে হইয়া গিয়াছে অদৃশ্য!

রামলাল গেল মা'র কাছে। মা তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাঁতা ঘুরাইয়া ভাজা মুগের মাথা ভাঙিতেছেন। রামলাল মা'র সম্মুখে বসিল। ভাবিল—মা যদি তাহাকে দেখিতে পান্ তাহা হইলে দুটি একটি কথা বলিবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু পাঁচ ছয় মিনিট বসিয়াও সে দেখিল মা কোন কথাই বলিতেছেন না, তিনি শুধু যাঁতা ঘুরানী গানেই মশ্‌গুল। কাজেই সে ভাবিল—মা নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, সে বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

রামলাল ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। আকাশে তখন চাঁদ হাসিতেছে, চারিদিক উজ্জ্বল জোৎস্নায় আলোকিত। দেখিয়া রামলালের ভারী আনন্দ হইল। কি চমৎকার রাত! এমন রাতে সে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবে, সকলকে দেখিতে পাইবে, অথচ তাহাকে কেহই দেখিতে পাইবে না! এর চাইতে আমোদের আর কি হইতে পারে? রামলাল বেড়াইতে লাগিল।

বোসেদের আরতি পুকুরপাড়ে বসিয়া বাঘা কুকুরটাকে বাঘ-ভালুকের গল্প শুনাইতেছে। দেখিয়াই রামলালের ইচ্ছা হইল একটু তামাসা করিবার। ভাবিল, আরতির সাম্নে গিয়া জোরে জোরে কথা কহিবে। আরতি তাহাকে দেখিতে পাইবে না, অথচ তাহার কথা শুনিবে। এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া কাহাকেও

দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই ভুতুড়ে ব্যাপার ভাবিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিবে। আরতি সাহসী মেয়ে বলিয়া বড়াই করে, তাই কাল তাহাকে বেশ ক্ষেপানো যাইবে।

এই ভাবিয়া রামলাল আরতির সাম্নে দাঁড়াইয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া নাচিতে নাচিতে নাকি-সুরে বলিতে লাগিল—"এঁইঁ আঁরঁতিঁ আঁজ তোঁর ঘাঁড় ভেঁঙে রঁক্ত খাঁবোঁ··· ·····" ইত্যাদি।

সেইদিন দুপুরবেলা রামলালের মা অনেকক্ষণ আরতিদের বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে কথায় কথায় তিনি বলিয়াছিলেন—"রামুটা ক'দিন ধ'রে যে কী পাগ্‌লামীই সুরু ক'রেছে। পড়ার বই ছোঁবে না, কেবল সাধু আর সাধু! সাধু ওর মাথাই খারাপ ক'রে দিয়েছে। বল্‌তেও ভর্‌সা পাই না—কি জানি যদি আবার সাধুর শাপ লাগে!"

রামুদার মাথা খারাপ হইয়াছে শুনিয়া আরতি তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এখন তাহার প্রমাণ একেবারে হাতে হাতে পাইয়া আরতি বেচারী হঠাৎ বিষম ভয় পাইয়া গেল। রামু যে অদ্ভুত রকম মুখভঙ্গী এবং বিকট আওয়াজ করিয়া ধেই ধেই নাচিতে সুরু করিয়াছে তাহাতে রামুর মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না। আরতি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঘা কুকুরটা ক্ষেপিয়া রামলালকে আক্রমণ করিতেই সে হঠাৎ চম্‌কাইয়া দ্রুত পিছু হাঁটিল, কিন্তু পালাবার উপায় নাই দেখিয়া বাঘাকে মারিল এক লাথি। সে লাথি কি যে সে লাথি?—একেবারে যাহাকে বলে 'রাম-লাথি'! সাত পালোয়ানের মত জোয়ান হইয়াছে রামলাল—যদিও সে নিজে তাহা জানে না,—তাহার উপর আবার প্রাণের দায়ে মরিয়া হইয়া মারা লাথি। একটা সামান্য কুকুর তাহা সহিতে পারিবে কেন? বেচারী আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়াই মরিল!
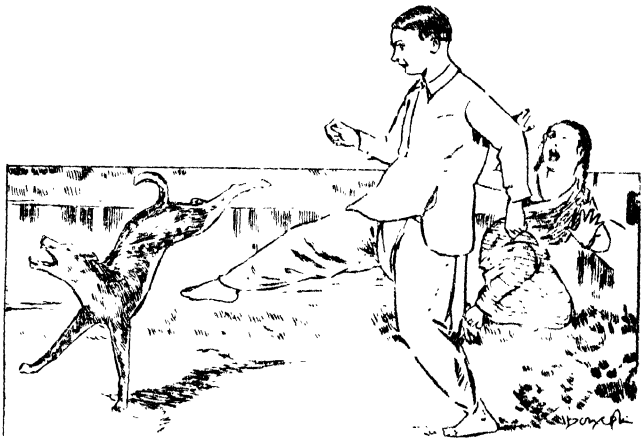
বাঘাকে মারিল এক লাথি

রামলাল হতভম্ব হইয়া গেল। প্রথমতঃ, এক লাথিতেই ব্যাটা মরিয়া গেল; দ্বিতীয়তঃ অদৃশ্য মানুষকে কি কুকুরেরা দেখিতে পায়?

রামলাল ভাবিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পায়। পাবে না কেন? কুকুর তো আর মানুষ নয়!' আরতিদের বাড়ীতে ভুলো নামে আর একটা কুকুর আছে—বাঘা অপেক্ষা ঢের বেশী জোয়ান আর তেজীয়ান। সে যদি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে রক্ষা থাকিবে না। ভুলোর গলার আওয়াজও পাওয়া যাইতেছে।

এই রে! আসিল বুঝি! প্রাণভয়ে রামলাল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। আশ্চর্য্য! রামলালের কোনও দিন দৌড়াদৌড়ির অভ্যাস ছিল না। সামান্য দৌড়াইলেই সে হয়রাণ হইয়া পড়িত। কিন্তু এখন এমন মনে হইতেছে যেন সে মাইলের পর মাইল অনায়াসে দৌড়াইয়া যাইতে পারে।

কিছুক্ষণ দৌড়াইয়া সে যেখানে দাঁড়াইল, তা'র কাছেই নন্দ হালুইকরের দোকান। এই দোকান হইতে রামলাল সঙ্গীদিগের সহিত কয়েকদিন বাকীতে মিঠাই খাইয়াছে; কিন্তু এখনও পয়সা দেয় নাই।

নন্দর ছোটভাই গদাই কহিল—"ঐ তো আজ অ্যাদ্দিন পর দেখা দিতে এয়েছেন। আজ্‌কে দেবো নাকি জোর তাগিদ্, দাদা? বল্‌বো নাকি—পয়সাকড়ি সব চুকিয়ে দিয়ে ফ্যালো কর্ত্তা, তা' নইলে—"

নন্দ কহিল—"না রে না, কিচ্ছু বল্‌তে হবে না। ওর সঙ্গে একটি কথাও বলিস্ নি। কালই যা'ব ওর মা'র কাছে। বুড়ীকে বল্‌লেই বাকী দাম সব চড়্‌চড়্ ক'রে আদায় হ'য়ে যাবে। বুড়ী বড্ড ভালো মানুষ। এ দেব্‌তাটির মতন নয়।"

রামলাল দোকানের পাশে দাঁড়াইল—বার কয়েক হাঁচিল; তারপর কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া দুই মিঠাইওয়ালা ভাইকে ডাকাডাকি করিল। দুই ভাই চুপ চাপ্ বসিয়া; সাড়াও নাই, শব্দও নাই। ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রাণ হইয়া রামলাল ভাবিল, 'দুত্তোর ছাই! ব্যাটারা পুরো-দস্তুর বেরসিক। দেখ্‌তে পাচ্ছে না, অথচ ডাক শুন্‌ছে—তা'তে যে ভয়ে দু'ভাই জড়াজড়ি ক'রে গড়াগড়ি খাবে তা নয়, উজ্‌বুগের মতো মুখবুজে চুপ্ ক'রে ব'সে আছে।' ভাবিয়া দোকান ছাড়াইয়া চলিতে চলিতে রামলাল আবার ভাবিল, 'কি আশ্চর্য্য শিকড়ের গুণ! জলজ্যান্ত মানুষটি রয়েছি, অথচ ব্যাটাদের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে এলুম, তবু আমায় দেখ্‌তে পেলে না! এ্যা! দেখ্‌তে পেলেই ঠিক তাগিদ্ দিত পয়সার জন্যে।......"

খানিকদূর অগ্রসর হইতেই গোপী মাষ্টারের বাড়ী। ইংরাজীর মাষ্টার তিনি—যে স্কুলে তা'রা দুটি ভাইই পড়ে। রাস্তার পাশের ঘরে তিনি বসিয়া আছেন, মিটিমিটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। রামলাল রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিল,—টেবিলের উপর এক গাদা পরীক্ষার খাতা। অল্প কিছুদিন আগে সেকেণ্ড্ টার্মিন্যাল্ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে দেখিল মাষ্টার মশাই ঝিমাইতে সুরু করিয়াছেন।

রামলাল ভাবিল, 'খাতায় তো যা লিখেছি, তা মা সরস্বতীই জানেন! একবার ঢুঁ মেরে যাই, দেখি কত নম্বর দেয়। নম্বর না—যেন ওঁর গায়ের রক্ত! কা'কে কত নম্বর দেয় সব দেখে যাই। নম্বর ব'লে দিয়ে ক্লাশের ছেলেদের বেশ অবাক্ ক'রে দেওয়া যাবে কাল।'

ভাবিয়া রামলাল ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাষ্টার মহাশয়ের তখন চক্ষু ঢুলুঢুলু—রামলালকে তিনি দেখিলেন না। রামলাল খাতাগুলি দেখিতে লাগিল। নিজের খাতাখানার উপরে দেখিল বেশ বড় একটা নীল পেন্সিলের গোলাকৃতি দাগ আঁকা! দেখিয়া ভয়ানক রাগ হইল। না হয় সে বেশী ভাল লিখিতে পারে নাই, তাই বলিয়া এমন নম্বর? অন্ততঃ একটা নম্বর দিলেও তো হইত! রামলাল ভাবিল আজ ভয়ানক ভয় দেখাইয়া দিবে মাষ্টারকে।

নিজের পরীক্ষার খাতাটা খুব শক্ত করিয়া মুড়িয়া সে একটি ডাণ্ডার মত করিল এবং সেটা শক্ত

মুঠিতে উঠাইয়া ধরিয়া কহিতে লাগিল—"ওঁরে হঁতচ্ছাঁড়া গুঁপেঁ! রাঁমলাঁলকে যঁদি ইংরিঁজীঁতেঁ পাশ কঁ'রেঁ নাঁ দিঁস্ তাঁ হঁলেঁ তোঁর রঁক্ষেঁ থাঁকবেঁ নাঁ! বুঁঝ্লি?"

চাকর ভজা এবং গোপী মাষ্টার দু'জনেই অদ্ভুত অনুনাসিক শব্দ শুনিয়া সন্ত্রস্তে চোখ মেলিল। ভজা দেখিল রামবাবু! গোপী মাষ্টার দেখিলেন বখাটে ছোঁড়া—রামলাল। রামলালের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আগমন এবং অভাবনীয় স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি এমন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, সহসা রাগ করিতে পারিলেন না। যেইমাত্র তিনি রাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অমনি রামলাল মোড়ানো খাতা দিয়া এক খোঁচা লাগাইল গোপী মাষ্টারের কপালে। রামলালের অবশ্য বেশী জোরে মারার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাহার দেহে যে সাত পালোয়ানের শক্তি! কাজেই

তাহার সামান্য খোঁচাটুকুই এত জোরালো হইল যে, সে ঠেলা মাষ্টার সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তিনি অস্ফুট চীৎকার করিয়া চেয়ার শুদ্ধ উল্‌টাইয়া পড়িলেন।

ভজা চেঁচাইয়া উঠিল—"ওকি রামবাবু!"

গোপী মাষ্টার উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া মাষ্টারের কুস্তীগীর ছেলে বটুকনাথ ছুটিয়া আসিয়া রামলালকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। অন্যদিন হইলে বটুক অনায়াসেই রামলালকে পিষিয়া ফেলিত, কিন্তু আজ রামলালের হাতে তাহার অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। এদিকে গোপী মাষ্টার চেঁচাইতেছেন—"হতচ্ছাড়া বদ্‌মায়েস্ ছোক্‌রা! তোকে রাস্‌টিকেট না করিয়ে যদি রেহাই দিই—তো আমার নাম গোপী হাজরা নয়।" রামলাল বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিল।

সে ভাবিল "একি সর্ব্বনাশ! আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে যে! আর আমার গায়ে এত জোরই বা হ'ল কি ক'রে! শিকড় বদল হ'য়ে যায় নি তো? সাধুবাবা তো এত সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। দেখি তো ভেবে।" একটু ভাবিতেই রামলাল বুঝিতে পারিল—ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিয়াছে সে। গোপী মাষ্টার যদি বাস্তবিকই তাহাকে রাষ্টিকেট করিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে তো বড়ই বিপদ্। অত্যন্ত চিন্তিতমনে রামলাল ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিল।

(আগামীবারে শেষ হইবে)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ.

লিথোগ্রাফির গোড়াপত্তন

আমার হাতের লেখা তোমরা কেউ দেখ নি, অথচ ছাপা অক্ষরে আমার লেখা কিন্তু সহজভাবে পড়তে পার; আবার তাহাও সকলে একসঙ্গে নয়—প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নিজের ঘরে ব'সে! তোমাদের যদি প্রশ্ন করি—'কি ক'রে তা' হয়, বল তো?' তোমরা বিজ্ঞের মত হেসে ব'লে উঠ্‌বে—'কেন, ছাপা অক্ষর যে!' এই ছাপা অক্ষরের কি ক'রে জন্ম এবং কি রকম অবস্থা থেকে তা'র ক্রম-বিকাশ, তা' ভারি মজার কথা; সে-কথা তোমাদের খুব ভাল লাগ্‌বে।

এ কথা সত্য যে—পৃথিবীতে সবার প্রথম ছাপার অক্ষর যে কে বা'র ক'রেছে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না; তাই পৃথিবীর প্রাচীন ও অগ্রণী দেশগুলি সে সম্মান পাবার জন্য প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করে যে, তাদের দেশেই নাকি ছাপা অক্ষরের প্রথমে আবিষ্কার হয়। সবাই যদি প্রমাণ দেখিয়ে বলে যে—'আমি রাজা', তা' হ'লে তোমাদের মধ্যে কেউ প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বে না সত্যকারের রাজা কে। তবে যার রাজ্য খুব বেশী, হয়তো তা'র উপর তোমাদের আস্থা হ'তে পারে। তেমনই ইতিহাস খুঁজে খুঁজে দেখা যায় যে, চৈনিক সভ্যতার প্রারম্ভেই তাদের মধ্যে এই ছাপা অক্ষরের প্রচলন ছিল; তা'রাই সকলের আগে কাঠের উপর অক্ষর তৈরী করে। সুতরাং তা'রা যদি এ দাবীটুকু ক'রে বসে, তা' হ'লে আমরা তাদের একেবার অমর্য্যাদা কর্‌তে পারি না। তাই আজকাল সকলেই স্বীকার ক'রেছেন যে—চীনদেশেই প্রথম ছাপাখানা প্রবর্ত্তিত হয়।

কাগজের উপর কালি দিয়ে ছাপাবার তিন রকম প্রথা আছে, প্রত্যেকটি একেবারে বিভিন্ন ধরণের। সংক্ষেপে তা' বল্‌ছি ঃ—

ইণ্টাগ্‌লিও (Intaglio) প্রথা সবচেয়ে আগে আবিষ্কৃত হয়। তা'র নিয়ম হচ্ছে—অক্ষরগুলি ক্ষুদে লেখা। তোমরা খেলার ছলে দুষ্টুমী ক'রে অনেক সময়ে আলু আধখানা ক'রে—বা লাউয়ের বোঁটার দিক্‌টা কেটে তা'র ভিতরে ছুরি দিয়ে উল্টো ক'রে 'গাধা' শব্দ ক্ষুদে সেটাতে কালি মাখিয়ে নাও। তারপর, তা' দিয়ে চুপি চুপি বন্ধুর জামার পিছনে একটা ছাপ মেরে দাও। কালিটুকু কাপড়ে লেগে যায় এবং অক্ষরটার শাদা ছাপ পড়ে। তা'র মানে তোমরাও এই ইণ্টাগ্‌লিও প্রথাটা জান—জান না শুধু নামটা।

আর এক রকম নিয়ম আছে—তা'কে বলে রিলিফ্ (Relief) ; সেটা আবার ঠিক ইন্টাগ্লিওর উল্টা। তা'তে অক্ষরগুলিকে গর্ত্ত ক'রে নীচু করা হয় না, উঁচু ক'রে রাখা হয়, আর অন্যান্য অংশকে কেটে নীচুতে রাখা হয় অর্থাৎ কেবল অক্ষরগুলি উঁচু হ'য়ে থাকে। তখন তা'র উপর কালি লাগিয়ে ছাপ দিলে দেখ্বে যে কেবল অক্ষরগুলির ছাপা উঠেছে—আর তা'র চারিদিকের অংশ অপেক্ষাকৃত নীচু ব'লে ছাপ উঠে নি। সাধারণতঃ ছাপাখানায় তোমরা এইরকম অক্ষরই দেখ্তে পাবে।

সব চেয়ে আধুনিক প্রথা হচ্ছে লিথোগ্রাফি (Lithography)—যার সম্বন্ধে তোমাদের বল্তে ব'সেছি। পূর্ব্বের দুই নিয়মে দেখ্লে—অক্ষরগুলি একটাতে নীচু ও অপরটাতে উঁচু করা হয়। আর লিথো বড় মজার—উঁচুও নয়, নীচুও নয়,—অর্থাৎ কিনা সমতল জায়গায়। তাই তা'র আর একটি নাম প্লানোগ্রাফিক্ (Planographic)। কিন্তু সমতল জায়গায় লিখে কি ক'রে ছাপা যায়? কালি লাগাতে গেলে চারদিকেই তো ছড়িয়ে যাবে, কিছুই তো পড়া যাবে না! আসলে কিন্তু তা নয়।

এ নিয়ম খুব বেশীদিন আবিষ্কৃত হয় নি, অথচ আজকাল রঙ্গীন বিজ্ঞাপন ও লেবেলগুলি এই নিয়মে ছাপাতে সবচেয়ে সস্তায় হয়। লিথোগ্রাফি কথাটা গ্রীক্ শব্দ হ'তে এসেছে। গ্রীক্ শব্দ লিথস্ (Lithos)—এক রকম পাথর বুঝায় এবং গ্রাফো (Grapho) মানে—লেখা। আসল অর্থ হ'ল—লিথস্ পাথরের উপর লেখা। কিন্তু আজকাল এই পাথরের ব্যবহার ক'মে গেছে, সাধারণতঃ দস্তার ও এলুমিনিয়ামের পাতের উপরেই লেখা হয়। অথচ নামটা সে-ই চ'লে আস্ছে। পূর্ব্বেই ব'লেছি এর আর একটা নাম প্লানোগ্রাফিক্, কেন না অক্ষরগুলি অথবা ছবিগুলি সমতলে এঁকেই ছাপা হয়। সব রকম ছাপাবার নিয়মের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বিজ্ঞান-সম্মত ও পরিবর্ত্তন-শীল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির কোন এক ভদ্রলোক—এলয় সেনে ফেল্ডার (Aloys Sene Felder)—সর্ব্বপ্রথম এই প্রথার আবিষ্কার করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিউনিক্ (Munich) নগরে রয়েল থিয়েটারের পরিচালক। সেনে ফেল্ডারের নিজের ইচ্ছা ছিল পিতার কাজ গ্রহণ করা এবং প্রথমবয়সে তিনি কয়েকখানা নাটকে অভিনয় ক'রে নামও ক'রেছিলেন। কিন্তু পিতার ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে আইন পড়্তে যেতে হয়। তাঁর পিতা বেশীদিন বাঁচলেন না, কাজেই তাঁকে অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত নিজেরই কর্তে হ'ল। অন্য কোন সুবিধা না দেখে তাঁকে আবার সেই থিয়েটারেই ভিড়্তে হ'ল; কিন্তু

সত্যকারের সুবিধা হ'ল না বিশেষ। শেষে অভিনেতা হওয়া তাঁর ভাগ্যে পোষাল না, তখন অন্য একদিকে তাঁর ঝোঁক্ গেল। একেবারে মঞ্চে নেমে নাটক করার চেয়ে—তিনি] ভাব্‌লেন যে, নাটক লিখে ও তাই অভিনয় করিয়ে তিনি ভাল রোজগার কর্‌তে পার্‌বেন। এই ধারণা নিয়ে তিনি কয়েকখানা নাটক লিখেও ফেল্‌লেন, এবং নিজেই সেগুলি ছেপে বাজারে প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

তখন ছাপা এত সহজ ছিল না এবং অনেক সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কি ক'রে উন্নত ও সহজপ্রথায় অল্প সময়ে ছাপা যেতে পারে, একদিন ফেল্ডার ব'সে ব'সে তাই বা'র কর্‌বার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময় তাঁর মা এসে তাঁকে ধোপা বাড়ীর হিসাবটা লিখে রাখ্‌তে ব'লে গেলেন। কাছে কোন কাগজ ও কালি না থাকায় তিনি উল্টো ক'রে লেখা অভ্যাস করার জন্য যে পাথর কিনে এনেছিলেন, তা'রই উপর—গ্রীজ্ (Grease-একরকম চর্ব্বি) মিশান কালি, যা সাম্‌নে ছিল, তাই দিয়ে হিসাবটি লিখে ফেল্‌লেন। পরে যখন লেখাটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল, তখন মুছে ফেল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন যে—লেখা কিছুতেই মোছা যায় না, এমন কি কোনও এসিডও তার উপর কোন কাজ করে না! যতক্ষণ না লেখা ক্ষুদে ফেলা হয়, ততক্ষণ লেখা প্রায় আগের মতনই থাকে!

এই গ্রীজ্ পদার্থটা তেল্‌তেলে ব'লে জলের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না অর্থাৎ চারদিকে জল ছড়িয়ে দিলেও গ্রীজ্-মাখান কালির উপর তা লেগে থাক্‌তে পারে না। এই প্লেটটাও এমন এক ধাতু দিয়ে তৈরী, আর তা'র উপর এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য ছাপ্‌বার সময় লেপে দেওয়া হয়—যা জলকে টেনে নিতে পারে। এখন যদি জল থাক্‌তে থাক্‌তে আবার গ্রীজ্-মেশান কালি প্লেটের উপর লেপে দাও, তবে কেবল ছবির উপরই কালি লাগ্‌বে আর অন্য সকল স্থানে জল থাকাতে কালি লাগ্‌তে পার্‌বে না, শাদাই থেকে যাবে। এখন কাগজে ছাপ নাও, দেখ্‌বে সুন্দর ছাপা হ'য়েছে।

এই হ'ল লিথোগ্রাফির জন্মকথা।

শ্রীগোপেশ সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি.

বাণী-বন্দনা

হের ঐ দলে দলে কাহার চরণ-তলে শতদল উঠিয়াছে জাগি !
দখিনের মৃদু বায় কা'র আগমনী গায় পরিমল বহে কা'র লাগি ?
আমের মুকুল ওই শাখে শাখে শোভাময়ী প্রকৃতির অপরূপ শোভা,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে চম্পক ফুটে বনে মালতীর হাসি মনোলোভা।
বকুল পড়িছে ঝরে আন মনে থরে থরে যাচে কা'র চরণের ধূলি ?
সুবাসিত গন্ধরাজ কেন এত হাসে আজ বার বার চাহে মুখ তুলি ?
পাপিয়ার কলতান পুলকে মাতায় প্রাণ দিকে দিকে একি কল-রব ?
মন্দিরে কেন আজি উঠিল বাজ্না বাজি চারি দিকে কিসের উৎসব ?
এসেছে জননী বাণী হ'য়ে গেছে জানাজানি জাগাইয়া জগতের প্রাণ,
তাই এত শোভারাশি উজলিল দশদিশি মাতাইয়া ওঠে হাসি গান।
নমঃ নমঃ বীণাপাণি বাজাও মা বীণাখানি তব কর-অঙ্গুলি পরশে,
ঝঙ্কার হৃদি মম বিহগ-কাকলী-সম তর তর ছন্দিত হরষে।
পুস্তক-হস্তে জননী নমস্তে নিখিলের তুমি জ্ঞানদাত্রী,
সূর্য্য-করোজ্জ্বল জ্ঞানের দেউটি জ্বাল হৃদয়ের নাশি অমা-রাত্রি।
এস এস বাঙ্‌ময়ী এস শ্বেত শোভাময়ী মূক মুখে ভাষা দাও ছন্দে,
মরাল-বাহিনী মাগো হৃদি-সরোবরে জাগো মহাসুখে সৃজন-আনন্দে।
কল্যাণে কল্যাণী ছেয়ে ফেলে ধরাখানি হে ভারতি দাও দাও শান্তি,
তব বন্দনা গানে প্রাণ পা'ক মৃত প্রাণে এ মিনতি, দূর হোক ভ্রান্তি।
মম মনো-মন্দিরে সারাটি জীবন ভ'রে মাগো তোর পূজিতে চরণ
যেন গো শকতি পাই আর কিছু নাহি চাই তম-ঘোর লভুক মরণ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কি ও কেন?

গাছে ফুল ফোটে কেন?

আমাদেরই কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—

মানুষ তাহার বাগানে নানাপ্রকারের ফুলের গাছ লাগায়। শীতকালের ফুল, গ্রীষ্মের ফুল, বর্ষার ফুল! ফুলের প্রকারই বা কত, আর বর্ণ-বৈচিত্র্যই বা কত? গন্ধই
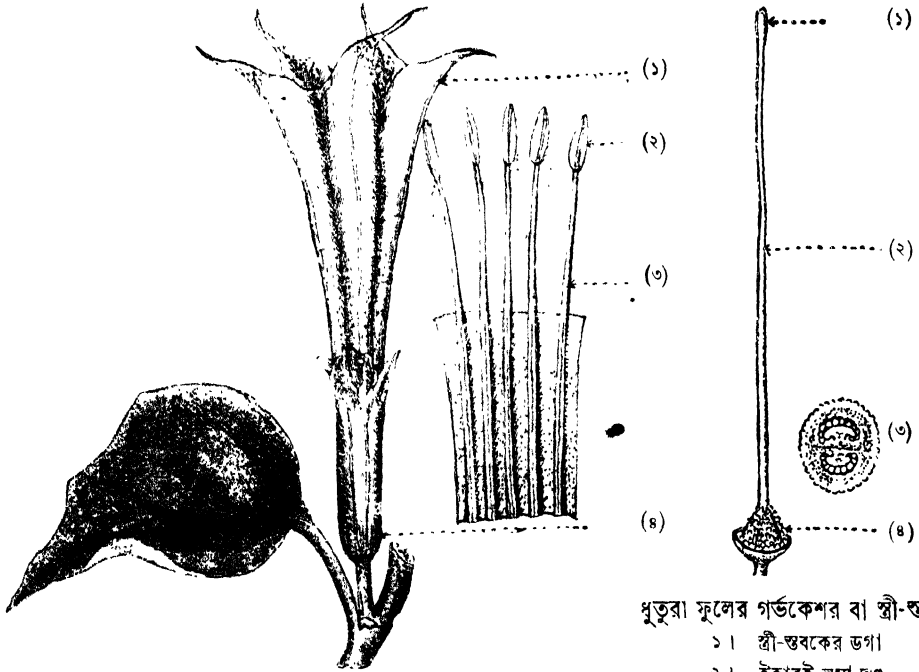
ধুতুরা ফুল
১। ফুলের ভিতরের আবরণ ২। পরাগ বা পুংরেণুর থলে
৩। পরাগ-থলের লম্বা বোঁটা বা দণ্ড ৪। ফুলে বাহিরের আবরণ

ধুতুরা ফুলের গর্ভকেশর বা স্ত্রী-স্তবক
১। স্ত্রী-স্তবকের ডগা
২। ইহারই লম্বা দণ্ড
৩। বীজের ভাণ্ড দুই ভাগ করিয়া বীজগুলিকে দেখান হইয়াছে
৪। বীজের ভাণ্ড

বা কি মনোরম! মানুষ তাহার যত কিছু ভাল—তাহা ফুলের উপমা দিয়াই প্রকাশ করে। যেমন 'ফুলের মত কোমল', 'ফুলের মত পবিত্র', ইত্যাদি। ফুল ভালবাসে না—এমন

মানুষ খুব কমই আছে। ফুল বাদ দিয়া কোন মাঙ্গলিক কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। গাছ যে তাহার দেহে ফুল ফুটায়—তা কি মানুষ তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবে বলিয়া ?

যে সব গাছে ফুল ফোটে, তাহারা সাধারণতঃ বীজ দিয়া বংশ রক্ষা ও বিস্তার করে। বীজের ভিতর থাকে গাছের ভবিষ্যৎ শিশু—সুপ্ত অবস্থায়। গাছ-শিশু জন্মে স্ত্রী ও পুং জনন-কোষের মিলনে। পুং-জনন-কোষ থাকে পরাগ-রেণুর মধ্যে, আর পরাগরেণু থাকে পুংকেশরের মাথায় অবস্থিত পরাগ-ধানীর ভিতরে।

স্ত্রী-জনন-কোষ থাকে ডিম্বকের মধ্যে, ডিম্বক থাকে গর্ভস্থলীর ভিতর। গর্ভস্থলী হইতেছে গর্ভ-কেশরের গোড়ার দিকের ফাঁপা অংশ। গোলাপ, চাঁপা, জবা, ধুতুরা প্রভৃতির ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই সঙ্গে থাকে, কিন্তু কুমড়া গাছে পুংকেশর ও গর্ভকেশর পৃথক্ পৃথক্ ফুলে থাকে, আবার পেঁপের মত গাছে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গাছে উৎপন্ন হয়।

জবাফুল; (১) বহির্ব্বাস, (২) পাপ্ড়ি-চক্র, (৩) পরাগকেশর, (৪) গর্ভনলী, (৫) গর্ভকেশর, (৬) গর্ভস্থলী

গাছ অচল জীব। তাহা হইলে পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের মিলন ঘটাইবে কে ? এই মিলন না হইলে গাছের ভবিষ্যৎ শিশু জন্মিবে না। তবে কি স-পুষ্পক গাছের বংশ লোপ হইবে ? না, তাহা হয় না। কীট-পতঙ্গ এই মিলন ঘটায়, কিন্তু কীট-পতঙ্গ ফুলের কাছে আসিবে কেন ? তাই ফুলের অমন বর্ণ-বৈচিত্র্য, অত মনোরম গন্ধ, সুমিষ্ট মধু ও পুষ্টিকর পরাগরেণু।

সাদা ফুলেই গন্ধ বেশী কেন?

বেলা, যুঁই, চামেলি, মল্লিকা, মালতী, রজনীগন্ধা, হাস্নুহানা, নেবু প্রভৃতি গাছের ফুল সাদা এবং মধুর গন্ধে ভরপূর। উহারা সকলেই গ্রীষ্মকালের ফুল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে দিনের বেলা কীট-পতঙ্গ বাহির হইতে পারে না; সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। রাত্রের অন্ধকারে ফুলের অন্য কোন রং দেখা যায় না, কিন্তু সাদা ধব্‌ধবে রং তবুও কিছু দেখা যায়। তাই গাছ বর্ণের বাহারে শক্তির অপচয় না করিয়া—সাদা পাপ্‌ড়িগুলি গন্ধে ভরপূর করিয়া রাখে। গন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া কীট-পতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে; গাছেরও কার্য্য সিদ্ধ হয়, কীট-পতঙ্গও তাহাদের খাদ্য পায়।

রঙ্গিন ফুলে সাধারণতঃ গন্ধ থাকে না কেন?

জবা, শিমুল, গেঁদা প্রভৃতি শীতকালের ফুল—তাহাদের রংএর বাহার কত? কিন্তু গন্ধ নাই। গন্ধ না থাকিলেও বর্ণ-বৈচিত্র্যে কাহার মন না ভুলে? গাছ তাহার রঙ্গিন ফুল দিয়াই কীট-পতঙ্গকে ভুলাইয়া আনিয়া কার্য্যসিদ্ধি করে। শীতকালে কেহ রাত্রে বড় একটা বাহির হয় না, কাজেই দিনের বেলা বর্ণের বাহারই নিমন্ত্রণ করিতে যথেষ্ট।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম. এস্‌-সি.

শিবানন্দ বিদ্যা-বাচস্পতি

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মহীনন্দ গ্রামের স্বর্গীয় শিবানন্দ বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল। নানাদেশ হইতে পড়ুয়াগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, এবং সদালাপী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একদিন বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার 'টোল'ঘরে শাস্ত্রের একটি জটিল মীমাংসায় নিবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ধীবর আসিয়া মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

"ঠাকুর কর্ত্তা! প্রণাম।"

হঠাৎ যেন যোগীর ধ্যান ভাঙ্গিল। চোখ তুলিয়া আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া আগন্তুককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি! কি চাও তুমি?"

জেলে বলিল—"ঠাকুর কর্ত্তা! আমার মেয়ের বিবাহের কথাবার্ত্তা সুস্থির হ'য়েছে; খুব ভাল বর পেয়েছি। একখানা লগ্ন দেখে দিন্।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা, ভাল কথা, বস। তামাক খাও। আমি হাতের কাজটা সেরে নেই।"

জেলে পাঁড়ি টানিয়া বসিল; তামাক সাজিয়া খাওয়ায় মন দিল। বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয়ও পুঁথির দিকে মন দিলেন। জেলে তামাক খাইতেছে—তাহার দিকে বাচস্পতি মহাশয় চোখ তুলিয়াও চাহিতেছেন না—ঠিক আগেকার মতই নিবিষ্ট হইলেন। এমন সময় একটি অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়ে আসিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা! স্নানের সময় হ'য়েছে, স্নান করুন।" বাচস্পতি "হাঁ, মা, যাই" বলিয়াই আবার ধ্যানে বসিলেন, বালিকার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল—তর্কের মীমাংসা হইল না। বাচস্পতিরও ধ্যান ভাঙ্গিল না। জেলে গালে হাত দিয়া বাচস্পতির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে আর একটি বিধবা কন্যা আসিয়া পূর্ব্ববৎ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"বাবা! বাবা! বাবা!"

আবার যোগীর ধ্যান ভাঙ্গিল, চাহিয়া উত্তর করিলেন—"কি মা?"

কন্যা বলিল—"বাবা! বেলা দুপুর পার হ'য়েছে; আপনি স্নান কর্‌বেন না?"

বাচস্পতি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, আস্‌ছি, মা।" বলিয়া তিনি আর একখানা পুঁথি হাতে নিলেন। মেয়ে চলিয়া গেল। এই পুঁথিখানার উপর কতক্ষণ চোখ বুলাইয়া আর একখানা পুঁথি, তারপর আর একখানা, তারপর আর একখানা। এইভাবে কয়েকখানা পুঁথি দেখিয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিয়া চোখ বুজিয়া বাচস্পতি নিশ্চল হইয়া রহিলেন। এমন সময় আর একটি বিধবা যুবতী আসিয়া অপেক্ষাকৃত উগ্রস্বরে ডাকিল—"বাবা, ও বাবা!"

বাচস্পতি চমকিয়া বলিলেন—"হ'য়েছে, হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে। হাঁ, ইহাই সত্য।"

বিধবা যুবতী বলিল—"বাবা! দিনটা ত গেল, স্নান কর্‌বেন না? এখনও আহ্নিক হয় নাই, পূজা হয় নাই, খাবেন কখন?"

বাচস্পতি বলিলেন—"হাঁ, মা, হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে। ইহাই সত্য।"

বিধবা বলিল—"আপনার এই 'ঠিক' ত রোজই হচ্ছে। বলি, আপনি স্নান-আহ্নিক কর্‌বেন না? কোন্ কালে—কোন্ যুগে পাক হ'য়েছে!"

বাচস্পতি—"হাঁ মা, যা তুই, এই আমি আস্‌ছি। এখনি আস্‌ছি" এই বলিয়া জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ, রে, তুই কেন এসেছিলি?"

জেলে। আমি কেন এসেছিলাম তা' বল্‌ব পরে; আগে জিজ্ঞাসা করি ঠাকুর কর্ত্তা, এই যে একে একে তিনটি মেয়ে আপনাকে ডাক্‌তে এসেছিলেন, ইঁহারা কে?

বাচস্পতি। কেন? আমার মেয়ে!

জেলে। আপনার মেয়ে! তিনটিই!

বাচস্পতি। হাঁ, তিনটিই।

জেলে। তবে ইঁহাদের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই যে?

বাচস্পতি। হাঁ রে কপাল! উহারা বিধবা!

জেলে। বিধবা! তিন তিনটিই বিধবা!

"হাঁ, তিন তিনটিই বিধবা! আমি বড়ই দুঃখীরে! বড়ই হতভাগ্য রে!" এই বলিয়াই বাচস্পতি উপরের দিকে হাত তুলিয়া দেখাইয়া কপালে আঘাত করিলেন; পুনরায় বলিলেন—"আমার তিনটি মাত্রই মেয়ে, তিনটিই বিধবা!"

জেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আজ্ঞা করুন তবে—আমি এখন যাই।"

বাচস্পতি। যাবি কি! তুই এসেছিলি কেন? কিছুই ত বল্‌লি নি?

জেলে। আমি এসেছিলাম আমার মেয়ের বিবাহের লগ্ন দেখার জন্য। তা'র আর দরকার নেই ঠাকুর কর্ত্তা।

বাচস্পতি। দরকার নেই কি রকম?

জেলে। ঠাকুর! তুমি দিন দেখ্‌তে জান না।

পাণ্ডিত্যাভিমানী বাচস্পতি মহাশয় দুই চোখ বড় করিয়া জেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি-ই-ই! আমি শিবানন্দ বিদ্যা-বাচস্পতি দিন দেখ্‌তে জানি না?"

জেলে। না ঠাকুরকর্ত্তা! তুমি পণ্ডিতলোক—রাগ ক'রো না। তুমি জ্ঞানী, বিচার কর। তুমি দিন দেখ্‌তে জান্‌লে, ঠাকুর, তোমার একটা একটা ক'রে তিন তিনটা মেয়ে বিধবা হয়?

বাচস্পতি মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল; বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"বলিস্ কি রে ?"

জেলে। আর বলি কি, ঠাকুর? তুমি দিন দেখ্‌তে জান্‌লে তিন তিনটি মেয়ে কাঁচারাড়ী হ'য়ে যায়? বাড়ীতে নূতন কুটুম্ব আছে। আজ্ঞা কর ঠাকুর আমি এখন বাড়ী যাই।

বাচস্পতি মহাশয় "একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া একখানি পুরাতন জীর্ণ কাপড়ে বাঁধা বস্তানি টানিয়া আনিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েক খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন; কাগজগুলি ক্রমে ক্রমে পাঠ করিলেন। সেগুলিতে তাঁহার বিধবা কন্যা তিনটির জন্মপত্রিকা ও বিবাহের তারিখ লেখা ছিল। তা'রপর আর একখানা প্রাচীন পুঁথি টানিয়া আনিয়া বাঁধা নেকড়া খুলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন ও বিবাহের তারিখগুলি ও জন্মপত্রিকাগুলির সঙ্গে মিলাইয়া বারংবার বিচার করিয়া হঠাৎ কাগজপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং জেলেকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন—"তুই, ঠিক ব'লেছিস্, ঠিক ধ'রেছিস্? আমি দিন দেখ্‌তে জানি না রে। আজও আমার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই হয় নি রে। আমি ভুল দিন ক'রে তিনটি মেয়েরই বিবাহ দিয়েছি, তিনটি দিনেই অকাট্য বৈধব্য দোষ! এতদিন অকারণ ভগবানের উপর দোষারোপ ক'রেছি। তুই জেলে বটে, কিন্তু, আজ তুই আমাকে জ্ঞান দিলি রে।"

ধীবর সজল-নেত্রে বিদ্যা-বাচস্পতির পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীনলিনীরঞ্জন কৃতিভূষণ

মসী ও লেখনী

মসী বলে—"লো লেখনি! বৃথা শ্রম তোর,
বৃথা তোর জন্ম ভাবি' ঝরে আঁখি-লোর,
কালের অনন্তপটে শুধু মম ঠাঁই।"
লেখনী বলিছে—"আহা গুণের বালাই!
ফুটিত কি তব রূপ আমার বিহনে?
আমারি পরশে তব বিকাশ ভুবনে!"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বেদান্তশাস্ত্রী

কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী

অনেকেই যে মোটরগাড়ী, মোটরবাস্, মোটরলরী প্রভৃতি দেখেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ সকল গাড়ী যে একমাত্র "পেট্রোল" (Petrol) অর্থাৎ একপ্রকার খনিজ তেল দিয়েই চালানো হয়, সেকথাও সকলেরই খুব সম্ভব জানা আছে। কিন্তু আজকাল একপ্রকার মোটরগাড়ী তৈরী হ'য়েছে—যেগুলি চালাতে হ'লে পেট্রোলের প্রয়োজন হয় না। প্রথমতঃ ইহাতে একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'লেও বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল অনেক রকম অসম্ভবও সম্ভবপর হচ্ছে। এই নূতন রকমের মোটরগাড়ীও সেই অসম্ভবের মধ্যে একটি। এইপ্রকার মোটরগাড়ী, কয়লা অথবা ধূমবিহীন পাথুরে কয়লায় চালানো হয়। কাঠকয়লা বা কয়লার আগুন হ'তে মোটরের এঞ্জিন গরম হয় এবং তা'তেই গাড়ী চলে। কিন্তু যে রকম কয়লাই ব্যবহার করা যাক্ না কেন, সেই কয়লার আগুনে ধোঁয়া হ'লে চল্‌বে না। সেই জন্য কাঠকয়লা এবং 'কোক্' অথবা একরকম ধূমহীন পাথুরে কয়লাই এই মোটরগাড়ী চালানোর পক্ষে উপযুক্ত।

কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী দেখ্‌তে ঠিক পেট্রোল-চালিত মোটরগাড়ীরই মত; কিন্তু ভিতরের কল-কব্জা পেট্রোল-মোটরের তুলনায় অন্য রকমের। পেট্রোল-মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীতে পূর্ব্বে একপ্রকার বিশ্রী দুর্গন্ধ বা'র হ'ত, কিন্তু যন্ত্রপাতির অদল-বদল করাতে এখন সেই দুর্গন্ধ আর পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও ইটালীতে আজকাল যে সকল কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে সেগুলি ঠিক পেট্রোল-মোটরগাড়ীরই মত। এইপ্রকার মোটরগাড়ী ইউরোপের অনেক দেশেই ব্যবহার করা হচ্ছে। একমাত্র জার্ম্মানিতেই কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী প্রায় ২০০০ চল্‌ছে। সেই সকল মোটরগাড়ীতে পেট্রোল-মটরগাড়ীর তুলনায় বিশেষ কোনই অসুবিধা বোধ হয় না।

এইপ্রকার মোটরগাড়ী প্রস্তুত হওয়াতে যে-সকল দেশে পেট্রোল একেবারেই পাওয়া যায় না অথবা সামান্যই পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে মোটরগাড়ী চালানো এখন খুবই সুবিধাজনক হ'য়েছে। ইউরোপের ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ইটালী প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশগুলিতে পেট্রোল নাই বল্‌লেই হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সকল দেশে মোটরগাড়ী চালানোর উপযোগী যথেষ্টরকম পেট্রোল পাওয়ার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর

ক'রে থাক্‌তে হ'ত। কিন্তু কয়লা-চালিত নূতন মোটরগাড়ীর সৃষ্টি হওয়াতে এখন তথায় অনেক সুবিধা হ'য়েছে।

পেট্রোল-চালিত মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী চালানোর খরচও অনেক কম। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, এক গ্যালন পেট্রোলে একটি গাড়ী যত মাইল যেতে পারে, একটি নবাবিষ্কৃত মোটরগাড়ী সাড়ে সাত সের কাঠকয়লাতে তত মাইল পথ যেতে পারে। তা' হ'লে সাড়ে সাত সের কাঠকয়লা এক গ্যালন পেট্রোলের সমান কাজ করে বলা যেতে পারে। খনি হ'তে তোলা, এক স্থান হ'তে অন্য

কয়লা-চালিত মোটরগাড়ী

স্থানে নিয়ে যাওয়া, দোকানীদিগের কমিশনপ্রভৃতি খরচ দেওয়ার পরে এক গ্যালন পেট্রোলের দাম পড়ে অন্ততঃ ছয় আনা ; কিন্তু সাড়ে সাত সের কাঠকয়লা প্রস্তুত ক'রে, এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, কমিশন প্রভৃতি দেওয়ার পরে তা'র দাম হয় বড় জোর তিন আনা। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, কাঠকয়লা-চালিত নূতন মোটরগাড়ী ব্যবহার কর্‌লে—পেট্রোল-মোটরগাড়ী চালানোর খরচ হ'তে অর্দ্ধেক খরচে কাজ হ'য়ে যায়। এই জন্য ইউরোপের অনেক স্থানেই আজকাল পেট্রোল-চালিত মোটরগাড়ীর পরিবর্ত্তে কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী ব্যবহার করার চেষ্টা চল্‌ছে।

ভারতবর্ষে এখনও কেবলমাত্র পেট্রোল-মোটরগাড়ীরই ব্যবহার হচ্ছে কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ী ব্যবহার করা হয় না। ভারতে পেট্রোল কেবলমাত্র আসাম এবং পাঞ্জাব প্রদেশেই পাওয়া যায়, তা'ও আবার অতি সামান্য। ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী

চালানোর জন্য প্রতি বছর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, রুমানিয়া, পারস্য এবং ব্রহ্মদেশ হ'তে আট কোটি গ্যালন পেট্রোল আমদানী করা হয়। উহার মূল্য বাবদ কোটি কোটি টাকা বিদেশে চ'লে যায়।

পেট্রোল-চালিত মোটরগাড়ীর তুলনায় কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীর দাম অনেক বেশী। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, একটি পেট্রোল-মোটরলরী প্রস্তুত করতে যত খরচ পড়ে, ঠিক সেই রকম একটি কয়লা-চালিত মোটরলরী তৈরী করতে প্রায় ২০০০৲ টাকা বেশী খরচ লাগে। বিশেষতঃ এখনও মোটরগাড়ী চালানোর উপযোগী কাঠকয়লা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যায় না। কাঠকয়লা-চালিত মোটরগাড়ীর দাম আরও সস্তা হ'লে এবং ঐ গাড়ী চালানোর উপযোগী কাঠকয়লা যথেষ্ট পাওয়া গেলে এদেশেও নূতন ধরণের মোটরগাড়ী চলতে পারে। তা' হ'লে বহুলোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'তে পারবে।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম্. এ., বি. এস্-সি., বি-কম্.

ক্যাপ্টেন কুক

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মানুষের অজ্ঞাত স্থান নাই বলিলেও চলে। জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সাগরসমূহের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছে। যে সকল মহাপ্রাণ পুরুষের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীর এক অংশের সহিত অন্য অংশের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহাদের মধ্যে মার্কো পোলো, কোলাম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ম্যাগিলন, ক্যাপ্টেন কুক, ডাঃ লিভিংষ্টোন প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যাপ্টেন কুকের অসমসাহসিক কার্য্যাবলীর কথা এখানে বলা হইতেছে।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কসায়ারে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে কুকের জন্ম হয়।

কুকের বয়স যখন তের বৎসর—তখন তিনি এক ব্যবসায়ীর দোকানে সামান্য চাকুরি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি হুইট্‌বি বন্দরে চলিয়া যান এবং এক জাহাজে নাবিকের কাজ গ্রহণ করেন। সেই জাহাজ কয়লা বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডের বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত করিত। ঐ জাহাজে থাকিয়া দেশবিদেশে যাওয়ার এবং জাহাজের কাজকর্ম্ম শিখিবার তাঁহার সুবিধা হয়। ক্রমে কাজের অভিজ্ঞতা দেখিয়া জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন।

সেই সময় ক্যানাডা দেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। 'সেণ্টলরেন্স' নামে সেই দেশে একটা নদী আছে। সেই নদীর জলের গভীরতা মাপিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য ইংরেজদের পক্ষ হইতে কুক্‌কে প্রেরণ করা হয়। অতিশয় সাহস ও দক্ষতার সহিত কুক্ ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি ক্যানাডার উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত লাব্রাডর উপকূল ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড

ক্যাপ্টেন কুক্

দ্বীপ জরীপ করিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভকরেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে "রয়েল সোসাইটী" নামে পণ্ডিতগণের একটি সভা আছে। উক্ত সোসাইটী সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপে একটি অভিযান পাঠান স্থির করেন। সোসাইটী কুক্‌কেই মনোনীত

করিলেন। কুকের বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। তিনি মহা উৎসাহের সহিত সেই পদ গ্রহণ করিলেন। যে জাহাজখানা তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার জন্য লওয়া হইল, উহার নাম "এন্‌ডেভার"।

প্রথম যাত্রা—১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের প্লিমাউথ বন্দর হইতে "এন্‌ডেভার" যাত্রা করিল। আট্‌লান্টিক মহাসাগর পার হইয়া জাহাজ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের অন্তর্গত রিও-ডি-জেনিরো বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে দক্ষিণদিকে চলিতে চলিতে জাহাজ হর্ণ অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী হইল। ঐস্থান বড় ভীষণ। সেখানে যেমন ভীষণ শীত—তেমনি ভীষণ ঝড়—আর সমুদ্রে বিরাট ঢেউ। তাহা দেখিয়াও কুক্ মাত্রই দমিলেন না। তিনি হর্ণ অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের
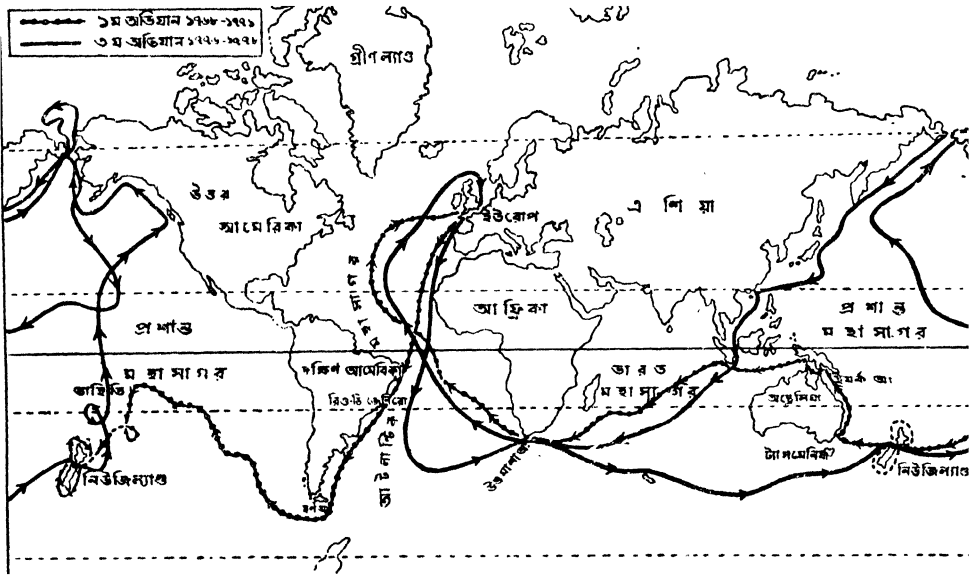
ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণপথের মানচিত্র

বুকে অবস্থিত 'তাহিতি' দ্বীপে গিয়া নঙ্গর করিলেন। সেই দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে কুকের দলের লোকের ক্রমে বন্ধুত্ব হইয়া গেল। কয়েক মাস তাহিতি দ্বীপে থাকিয়া কুক্ জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধীয় কাজ শেষ করিলেন এবং পরে সেই দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। রয়েল সোসাইটীর নামের অনুকরণে তিনি সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন "সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ"।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নিউজিল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাহার প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে হল্যাণ্ড দেশীয় 'ট্যাসমান' নামক একজন নাবিক এই দ্বীপটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিউজিল্যাণ্ড

দুইটি বড় বড় দ্বীপের সমষ্টি, এবং এই দুই দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি অপ্রশস্ত প্রণালী আছে। কুকের নামানুসারে ঐ দ্বীপের মধ্যস্থ প্রণালীটির নাম রাখা হয় 'কুক্ প্রণালী'। নিউজিল্যাণ্ডে পদার্পণ করামাত্র ঐ দেশের

একদল মেওরী

অধিবাসীরা কুকের দলকে আক্রমণ করে। এই দেশের অধিবাসীরা 'মেওরী' নামে পরিচিত। তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও দুর্দ্ধর্ষ জাতি ছিল।

নিউজিল্যাণ্ড হইতে কুক্ অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে রওনা হন। ইহার পূর্ব্বে স্পেন্ ও পর্ত্তুগালের লোকেরা উহার পশ্চিম উপকূলে গিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ঐ দেশে গিয়াছিল, কিন্তু সেই দেশের বিশেষ বিবরণ তাহারা সংগ্রহ করে নাই। কুক্ সেই দেশে অবতরণ করিয়া ক্যাঙ্গারু নামক প্রাণী দেখিতে পান। তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে এই প্রাণীর বিবরণ প্রকাশ করেন। এই অদ্ভুত প্রাণী লাফাইয়া লাফাইয়া চলে—
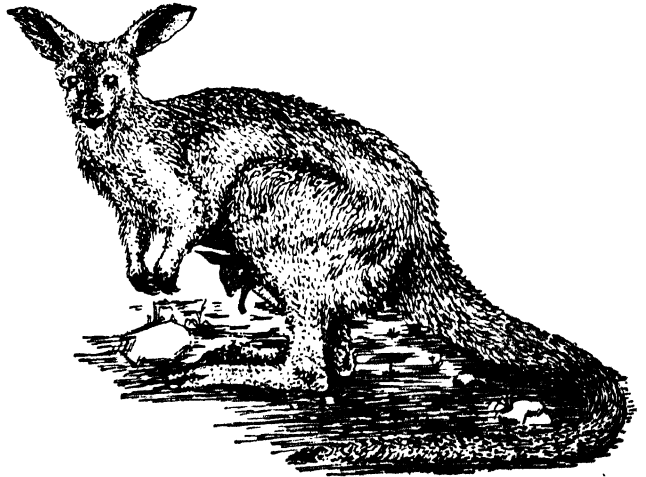
ক্যাঙ্গারু

ইহাদের পিছনের পা লম্বা, সামনের পা হাতের মত ছোট। ইহাদের বুকের পাশে একটা থলে আছে, এই থলিতে ছানাগুলি পুরিয়া রাখে।

কুক্ নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী 'টরেস্ প্রণালীতে' যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশে নামিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেখান হইতে রওনা হইয়া তিনি যাভাদ্বীপের প্রধান নগর 'ব্যাটাভিয়াতে' পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করে। ইহার পর ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, আফ্রিকার দক্ষিণভাগ ঘুরিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া লোক অবাক্ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে ডাকাইয়া নিয়া সকল কাহিনী শুনিলেন।

দ্বিতীয় যাত্রা—বহু প্রাচীনকাল হইতেই লোকের বিশ্বাস যে, মেরুর কাছে এমন সব দেশ আছে, যেখানে অপর্য্যাপ্ত সোনা পাওয়া যায়। একবার দেশ আবিষ্কারে সফলতা লাভ করিয়া, নানা দেশ আবিষ্কায় করিবার জন্য কুকের একটা নেশা ধরিয়া গিয়াছিল। তিনি দেশে ফিরিয়া আবার সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; এবার দুইখানা জাহাজ ও দুইশত সঙ্গী লইয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সেই সোনার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। তিনি দক্ষিণদিকে জাহাজ চালাইলেন। আফ্রিকার দক্ষিণভাগ ছাড়াইয়া কিছুদূর যাইতেই তিনি এমন জায়গায় যাইয়া পড়িলেন—যেখানে শুধু বরফ ছাড়া আর কিছুই নাই। বরফের উপর দিয়া ত আর জাহাজ চলিতে পারে না। সুতরাং জাহাজের গতি ফিরাইতে হইল। কিন্তু তিনি চেষ্টা ছাড়িলেন না; প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরিয়া কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন। পরে আবার মেরুর দিকে জাহাজ চালাইলেন, কিন্তু সফলকাম হইলেন না। তিনি মেরুর যতটা সন্নিকটে গিয়াছিলেন, এত সন্নিকটে পূর্ব্বে আর কেহই যাইতে পারে নাই। তিন বৎসর সাগরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়াও তিনি "সোনার দেশ" মেরুর কোন সন্ধানই পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিযানের ফলে অনেক নূতন দ্বীপ ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

তৃতীয় যাত্রা—আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল—কিন্তু এই পথ অতি দীর্ঘ এবং যাতায়াতে বিপদও অনেক। তখন ইংলণ্ডের লোকেরা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতে পৌঁছিবার একটা সহজ পথ আবিষ্কার করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাফিন্ উপসাগর ও ক্যানাডার উত্তর দিক দিয়া যদি কেহ কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

কুক্ ঘোষণা শুনিয়া ভারি আনন্দিত হইলেন এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। প্রথমেই আট্লাণ্টিক মহাসাগর হইতে চেষ্টা আরম্ভ না করিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া বেরিং প্রণালীর উপর দিয়া আট্লাণ্টিক মহাসাগরে আসিয়া পৌঁছিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি প্রথমতঃ আফ্রিকার দক্ষিণদিক অতিক্রম করিয়া ট্যাসমানিয়াতে পৌঁছিলেন; পরে নিউজিল্যাণ্ড হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভাসিয়া পড়িলেন, এবং ক্রমাগত কয়েক মাস প্রশান্ত মহাসাগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কতকগুলি দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন। মাজিয়া, পামারষ্টন, ওয়াটিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এই সময়ে আবিষ্কৃত

হয়। পরে এই সকল দ্বীপ একত্র মিলাইয়া 'কুক্ দ্বীপপুঞ্জ' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত তাহিতি দ্বীপপুঞ্জেও একবার গেলেন। ইহার পর উত্তরদিকে গিয়া তিনি একটি দ্বীপপুঞ্জের সাক্ষাৎ পাইলেন। এই অভিযান লর্ড স্যাণ্ডউইচের উৎসাহেই প্রেরিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম 'স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপপুঞ্জ' রাখিলেন।

ইহার পর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল এবং আর্কটিক সমুদ্র দিয়া পূর্ব্বদিকে যাওয়ার কোন পথ আছে কিনা, সেই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না; বিরাট তুষারের স্তূপ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কুক্ জাহাজের গতি ফিরাইলেন। এদিকে গ্রীষ্মকালও শেষ হইয়া শীত আসিয়া পড়িতেছিল। কাজেই চেষ্টা শেষ করিয়া তাঁহাকে আবার পেছনে ফিরিতে হইল। জাহাজ আসিয়া স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপপুঞ্জের 'হাওয়াই' দ্বীপে ভিড়িল।

জাহাজ হইতে সাহেবেরা তীরে নামিলে ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা সাহেবদিগকে আক্রমণ করিল। কুক্ ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী তীরে দাঁড়াইয়া গুলি ছুঁড়িতেছিলেন, এমন সময় একবার তিনি পেছন ফিরিয়া তাকাইতেই একজন অসভ্য ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে ছুরি বসাইয়া দিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপে বিদেশে কর্ম্মবীর কুক্ প্রাণ হারাইলেন।

কুক্ মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি মানবের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মানুষ তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

কর্ত্তব্য

ঈশ্বরে বাসগো ভাল—
মন, প্রাণ, আত্মা, শক্তি করিয়া প্রদান,
আত্মজ্ঞান কর পড়সীরে,
হও সাধু সুবিশ্বাসী দয়ালু মহান।
সকলের সনে কর ব্যবহার
তোমার অন্তর যাহা গো চায়,—
যাহাতে ব্যথিত তোমার অন্তর—
অন্য কেউ যেন তাহা না পায়।

শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়

পাটলিপুত্রের পথে

(ভ্রমণ-কাহিনী)

পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে জল-বুদ্বুদের মতই সে বাসনা মনে একবার ফাঁপিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে বিলীন হইত। হঠাৎ একদিন আমার বিষাদ-মাখা হৃদয়-গগনের সকল মেঘ সরিয়া গেল; তাহা যেন সৌভাগ্য-রবির বিমল কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—মন অপার আনন্দে আপন-হারা হইয়া পড়িল। আমার ছোট ভাইটির তখন ভীষণ অসুখ। 'রেমিটেণ্ট্ ফিভার'—১০৫° পর্য্যন্ত জ্বর, কিছুতেই আর বন্ধ হয় না দেখিয়া তাহাকে বিহার-প্রদেশের রাজধানী—'নিউ-ক্যাপিটেল' বা গর্দ্দানিবাগে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। নানা-অশান্তির মধ্যেই যাত্রার আয়োজন সমাধা হইল।

আমরা সকাল নয়টার ট্রেনে ই. বি. রেল-পথের রাণাঘাট-লালগোলা শাখাস্থিত বেলডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে বহরমপুরে রওনা হইলাম। ট্রেনে উঠিয়াই মনের পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম। গাছপালা, ডোবা, পুষ্করিণী, বাগান-বন পিছনে ফেলিয়া একটির পর একটি করিয়া ষ্টেশন পার হইয়া, কিছুক্ষণ পরেই 'বহরমপুর-কোর্ট' ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল। সেই পুরাতন 'পান-বিড়ি-সিগারেট্' হাঁকও শোনা গেল। কত মুটে-মজুর ছুটিতেছে—ষ্টেশনের ফটকে যাত্রীদের ভিড় ও টিকিট্ দিয়া একে একে বাহির হইবার আয়োজন, দেখিয়া মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! আমরাও ট্রেন হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ী পোঁছিলাম। সেখানে অনেক দিন পরে জ্যেঠা-মশাই ও জ্যেঠ্তুতো ভাই-বোনদের দেখিতে পাইয়া যেন আনন্দে দিশাহারা হইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য, রাত্রি-জাগরণ ত হইবেই, কাজেই কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া লওয়া আবশ্যক। রাত্রি দুইটার সময় আবার আমাদের ট্রেন ছাড়িবে।

রাত্রি ১১টার সময় রওনা হইলাম, বহরমপুরের সুবিখ্যাত 'রাধার-ঘাট' নামক খেয়াঘাটে ভাগীরথী পার হইলাম। আমরা যখন ঘাটে পোঁছিলাম, তখন বাবা সকলের মাথায় ভাগীরথীর পূত-সলিল-বিন্দু বর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিশু-চিত্ত যেন মুগ্ধ হইয়া গেল;—ভক্তির এক অভিনব স্রোত যেন ক্ষুদ্র ভাগীরথীর মূর্ত্তিতে

আমার মনের কন্দরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখে কোন কথা নাই, অথচ বুকের মধ্যে বিদ্যুতের খেলা অনুভব করিলাম। আমার কর-দ্বয় যেন আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া ললাটে সংলগ্ন হইল। ভাগীরথীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম; ছোট বোনটিও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। পরপারে ঘোড়ার গাড়ী ধরিয়া আমরা মিনিট-কুড়ি মধ্যেই 'খাগড়া-ঘাট রোড্' ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

ট্রেনের তখনও অনেক দেরী। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইলে নিশ্চয় বিরক্তি ধরিয়া যাইত। কিন্তু মা ও বাবার সংসর্গের জন্যও বটে এবং রাত্রিকালে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ফাঁকা-মাঠের দৃশ্য দেখিয়াও বটে, কোনরূপ বিরক্তি আসে নাই। তা-ছাড়া গঙ্গার ঘাট হইতেই মনে কেমন যেন তোল-পাড় চলিতেছিল। নানা আলাপের মধ্যেই সেদিন 'গঙ্গা', 'ভাগীরথী' ও 'নদী' এই কথাগুলির অর্থের তফাৎ সর্ব্ব-প্রথম শিখিলাম। আমাদের পাটনা জংশনের টিকিট করা হইয়াছিল। যথাসময়ে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী এখানে বেশীক্ষণ থামে না; তাই তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র উঠাইয়া ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেন ছাড়িল। ভোঁস্-ভোঁস্ শব্দে 'যন্ত্রদানব' ছুটিতে লাগিল। আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর, বারহারোয়া, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টেশন পর-পর পিছনে ফেলিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন কিউল ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা প্রায় ১২টা।

আমরা ব্যস্ত হইয়া মুটে ডাকিতে লাগিলাম, কারণ কিউলে নামিয়া গাড়ী-বদল করিতে হইবে। কিউলে পাটনার ট্রেনের জন্য আমাদিগকে প্রায় দেড় ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তবে, একটা সুবিধার কথা, কিউল ষ্টেশনে যাত্রীর ভিড় লাগিয়াই থাকে; অল্প পরে-পরেই এক একখানি ট্রেন আসে ও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে। অন্য অনেক ষ্টেশনের মতই 'পান-বিড়ি-সিগারেট'-ওয়ালার মিঠে-কড়া চীৎকারে, 'চা ও মিঠাই'-ভেণ্ডারের এবং 'গোস্ত্-রোটি'-ওয়ালার সরস গলা-বাজিতে, ট্রেনের কড়ি-কোমল বাঁশীর আওয়াজে এবং মালপত্রের মল্ল-রণের ধ্বনিতে, শুধু প্লাট্‌ফরম্ নয়—সমগ্র ষ্টেশনই সদা-মুখরিত। সেই সব সজীব দৃশ্য ও কোলাহলের মধ্যে একখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিয়া আমরা সানন্দে সময় কাটাইতেছিলাম। ট্রেনে বসিয়া আমার খাইতে ইচ্ছা করে নাই, এখনও করে না;—ইহার কারণ অন্য কিছু নয়, বহু স্থানের বহু লোক যাইতেছে, তাহারা আমার সমবয়স্কও নয়, পরিচিতও নয়; সে সমস্ত লোকের সম্মুখে খাওয়াটাই যেন আমার মনে কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ আনিয়া দেয়,

যেন কি একটা অভদ্রতার অভিনয় বলিয়া সেটাকে বিবেচনা করি। যাহা হউক পেটে যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহার জোরে খাবারের প্রতি (বাড়ীর তৈয়ারী) 'সুবিচার' করিতে সময় বেশী লাগিল না। খাওয়ার পর ছোট বোন্ রমাকে লইয়া প্লাটফরমে পায়চারি করিতে লাগিলাম। চারিদিকে দেখিবার মত যাহা কিছু, সমস্তই দেখিয়া ও রমাকে দেখাইয়া ফিরিয়া আসিলে বাবা ও মা উভয়েই আমাদিগকে রৌদ্রে না বেড়াইয়া স্থির হইয়া বসিতে বলিলেন।

তাঁহারা পান খাইতেছিলেন। আমারও একটি পান খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় মাকে সন্তর্পণে তাহা জানাইলাম। সচরাচর পানের ভক্ত নই, বা সেজন্য 'বায়না'-ধরার অপরাধও করি না; কাজেই মা বিনা-আপত্তিতে আমার 'সখ' মিটাইলেন। মায়ের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরপূর হইল; কিন্তু তখন তাহা প্রকাশ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না।

অনতিবিলম্বে আমাদের ট্রেন আসিল। গাড়ীকে কিউলে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়াইতে হইবে। ট্রেনে উঠিয়া ষ্টেশন ও নিকটবর্ত্তী স্থানের এবং মুক্ত প্রান্তরের দৃশ্য পুনরায় দেখিতে লাগিলাম। মনে ভ্রমণ-জনিত অপার আনন্দ; ভাইটির অসুখের কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলাম! আমার মনে এক একবার প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, "আমরা কি সত্যই রেল-গাড়ীর যাত্রী, না, একখানি আনন্দ-যানে চড়িয়া 'মজার-দেশ' পাটনায় চলিয়াছি ?"

এইবার মোকামা-ঘাটের মনোরম দৃশ্য দেখিবার পালা! সেকথা শুনিবা-মাত্র আমার কৌতূহল ও আনন্দ যেন সত্যই সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিল। এখানকার শুভ্র-সলিলা জাহ্নবীর তরঙ্গায়িত বক্ষের মাধুরী-চ্ছটা, সেই অনুপম দিব্য লাবণ্যের আকস্মিক ঝলক চোখে পড়িবামাত্রই প্রাণে যেন ধাঁধা লাগিল, মন যেন ছুটিয়া এক অজানা জগতে পৌঁছিবার জন্য পাগল হইল। মনের সে অবস্থা আজ ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমার নয়ন-যুগল অনিমেষে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা প্রাণে বিভোর হইল। ষ্টেশনের তেমন জাঁক-জমক নাই! কিন্তু মোকামা-ঘাটের গঙ্গার দৃশ্য ভুলিবার নয়। তরঙ্গসত্ত্বেও জল অতি নির্ম্মল;—মনে হইল, এ গঙ্গার কাছে কলিকাতার গঙ্গার তুলনাই হইতে পারে না। দেখিলাম মোকামার পরপারে যাইবার জন্য অসংখ্য দরিদ্র হিন্দুস্থানী যাত্রী লইয়া একখানা ষ্টীমার ছাড়িল। "গঙ্গা মায়ি কি জয়" ধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষ প্লাবিত হইয়া পড়িল।

এদিকে ষ্টেশনের কোলাহল পেছনে ফেলিয়া ভোঁস্-ভোঁস্ শব্দে, চিরপরিচিত পথে ট্রেনও ছুটিতে লাগিল। এ যেন তা'র বাহিরের প্রকৃতির সহিত 'আড়ি' করিয়া চলা। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা 'গুল্‌জারবাগে' পৌঁছিলাম। তখন আনন্দে আমার বুক নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ, তাহার পর পাটনা-সিটি পার হইয়াই পরের ষ্টেশন পাটনা জংশনে আমাদিগকে নামিতে হইবে।

নীল ও শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত আমাদের ট্রেনখানির চমৎকার চেহারা দেখিবার জিনিস! কিন্তু নিমেষেই দেখা শেষ করিতে হইল! অদূরে বড়মামা আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। ষ্টেশনে তাঁহার স্নিগ্ধ-নীরব অথচ উৎসুকপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া কি যে আনন্দ হইয়াছিল—তাহা আর বলিতে পারি না। সে স্মৃতিটুকু বড় মধুর। পাটনা জংশন হইতে ট্যাক্সি করিয়া মামার বাড়ী পৌঁছিলাম। সেখানে দিদিমা, দাদামশাই এবং মামা ও মাসীমাদের পাইয়া মনে আনন্দ আর ধরে না! তাঁহাদের পদধূলি মাথায় লইয়া এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের শ্রান্তি নিমেষে যেন কোথায় পলাইয়া গেল!

একটি দরকারী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সাহেবগঞ্জ হইতে কিউলের পথে জামালপুরের 'টানেল্' পড়ে। আমাদের ট্রেন যখন সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হঠাৎ সব অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। সুড়ঙ্গের অপূর্ব্ব দৃশ্য একসঙ্গেই ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল ও আনন্দের এক অপরূপ 'রঙ্গ' বা হুড়োহুড়ি খেলার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া সকলের মুখের পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার বোনটি ত সেই আজ্‌গুবি দৃশ্যের ফাঁপরে পড়িয়া কান্নাই সুরু করিয়াছিল। উপযুক্ত কথায় তাহার 'সানাই' শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতেই গাড়ী আলোর বুকে পড়িয়া ছুটিতে লাগিল। আমরা ভাই-বোনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! আঁধারের বাহিরের সেই আলো সত্য সত্যই বেশ উপভোগ করিয়াছিলাম। মনে হইল, বাস্তবিক আলোই 'আঁধার ব্যাধির' ঔষধ। টানেল্ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে শুনিতে চলিলাম, মাঝে মাঝে সঙ্গত-অসঙ্গত নানা প্রশ্নও যে তুলি নাই এমন নয়। তাহার স্মৃতি আজও আমার কাছে গুরুতর বস্তু।

'বক্তিয়ারপুর' জংশনের কথা বলা হয় নাই। সেখানে নামিয়া অনেকে 'রাজগৃহ' বা 'রাজগীর' নামক স্থানের জরাসন্ধ-ভবন ও জগদ্বিখ্যাত 'নালন্দা' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যায়। আমার সে সাধ থাকিলেও তাহা পূর্ণ হয় নাই। ইতিহাসে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী—পৌরাণিক পাটলিপুত্র ধামের মৃত্তিকা আমার নিকট চির-

পবিত্র। আমরা বীরভূম জেলার অন্তর্গত সুদূর বঙ্গ-পল্লী 'বিষ্ণুপুর' গ্রামের লোক হইলেও আমি পাটনায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। পাটনার গোল-ঘর, লন্, দানাপুরের সেনা-নিবাস, পাটনার হাইকোর্ট, জেনেরল্ পোষ্ট-অফিস, হার্ডিঞ্জ-পার্ক, সেক্রেটারিয়েটের টাওয়ার প্রভৃতি অনেক বার দেখিয়াছি। সেই পার্কের নিকট হইতে কত 'ইউক্যালিপ্‌টাস্' গাছের পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়াছি! 'গোল-ঘরের' সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া কত উঠিয়াছি, নামিয়াছি, কত আনন্দ ও ভয় পাইয়াছি। পাটনার ফল, জল ও ফসল অনেক দিন উপভোগ করিয়াছি। পাটনার স্মৃতি আমার নিকট মাতৃস্নেহের মতই অক্ষয়, অমূল্য ও চিরমধুময়!

তখন বয়স ছিল কম। তাই গো-অশ্ব-নৌ-মোটর-বাষ্প-যানের যোগে এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক অভিনব ও অলৌকিক মনে হইয়াছিল। অনেক দিন হইয়া গেল—কিন্তু রেলপথে এই দীর্ঘ ভ্রমণের সুখ-স্মৃতি এখনও মনের পটে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে। যখনই এই ভ্রমণকথা মনে পড়ে তখনই আনন্দের স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল প্রবাহে মন যেন একবার সাঁতার কাটিয়া লয়!

শ্রীনিমাইচাঁদ রায়

আকাশের ডাকে যারা হারাইল প্রাণ

পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, নক্ষত্র-খচিত আকাশ সুন্দর, মাতৃক্রোড়ে শিশু সুন্দর, ঊর্ম্মি-মুখর সাগর সুন্দর, গহন অরণ্য সুন্দর, কালবৈশাখীর নৃত্য সুন্দর, তুষার-মৌলি পর্ব্বত সুন্দর, গর্জ্জমান জলপ্রপাত সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুন্দর—মানুষের মত মানুষ।

কবি চণ্ডিদাসের কথায় 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ,—তাহার উপরে নাই'। সুতরাং জগতে মানুষের এমন একটা কিছু ক'রে যাওয়া কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। জগতের কল্যাণ হ'লেই কল্যাণ-কারী অমর হ'য়ে থাকেন।

এই প্রবন্ধে এমন কয়েকজন নরনারীর বিচিত্র কাহিনী সংক্ষেপে বল্‌ব—যাঁ'দের নাম বিমান-বিহারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাক্‌বে চিরদিন। জগতের কল্যাণার্থে তাঁরা নূতন কিছু আবিষ্কারের আশায় প্রকৃতির বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে শেষে মরণকে বরণ ক'রেছেন।

"বিদায় বন্ধুগণ—বিদায়। কিন্তু চিরবিদায় দিতে ভয়ে বুক যে কেঁপে উঠে। তোমাদের যাত্রা সফল হোক—শান্তিময় হোক—জয়-যুক্ত হোক—বিদায়।"

বিদায়-অভিনন্দনের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমান-এঞ্জিন ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠে। তারপর বেপরোয়া বিমান-চারী যন্ত্র-দানবের পাখা মেলে অজানার উদ্দেশে যাত্রা সুরু করেন।

প্রতিটি মুহূর্ত্তের সিঁড়ি বেয়ে দিনের পর দিন চ'লে যায়। আত্মীয়-বন্ধুগণ বুকভরা আশা ও আশঙ্কার সঙ্গে তাদের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে থাকে। কিন্তু কতযুগ কেটে যায়—তবু তাদের কোন সন্ধান মেলে না। সব হয় চুপ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত কত সাহসী, কত সুদর্শন নরনারী আকাশের ডাকে অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন চিরতরে, কে তা'র খোঁজ রাখে?

প্রিন্সেস্ লাওয়েনষ্টীন ওয়ার্থিস—কর্ণেল· এফ. এফ. মিন্‌চিন ও ক্যাপ্টেন লেলী হ্যামিল্টনের সঙ্গে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আট্‌লান্টিক পাড়ি দিবার কামনা বুকে নিয়ে যাত্রা কর্‌লেন আকাশ-পথে। নারী জাতির মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম আট্‌লান্টিক পার হ'বার গৌরবের আশায় তাঁর প্রিয় 'র‍্যাফেলের' পাখা উড়ালেন সুনীলের পানে সাতদিন পরে একটি চাকাকে ভেসে আস্‌তে দেখা গেল সাগরের বুকের উপর দিয়ে। সেটা নাকি র‍্যাফেলের শেষ চিহ্ন! পরে আর তাঁদের কোন বার্ত্তা পাওয়া যায় নি।

পরলোকগত লর্ড ইঞ্চকোপের কন্যা এলিস্‌ম্যাকে। এলিস্‌ম্যাকে বড় ঘরের মেয়ে। ইনি এবং ক্যাপ্টেন হিঞ্চ লিফ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'হেণ্ডারসন' নামক বিমানে চ'ড়ে আট্‌লান্টিক পার হ'তে গিয়ে নিরুদ্দেশ হ'ন। তাঁরা আর ফেরেন নি।

সুদূর নিস্তব্ধতার ডাকে পথ হারিয়েছেন অনেক নারী। মার্কিন নারী-বৈমানিক মিসেস্ গ্রেস্‌ন্ একদিন তিনজন সঙ্গী নিয়ে নিউইয়র্কের বুক হ'তে বিদায় নিলেন। তিনি আর ফির্‌তে পারেন নি।

নিউইয়র্ক হ'তে রোম যাত্রার পথে এডনা নিউকামার—ডাক্তার লিউপিচকুলি ও উইলিয়াম উনব্রিচের সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন সুনীল আকাশে, কিন্তু তাঁদের বার্ত্তা কারুর কানে এসে আর পৌছোয় নি।

মিল ড্রেট ডোরান্ন ছয়জন যাত্রিসহ কালিফোর্ণিয়া থেকে হনলুলু যাত্রার পথে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হারিয়ে গেলেন মেঘের দেশে। তাঁদের কোন সন্ধান আর পাওয়া যায় নি।

বিখ্যাত বৈমানিক বার্টহিঙ্কলার ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল বড় নম্র। চোখে মুখে ছিল তাঁর ঘন-বিষাদের ছায়া। দরিদ্র বার্টহিঙ্কলার ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার বিমান রেকর্ড ভেঙ্গে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি হ'য়ে গেলেন মস্তবড় ধনী। কিন্তু আরও প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় তিনি কেপ অভিযানের পথে যাত্রা করেন। তাঁর বিমান ও দেহের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় আপেনাইনের গিরিসঙ্কটের মধ্যে।

মার্কিন বৈমানিক পলরেডফার্ন জর্জ্জিয়া থেকে রিউদা-জেনেরো যাত্রা-পথে হারিয়ে যান; আর তাঁকে পাওয়া যায় নি।

স্যার চার্লস্ কিংস্ ফোর্ড স্মিতের বীণা-ধ্বনি নীরবতা লাভ ক'রেছে অল্পদিন আগে। তিনি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার রেকর্ডের টানে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লিম্পন হ'তে যাত্রা ক'রে "আমি আর ফির্ব না—শুধ্ চল্ব এগিয়ে" ব'লে যখন চির-নীরবতার দেশে অন্তর্হিত হ'ন, তখন লিণ্ড্বার্গ বলেছিলেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈমানিকের আজ অবসান ঘট্ল।

ভাগ্যহীন ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্কাষ্টার একদিন কেপ অভিযানে যাত্রা সুরু কর্লেন সাহারার সীমাহীন বালুকাময় বুকের উপর দিয়ে। তাঁর বিমানের শেষ গর্জ্জন-ধ্বনি শোনা যায় সীমাহীন সাহারার বুকের উপর। তারপর আর তাঁকে খুজে পাওয়া যায় নি।

ক্যাপ্টেন নান্ গেসার, এম. কেলীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লাবুর্জেট হ'তে তাঁর বিমান 'হোয়াইট বার্ড' যোগে নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনিও আর প্রিয়জনের মুখচ্ছবি বা সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত দিন দেখ্তে পান নি।

খুব অল্পদিন হ'ল আমেরিকার মহিলা বৈমানিক মিস্ এমেলিয়া ইয়ারহার্ট প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পথ হারিয়েছেন। হাওল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট হ'তে তিনি শেষ বেতার পাঠান—"আর মাত্র আধঘণ্টা চল্বার মত পেট্রল আছে আমার সঙ্গে—স্থলভাগের কোন চিহ্ন চোখে পড়্ছে না।" তারপর ?—সব শেষ।

বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈমানিক মিঃ বি. কে. দাস ও ডি. কে. রায়—একজন পুরুষসঙ্গী (মিঃ পি. গুপ্ত) ও একজন ইউরোপীয় মহিলা সঙ্গিনী সহ দু'খানা বিমান যোগে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল আকাশের ডাকে সাড়া দেন। তাঁরা কিন্তু নিরুদ্দেশ হ'ন নি। একজনের বিমানের সঙ্গে আর একজনের বিমানের ধাক্কা লেগে চারজন আরোহীকেই শোচনীয়ভাবে মরণকে বরণ কর্তে হ'য়েছে। এ বিমান দুর্ঘটনা ভারতীয় বৈমানিকদের প্রথম দুর্ঘটনা।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান বিমান 'হিণ্ডেনবুর্গ' গত ৬ই মে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে, সে দুর্ঘটনায়ও লোকক্ষয় হ'য়েছে। উহা জগতের বৃহত্তম বিমান ছিল।

চির-নীরবতার দেশে যাঁরা হারিয়ে গেছেন তাঁরা তাঁদের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়ে আমাদিগকে মুগ্ধ ক'রেছেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হান্‌স্ বারট্রাম ও ক্লসম্যান 'আটলাণ্টেস' নামক সি-প্লেনে রাইনের তীর হ'তে ভারত-পথে যাত্রা করেন। রাত্রিতে ভুল ক'রে পথ হারিয়ে উঠ্‌লেন গিয়ে জন-মানব-হীন দেশে। তাঁরা পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন সভ্যজগতের সন্ধানে। এক সপ্তাহের উপর তাদের না জুট্‌ল জল, না জুট্‌ল খাবার। তৃষ্ণায় পাগল হ'য়ে অবশেষে তাঁরা সমুদ্রতীর আবিষ্কার কর্‌লেন; বন থেকে কাঠ কেটে নৌকো তৈরী ক'রে আবার ভাস্‌লেন সাগর-বুকে। কিন্তু এতেই তাঁদের দুঃখের অবসান হ'ল না। অনেক দিন পর ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে তাঁরা এ দেশে এলেন। হান্‌স্ বারট্রামের বাড়ী অষ্ট্রেলিয়ায়। কলকাতা হ'তে একদিন তিনি যাত্রা কর্‌লেন বিমানযোগে। প্রায় মাস দুই পর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল রেঙ্গুন থেকে দেড় শত মাইল দূরে!

এই রকমে বহু বৈমানিক অজানার সন্ধানে প্রাণ হারিয়েছেন। এই অল্পকালের সীমারেখার মধ্যে কত বীর কত বীরাঙ্গনা মেরুপ্রদেশে বরফের মাঝে,—সাহারার বালুকাময় বুকে,—দক্ষিণ আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে,—অষ্ট্রেলিয়ার জন-মানব-হীন উপকূলে মিলিয়ে গেছেন কে জানে? তবু বিমান-বিহারীদের প্রাণে নেই ভয়। তাঁদের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আকার বেড়ে চ'লেছে। তাঁরা শুধু চা'ন জগতে নূতন দেশ আবিষ্কার ক'রে জগতকে উন্নত কর্‌তে! মৃত্যুকে তাঁরা ছেলেখেলা মনে করেন! যাঁরা আকাশ-যাত্রা ক'রে ফেরেন নি তাঁদের উদ্ধারের জন্য কত আয়োজন হ'য়েছে, কত জাহাজ ঘুরে ঘুরে ম'রেছে—কিন্তু সব হ'য়েছে ব্যর্থ।

মাঝে মাঝে হয়ত বাতাসে ভেসে এসেছে তাঁদের করুণ স্বর। কত নরনারী তাঁদের প্রিয়জনদের বিদায়বাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ফিরে এসে সে বিদায়বাণীর সাড়া দেন নি।

অজানা পথে যাত্রা ক'রে যাঁরা পথ হারিয়েছেন অসীম তাঁদের সাহস—অপূর্ব্ব তাঁদের মরণ। মৃত্যুর সম্মুখে তাঁরা বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন শুধু জগতের কল্যাণে।

—মুজ্জাম্মিল হক

শীত

কন্ কন্ সন্ সন্ শীত আজ পড়্‌লো,
কুয়াসার আঁধিয়ার চারিদিক্ ভর্‌লো।
ভানুদাদা হ'লো হাঁদা লেপে মুখ ঢাক্‌লো,
শীতে তায় বুঝি হায় কম্পন জাগ্‌লো।
ঠক্ ঠক্ ধক্ ধক্ কেঁপে সবে মর্‌লো,
রোদ নাই কোথা যাই কি আপদ্ ধর্‌লো।
শীতে হায় প্রাণ যায় নিয়ে আয় অগ্নি,
বস্ ঘিরে অগ্নিরে সব ভাই ভগ্নী।
নদী-নীর বহে ধীর কল্লোল কম্‌লো,
পাখীকুলে গীতি ভুলে এক ঠাঁই জম্‌লো।
মনোলোভা শ্যামশোভা বনানীর ঘুচ্‌লো,
আস্‌মানে সবখানে ঘনরাশি মুছ্‌লো।
অলিকুলে কোলে তুলে নিতে গাঁদা ফুট্‌লো,
সরিষার ফুলে হার যেন গেঁথে উঠ্‌লো।
টোপা কুল বিলকুল গাছ ভ'রে পাক্‌লো—
ছুটে চলে যত ছেলে— বই খাতা থাক্‌লো।
হারুভায়া গাছে গিয়া রস পেড়ে আনে ঐ
ছেলেমেয়ে রস পিয়ে হাসে ক'রে হৈ হৈ।
নয়া গুড় ভুর্ ভুর্ বাস দেয় বেশ ভাই!
সব্‌বার চাখ্‌বার জাগ্‌লো যে সখ্ তাই!

শ্রীশচীকান্ত রায়

পূজার ছুটি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চিত্রায় ‘কপালকুণ্ডলা’ দেখিয়া ফিরিবার পথে অনু ভাবিতেছিল একটা পর্দার উপরে ছবিগুলা ঠিক জীবন্ত মানুষের মতই এ রকম চলাফেরা করে কেমন করিয়া? তাহাদের গ্রামে সেবার রথের মেলায় সে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়াছিল। কাঁচের প্লেটে রং-বেরঙের ছবি আঁকা। সেই ছবিগুলা আলোর সাম্‌নে ধরিলে পর্দার উপরে তাহার ছায়া পড়ে। কিন্তু সে ছায়া তো নড়া-চড়া করিতে পারে না। বায়োস্কোপের পর্দার আড়ালে কি তবে সত্যিকারের মানুষ থিয়েটারের মত সাজগোজ করিয়া অভিনয় করে? অনুর এই রকম সন্দেহ হইলেও সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। যদি তাহার অনুমান ভুলই হয়, তাহা হইলে তো সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিবে।

অনুর মনে চিন্তার আর বিরাম নাই। এদিকে দলের অন্যান্য সকলে আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছে—“সমুদ্রের দৃশ্যটা বেশ হ’য়েছে—বোধ হয় পুরীতে তোলা।” কাহারও মতে—“নবকুমারের ঢংটা যেন একটু সাহেবি ধরণের।” মীনু বলিল—“কাপালিকের পাঠটাই সব চেয়ে ভাল হ’য়েছে। কি মূর্ত্তি! মাগো, দেখলেই ভয় করে। যে সেজেছিল সে যদি আজ নিজে এসে তার ছবিখানা দেখত তো নিজের চেহারাই চিনতে পারত না।”

জামাই বাবু বলিলেন,—“আসতে পারলে হয়ত একদিন আসত। কিন্তু আসার যে আর উপায় নেই। ভদ্রলোক এখানে এত সুন্দর অভিনয় করলেন যে, তাই দেখে ইন্দ্রদেবের নজর পড়ল তাঁর উপর। হুকুম দিলেন চিত্রগুপ্তকে—মর্ত্ত্যের কাপালিককে হাজির কর স্বর্গে; আমার সভায় অভিনেতার অভাব। বাস্! অমনি মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়ে হাজির! সে তো আর যেমন তেমন দূত নয়। মনিবের হুকুম পালন না ক’রে সে কখনও ছাড়ে না।”

অভিনেতাটি মারা গিয়াছেন শুনিয়া কেহ দুঃখ করিল, আবার কেহ বা অজয়ের কথার ভঙ্গিতে হাসিয়া উঠিল। অনুর একটা সন্দেহের সমাধান হইয়া গেল। সে না জিজ্ঞাসা করিয়াও এটুকু বুঝিতে পারিল যে, সত্যই পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া কেহই হাত পা নাড়ে নাই। যে অনেক দিন আগে মারা গিয়াছে সে আজ আসিবে কেমন করিয়া? বায়োস্কোপটা তাহা হইলে আগে হইতে তোলা ছবি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ছবিই যদি হয় তো নড়ে কেমন করিয়া?

অনুর মামা সেদিন সঙ্গে ছিলেন না। তিনি থাকিলে সে তখনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত। আর কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিতে তার ভরসা হইল না।

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়া গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিতে আরও ঘণ্টা-খানিক কাটিয়া গেল। মামাবাবু ততক্ষণে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই অনুর প্রশ্ন অনুর মনেই রহিয়া গেল। বায়োস্কোপের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কার্ত্তিকের শেষ। শীতটা একটু পড়িয়াছে। মণ্টু, অনু ও মীনু তিনজনে মিলিয়া ছাদে বসিয়া বেগুনি ফুলুরি সহযোগে মুড়ির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে রোদ পোহাইতেছিল। এমন সময় অনুর মামা ছাদে উঠিয়া তাহাদের বৈঠকে যোগ দিলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই খুসী হইয়া উঠিল। সত্যই তাঁহাকে না পাইলে শিশুদের আসর তেমন জমে না।

"কি গো মা গিন্নি, কাল কিরকম বায়োস্কোপ দেখা হ'ল ?"—মীনুর বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মীনু বলিল,—"ভারি সুন্দর বাবা। উঃ সেই কাপালিকটার চেহারা কি ভীষণ! জামাইবাবু বললেন কাপালিকটা নাকি মারা গেছে।"

—"হ্যাঁ সে আর এ জগতে নেই সত্যি। কিন্তু বিজ্ঞানে তাকে অমর ক'রে রেখেছে। তার চেহারা, তার হাব-ভাব, তার চাল-চলন এসব আমরা কোন দিন ভুলব না। আজ থেকে দুশো বছর পরে যারা জন্মাবে তা'রাও বায়োস্কোপে তার ছবি দেখে বুঝবে এমনিধারা লোক একদিন এদেশে ছিল। আমাদের দেশে একদিন রাজত্ব করেছিলেন মহারাজ অশোক, ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন বুদ্ধদেব, তখন যদি এই বায়োস্কোপ যন্ত্র বা টকি বেরোত, তা হ'লে আজ আমরা ২৫০০ বছর পরেও তাঁদের চেহারা দেখতে পেতাম—তাঁদের কথা শুনতে পেতাম।"

—"বায়োস্কোপে ছবি না-ই বা তুললে, একটা ফোটোগ্রাফ তুলে রাখলেই তো হ'ত!" মণ্টু বলিয়া উঠিল।

—"ফোটোগ্রাফের যন্ত্রও কি তখন তৈরি হ'য়েছে? মাত্র একশো বছর হ'ল যন্ত্রের সাহায্যে লোকে ছবি তুলতে শিখেছে।"

—"তবে যে মামাবাবু আমাদের বইয়ে আকবর, ঔরংজেবের—এমন কি সীতা রাম ভীম অর্জ্জুনের পর্য্যন্ত ছবি আছে—সেগুলো কি তা হ'লে খাঁটি নয়?"

অনুর প্রশ্ন শুনিয়া প্রিয়ব্রতবাবু বলিলেন,—"ছবি দু রকম। এক রকম ছবি, শিল্পীরা যা রং দিয়ে তুলি দিয়ে এঁকে থাকেন। সে ছবি খুব প্রাচীনকালেও আঁকা হ'ত, এ যুগেও আঁকা হয়। এভাবের ছবি শিল্পীরা কোন কিছু দেখে আঁকেন, আবার নিজের মন থেকেও আঁকেন। কাজেই এগুলো ঠিক আসল জিনিসের নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি হয় না। তোমরা ইতিহাসের বা পুরাণের গল্পে যে সব ছবি দেখ—তার অধিকাংশই হ'চ্ছে এই ধরণের চিত্র। কিন্তু ফোটোগ্রাফে যে মানুষটির ছবি নেওয়া হয় তার খাঁটি রূপটি উঠে। এই ফোটোগ্রাফ বিজ্ঞানের এক মস্ত বড় দান। ফোটোগ্রাফ আগে হ'ল ব'লেই তো আজ তোমরা বায়োস্কোপ দেখতে পেলে!"

—"বায়োস্কোপ আর ফোটো কি এক জিনিস মামাবাবু? বায়োস্কোপের ছবি চলে, ফোটো তো চলে না?"

—"তফাৎ এই মাত্র! একটা চলে আর একটা চলে না। তা নইলে দুই-ই সমান। বায়োস্কোপের জন্যে ছবি তোলা হয় একটা লম্বা স্বচ্ছ ফিতার উপরে, একসঙ্গে অনেকগুলো ক'রে। ম্যাজিক লণ্ঠনের

মতই একটা যন্ত্র আছে। তার মুখে আলোর সামনে এই ফিতার একটি ছবি যদি ধ'রে রাখা হয় তো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতই ছবিটি স্থির হ'য়ে থাকবে—নড়বে না। কিন্তু যদি ফিতাটা একদিকে থেকে আর একদিকে টানি তা' হ'লে কি হবে ?"

—"তা হ'লে ছবিগুলো পর্দার উপর একটা একটা ক'রে দেখা যাবে।"

—"কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি টানলে ব্যাপার দাঁড়াবে অন্য রকম। আচ্ছা শোন, কথাটা বুঝিয়ে বলি। মোহনবাগানের গোষ্ঠপাল যখন হাইশুট করে—ও! অনু তো আবার গোষ্ঠপালকে দেখে নি।"

—"না মোহনবাগানের খেলা দেখি নি। কিন্তু আমাদের বামুনদীঘি হাইস্কুলের ছেলেরা ময়নাপাড়া স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সেদিন যে একটা ফুটবল ম্যাচ খেলেছিল—সেই ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের নিধিরাম যে একটা বল মারলে—উঃ কি উঁচু! ঠিক যেন তালগাছের সমান।"

—"দেখেছ তো! আচ্ছা মনে কর বলটা এক সেকেণ্ডে ৬০ হাত উঠল। ক্যামেরাতে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ বলটার ষোলখানা ছবি নেওয়া হ'ল। বলটাকে খেলোয়াড় যখন শুট করে তখন একটা, বলটা যখন চার হাত উপরে তখন আর একটা, আবার বলটা যখন আট হাত উপরে উঠেছে তখন আর একটা; এমনি ক'রে মোট ষোলটা ছবি পরের পর ফিতার গায়ে তোলা হ'ল। সেই ফিতাটা যদি আলোর সামনে ধ'রে এক সেকেণ্ডের মধ্যে টেনে নেওয়া যায় তা হ'লে পর্দার উপরে এক সেকেণ্ডে ষোলটা ছবি দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের মনে হবে যেন বলটা বোঁ ক'রে উপর দিকে উঠে গেল। আবার যদি খুব আস্তে আস্তে টানা যায় তা হ'লে দেখতে পাবে প্রথম ছবিতে খেলোয়াড় বলটা মারলে তারপর পর্দা হবে অন্ধকার। তারপর আবার দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাবে বলটা আর একটু উপরে উঠেছে। আবার—অন্ধকার। আবার আসবে তৃতীয় ছবি, আবার অন্ধকার।"

—"বায়োস্কোপে তো পর্দা কখনও অন্ধকার থাকে না মামাবাবু।"

—"সেই তো মজা! তুমি তো আমার দিকে চেয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কথা বলছ? এর মধ্যে কত হাজার বার—তোমার চোখের পলক পড়েছে।"

—"সত্যিই তো এতবার চোখ বন্ধ করেছি, কিন্তু দেখা তো একবারের জন্যেও বন্ধ হয় নি।"

—"কিন্তু সেদিন যখন তোমরা কানামাছি খেলছিলে, তোমার চোখে কাপড় বেঁধে মীনু যখন তোমার মাথায় টোকা মারছিল তখন তুমি ভুল ক'রে বার বার মণ্টুর নাম করছিলে।"

মীনু বলিয়া উঠিল,—"আবার দাদা যখন মারদিল তখন অনুদা ভাবলে আমি মেরেছি।"

"বারে! আমি কি ঐ কাপড়ের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম যে ঠিক ক'রে বলব। তাই আন্দাজে বলছিলাম যদি লেগে যায়।"—অনু বলিয়া উঠিল।

—"ঠিক কথা! কাপড়ের মধ্যে দিয়েও দেখা যায় না, আবার অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করলে ত দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে যদি খোলা যায় তা হ'লে আবার দেখার অসুবিধা হয় না। তাই একশ'বার চোখের পাতা ফেলেও আমরা দেখতে পাই।"

মণ্টু বলিল,—"কিন্তু বাবা বায়োস্কোপের পর্দাটা যে তুমি বললে সেকেণ্ডে ষোল বার ক'রে অন্ধকার হয়ে যায়, সে অন্ধকারটা আমাদের চোখে পড়ে না কেন?"

—"ঐ একই কারণে। অন্ধকার এত ঘন ঘন হয় এবং এত তাড়াতাড়ি অন্ধকারের জায়গায় আলো এসে পৌঁছে যে, সে অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। চোখ দুটো একটা আলোর কথা ভুলতে না ভুলতেই আর একটা আলো এসে পড়ে। ভগবান্ এমনি কৌশলে আমাদের চক্ষু গড়েছেন।"

সবাই বলিয়া উঠিল,—"সত্যি কি আশ্চর্য!"

মীনু কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ পাশের বাড়ীতে গ্রামোফনে বাজিয়া উঠিল—

"কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন"

গানটা মণ্টুর ভারি প্রিয়, তাই সে ধমক দিয়া মীনুকে থামাইয়া দিল।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

সাময়িকী

সাংহাই চীনদেশের একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। সংপ্রতি জাপানীরা ঐস্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু জাপানীদের গোলাগুলি ও বোমায় স্থানটার শ্রী-সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে ঐস্থানের লোকগুলির যে কিরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা কল্পনার অতীত। খবর আসিয়াছে যে—সাংহাই বন্দরে একটি দুটি নহে—চল্লিশ হাজার চীনা স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং শীতে দেহ ত্যাগ করিয়াছে! চীন ও জাপান উভয় দেশের লোকই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্মের একমাত্র কথা—"অহিংসাই পরমধর্ম্ম"।

* * * *

গুজরাটের কাছে বরোদা রাজ্য। তাহার অধিপতির উপাধি **গায়কোয়ার**। বর্ত্তমান মহারাজের নাম **সয়াজিরাও**। গত ৮ই পৌষ তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ দেখিতে গিয়াছিলেন। কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী মহারাজকে "ভূপতিচক্রবর্ত্তী" উপাধি দিয়াছেন। পণ্ডিতগণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে আবার গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতের

যাহা আদর্শ ছিল, তাহা আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় দেখিয়াছি—তথাকার নরনারী—বালকবালিকার পর্য্যন্ত—ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ আছে—কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা নাই।" অথচ ভারতবর্ষ ধর্ম্মভূমি নামে প্রসিদ্ধ!

*　　*　　*　　*

জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার জীবনের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ, তাহা বিজ্ঞান ও দেশের কল্যাণ-কল্পেই দিয়া গিয়াছেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য তাঁহার দান অনূ্যন তেরলক্ষ টাকা। তাঁহার পত্নী লেডী বসু—আচার্য্য বসুর শেষ দানের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত দানের ব্যবস্থা হইয়াছে :—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলোসিপের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ।

২। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও শারীর বিদ্যা সম্পর্কে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তির জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ৫০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ।

৩। শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ—বিহারে মদ্যপান নিবারণের জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এবং তাঁহার পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রদত্ত হইবে। এই অর্থ বিহার ও বঙ্গদেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক সম্প্রীতির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ বর্ত্তমানে নারী-শিক্ষা-সমিতির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ১০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। সাহিত্য পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ৩ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। রামমোহন লাইব্রেরীতে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ৩ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। এই কাগজের সুদ হইতে পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে।

৮। সার নীলরতন সরকারের সহিত বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় গবেষণার জন্য সার নীলরতনের নামে ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

মানুষ চাহে বড় হইতে। অন্ততঃ বড়র বংশে বা বড়র দেশে যে তাহার জন্ম সে পরিচয় দিতে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ। তাই বড়দের লইয়া বড়ই টানাটানি পড়ে।

কবি কালিদাস অতি প্রসিদ্ধ কবি—ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য কবি জন্মে নাই। এতদিন তাঁহার বাড়ী ঘরের সংবাদের জন্য কাহারও কোন ঔৎসুক্য ছিল না—কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহাকে লইয়া টানাটানি চলিতেছে। তাঁহার কাব্যে বর্ণনার বিচিত্রতা আলোচনা করিয়া বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিতেছেন যে—কালিদাস বঙ্গ-সন্তান। বঙ্গের বাহিরের বিদ্বৎসমাজ সে কথায় সম্মতি না দিলে ত আর কালিদাসকে বাঙ্গালী সিদ্ধান্ত করা চলিবে না। সিদ্ধান্তের জন্য **কালিদাস-সমিতি** গঠিত হইয়াছে—সমিতি ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। গত ৯ই পৌষ মান্দ্রাজের অন্তর্গত গোদাবরী ষ্টেশনে সমিতির এক অধিবেশন হয়। তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন—বর্ষীয়ান্ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় ফরিদপুর জিলার কার্ত্তিকপুরের অধিবাসী। সভায় আরও কয়েকজন বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের আলোচনায় শ্রোতৃবর্গ বুঝিয়াছেন যে, কালিদাস বাঙ্গালীই ছিলেন।

* * * *

দেশদ্রোহিতার শাস্তি সকল দেশেই কঠোর ভাবে হয়। জাপানীরা চীনদেশ দখল করিতে চাহিতেছে, চীনারাও স্বদেশরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। স্বার্থপর, দেশদ্রোহী, স্বজাতি-শত্রু চীনদেশেও আছে। কতকগুলি চীনা দোকানদার পয়সার লোভে জাপানী দ্রব্যের বেচা-কেনা করিতেছিল। ক্রেতারা বারংবার উহাদিগকে জাপানী জিনিস বেচিতে নিষেধ করে; কিন্তু লোভী দোকানী তাহাতে কানই দেয় নাই। ক্রেতারা অবশেষে ঐ লোভী দোকানীর কান কাটিয়া দেশদ্রোহিতার যোগ্য শাস্তি দিয়াছে।

* * * *

সুপ্রসিদ্ধ ডি. ভেলেরার নেতৃত্বে আয়র্লণ্ড "আইরিস্ ফ্রী.ষ্টেট্" নামে প্রায় স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর পনর বছরের চেষ্টায় সংপ্রতি তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছে—এখন উহার নাম হইল **আইয়ার**। এই নূতন রাজ্যে অন্যান্য নিয়মের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে; শুধু রহিত নহে—যে কেহ অন্য রাজ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলেও আইয়ারে আসিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া নিয়ম করা হইয়াছে।

চীন-জাপান যুদ্ধ

কয়েকমাস ধরিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। ইহারই মধ্যে জাপান পিকিং, সাংহাই, নান্‌কিং প্রভৃতি স্থানগুলি দখল করিয়াছে। চীনের সৈন্যবল থাকিলেও জাপানের ন্যায় সমরোপকরণ নাই। চীনারা গরিলাযুদ্ধ করিয়া জাপানীদিগকে বিব্রত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্রের অভাবেই চীনাগণ এত শীঘ্র পরাভব স্বীকার করিতেছে। চীনের কৃষক বাহিনীও যুদ্ধে বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

চীনাদের বাণিজ্য ও শাসনকেন্দ্র নষ্ট হইলে আত্মসমর্পণ করিবে এই আশায় জাপানীগণ ক্যান্টন, হ্যাঙ্কাও ও নানকিংএ নৃশংসভাবে বোমাবর্ষণ দ্বারা নির্দ্দোষ নাগরিকগণকে হত্যা করিয়া যে অমানুষিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সমস্ত জগদ্বাসী ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে জাপানী পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন চলিতেছে।

নানকিংএ প্রবেশ করিয়া জাপসৈন্যগণ অসংখ্য নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিতে সুরু করে, এমন কি আহত নাগরিকগণকেও গুলি করিয়া হত্যা করে। এত অত্যাচারেও চীনারা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবশ্যক মত অস্ত্র নাই, বিমান নাই, তবুও চীনারা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামে প্রস্তুত। চীনবাসীর এই দেশভক্তি অতি অপূর্ব্ব।

জাপানীগণ মার্কিণ জাহাজেও বোমা বর্ষণ করিয়াছে এবং তাহার জন্য আমেরিকা-বাসীর মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এজন্য জাপসম্রাটের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া বিমানপোত প্রেরণ করিয়া চীনকে সাহায্য করিয়াছে। ভবিষ্যতে আমেরিকাও হয়ত চীনকে সাহায্য করিতে পারে।

জেনারল চিয়াং কাইশেক চীনে নূতন যুগ আনিয়াছেন এবং সেই জন্যই চীন এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পরিতেছে। বিজয়ী জাপানী ও তাহাদের ভীষণ অস্ত্রের সম্মুখে চিয়াং নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। দেশের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

চিয়াং কাইশেকের বিদুষী স্ত্রী ম্যাডাম চিয়াং চীনের যুদ্ধসভার বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতার দ্বারা বেশবাসীর হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন।

নেপোলিয়ন-বর্ণিত সেই ঘুমন্ত সিংহ চীন আজ জাগিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা জাপানের সমকক্ষ এখনও হইতে পারে নাই। এই প্রাচীন জাতির ভাগ্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কে জানে?

শ্রীমতী যুথিকা দাশ

খেলা-ধূলা

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম

লাহোরে প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলার নিসার এবং সুঁটে ব্যানার্জ্জির অভাবে অল্ ইণ্ডিয়া দলকে ভীষণ পরাজয় মেনে নিতে হয়। তাই বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলটিকে অদল-বদল ক'রে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ক'রেই গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, সে খেলায়ও অল্ ইণ্ডিয়া টীম ছয় উইকেটে হেরে গেছে। এবারও মার্চ্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, অমরনাথ প্রভৃতি সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন না, একমাত্র তরুণ ক্রিকেটবীর মানকদই টীমের মুখ রক্ষা করেন। অল্ ইণ্ডিয়া টীম প্রথমবারে সকলে মিলে ১৫৩ রাণ করেন—তা'র মধ্যে মানকদ ৩৮ রাণ ও অমরনাথ ৩০ রাণ করেন; টেনিসন্ দলের গোভার একাই ৫ জনকে আউট করেন। দ্বিতীয় বারে ভারতীয় দল মোট রাণ করেন ২০৮, তা'র মধ্যে মানকদ ৮৮ ও সুঁটে ব্যানার্জ্জি ৩৬ রাণ করেন। এবারেও গোভার একাই ৫টি উইকেট পান। টেনিসনের দল প্রথমবারে মোট ১৯৯ রাণে সকলে আউট হ'য়ে যান এবং দ্বিতীয়বারে ৪ জন আউট হ'য়ে ১৭১ রাণ ক'রে ভারতীয় দলের দুইবারের মিলিত রাণ সংখ্যা অতিক্রম করেন। কাজেই তাঁরা ছয় উইকেটে জিতে গেলেন। প্রথমবারে ব্যানার্জ্জি ৪ জনকে আউট করেন।

পর পর দুটো টেষ্টে হেরে গিয়েও ভারতীয় দল কিন্তু মোটেই দম্‌ল না। তা'র প্রমাণ তাঁরা দেখালেন কলিকাতায়, তৃতীয় টেষ্ট খেলায় টেনিসনের দলকে ৯৩ রাণে হারিয়ে দিয়ে! এতকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কোন ক্রিকেট টীমই টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হ'ন নি—এবার কলিকাতার খেলায়ই ভারতে বিলাতী দলের প্রথম পরাজয়। এটা আমাদের বড় গর্ব্বের বিষয়!—কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে চিরদিনই ব্যথা জাগাবে যে, আমাদের বাঙ্গালী ক্রিকেটবীর কার্ত্তিক বসু ও কমল ভট্টাচার্য্যকে এবার দলে নেওয়া হবে ব'লে আশ্বাস দিয়েও শেষ মুহূর্ত্তে তাঁদের দু'জনকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ ক'দিন আগেই বোম্বাইতে প্রদর্শনী খেলায় কার্ত্তিক বসু কি চমৎকার ব্যাটিং-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন! বাঙ্গলার উপর এমন অবিচার ও উপেক্ষা আর কতদিন চল্‌বে?—যাক্ এবার খেলার কথা বলা যাক্।

অন্য দু'বারের মত এবারও টসে জিতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মার্চ্চেণ্ট প্রথমে ব্যাট করাই স্থির কর্‌লেন। অন্যান্যবারে মার্চ্চেণ্ট নিজেই প্রথমে ব্যাট কর্‌তে গিয়েছিলেন

কিন্তু প্রত্যেকবারই বিফল হ'ন। তাই এবার তিনি প্রথমে মুস্তাক আলি ও হিন্দেলকারকে ব্যাট কর্‌তে পাঠালেন। ২৪ রাণের সময় হিন্দেলকার আউট হ'য়ে গেলেন। তারপর মানকদ এসে মুস্তাকের সঙ্গে যোগ দিলেন। খেলা জমে গেল। তার ফলে মুস্তাক আলি ও অমরনাথ ছু'জনেই ঐদিনে সেঞ্চুরী বা একশত রাণ করলেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৫ জন আউট্ হ'য়ে রাণ হ'ল ৩১৩। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আর মাত্র ৩৭ রাণ ক'রে মোট ৩৫০ রাণে ভারতীয় দলের সকলে আউট হ'লেন। হার্ডষ্টাফ্ ও পোপ্ ছাড়া টেনিসন দলের কেউ নিসারের বলের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে খেল্‌তে পার্‌লেন না—প্রথম বারে তাঁদের রাণ হ'ল মোট ২৫৭—তাও খারাপ ফিল্ডিংএর জন্যে। ৯৩ রাণ বেশী হাতে নিয়ে ভারতীয় দল আবার খেলা সুরু কর্‌লেন। দ্বিতীয় বারে ভারতীয় দল বা টেনিসনের দল কেউ ভাল খেল্‌তে পার্‌লেন না—ছু'দলেরই খেলা সেবারে ১৯২ রাণে শেষ হ'ল। কাজেই আগের বারের ৯৩ রাণেই ভারতীয় দলের জয় হ'ল।—এবারও মানকদ ভাল ব্যাটিং করেন। নিসার প্রথম বারে ৫ জনকে আউট করেন—আর দ্বিতীয় বারে মানকদ ও অমর সিং প্রত্যেকে ৪ জনকে অল্প রাণে আউট ক'রে বোলিংএর কৃতিত্ব দেখান। কে কত রাণ করেছেন নীচে তা'র তালিকা দেওয়া হ'ল ঃ—

অল ইণ্ডিয়া

প্রথম ইনিংস্

মুস্তাক আলি	...	...	১০১
হিন্দেলকার	...	...	১০
মানকদ	...	...	৫৫
অমরনাথ	...	...	১২৩
কমরুদ্দিন	...	...	৪
মার্চ্চেণ্ট	...	...	১৯
আব্বাস খাঁ	...	...	২
ব্যানার্জ্জি	...	...	২
অমর সিং	আউট না হইয়া		৯
আমির এলাহি	...	...	০
নিসার	...	...	০
	একস্‌ট্রা	...	২৫
	মোট	...	৩৫০

গোভার ৪ জনকে ও
পোপ ৫ জনকে আউট করেন।

লর্ড টেনিসনের টীম

প্রথম ইনিংস্

এড্রিক	...	...	১৯
ম্যাক্‌করকেল	...	...	২৮
হার্ডষ্টাফ্	...	...	৫৯
ইয়ার্ডলি	...	...	৩৮
ল্যাংরিজ	...	...	[illegible]
ওয়ার্দ্দিংটন্	...	...	১
গিব্	...	...	৬
ওয়েলার্ড	...	...	২২
লর্ড টেনিসন্	...	...	২৮
পোপ্	আউট না হইয়া		৪১
গোভার—	...	...	৩
	একস্‌ট্রা	...	১২
	মোট	...	২৫৭

নিসার ৫ জনকে ও
অমর সিং ৩ জনকে আউট করেন।

অল ইণ্ডিয়া

দ্বিতীয় ইনিংস্

মুস্তাক আলি	...	...	৫৫
হিন্দেলকার	...	...	৬০
মানকদ	...	...	২৫
অমর সিং	..	...	২
অমরনাথ	...	...	০
মার্চ্চেণ্ট	...	...	৯
কমরুদ্দিন	...	...	২
আব্বাস	...	...	১৩
ব্যানার্জ্জি	...	...	০
আমির এলাহি	আউট না হইয়া		১৫
নিসার	...	...	১
	একস্ট্রা	...	১০
	মোট	...	১৯২

ল্যাংরিজ ৬ জনকে ও
ওয়েলার্ড ৪ জনকে আউট করেন।

লর্ড টেনিসনের টীম

দ্বিতীয় ইনিংস্

এড্রিক	...	...	৩
ম্যাক্‌করকেল	...	...	৩
হার্ডষ্টাফ্	...	...	৪৯
ইয়ার্ডলি	...	...	১৫
ল্যাংরিজ	...	...	৩০
ওয়ার্দ্দিংটন্	...	...	১১
পোপ্	...	...	২
লর্ড টেনিসন্	...	...	৮
ওয়েলার্ড	...	...	১৫
গিব্	আউট্ না হইয়া		২৯
গোভার	...	...	১৩
	একস্ট্রা	...	১৪
	মোট	...	১৯২

অমর সিং ৪ জনকে ও
মানকদ ৪ জনকে আউট করেন।

ধাঁধা

তিন অক্ষরে নাম মোর জলমধ্যে বাস,
আদ্যত্যাগে খায় লোকে,
মধ্যত্যাগে জীব বাঁচে,
ক্ষুদ্র দেহ ধরি কিন্তু বিশ্বে করি ত্রাস।

দাদু

দ্রষ্টব্য ঃ—ধাঁধার উত্তর **১০ই মাঘের** মধ্যে পাঠাইতে হইবে।
উত্তর পাঠানের সময় নামের সঙ্গে গ্রাহক-নম্বরও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press ;
5, College Square, Calcutta.

[এই ছবির বিষয় শিশুসাথীর শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ষোড়শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৪ { ১১শ সংখ্যা

জাগো

ছোট ফুল জাগো !

তরুণ অরুণ পূব-আকাশে, আলোর ধারা ঢাল্‌ল হেসে,

ভোর এসেছে নবীন বেশে,

আর ঘুমিয়ো না গো ;

পাতার কোলে সবুজ ডালে

ছোট ফুল জাগো !

ছোট পাখী জাগো !

আঁধার ধরায় আলোক এল, গাছের কোলে ফুল জাগিল,

খাবার খোঁজার সময় হ'লো

আর ঘুমিয়ো না গো ;—

গাছের কোলে আপন নীড়ে

ছোট পাখী জাগো !

ছোট খোকা জাগো !

ফুল জাগল আপন ভুলে, গাছের মাথায় দু'লে দু'লে,
জাগল পাখী আপন কুলে
আর ঘুমিয়ো না গো ;—
মায়ের বুকে স্নেহের নীড়ে
ছোট খোকা জাগো !

ছোট খুকু জাগো !
ফুলের সাথে সুবাস জাগে, ভোরের বাতাস সবার আগে,
হাস্‌ল ঊষা রক্ত রাগে
আর ঘুমিয়ো না গো ;—
মায়ের কোমল কোলের কাছে
ছোট খুকু জাগো !

ভোর হ'য়েছে জাগো !
ঘুমের শেষে যুগল হাতে, বিনয় সাথে আপন মাথে,
ভগবানের দয়ার সাথে
আশিস্‌-ধারা মাগো ;—
ফুল-সাথী ও খোকাখুকু
তোমরা সবাই জাগো !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ

জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী-পরিবার

আজকাল জাপান সম্বন্ধে কত কথাই না শুনতে পাওয়া যায়! বাজারে গেলে চারদিকে সব জাপানি জিনিসে ছেয়ে গেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা সেখানকার শুধু ধনকুবের ন'ন—তাঁরা জাতির একটা গর্ব্বের বিষয়, আর সব বিষয়ে তাঁরা জাতির গৌরব। প্রকাণ্ড বড় ব্যবসায়ী তাঁরা, নাম তাঁদের 'মিৎসুই'। জাপানের সমস্ত ব্যবসায়ের প্রায় সিকিভাগ তাঁদের হাত দিয়ে হয়। এমন জিনিস নেই যা তাঁরা কেনা-বেচা না করেন—বড় বড় কলকব্জা, চাষবাসের জিনিস থেকে আরম্ভ ক'রে কাপড়-চোপড়, তূলা, রেশম, চিনি, চাউল ইত্যাদি সব-কিছুর ব্যবসাই তাঁরা করেন। এসব ছাড়া তাঁদের ব্যাঙ্ক ও জাহাজ আছে। তাঁদের নিজস্ব এত জাহাজ আছে যে, সংখ্যায় প্রায় ফ্রান্সের সমান হবে—অবশ্য সেগুলো মালপত্র বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তাঁরা ব্যবসা কর্‌ছেন, আর তাঁদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে অনেককে পরাস্ত হ'য়ে পেছিয়ে পড়্‌তে হ'য়েছে। প্রায় তিনশো বছর ধ'রে এই মিৎসুই পরিবার কারবার কর্‌ছেন। আজ তাঁদের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীর মতই অনেক উচ্চে।

তাঁদের একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে, যা শুন্‌লে একটু আশ্চর্য্য হ'তে হয়। তাঁদের পরিবারের মধ্যে কোনও ছেলের ১৪।১৫ বৎসর বয়স হ'লে যদি দেখা যায় যে, তা'র বিষয়-বুদ্ধি খুব কম, তা' হ'লে দয়া-মায়া ও চক্ষুলজ্জা না ক'রে তা'কে নিঃশব্দে তাঁদের পরিবার থেকে বা'র ক'রে দেওয়া হয়—কেহ কোন ওজর আপত্তি করে না। সেদিন থেকে সে 'মিৎসুই' নাম ত্যাগ ক'রে অন্য নাম গ্রহণ করে। আর দরকার হ'লে কোনও গরীব পরিবারের একটি মেধাবী ও চরিত্রবান্ যুবককে 'মিৎসুই' নামে সাদরে মিৎসুই পরিবারে আনা হয়। দয়া-মায়া দেখিয়ে কতকগুলো অলস ও অকেজো লোক বাড়িয়ে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয় না। এতে তাঁদের আদর্শও মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁরা নিজেদের সম্পদ্‌কে জাতীয় সম্পদ্ ব'লে গণ্য করেন। তাঁদের ব্যবসায়ের ভিত্তিটা এত সুদৃঢ় ব'লেই এতদিন ধ'রে তাঁদের ব্যবসা সমানভাবে এগিয়ে চ'লেছে।

সে-দেশের রাজার আদেশে ঐ পরিবারে কতকগুলো আইন প্রচলিত আছে, সেইমতে তাঁদের চল্‌তে হয়। কার্য্যক্ষম থাক্‌লে কেহ সে পরিবার ছাড়্‌তে পারে না।

যদি কেহ তাঁদের নিয়ম কখন না মান্‌তে চায় তবে তা'কে সেই পরিবার ছেড়ে চ'লে যেতে হয়—অবশ্য অন্য নামে। খুব বড় হ'লেও মূলধন নিজের কোনও কাজে কেহ খরচ কর্‌তে পারে না। পরিবারে কারও বিয়ের বয়স হ'লে পরিবারের সকলকার মত নিয়ে বিয়ে কর্‌তে হয়।

কেউ বার্দ্ধক্যের জন্য কার্য্যাক্ষম হ'লে সকলকে ভেবে ঠিক কর্‌তে হয় যে, সত্যই তাঁর অবসরগ্রহণের সময় হ'য়েছে কিনা এবং তাঁর স্থানে কা'কে মনোনীত কর্‌লে তাঁদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে না। সম্প্রতি তাঁদের ব্যবসায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা এরূপ অবসর গ্রহণ কর্‌বার আগে—কোরিয়া দেশে তাঁদের যে সব জায়গা জমি আছে সেখানে প্রায় দশ লাখ গাছ পুঁতে তবে অন্য নাম গ্রহণ করেন; উদ্দেশ্য যে, ভবিষ্যতে পঞ্চাশ বছর পরেও মিৎসুই পরিবারের কাঠের অভাব হবে না। তাঁর জায়গায় পরিবারের আর একজনকে কর্ত্তা করা হ'ল, তিনি হার্ভার্ড্ ও ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ—ব্যবসায়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে প্রথামত রাজা তাঁকে 'ব্যারণ' উপাধিতে ভূষিত ক'রে দিলেন—এতই তাঁদের সম্মান। একটি সহজ উপদেশ তাঁরা সকলেই মেনে চলেন; তা' এই—'দেশ দেবতাদের, রাজাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে হবে, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে হবে, আর প্রজার কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পালন কর্‌তে হবে।' এ উপদেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

মিৎসুই পরিবারের যিনি কর্ত্তা তিনি টোকিও সহরের মাঝখানে একটি পার্কের মধ্যে ছোট্ট একখানি কুটীরে বাস করেন। সৌন্দর্য্যের অভাব নেই সেখানে, চারদিক সুগন্ধি দেবদারু গাছে ঘেরা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল-ফোটা অনেক হ্রদ আছে। তা'র পাশে মার্ব্বেল পাথরে তৈরী সুরম্য অট্টালিকা, নানারূপ আসবাবে ভরা—সেটা শুধু অভ্যাগতদিগের জন্যে। যাঁদের অত বিশাল কারবার পৃথিবীর চারদিকে, তাঁদের কাছে বড় বড় লোক যাওয়া-আসা ক'রেই থাকেন। তাঁদের আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় না। সেখানে বিলাসিতার কোন অভাব নেই—হাজার হাজার টাকা জলের মত ব্যয় করা হয়, তা'র কোন হিসাব থাকে না। কিন্তু কর্ত্তা যে বাড়ীতে থাকেন, সেখানে জাঁকজমকের লেশমাত্র নাই—একটি পয়সা খরচেরও হিসাব সেখানে রাখা হয়। একটা বিশাল সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব আছে ব'লে নিজের জন্য কোন বাজে খরচ অন্যায় ব'লে মনে করা হয়। আতিথেয়তায় তাঁদের কেহ পরাস্ত কর্‌তে পারে না—এটা তাঁদের মজ্জাগত

এবং অনেকদিনের সাধনা। জাপানে 'মিৎসুই' পরিবার সেখানকার অন্য ধনীদের আদর্শ। তাঁরা ব্যবসায়ের উন্নতির মূল উদ্দেশ্য নিজেদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ কর্‌বার জন্য মনে করেন না এবং ব্যবসায়ের উৎপন্ন অর্থের কিছু নিজেদের বিলাসিতায় ব্যয় করেন না; শুধু জাতির ধনবৃদ্ধি ও গৌরবের জন্যই যেন তাদের অস্তিত্ব। অন্য দেশের বড় বড় বিখ্যাত ধনীরা নিজেদের আত্মসুখের জন্য কত পয়সাই না ব্যয় করেন!

জাপানের রাজা নিজেও অসম্ভব রকমের ধনী, কিন্তু প্রজারা জানে যে, জাতির বিপদে সে ধন তিনি মুক্ত-হস্তে খরচ কর্‌বেন। একবার কোনও একজন বড় বিদেশী লোক, এক রাজকর্ম্মচারীর কাছে রাজার কত ঐশ্বর্য্য জান্‌তে চাইলে বেশ সুন্দর ও কড়া রকমের জবাব পেয়েছিলেন। কর্ম্মচারী ব'লেছিলেন—"এ পর্য্যন্ত রাজার ধন-দৌলত কখনও হিসাব ক'রে দেখা হয় নি, ভবিষ্যতেও কখন গণনা করা হবে না—এরূপ প্রশ্ন কেহ কখনও করেন না, কারণ ইহা নীতি-বিরূদ্ধ। রাজার ঐশ্বর্য্য ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি এখানে একসঙ্গে জড়িত।"

জাপানের প্রত্যেকেই দেশ ও জাতির কথা ভাবে। তাঁদের এ-সব দেখে শুনে আমাদেরও সত্যিকারের মানুষ হ'বার চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীবিজলীনাথ বসু

শিকড়ের গুণ

(শেষ)

ওদিকে রামলালকে ধম্‌কাইয়াই শ্যামলাল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং লাল শিকড়টি খাইয়া ফেলিল। খাইতেই সে হইয়া গেল সম্পূর্ণ অদৃশ্য, কিন্তু সে মনে করিতে লাগিল—সে হইয়াছে সাত পালোয়ানের মত জোয়ান। সমস্ত শরীরটাই যেন ভয়ানক হাল্‌কা বোধ হইল। যেন ইচ্ছা করিলে সে উড়িয়া যাইতে পারে। সে ভাবিল, পালোয়ান হইলে বোধ হয় শরীর এম্‌নি হাল্‌কা লাগে।

কিন্তু আবার সন্দেহও একটু একটু হইল। সে পালোয়ান হইয়াছে কিনা সেটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে চলিল নগেন্দ্র সা'র চাউলের আড়তে। সেখানে চাউল ওজন করিবার জন্য লোহার যে-সব একমণী, দুই মণী, আড়াই মণী বাটখারা আছে সেগুলির সাহায্যেই শক্তির চুড়ান্ত পরীক্ষা হইবে।

নগেন্দ্র সা'র চাউলের আড়ৎ মস্ত বড়। তাহার দুইটি বিভাগ। এক বিভাগে গুদাম—অন্য বিভাগে দোকান, অর্থাৎ সেখানে চাউল বিক্রী চলে। বিক্রয় বিভাগে মণের পর মণ চাউল বিক্রী হইতেছে। গুদাম বিভাগে একা নগেন্দ্র সা' বসিয়া আছে তাহার পার্সন্যাল্ অর্থাৎ ব্যক্তিগত গদীতে। বিক্রয় বিভাগটিও একটি ছোটখাট গুদাম-বিশেষ। কাজেই আসল গুদামে ভিড় হয় না, সপ্তাহ-শেষে একবার বিক্রয় বিভাগের চাউল ফুরাইয়া আসিবার উপক্রম হইলে গুদাম বিভাগ হইতে চাউল লইয়া 'ষ্টক্' পুরাইয়া রাখা হয়।

৺শ্রীশ্রীপাহাড়িয়াবাবার তিরোধানোৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মহোৎসবে দু'হাজার মণ চাউলের 'কনট্র্যাক্‌ট্' পাইয়াছে নগেন্দ্র সা'। অন্যবার অপেক্ষা এবার তাহার আকাঙ্ক্ষা আরও বড় রকমের। এবার সে ঠিক করিয়াছে মস্ত দাঁও মারিবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এমন একটি আধমণী বাটখারা তৈরী করিয়াছে—যাহা বাহির হইতে দেখিয়া আধমণী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ওজনে সাড়ে সাত সের মাত্র। এই অভিনব ফাঁপা বাটখারাটির সাহায্যে বিনা হাঙ্গামায় ফাঁকের উপর বহু টাকা লাভ করিবে, ইহা ছাড়া দরে যে লাভ হইত তা তো আছেই। আর মহোৎসবে অসংখ্য লোক খাইবে—কাজেই এসব ধরা পড়িবার ভয়ও নাই।

সেই অভিনব বাটখারাটি ছিল নগেন্দ্র সা'র ঠিক পিছনে। নগেন্দ্র সা' একটা খাতায় ভাবী লাভের হিসাব কষিতেছিল, এমন সময় শ্যামলাল উপস্থিত। নগেন্দ্র সা'র কাছে যাইতেই তাহার চোখে পড়িল সেই বাটখারাটি। শ্যামলাল ভাবিল—'যাক্, এই তো আধমণী বাটখারাটা পাওয়া গেছে। এর ওজনটা দিয়েই গায়ের জোরটা মাপা যাবে। আগে তো এক হাতে কোনরকমে মাটি থেকে এটাকে উঁচু কর্‌তে পার্‌তুম ইঞ্চি কয়েক। দেখি এখন।' এই মনে করিয়া বাটখারাটা সে অনায়াসে একেবারে মাথার উপর তুলিয়া ফেলিল। উঃ! তখন তা'র কি আনন্দ! বাটখারাটি মাটিতে রাখিয়া এবার সে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়া সেটিকে তুলিল। তখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, শিকড়ে কাজ হইয়াছে—সে সাত পালোয়ানের মত পালোয়ান হইয়া গিয়াছে! নিজের অদ্ভুত ক্ষমতা নগেন্দ্র সা'কে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার লোভ শ্যামলাল সংবরণ করিতে পারিল না; কারণ শ্যামলালকে তাহার অজীর্ণ-রোগ-জীর্ণ দেহটির জন্য এই নগেন্দ্র সা'ই বহু ঠাট্টা করিয়াছে। শ্যামলাল হিসাব-কষা নিরত নগেন্দ্র সা'র মাথার উপরে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে বাটখারাটি তুলিয়া ধরিয়া বাহাদুরী করিয়া বলিতে লাগিল—"চেয়ে দেখ সা' মশায়, আমার ক্ষমতা আছে কিনা!"

নগেন্দ্র সা' শূন্যে অবস্থিত বাটখারাটি দেখিয়া এবং অদৃশ্য-কণ্ঠের কথা শুনিয়া ভারী ভড়্‌কাইয়া গেল। ভাবিল এ ৺শ্রীশ্রীপাহাড়িয়াবাবা ছাড়া আর কেউ নয়। সে কিনা পাহাড়িয়াবাবার সঙ্গে অমন জুয়াচুরী করিতে যাইতেছিল! বাবা তাই অদৃশ্যদেহ ধারণ করিয়া তাহাকে কিছু শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। কাঁদিয়া উঠিয়া সে বলিতে লাগিল—"দোহাই বাবা! এবারটি ক্ষমা করো। আর কথ্‌খনো কোন জুয়াচুরীর কথা মনেও ঠাঁই দেবো না।... ..."

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া শ্যামলাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং নগেন্দ্র সা' অদৃশ্যদেহী শ্রীশ্রীপাহাড়িয়াবাবার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ওদিকে দোকানে খরিদ্দারগণ এবং দোকানের লোকেরা এই অদ্ভুত কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল 'জাজ্জ্বল্যমান্' লোহার বাটখারাটি নগেন্দ্র সা'র মাথার উপর শূন্যে ভাসিতেছে। দেখিয়া সবাই বিস্ময়ে মৃদুস্বরে কি উচ্চারণ করিল বুঝিতে পারা গেল না, কিন্তু সকলের সমবেত বিস্ময় প্রকাশে বেশ একটি গোলমালের সৃষ্টি হইল। শ্যামলাল বেচারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কেমন যেন অবসন্ন বোধ করিতে লাগিল। লোহার বাটখারাটা হাত হইতে খসিয়া পড়িল। আর একটু হইলেই পড়িত—নগেন্দ্র সা'র মাথায়, কিন্তু আরো কয়েক বছর চাউলের ব্যবসা করা নেহাৎই বিধাতাপুরুষ তাহার কপালে
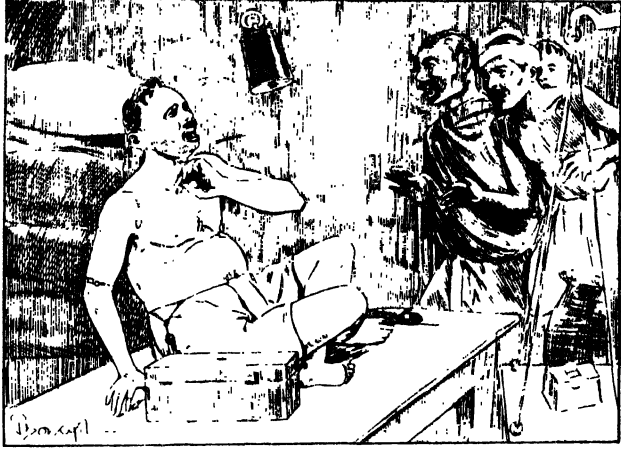
বাটখারাটি মাথার উপর শূন্যে ভাসিতেছে

লিখিয়াছিলেন, তাই পড়িল তাহার পিঠে। সবাই হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল এবং নগেন্দ্র সা' আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িল।

শ্যামলাল সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। ভাবিল গতিক সুবিধার নয়। তা'ছাড়া রেধোকে ঠেঙানো আসল কাজটাই বাকী রহিয়া গিয়াছে, দেরী করিলে চলিবে না। রেধোর ফেরার সময় হইয়া আসিল। রোজ চটকলে কাজ করিয়া রেধো কুণ্ডুদের আমবাগানের পাশ দিয়া বাড়ী ফেরে। শ্যামলাল আমবাগানের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া রেধোর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মারিয়া রাগের ঝাল্ মিটাইয়া লইবার পক্ষেও জায়গাটি আদর্শস্থল। কাছে কোন বাড়ী নাই, চীৎকার করিলেও সহজে কেহ শুনিবে না। কিন্তু শ্যামলালের মনে একটি চিন্তা ভীষণ ভাবে দেখা দিল—তাহার জোরের তো মেয়াদ আজ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। তারপরেই তো আবার আগেকার মতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে সে। আজ যদি রেধো ব্যাটা তাহাকে চিনিয়া ফেলে তাহা হইলে তো সে ভয়ানক প্রতিশোধ লইবে। কাজেই মারিতে হইবে ঠিক ঐ অন্ধকার জায়গাটায়—যেন রেধো তাহার চেহারা দেখিতে না পায় এবং কণ্ঠস্বর করিতে হইবে বিকৃত, যেন সে চিনিয়া না ফেলে। এই ঠিক করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দূরে জ্যোৎস্নালোকে রেধোকে দেখা গেল। সে গান করিতে করিতে আসিতেছিল। দেখিয়া আস্তীন্ গুটাইতে গুটাইতে শ্যামলাল কহিল—"আপন ঘরে আজ ভালো ক'রেই ফেরাচ্ছি।"

তেমনি গান গাহিতে গাহিতে রেধো অগ্রসর হইল :—

"খাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে,
আনন্দ আজ আনন্দ রে !"

এইটুকু গাহিতেই রেধো সেই অন্ধকার জায়গাটিতে আসিয়া পড়িল। শ্যামলাল দেখিল এই সময়। বিকৃতস্বরে "আনন্দ পাওয়াচ্ছি" বলিয়াই সে রাধাচরণকে আক্রমণ করিল। পিছন হইতে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রাধাচরণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারিটি ঘুঁসী খাইল বটে, কিন্তু শ্যামলালের সরু হাতের ঘুঁসীতে তাহার শক্ত শরীরের কোনও ক্ষতি হইল না। শ্যামলালকে বাঁ হাতে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রাধাচরণ ডান্ হাতে কষিয়া এক চড় লাগাইল। ঘুঁসী লাগাইল না, কেন না সে বুঝিল যে যাহার হাত অমন সরু তাহাকে ঘুঁসী লাগাইলে শেষকালে খুনের দায়ে পড়িবার আশঙ্কা যথেষ্ট। একটি চড় খাইতেই শ্যামলাল বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহাকে আক্রমণ করিবার মত দুঃসাহস যাহার হইয়াছে সেই মূর্খের চেহারাটি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল সে জায়গায় শ্যামলালকে সে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু অদৃশ্য শ্যামলালকে দেখা গেল না। ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া রাধাচরণ আর তিলেকমাত্র না দাঁড়াইয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

একে বিষম চড়, তাহার উপর আছাড়। শ্যামলালের প্রাণ আসিল প্রায় ঠোঁটের ডগায়। তাহার ভয় হইতেছিল ষণ্ডা রেধো বুঝি আরো মার লাগাইবে। কিন্তু তাহাকে পলাইতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যও হইল, পরম স্বস্তিও বোধ করিল। ভাবিল, শরীরের হাড়গুলি বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে বিষম ব্যথা। শুইয়া ব্যথায় মৃদু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল—'এমন হইল কেন? শিকড় খাইয়া তো গায়ের জোর নিশ্চয়ই হইয়াছিল—নহিলে আধমণী বাটখারাটি অনায়াসে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়া তুলিয়াছিলাম কিরূপে? কিন্তু জোয়ান্ যদি হইয়াই থাকি, তাহা হইলে রেধোর হাতে এমনভাবে লাঞ্ছিত হইলাম কেন? আর রেধো অমন হঠাৎ পলাইলই বা কেন?'

এইভাবে অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া তারপর বহু কষ্টে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে বাড়ীর দিকে চলিল নিরালা পথ ধরিয়া। এক ভদ্রলোক সাইকেলে চড়িয়া আসিতেছিলেন। পিছন হইতে অদৃশ্য শ্যামলালের গায়ে ধাক্কা খাইয়া সাইকেলশুদ্ধ তিনি তো পড়িলেনই, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া শ্যামলালও পড়িল। ভদ্রলোক ভয় পাইয়া সাইকেল ফেলিয়াই পলাইলেন। শ্যামলাল আস্তে আস্তে উঠিয়া আবার বাড়ীর দিকে চলিল। ব্যাপার দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল হয় তো ভুলে শিকড় বদল হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই এই সমস্ত নিদারুণ ব্যাপার। বহু কষ্টে বাড়ী ফিরিয়া সে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।...

পরদিন ভোর হইতেই নগেন্দ্র সা' কুলীর মাথায় একমণ সেরা গোবিন্দভোগ চাউল লইয়া হাজির। সঙ্গে পুত্র নফরচাঁদ। পিঠের ব্যথা ভয়ানক রহিয়াছে, তবু নগেন্দ্র সা' কষ্ট করিয়া আসিয়াছে—নফরচাঁদের কাঁধে ভর দিয়া। রাম-শ্যামের মা তখন তাঁহার যাঁতা লইয়া সবেমাত্র কাজে লাগিতেছেন। তিনি বলিলেন—"সে কি! চা'ল দিতে তো আমি বলি নি!"

নগেন্দ্র সা' বলিল—"না মা! এ আমি নিজেই নিয়ে এসেছি। আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে।"

—"প্রায়শ্চিত্ত আবার কিসের?"

তখন নগেন্দ্র সা' বুঝাইয়া দিল যে, এই যে গেল সপ্তাহে সে এক মণ চাউল দিয়াছে তাহাতে পাঁচ সের চাউল চালাকী করিয়া কম দিয়াছে। তাহাতে যে পাপ হইয়াছে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে এই চাউল আনিয়াছে। বুড়ী কিছুতেই নিতে চায় না; বলে—"পাঁচ সের চা'ল কম দিয়েছ তো ঐ পাঁচ সের দিয়ে পুরো ক'রে দাও। আর এত দামী চা'ল কেন?" নগেন্দ্র সা' তখন নানাভাবে রং চড়াইয়া অদৃশ্যরূপে ৺শ্রীশ্রীপাহাড়িয়াবাবার আবির্ভাব ইত্যাদির কথা বর্ণনা করিল; সর্ব্বশেষে বলিল—"বাবা খুব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এখন থেকে জুয়াচুরী ব্যবসা আর কোন দিন করব না।"

নগেন্দ্র সা'র সকরুণ মিনতিতে অবশেষে ঐ এক মণ গোবিন্দভোগ চাউল রাখিতেই হইল। ওদিকে ঘরে বিছানায় শুইয়া নগেন্দ্র সা'র কথা শুনিয়া এত ব্যথায়ও শ্যামলালের হাসি পাইতে লাগিল।

তারপর আসিলেন গোপী মাষ্টার এবং সঙ্গে তাঁহার পালোয়ান পুত্র বটুকনাথ এবং ভৃত্য ভজা। গোপী মাষ্টারের গলা সপ্তমে চড়িল। তিনি লাঠি উঁচাইয়া কহিলেন—"কই রামু ছোঁড়া কোথায়? আজ ওরই একদিন, কি আমারই একদিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা ছোঁড়ার!"

তারপর গোপী মাষ্টার সবিস্তারে রামলালের গত রাত্রির কীর্ত্তি বর্ণনা করিলেন, বটুকনাথও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রসান দিতে লাগিল। পুত্রের কীর্ত্তির কাহিনী শুনিয়া গালে হাত দিয়া রামলালের মা কহিলেন—"তাই নাকি গো মাষ্টারবাবু! ছেলেটা যে একেবারে ক্ষেপে গেল, এখন আমি কী উপায় করি? বল্‌তে নেই—ঐ সাধুই ছোঁড়ার মাথা একেবারে খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে। কি যাদুই ক'রেছে কে জানে?"

রামলাল চট্ করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল, বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় পাগ্‌লামীর ভাণ করা, যেন গত রাত্রির কাজটা গোপী মাষ্টার পাগ্‌লামী বলিয়া মনে করিয়া নেন। সে চীৎকার করিয়া বলিতে ও গাহিতে লাগিল—"জয় মা কালী! বন্দেমাতরম্! ইফ্ টু সাইড্‌স্ অব্ এ ট্রায়াঙ্গল্ আর ইকোয়্যাল টু টু রাইট্ অ্যাঙ্গল্‌স্—ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দেবো না—আকবর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন—" ইত্যাদি।

রামলালের মা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন—"ঐ শুনুন মাষ্টারবাবু! কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে যা ক'রেছিল সেও অনেকটা এই ধরণের। ছেলেকে নিয়ে এখন কি করি বলুন তো?"

গোপী মাষ্টার ভাবিলেন—'তাই তো!'

এমন সময় আরতির দাদা অমল এবং আরতি প্রবেশ করিল। অমল বলিল—"রামুর কি হ'য়েছে বলুন তো! মাথা খারাপ নাকি? কাল আমাদের বাবা কুকুরটাকে এক লাথিতে মেরে ফেলেছে।"

আরতি বলিল—"আর আমাকে ব'লেছে—'আঁরঁতিঁ, তোঁর ঘাঁড় মঁট্‌কে রঁক্তঁ খাঁবোঁ।' উঃ মাগো! কি ভয়ানক তা'র দাঁত-খিচুনি! আর কি তা'র ধেই ধেই নাচ! রামুদা'কে বোধ হয় ভূতে পেয়েছে।"

রামলালের মা বলিলেন—"ও মাগো! আমি কোথায় যাবো গো!"

রামলাল বলিল—"সাম্নে-ওয়ালা ভাগো। লাল পল্টন আস্‌ছে—লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌।" মিলিটারী মার্চ্চের ভঙ্গীতে রামলাল বাইরে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"জয় বাবা সাধু মহারাজ !"

এইবার আসিল নন্দ হালুইকর ও তাহার ভ্রাতা গদাই। নন্দ বলিল—"মা ঠাক্‌রুণ—" কিন্তু আর কিছু তাহাকে বলিতে হইল না। অগ্রসর হইয়া আসিয়া রামলাল কহিল—"নমস্কার স্যার্‌, আমার ইংরেজীর নম্বরটা দয়া ক'রে যদি বলেন—।" তারপর একটু যেন অবাক্‌ হইয়া বলিল—"একি ! মাষ্টার মশাই যে নন্দ হালুইকর হ'য়ে গেল ! নাঃ, সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।...জয় সাধুবাবা !" বলিয়া যুক্তকরে প্রণাম জানাইয়া কখনও হাসিতে হাসিতে, কখনও আবোল্‌ তাবোল্‌ বকিতে বকিতে রামলাল ঘরের দরজায় একটা প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

একি ! মাষ্টার মশাই যে নন্দ হালুইকর...

গোপী মাষ্টারের রাগ জল হইয়া গেল, অমলের আর কুকুরের মৃত্যুতে লোক্‌সানের জন্য দাবী জানানো হইল না, এবং নন্দ হালুইকরের পাওনা আদায় করাও হইল না।

গোপী মাষ্টার বলিলেন—"তাই তো ! সাধুফাধুদের পাল্লায় প'ড়ে কত ছেলের মাথা যে এ ভাবে নষ্ট হচ্ছে ! আমার কাছে মধ্যমনারায়ণ তেল আছে—পাঠিয়ে দেবো'খন। কিছুদিন মাথায় দিক্‌—দেখুক কেমন হয়। উপকার দেবেই। খুব ভাল জিনিস।...বড় ভাল ছেলে ছিল। মাথা খারাপ হ'য়ে গেলে ভারী দুঃখের কথা।..."

অমল বলিল—"দামী কুকুরটাকে মেরে ফেল্‌ল। যাক্‌ গে। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো ভাল।"

নন্দ হালুইকর বলিয়া গেল এ ব্যামো ঝাড়-ফুঁক্‌ ছাড়া অন্য কিছুতে সারিবে না ; তাহার চেনা এক গুণী আছে যে ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা খুব ভাল জানে, দরকার হইলে সে তাহাকে নিয়া আসিতে পারে। পয়সাকড়ি দিতে হইবে না—শুধু মায়ের পূজা বাবদ সওয়া পাঁচ আনা দিতে হইবে যদি সারে, আর সারিবে নিশ্চয়।

সেদিন ভোরবেলাই দু'ভাই প্রতিজ্ঞা করিল—ভবিষ্যতে আর কোনও সাধুর কাছে তাহারা যাইবে না এবং নেহাৎই যদি যায় তো বর চাহিবে না।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম. এ.

দুটি বাক্স

এমন একটা মজার বাক্স থাক্‌ত যদি, দাদা,
ভেতরে যার ভরা আছে হাসি গাদা গাদা,—
থাকে যদি এমন বাক্স,—খোঁজ যদি তার পাই,
মনের সুখে কী যে করি—ঠিকানা তার নাই।
ডালা খুলে কলটাকে দিই বে-কল ক'রে তার,
কোনরূপেই বন্ধ করা যায় না যেন আর।
তার পরেতে মুঠো মুঠো নিয়ে হাসির রাশি,
মনের সাধে চতুর্দ্দিকে ছড়াই,—এবং হাসি!
এমনভাবে দিই ছড়িয়ে,—ছিট্‌কে গিয়ে বেগে
ছেলে বুড়ো সবার মুখে সমান থাকে লেগে।

আর একটি বাক্স—যদি এমন বড় হয়—
ভেতরে যার আঁট্‌তে পারে দুনিয়ার সব ভয়,
এমন বাক্স মেলে যদি—এমন ধারাই বড়,—
আহার নিদ্রা ছেড়ে করি ভয়গুলোকে জড়;
বাড়ীতে আর ইস্কুলেতে যে সব ভয়ের চোটে
ধম্‌কানি আর চোখ্‌রাঙানোয় পিলে চম্‌কে ওঠে,
সেইগুলোকে ঠেসেঠুসে বাক্সবন্দি ক'রে
রাক্ষুসে তার চাবিটাকে দিই ঘুরিয়ে জোরে;—
দিই লাগিয়ে পেছনে তার দেশের যত ছেলে—
সমুদ্দুরের অতল জলে আসুক সেটা ফেলে।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., কাব্যসাংখ্যতীর্থ

ভূদাদুর চিঠি

(গড়ওয়াল বর্ণন)

স্নেহের অণু-কণু,

তোমরা বোধ হয় বদরীনাথ-কেদারনাথের নাম শুনেছ। ঐ জায়গা দুটি **গড়ওয়াল** পাহাড়ে। এবার গড়ওয়াল পাহাড়ের বিষয় তোমাদের কিছু বল্‌ব।

গড়ওয়াল পাহাড়ে ঢুক্‌তে হ'লে **নজীবাবাদ** থেকে রেলগাড়ীতে চ'ড়ে পনর মাইল দূরে **কোট্‌দোয়ারায়** যেতে হয়। নজীবাবাদ থেকে হরিদ্বার ৪৩ মাইল আগে।

কোট্‌দোয়ারার পরে রেলগাড়ী আর যায় না। কোট্‌দোয়ারা রেল-ষ্টেশনটি ভারি মজার। পাহাড়ের পায়ের তলায় রেল-লাইন, আর ষ্টেশনঘর পাহাড়ের উপরে। গাড়ী থেকে নেমে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে ষ্টেশনে উঠ্‌তে হয়, তারপর যেতে হয় বাইরে।

কোট্‌দোয়ারা থেকে গড়ওয়াল আরম্ভ। গড়ওয়াল রাজ্যে মাত্র এই একটি জায়গায় রেল গেছে। কোট্‌দোয়ারাকে গড়ওয়ালের প্রধান দরজা বলা হয়। সেখান থেকে একটি সুন্দর পাকা পথ সাড়ে ছাবিবশ মাইল দূরে **ল্যান্‌স্‌ডাউন** (Lansdowne) অবধি গেছে। সেখান থেকে মোটরগাড়ীতে মাত্র ১০ মাইল দূরবর্ত্তী দুগড্ডা যাওয়া যায়।

গড়ওয়ালে ল্যান্‌স্‌ডাউনই একটি মাত্র জায়গা যেখানে সমতল দেশের লোকেরা বিনা কষ্টে ও না হেঁটে পৌঁছুতে পারে। উহা সৈন্য থাক্‌বার একটি কেন্দ্র। ওখানে অনেক গড়ওয়ালী পল্টন ও একটি গুর্খা পল্টন থাকে। ওখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে গড়ওয়ালী সেনা খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল, সেইজন্য ওখানে একটি স্মারক তৈরী করা হ'য়েছে।

ল্যান্‌স্‌ডাউনের ঠিক পাশেই **জয়হরিখাল** নামে একটি জায়গা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠ্‌ছে। গরমকালে লোকেরা ওখানে বেড়াতে যায়। সাধারণে ল্যান্‌স্‌ডাউনের চেয়ে ওখানে থাক্‌তে বেশী পছন্দ করে। ওখানে একটি সরকারি হাইস্কুলও আছে।

গড়ওয়ালের সব চেয়ে বড় ব্যবসার জায়গা হ'ল **দুগড্ডা**। দুগড্ডার জল-হাওয়া তেমন ভাল নয়। জায়গাটি বড় নোংরা। সেখানে অনেক ছোট ছোট হোটেল আছে। দুগড্ডা গড়ওয়ালের ভিতরের ভাগ থেকে অনেক দূরে। এইজন্য গড়ওয়ালীরা ১৫-২০ দিন—এমন কি ২৫-৩০ দিন হেঁটে দুগড্ডায় আসে গুড়, নুন ও কাপড় কিন্‌তে। সেখানে কুলি, ঘোড়া ও ডাণ্ডি অনেক পাওয়া যায়।

দুগড্ডা থেকে একটি **উনপঞ্চাশ** মাইল লম্বা আঁকা-বাঁকা রাস্তা চড়াই-উতরাই কর্‌তে কর্‌তে **গড়ওয়ালের** রাজধানী **পৌড়ী** (Pauri) হ'য়ে **শ্রীনগর** (গড়ওয়াল) অবধি গেছে। রাস্তাটি পাকা নয়, কেবল পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরী করা হ'য়েছে। গড়ওয়ালীদের কাছে ওই রাস্তাটি সব চেয়ে দরকারী। সেই রাস্তায় তিন-চার মাইল পর পর অনেক চটি আছে। প্রত্যেক চটিতেই অন্ততঃ দু-একটি মুদির দোকান আছে। মুদিরাই রাত্রে থাক্‌বার জন্য জায়গা দেয়। ঘর-ভাড়া লাগে না, তবে তাদের দোকান থেকে কিছু জিনিস কিন্‌তে হয়। কেউ যদি ভাত, রুটি বা লুচি খেতে চায়, তা'রা তৈরী ক'রে দেয়। সাধারণ খাবারের জন্য লোক পিছু তিন আনা ক'রে লাগে।

সেই রাস্তায় দু' জায়গায় বড় বড় জঙ্গল পড়ে। তাদের নাম **অধওয়ানী** ও **কাঁশক্ষেত** জঙ্গল। জঙ্গলে বড় বড় বাঘ ভাল্লুক আছে। অনেকে শিকার কর্‌তে আসে।

রাস্তাটি বেশীর ভাগ শুক্‌না। এক এক জায়গা বড় ভয়ঙ্কর, ঠিক নীচেই পাঁচ শ' ছয় শ' ফুট গভীর খাদ, দেখ্‌লে গা শিউরে উঠে। রাতে লোক চলাচল নাই, তবে গরমকালে ভোর হ'তে না-হ'তেই লোকেরা ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই ক'রে প্রাণ খুলে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চল্‌তে থাকে। কিন্তু শীতকালে ঘোড়ার বদলে হাজার হাজার ছাগল ও ভেড়া, পিঠে গুড় ও নুন নিয়ে উত্তর গড়ওয়ালের দিকে যেতে থাকে।

দুগড্ডা থেকে পৌড়ী ৪১ মাইল, সেখানে পৌঁছুতে তিন দিন লাগে। একই কুলি পিঠে ক'রে একমণ-দেড়মণ জিনিস পৌড়ী বা শ্রীনগর অবধি নিয়ে যায়। সেখানকার কুলিদের সাহস ও ক্ষমতা অসাধারণ।

পৌড়ী একটি ছোট্ট সহর। তথায় আদালত, স্কুল, হাসপাতাল, বড় ডাকঘর, জেল—সবই আছে। সাধারণ সব রকম দরকারী জিনিসও পাওয়া যায়, তবে রাত্রি আটটার পর বাজার একেবারে খালি, কেবল দু-একটা মুদিখানায় টিম্‌টিম্ ক'রে আলো জ্বলে। গড়ওয়ালীরা ঐ সহরকেই মনে করে কত বড়! তাদের মুখে তা'র সুখ্যাতি আর ধরে না!

পৌড়ীর জল-হাওয়া খুব ভাল। সেখান থেকে অনেক দূর অবধি বরফ-ঢাকা পাহাড় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেখানেও শীতকালে খুব বরফ পড়ে। সমতল দেশ থেকে পৌড়ী গেলে প্রথম প্রথম মনে হয়—এটা এক জগত-ছাড়া দেশ! সেখান থেকে মোটর-

ষ্টেশন ৪১ মাইল দূরে, কিন্তু সেই ৪১ মাইল পথ ফিরে যাবার কথা মনে পড়্‌লেই গা কেঁপে উঠে, প্রাণে কষ্ট বোধ হ'তে থাকে। অবশ্য গড়ওয়ালীদের কাছে এ-ত একটা আনন্দের পথ!

পৌড়ী থেকে শ্রীনগর (কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়) কেবল আট মাইল দূরে। শ্রীনগর অনেক নীচুতে। রাস্তা ঘুরে ঘুরে চ'লেছে ত চ'লেছেই; উতরাইয়ের যেন আর শেষ নেই! কেবল নীচের দিকে নামা আর নামা। পা ধ'রে যায়, বড় বিরক্তি লাগে—সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়্‌তে থাকে।

পূর্ব্বে শ্রীনগরই ছিল গড়ওয়ালের রাজধানী। পুরাণ শ্রীনগর **অলকনন্দা** নদীর বানে ধ্বংস হওয়ার পর নূতন ক'রে শ্রীনগর সহর তৈরী হ'য়েছে। শ্রীনগরে অনেক মন্দির, একটি সরকারি হাইস্কুল ও কয়েকটি বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে। **কেদারনাথ-বদরীনাথের** যাত্রীদের শ্রীনগর হ'য়ে যেতে হয়। গ্রীষ্মের ছ'মাস দলে দলে কত যাত্রী যায় ও আসে, তা'র ইয়ত্তা নেই। সেখানে সব রকম দরকারী জিনিস পাওয়া যায়। গরমকালে বেশ গরম পড়ে, এক এক সময় গায়ে জামা-কাপড় রাখ্‌তে কষ্ট হয়। শ্রীনগর সলীমসাই জুতার জন্য বিখ্যাত, তবে কিন্‌তে হ'লে অর্ডার দিয়ে তৈরী করাতে হয়।

হরিদ্বার থেকে **লছমনঝোলা** হ'য়ে যে রাস্তা বদরীনাথ গেছে, তা'কে "তীর্থযাত্রার পথ" বা "যাত্রা-লাইন" বলা হয়। ওদিকে গড়ওয়াল পাহাড় আরম্ভ হয় লছমনঝোলা থেকে।

যাত্রা-লাইন লম্বায় বদরীনাথ অবধি ১৮৩ মাইল। সেই পথেও তিন-চার মাইল অন্তর অনেক চটি আছে। অনেক গড়ওয়ালী ঐ যাত্রা-লাইনে দোকান করে। গ্রীষ্মকালে সেই পথে অনেক যাত্রী চলা-ফেরা করে। তা'রা সকাল-বিকেল হাঁটে, দুপুরে কোন চটিতে খাওয়া-দাওয়া সারে ও একটু বিশ্রাম করে, রাত্রে আবার আড্ডা গাড়ে অন্য কোন চটিতে। এই রকম ক'রে প্রত্যহ প্রায় ১০ মাইল পথ চলে।

ঐ যাত্রা-লাইনে এত মন্দির ও দেবদেবী আছে যে তা'র সংখ্যাই নেই। যাত্রীদের ভক্তি ও মনের জোর দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়।

লছমনঝোলায় একটি ঝোলা পোল আছে। ঐটাই হ'ল বদরীনাথের পথে প্রথম পোল। পোল পার হ'বার সময় যাত্রীদের প্রাণে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। পোল পার হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই সমতল ভূমিও শেষ হয়, পাহাড়ী-দেশ আরম্ভ হয়। পোল থেকে নাম্‌তে না-নাম্‌তেই, যাত্রীরা ধ্বনি করে "জয় বদরী বিশাল কী জয়।"

গরমকালে যাত্রা-লাইনের দৃশ্য অদ্ভুত। সকাল-বিকেল যাত্রীরা চ'লেছে দলে দলে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, গুজরাটী, মারওয়ারী, মাদ্রাজী আরও কত দেশের লোক চ'লেছে। কেউ চ'লেছে হেঁটে, কেউ চ'লেছে ঘোড়ার পিঠে, কেউ ডাণ্ডিতে, কেউ বা কাণ্ডিতে—সকলেরই উদ্দেশ্য এক। সকলেই যেন ক্লান্ত, চল্‌তে যেন আর পার্‌ছে না, কোন রকমে আগে পা ফেল্‌ছে মাত্র। সকলেরই পায়ে কড়া প'ড়েছে, হাপরের মত নিঃশ্বাস পড়্‌ছে, শরীর ঘামে ডুবে গেছে। এমন কি কুলিদেরও মুখ থেকে অস্ফুট বেদন-ভরা আওয়াজ বেরুচ্ছে! সকলেই চটিতে পৌঁছুবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ছে।

ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় এই যাত্রাপথে পাওয়া যায়। যাদের দেখ্‌লে মনে ভয় হয় যে, কেমন ক'রে এত চড়াই-উতরাই ক'রে এরা বদরীনাথ পৌঁছুবে, তা'রাই কিন্তু থাকে সকলের আগে!
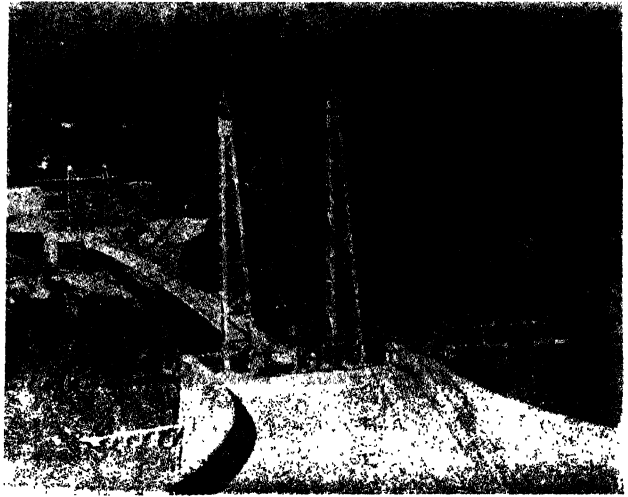
লছমনঝোলার পোল

প্রথম প্রথম পাহাড়ী-পথে যাত্রীদের হাঁট্‌তে কষ্ট হয়, তবে তিন-চার দিন হাঁট্‌বার পর তত কষ্ট আর বোধ হয় না। তাদের প্রাণে প্রথম প্রথম পাহাড়ী দৃশ্য ঢেলে দেয় অপার আনন্দ! ভোরবেলার অলৌকিক শোভা, পথের গম্ভীর নিস্তব্ধতা, চীড় (Pine) ও দেবদারু গাছের অফুরন্ত সরসর শব্দের মধুর গান, চীড়-বনের (Pine-forest) মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া, বরফ-গলা জলের কুল-কুল সুরে জঙ্গলের মধ্যে ছুট, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ীদের মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে ছাগল-ভেড়া চরান, পাহাড়ী রমণীদের এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁকিয়ে সিঁড়ি-ক্ষেতে কাজ করা, কাল কাল পাথরের উপর শাদা দুধের খালের মত গভীর নদীর ও স্বচ্ছ ঝর্‌ণার ঝিকিমিকি—এই সব দৃশ্য যাত্রীদের পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

কখন আবার তাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় শুক্‌না ও নেড়া পাহাড়ের উপর চড়াই, বিরক্তিকর রৌদ্রের চোখ-ঝল্‌সানো গরম, সন্ধ্যাবেলার বন্য পশুর ভয়, পথের সাথীদের বিমর্ষ চেহারা, ক্ষুধাভরা পেটের জ্বালা ও বেদনা-ভরা পায়ের টাটানি।

কেদারনাথের মন্দির

বেশীরভাগ যাত্রী প্রথমে কেদারনাথ তীর্থে যায়। কেদারনাথে পৌঁছুবার সাত মাইল পূর্ব্বে গৌরীকুণ্ড চটি। সেখানে গরম ও ঠাণ্ডা ধারায় স্নান ক'রে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেখান থেকেই পথ খুব কঠিন হ'তে আরম্ভ হয়। কয়েক জায়গায় পথ থাকে বরফে ঢাকা।

কেদারনাথ একটি সুবিখ্যাত তীর্থস্থান। কেদারনাথ মন্দিরের সাম্‌নে অনেকটা সমতল জায়গা আছে, কিন্তু তা' বরফে ঢাকা থাকে। সেখানে **মন্দাকিনী, সরস্বতী** ও **দুধগঙ্গা** নদীর সঙ্গমস্থানে লোকেরা স্নান করে। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু শ্রদ্ধালু বৃদ্ধারা বরফের জলে ডুব দিতে ছাড়ে না। তা'রা যখন জলে ডুব

দিতে থাকে, তখন মনে হয়, এই বুঝি বরফের ডেলা হ'য়ে গেল! কিন্তু স্নানের পর তাদের দেখে অবাক্ হ'তে হয়। তাদের শরীরে এক নূতন শক্তি এসে পড়ে।

কোয়াসা-ভরা হিমগিরির মধ্যে বিশাল কেদারনাথের মন্দির দেখ্‌বার মতন। আত্মা আনন্দে বিভোর হ'য়ে উঠে। মন্দিরটি সমুদ্রের লেভেল থেকে ১১,৫০০ ফুট উঁচুতে। কেদারনাথের পূজা কেদারনাথ মন্দিরে কেবল ছ'মাস হয়, শীতের ছ'মাস ২৭ মাইল দূরে উখীমঠে হয়। পাণ্ডারা পূজার সব জিনিস রেখে, প্রদীপ জ্বেলে ছ'মাসের জন্য মন্দির বন্ধ ক'রে চ'লে যায়; আবার বৈশাখ মাসে বরফ কেটে রাস্তা ক'রে মন্দির খোলে।

কেদারনাথ থেকে বদরীনাথ ১০৭ মাইল দূরে। আসলে জায়গা দুটি কাছাকাছি, কেবল মধ্যে একটি পাহাড়। কিন্তু ঐ পাহাড়টি এত উঁচু যে, কোন লোক পার হ'য়ে যেতে পারে না। সেইজন্য ঘুরে ঘুরে চক্কর দিয়ে যেতে হয়। সেই পথে কয়েক জায়গায় দড়ির পোলের উপর দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে যেতে হয়।

বসুধারা ঝর্‌ণা

বদরীনাথের কাছাকাছি বরফ-ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে চল্‌তে হয়। 'অলকনন্দা-গঙ্গা'ও থাকে বরফে ঢাকা, কেবল এক এক জায়গায় একটু একটু জল দেখা যায়। বদরীনাথ পেঁছুবার আগেই যাত্রীরা জুতা খুলে ফেলে—কেউ বা হাতে নিয়ে চলে, আর কেউ বা আগেকার চটিতে রেখে আসে।

উত্তরাখণ্ডে বদরীনাথ সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান—সমুদ্রের লেভেল থেকে ১০,৫০০ ফুট উঁচুতে। সেখানে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার লোক যায়। যাত্রীদের থাক্‌বার জন্য অনেক ধর্ম্মশালা আছে। বদরীনাথের মন্দির পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু; শ্বেতপাথরে তৈরী, উপরের তিন হাত সোনার পাতে মোড়া। জগন্নাথপুরীর মতন সেখানেও সকলে একসঙ্গে ব'সে ভোগ খায়।

বদরীনাথ মন্দিরও ছ'মাস বন্ধ থাকে—শীতকালে জোশীমঠে পূজা হয়। বদরীনাথের দৃশ্য অতি মনোহর। সেখানে থাক্‌লে চিত্ত শুদ্ধ, বিচার উন্নত ও মন প্রসন্ন হয়। বদরীধামকে পুরাকালে তপোধাম বলা হ'ত।

বদরীনাথ থেকে চার মাইল উত্তরে বসুধারা নামে একটি ঝর্‌ণা আছে। সেই ঝর্‌ণায় স্নান কর্‌লে পরম আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। শরীরে এক অদ্ভুত শক্তি আসে। ঝর্‌ণার জল দুইশ' ফুট উঁচু থেকে পড়্‌ছে। বসুধারার কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি পড়ে না—শাদা মেঘ বরফে ঠোকর লেগে বরফরূপ ধারণ করে !

(আস্‌ছে মাসে শেষ হবে)

শ্রীবিজয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর

কে বলে, এ মরলোকে নাই অমরতা ?
কে বলে, এ স্বপ্নযুগ অতীতের কথা ?
যথা সত্য, শান্তি, কর্ম্ম, পর-উপকার ধর্ম্ম,
যথা ত্যাগ, স্বর্গপুর বিদ্যমান তথা ;
মরলোকে স্বর্গ যথা তথা অমরতা।

আয়াসে লভিতে হয় অমরতা-ধন,
কর্ত্তব্যের মহাব্রত স্বজীবন-পণ।
হেন অমরতা-ধন কীর্ত্তি-রূপে প্রকটন,
অজর অমর সদা কীর্ত্তিমান জন,
উচ্চছন্দে কীর্ত্তিবাস স্বর্গের মতন !

অন্ধ-তমো-জীবনের আলোক-বিকাশে,
এ মানব-পুর-মাঝে স্বরগ প্রকাশে,
করিয়া জীবন-পণ কীর্ত্তিরূপ মহাধন
লভিয়া মহৎ জন যায় স্বর্গবাসে,
অমর-মূরতি ভাসে মানব-সকাশে।

মানব-হৃদয় রাজ্য কল্পতরু বন,
কীর্ত্তিরূপ অমরতা লভিতে যে জন
পর উপকার-ধর্ম্মে লাগিয়া মহৎ কর্ম্মে
পূর্ণে নিজ বাঞ্ছা কিম্বা ত্যজয়ে জীবন,
অমর এ মর-ভূমে সেই মহাজন।

শ্রীবিমলাপদ হালদার

আবর্জ্জনার মূল্য

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে তা'রা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছ যে, প্রত্যেক বাড়ীর যত ময়লা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি একত্র ক'রে বাড়ী-সংলগ্ন অপরিষ্কার জমির একধারে ফেলে দেওয়া হয় এবং এই রকমে অনেক আবর্জ্জনা একত্র হ'লে তা'তে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। ঐ আবর্জ্জনার স্তূপে আগুন না লাগালেও তা'রা বৃষ্টিধারায় এবং রৌদ্রের তেজে ক্রমশঃ পচে এবং মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

আবার তোমাদের মধ্যে যারা সহরে বাস কর তা'রা বোধ হয় জান যে, সহরের প্রত্যেক বাড়ীর যত ময়লা, নোংরা বাজে জিনিস এবং আবর্জ্জনা—সমস্তই একত্র ক'রে প্রথমে বাড়ীতে একটা টবে রাখা হয় এবং পরে সেই টবের যত আবর্জ্জনা রাস্তার ডাষ্ট-বিন্ (Dust-bin) অথবা ময়লা-ফেলা টবে ফেলে দেওয়া হয়। পরে মিউনিসিপ্যালিটির গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী অথবা মোটর-লরী এসে সেই সকল টবের আবর্জ্জনা নিয়ে যায়। এই রকমে সহরের যত ময়লা একত্র ক'রে তা'তে আগুন লাগিয়ে সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা হয়; অথবা সেই আবর্জ্জনা যন্ত্রপাতি এবং পাম্পের সাহায্যে প্রথমে নদী বা খালে এবং পরে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। কখনও কখনও আবার সেই আবর্জ্জনা দিয়ে সহরের নিকটস্থ নীচু এবং জলা জায়গা ভরাট করা হয়।

পল্লীগ্রাম বা সহরের আবর্জ্জনা যে মানুষের কোনও কাজে লাগ্‌তে পারে তা' বহুদিন পর্য্যন্ত কেউই ভাব্‌তে পারে নি। এতদিন লোকে মনে কর্‌ত 'আবর্জ্জনা আবার মানুষের কোন্ কাজে লাগ্‌তে পারে এবং আবর্জ্জনার আবার দামই বা কি!' কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এই আবর্জ্জনা থেকেই আজকাল অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এবং বর্ত্তমান যুগে আবর্জ্জনারও দাম হ'য়েছে! আবর্জ্জনা থেকে কি কি জিনিস পাওয়া যায় এবং আবর্জ্জনা মানুষের কি কাজে লাগ্‌তে পারে সেই সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

আমরা প্রত্যহ রাস্তার ময়লা-ফেলা টবে কত জিনিস যে বাজে বা অকেজো ব'লে ফেলে দেই তা'র ঠিক নেই। কিন্তু ঐ সকল বাজে জিনিসের প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও জিনিস প্রস্তুত করতে দরকার হয়। এই রকম দশ-পনেরটা ময়লা-ফেলা টবের আবর্জ্জনা একত্র কর্‌লে দেখা যায় যে, তা'তে নেই এমন জিনিসই নেই—নানারকম ধাতুর টুক্‌রো থেকে আরম্ভ ক'রে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পর্য্যন্ত সব রকম জিনিসই তা'র মধ্যে আছে!

এই আবর্জ্জনার মধ্যে কিপ্রকার জিনিস পাওয়া যেতে পারে তাই পরীক্ষা করার

জন্যে ইংলণ্ডের বার্‌মিংহাম্ সহরের প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীর ময়লা-ফেলা টবের যত আবর্জ্জনা একত্র ক'রে দেখা গিয়েছিল যে, তা'তে চার আউন্স সোনা, ১৭০ আউন্স রূপা, সাত টন পিতল, দু'টন তামা, এক টন সীসা, দু'টন এলুমিনিয়ম্, তিন হন্দর টিন এবং সীসা-মিশ্রিত এক রকম ধাতু, দু'টন দস্তা এবং আরও বহুপ্রকার জিনিস আছে, এবং তাদের মোট মূল্য প্রায় ২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৭০০০ টাকা!

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে কি ক'রে এই আবর্জ্জনা থেকে ঐ সকল জিনিস কম খরচে উদ্ধার ক'রে সেগুলো আবার আমাদের কাজে লাগান যায়। তাঁদের চেষ্টার ফলে এখন অসাধ্য সাধন করা সম্ভবপর হ'য়েছে। এমন কি মল, মূত্র প্রভৃতি ময়লা যা সহরের ড্রেনের মধ্য দিয়ে নদী বা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা'ও আজকাল জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা' থেকে এক রকম ইট এবং টালি তৈরী হয়। আবার এই ময়লা ক্ষেতে সার দেওয়ার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

ময়লা-ফেলা টবে যত আবর্জ্জনা ফেলা হয় তা'র মধ্যে ছেঁড়া জামা-কাপড় এবং ছেঁড়া ন্যাকড়াই প্রধান। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে যে, ইংলণ্ডের সমস্ত ময়লা-ফেলা টবে প্রতি বছর যত ছেঁড়া পশমী জামা, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি ফেলে দেওয়া হয়, তা'র পরিমাণ প্রায় ১৯০০০ টন, অর্থাৎ প্রায় ৫৫০,০০০ মণ! এই পরিমাণ ছেঁড়া পশমী জামা, মোজা প্রভৃতি যদি ঐ ভাবে না ফেলে দেওয়া হয়, তা হ'লে সেগুলো যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিষ্কার ক'রে, নূতন পশমের সঙ্গে মিশিয়ে, তা' থেকে আবার নূতন জামা, মোজা সোয়েটার প্রভৃতি তৈরী করা যায়। এইভাবে ছেঁড়া পশমী জিনিসগুলো ব্যবহার কর্‌লে প্রতি বছর ১৯০০০ টন পশম বিদেশ থেকে আমদানী কর্‌তে হয় না! কাগজ এবং পোষ্টকার্ড প্রস্তুত কর্‌তে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া লাগে।

এইরকমে আবর্জ্জনা থেকে যথাসম্ভব কাজের জিনিস বেছে নিয়ে, আবর্জ্জনার বাকী অংশ একত্র ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জ্বালানোর ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা'র সাহায্যে জল থেকে ষ্টীম বা বাষ্প প্রস্তুত করা হয়। সেই বাষ্পে 'ডায়নামো' চালান যায় এবং ডায়নামোর সাহায্যে ইলেক্‌ট্রিক্ উৎপন্ন হয়। আবর্জ্জনা জ্বালানোর পর যা' অবশিষ্ট থাকে তা' থেকে ইটের মত একরকম খুব শক্ত জিনিস পাওয়া যায় এবং সেগুলো রাস্তা প্রস্তুত করার কাজে লাগে। ইউরোপ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সহরে এই উপায়ে আবর্জ্জনাকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগান হয়।

এইবার, প্রধানতঃ কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে এই আবর্জ্জনাকে কাজে লাগান হয় সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি। প্রত্যেক বাড়ী বা রাস্তার ময়লা-ফেলা টবের যত আবর্জ্জনা একত্র ক'রে এক একটা বড় ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরের মধ্যে একরকম ইলেক্‌ট্রিক্‌ পাখার সাহায্যে খুব জোরে বাতাস চালিয়ে দেওয়া হয় এবং তা'র ফলে ঐ আবর্জ্জনার মধ্যে যত ধূলা থাকে সে সমস্তই একটা ছোট দরজা দিয়ে বা'র হ'য়ে পাশের একটা ঘরে জমা হয়। সেই ধূলা ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর-লরীতে ক'রে নিয়ে গিয়ে সহরের নীচু জায়গাতে ফেলে দেওয়া হয়—যাতে সেই সকল জায়গা ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে উঠে। এইভাবে ধূলা আলাদা করার পরে ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত জিনিসপত্র আলাদা করা হয়। তোমরা বোধ হয় চুম্বক লোহার নাম শুনেছ। আবর্জ্জনা থেকে ধূলা ঝেড়ে ফেলার পর খুব শক্তিশালী চুম্বক লোহা দিয়ে তা'র মধ্যকার সমস্ত ধাতুনির্ম্মিত জিনিস আলাদা ক'রে নেওয়া হয় এবং এই উপায়ে আবর্জ্জনা থেকে অনেক সময়ে সোনার আংটি, বোতাম, রূপার মেডেল, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনেক সময়ে অসাবধানতার ফলেই এই সকল জিনিস আবর্জ্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

আবর্জ্জনা থেকে জগতের কি উপকার হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ইউরোপের এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধ'রে চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে ঐ সকল দেশের আবর্জ্জনা থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস তৈরী করা সম্ভবপর হ'য়েছে। সে-সব দেশের অনেক সহরের রাস্তায় 'ফুটপাথ' এবং বাড়ী তৈরী কর্‌তে যে টালি ও ইটের প্রয়োজন, আবর্জ্জনা থেকেই সেই ইট ও টালি প্রস্তুত হয়।

তোমরা চুল বা নখ বড় হ'লে নাপিত দিয়ে কেটে ফেল। কিন্তু চুল এবং নখ থেকেই রাসায়নিক ঔষধপত্রের সাহায্যে আজকাল অনেক রকম রাসায়নিক জিনিস ও ঔষধ তৈরী হচ্ছে! মানুষের চুল যে কোনও কাজে লাগ্‌তে পারে তা' এতদিন কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মেণীতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, মানুষের চুল থেকে পশম তৈরী করা যায় এবং সেই পশম ভেড়ার লোমে প্রস্তুত পশমেরই মত। এখন জার্ম্মেণীতে চুলকাটার দোকান থেকে প্রতিদিন রাশি রাশি চুল পশমের কারখানায় পাঠান হয় এবং যে চুল কিছুদিন পূর্ব্বেও আবর্জ্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হ'ত, তাই এখন মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম. এ., বি. এস্‌-সি, বি. কম্‌

অচিন পথের যাত্রী

হতভাগা হান্‌সের সংসারে আর কেহই রইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পিতা হান্‌সের মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"হান্‌স, উপরে ভগবানে বিশ্বাস রেখো, তিনি তোমার সহায় হবেন।" দুফোঁটা চোখের জল বৃদ্ধের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

বাইরে প্রবল ঝড়। ঘন অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে' আকাশের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত চিরে ফেল্‌ছে। পিতার মৃত্যু-শীতল বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হান্‌স কখন ঘুমিয়ে পড়্‌ল। সে স্বপ্ন দেখ্‌ল— বাবা আবার ফিরে এসেছেন। একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়ে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে তা'র পাশে দাঁড়িয়ে। এত সুন্দর যে মানুষ হয় হান্‌স তা' ধারণা ক'র্‌তে পারে না। বাবা বল্লেন,—"হান্‌স, এই কুমারীকে তুমি ডা'নের হাত থেকেরক্ষা কর।" হান্‌সের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

হান্‌সের প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেও বের হ'ল অচিন দেশের সন্ধানে—বন্ধনহীন পাখীর মত।

সকালে উঠে' হান্‌স চল্‌ল গীর্জ্জায়। সেখানে সে কত রবিবার বাবার হাত ধ'রে গেছে। আজ সে একা। হাঁটু গেড়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা কর্‌ল। মন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে এল। হান্‌স ভাব্‌ল ঐ উপরে স্বর্গ,—ওখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, বিচ্ছেদ নেই। তা'র বাবা এখন সেখানে আছেন। সে শুনেছে সৎ-লোকেরা মৃত্যুর পর সেখানে যেতে পারে। সেও ত কাহারও অনিষ্ট করে নাই। কবে সেদিন আস্‌বে—সে বাবার কাছে যেতে পার্‌বে! কবরখানায়, তা'র বাবার কবরের পাশে ব'সে সে প্রার্থনা কর্‌ল। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে কবরের উপর ছড়িয়ে দিল। পাশেই কার অনাদৃত কবর—ঘাসে ঢেকে ফেলেছে; হান্‌স সেটা পরিষ্কার ক'রে তা'র উপরও কিছু ফুল ছিটিয়ে দিল; তারপর সোজা চালিয়ে দিল পা,—দুচোখ যেদিকে যায়। দুপুরের আগেই পথটা এসে ঢুক্‌ল একটা বনে। দূরে একটা ঝর্‌ণা। হান্‌স তা'রই পাশে ব'সে বিশ্রাম কর্‌ল। থলে থেকে বাসি রুটি বের ক'রে সে ঝর্‌ণার শীতল জল আর রুটিতেই মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ কর্‌ল। সম্বল তা'র ঐ থলে আর গোটা দশেক টাকা। সন্ধ্যার আগেই চারদিক অন্ধকার ক'রে উঠ্‌ল ঝড়। হান্‌স ছুট্‌তে ছুট্‌তে উঠ্‌ল গিয়ে একটা গীর্জ্জায়। সমস্ত দিনের শ্রান্তিতে চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল। যখন জাগ্‌ল তখন পরিষ্কার আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে।

ঘরের ভিতর আব্‌ছা অন্ধকারে সে দেখ্‌লে একটা খোলা কফিন একটা শব বুকে ক'রে প'ড়ে আছে। হান্‌স ওতে একটুও ভয় পেল না, কারণ সে জানে, মৃতের সাথে জীবিতের কোনও শত্রুতা নেই। তা'রা কোনও অনিষ্ট করে না। মানুষের শত্রু মানুষ—প্রেতাত্মা নয়। হান্‌স আরও দেখ্‌লে যে, নিষ্ঠুরপ্রকৃতির দুটি লোক সেই মৃতদেহটাকে কফিন থেকে টেনে বের কর্‌ছে। হান্‌স ছুটে গিয়ে তাদের বারণ ক'রে বল্লে,—"ছি ভাই! ওকে আর কেন জালাতন কর। এ জগতের দেনা-পাওনা সব মিটিয়েই ত সে চ'লে গেছে। এখন ওকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।"

লোক দু'টি তাদের ঘৃণিত মুখ আরও বিকৃত ক'রে বল্লে—"রেখে দাও তোমার সাধুতা, কে না চিন্‌ত এই জোচ্চোরকে ? হতভাগা সকলের কাছ থেকেই টাকা নিত, ফিরিয়ে দেবার নামটিও করত না। বেঁচে থাকৃতে অতগুলি টাকা নিল,—আর কি আমরা তা'র একটি পয়সারও মুখ দেখ্‌ব ?"

হান্‌স নিজের সমস্ত সম্বল তাদের হাতে তুলে দিয়ে বল্লে,—"ভাই! আমার আর ত কিছুই নেই, এ নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও। এ শবটা শেয়াল কুকুরের মুখে তুলে দিয়ে ত তোমাদের কোনও লাভ নেই।"

লোক দুটি আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল। হান্‌স শবটিকে আবার কফিনের ভিতর রেখে দিয়ে তা'র আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করল; তারপর দেওয়ালের গায়ে পিঠ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্য্য ঠাকুর পূর্ব্বাকাশে রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বার সাথে সাথেই সুরু হ'ল তা'র যাত্রা। দুপুরের রোদ পৃথিবীখানাকে যেন পুড়িয়ে ফেল্‌ছে। হান্‌সের পা আর চলে না। সে ব'সে পড়ল একটা গাছের শীতল ছায়ায়। কে একজন কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,—"তুমি কোথায় যাবে ভাই ?"

হান্‌স উত্তর দিল,—"আমি বের হ'য়েছি পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায় তাই খুঁজ্‌তে।"

পথিক খুশী হ'য়ে বল্লে,—"আমার উদ্দেশ্যও তাই, চল একসাথে যাওয়া যাবে।"

আবার চলে তা'রা। বনের ধারে একটা বুড়ী কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাঠের বোঝা বুড়ীর চেয়ে বেশী ভারী। হঠাৎ পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়ে বুড়ী কাতরস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। হান্‌স আর তা'র অচিন পথের সাথী ছুটে গেল তা'র সাহায্য করতে। বুড়ী তাদের দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করল। কিন্তু বন্ধু বল্লে,—"বুড়ী মাসী, তোমার বোঝা থেকে আমায় তিনটি কাঠি দিতে হবে।" বুড়ী খুশী হ'য়ে তা' দিল।

পথ চল্‌তে চল্‌তে হান্‌স জিজ্ঞেস করলে,—"এ দিয়ে কি হবে বন্ধু ?"

সে হেসে উত্তর দিল,—"পৃথিবীর সব জিনিসই কাজের, কখনও হয়ত কাজে লাগ্‌তে পারে।"

সন্ধ্যার সময় তা'রা এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল। সেখানে খুব আমোদ চল্‌ছিল।

হান্‌স আর তা'র সাথী আসরের একধারে গিয়ে বসল। চমৎকার পুতুল নাচ হচ্ছিল। ছোট ছোট পুতুল চমৎকার পোষাক প'রে—রঙ্গমঞ্চে নেচে নেচে ঘুর্‌তে থাকে। একটা পুতুল,—তার গোল গোল চোখ দুটি সর্ব্বদাই ঘুর্‌ছে। মঞ্চে এসে হাত তুল্‌তেই নাচ বন্ধ হ'য়ে যায়। আর অম্‌নি এল রাজা আর রাণী পুতুল। রাণীই এই খেলোয়ারের সবচেয়ে সুন্দর পুতুল। পোষাকও তা'র রাণীর মতই জম্‌কাল। একটা কসাই তা'র পোষা কুকুর নিয়ে মঞ্চের কাছে ব'সেছিল। রাণী যেই হাত-পা নেড়ে অভিনয় করতে যাবে, অম্‌নি কুকুরটা এক লাফে ধরল গিয়ে রাণীর ঘাড় কাম্‌ড়ে—আর সাথে সাথে রাণী হ'ল দু'টুকরো! পুতুলওয়ালা তা'র সব চেয়ে সুন্দর পুতুলের এই দুর্দ্দশা দেখে কেঁদে ফেল্লে। হান্‌সের বন্ধু এগিয়ে এসে পুতুলের গায়ে একটা মলম মালিশ করতেই পুতুল যোড়া ত লাগ্‌লই, তা' ছাড়া হাত-পা নেড়ে নাচ্‌তেও লাগ্‌ল। পুতুলওয়ালা অনেক ধন্যবাদের সাথে তা'কে কিছু পুরস্কার দিতে চাইল। সে বল্‌লে,—"টাকা তুমি রেখে দাও; তোমার কাজে লাগ্‌বে। আমি মুসাফের, তোমার কোমরের বাঁকা তলোয়ারখানা দিলে আমি খুশী হ'ব।" খেলোয়ার নিজ হাতে তলোয়ারখানা তা'র কোমরে বেঁধে দিল।

ভোরের সাথে সাথে তা'রা আবার বেরিয়ে পড়্‌ল। একটা উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে যেতে শুন্‌তে পেল একটা মিষ্টি গান দূর থেকে ভেসে আস্‌ছে। ক্রমেই কাছে—আরও কাছে। ক্রমে তা'রা দেখ্‌তে পেল একটা রাজহাঁস করুণস্বরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তাদের পায়ের কাছে এসে প'ড়ে গেল। হান্‌সের বন্ধু হাঁসটির সুন্দর বড় বড় পাখা দু'খানা কেটে নিয়ে বল্‌ল,—"দেখ্‌ছ হান্‌স! তলোয়ারখানা ছিল ব'লেই কাজে লাগ্‌ল।"

তা'রা আরও এগিয়ে চল্‌ল। দুপুরের আগেই একটা সুন্দর সহরের মধ্যে গিয়ে তা'রা পৌঁছল এবং একটা ভাল হোটেলে ঢুকে স্নান ক'রে নিল। বাইরে সুন্দর ঐক্যতান বাজ্‌তে বাজ্‌তে হোটেলের দিকেই আস্‌ছিল। তা'রা হোটেলওয়ালার কাছে শুন্‌ল—এদেশের রাজকুমারী ঘোড়ায় চ'ড়ে নগর-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পৃথিবীতে নাকি তাঁর মত সুন্দরী মেয়ে খুব কমই আছে। কিন্তু তাঁর বাহিরটা যেমন সুন্দর ভিতরটা তেমনই কদর্য্য। এদেশের লোকেরা তাঁকে রক্তলোলুপ রাক্ষসী ব'লে জানে। তাঁর সৌন্দর্য্যের মোহে প'ড়ে কত যুবক যে অকালে প্রাণ হারিয়েছে—তা'র ইয়ত্তা নেই। যে কেউ তাঁর পাণি-প্রার্থী হ'তে পারে; কিন্তু তা'কে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পার্‌লে কুমারী তা'কে বিয়ে কর্‌বেন। আর রাজ্যের ভবিষ্যৎ মালিক হবে সে। কারণ রাজার ঐ একমাত্র মেয়ে। কিন্তু অকৃতকার্য্যতার বিনিময়ে দিতে হবে পাণি-প্রার্থীর প্রাণ। আজ পর্য্যন্ত কেউ রাজকুমারীর প্রশ্নের ঠিক্ উত্তর দিতে পারে নি।

হান্‌স ঘৃণায় মুখ বিকৃত ক'রে বল্লে,—"রাজকুমারী নিশ্চয়ই একটা ডাইনী, তা'র উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে—জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা।"

তা'রা কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তেই রাজকুমারী ঘোড়ার পিঠে তাদের হোটেলের সম্মুখের রাস্তায় এসে পড়্‌লেন। কুমারী প্রকৃতই সুন্দরী। এত সুন্দরী যে, চোখ্‌কে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। একটা দুগ্ধ-ধবল ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি বেড়ান। তাঁর পোষাক যেন সহস্র প্রজাপতির পাখায় তৈরী। মাথায় সোনার মুকুট রোদে চিক্‌চিক্ ক'রে জ্বল্‌ছে। কিন্তু সমস্ত পোষাকের চাকচিক্য তাঁর রূপের কাছে ম্লান হ'য়ে আছে। হান্‌স মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।—এ কি! এই কুমারীকেই ত সে দেখেছিল স্বপ্নে। অজ্ঞাতে তা'র মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল—"হ'তেই পারে না সে এত নিষ্ঠুর। আমি যা'ব তা'র প্রশ্নের উত্তর দিতে।"

হান্‌সের বন্ধু ও হোটেলওয়ালা তা'কে অনেক ক'রে বারণ কর্‌লে। কিন্তু হান্‌স কোন কথাই শুন্‌ল না, তখনই বের হ'য়ে পড়্‌ল রাজবাড়ীর সন্ধানে। বুড়ো রাজা তা'কে অনেক বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লেন। হান্‌স তখনও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। রাজা তা'কে নিয়ে গেলেন কুমারীর প্রমোদ-উদ্যানে। তা'রা ঢুক্‌তেই একটা দমকা হাওয়ায় বৃক্ষ-বিলম্বিত নর-কঙ্কালগুলি থর-থর ক'রে উঠ্‌ল—বহুকালের অভিমান-রোষে যেন তা'রা গুম্‌রে উঠ্‌ছে! এই বীভৎস দৃশ্যে হান্‌সের মন হ'য়ে উঠ্‌ল বিষাক্ত। রাজাও উঠ্‌লেন ছেলেমানুষের মত কেঁদে। সেখানে তা'রা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌লেন না। ফিরে এসে হান্‌স হল্‌ঘরে

ব'সে রইল গুম্ হ'য়ে। একটু পরেই কুমারী ফিরে এলেন। হান্‌সকে তিনি খুব সাদরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। রাজকুমারীর মিষ্টি ব্যবহারে ও তাঁর সদ্য শিশির-ধৌত শুভ্র গোলাপের মত মুখের দিকে চাইতেই হান্‌স তাঁর সকল নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে গেল। সে তা'র প্রার্থনা জানাতেই রাজকুমারী খুশী হ'য়ে তা'কে বল্লেন—"বেশ, কাল সকালে আপনি আস্‌বেন। আমি কি ভাব্‌ছি তা' আপনি ঠিক বল্‌তে পার্‌লে, তারপর আরও দুইটি ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর কর্‌তে পার্‌লে, আপনি হবেন আমার স্বামী; আর অকৃতকার্য্যতার অর্ঘ্য হবে আপনার ছিন্ন শির।"

হান্‌স রাজী হ'য়ে ফিরে গেল হোটেলে। বন্ধুকে জড়িয়ে ধ'রে সে বল্‌লে—"বন্ধু! আজই হয়ত আমাদের শেষ দিন।"

বন্ধু বল্‌ল—"আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুমি জয়ী হও।"

সান্ধ্য-ভোজনের পর হান্‌স শুয়ে পড়্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পুরীটা নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। হান্‌সের বন্ধু হাঁসের পাখা দুইটি নিজের দু'হাতে শক্ত ক'রে বাঁধ্‌ল। তারপর বুড়ীর দেওয়া ছড়ি থেকে একটা ছড়ি বেছে নিয়ে জান্‌লা দিয়ে উড়ে' বেরিয়ে পড়্‌ল—রাজবাড়ীর দিকে। রাজকুমারীর শোবার ঘরের কাছে সে নাম্‌ল। ঠং ঠং ক'রে ঘড়ীতে যখন এগারটা বেজে গেল, খট্ ক'রে তখন খুলে গেল একটা জান্‌লা, আর সাথে সাথে রাজকুমারীও উড়ে' চল্‌লেন আকাশের গায়। হান্‌সের বন্ধুও অদৃশ্য হ'য়ে তাঁর পিছু নিল, আর অনবরত ছড়ি দিয়ে রাজকুমারীর পিঠে মার্‌তে লাগ্‌ল খোঁচা। রাজকুমারী কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, কারণ হান্‌সের বন্ধু হ'তে পার্‌ত অশরীরী। কুমারী ভাব্‌লেন আজ বড় শিল পড়্‌ছে। সে তা'র পাখা চালিয়ে দেয় জোরে। তা'রা একটা পাহাড়ের কাছে আস্‌তেই বিকট শব্দ ক'রে পাহাড়টা গেল দু'ফাঁক হ'য়ে। দু'জনই ঝাঁ ক'রে ঢুকে পড়্‌ল তা'র ভিতরে। অম্‌নি পাহাড় হ'য়ে গেল বন্ধ!

রাজকুমারী বস্‌তেই ডাইনটা ব'সে পড়্‌ল তাঁর পাশে

ভিতরে সুন্দর হল্‌ঘর। দেয়ালের গায় লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা রংএর বাতি—পর পর নিভ্‌ছে আর জ্বল্‌ছে। কিন্তু কেউ যদি ভাল ক'রে দেখে তবে দেখ্‌তে পাবে যে, ঐগুলি মোটেই বাতি নয়—অসংখ্য বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে আছে, আর তাদের নিঃশ্বাসে ঐরকম আলো হচ্ছে। হলের মাঝখানে একটা কৌচ, তা'র গদী হচ্ছে কতকগুলি বড় বড় ইন্দুর। কৌচের উপর ব'সে আছে একটা

কদাকার ডাইন। সে মহাসমারোহে রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করল। রাজকুমারী সেই কৌচটায় বসতেই ডাইনটা ব'সে পড়ল তাঁর পাশে। অনেকক্ষণ তাদের গল্প-গুজব চলল।

রাজকুমারী বললেন,—"আমার একজন নূতন প্রণয়ী এসেছে। কাল সকালে কি ভাবা উচিত বল।"

ডাইন হেসে বল্লে,—"কাল তুমি তোমার জুতার কথা ভেবো। সে কখনও উত্তর করতে পারবে না। তুমি কিন্তু তা'র চোখ দুটো তুলে নিয়ে আসবে, কারণ ওদুটো আমার সান্ধ্য-ভোজন উপাদেয় ক'রে তুলবে।"

হান্‌সের বন্ধু সব কথাই শুনছিল, কারণ সে অদৃশ্য হ'য়ে ঠিক তাদের পিছনেই ছিল। একটু পরেই নাচ সুরু হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে আমোদের হল্লা ছুটতে লাগল। ভোরের আগেই রাজকুমারী আবার ফিরে চললেন। হান্‌সের বন্ধুও চলল তা'কে মারতে মারতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত। হোটেলে যখন সে পৌঁছল তখন ভোর হবার বেশী বাকী নেই। সে পাখা দু'খানা খুলে শুয়ে পড়ল হান্‌সের পাশে।

সকালে হান্‌স বন্ধুর কাছে বিদায় চাইতে সে পূর্ব্বরাত্রির কোন বৃত্তান্ত না ব'লে শুধু বলল,—"হান্‌স! কুমারীর প্রশ্নের উত্তরে তা'কে বলবে যে, সে তা'র জুতার কথা ভাবছে।"

হান্‌স বলল,—"বন্ধু! স্বপ্নে কোনও দেবদূত তোমায় একথা ব'লে গেল নাকি? আমি নিশ্চয়ই তোমার উপদেশ অনুসারে কাজ করব। কারণ আমি বিশ্বাস করি ভগবান আমার সহায় আছেন।"

হান্‌স রাজবাড়ী পৌছবার পূর্ব্বেই অসংখ্য লোকে রাজসভা ভ'রে আছে। রাজা অতি দীনভাবে সিংহাসনে ব'সে আছেন, সভাসদ্‌গণ তাঁরই দু'ধারে বিষণ্ণবদনে ব'সে; দর্শকগণ নিস্তব্ধ, একটা বিপদের আশঙ্কায় সবাই আচ্ছন্ন। শুধু রাজকুমারী সোৎসাহে এগিয়ে হান্‌সকে অভ্যর্থনা করলেন। হান্‌স আসন গ্রহণ করতেই রাজকুমারী প্রশ্ন করলেন,—"বলুন আমি কি ভাবছি।"

হান্‌স কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বলল—"আপনি আপনার জুতার কথা ভাবছেন।"

এক নিমিষে কুমারীর মুখখানা ছাইয়ের মত শাদা হ'য়ে গেল। তিনি হান্‌সের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। উল্লাসে রাজা মাথার মুকুট ঊর্দ্ধে ছুড়ে দিলেন। সমস্ত সভাস্থলে একটা আনন্দের তুফান উঠল। হান্‌সের জয়ে সকলেই আনন্দিত,—অন্ততঃ একদিনের জন্যও হান্‌স জয়ী। হান্‌সের বন্ধুও এসংবাদে খুব সুখী হ'লেন।

সে-রাত্রিতেও হান্‌স ঘুমিয়ে পড়লে পর বন্ধু বেরিয়ে পড়ল পূর্ব্বরাত্রির মত। এবার সে দু'খানা ছড়ি নিল। সমস্ত রাস্তা সে কুমারীকে দু'খানা ছড়ি দিয়ে মারলে। দুষ্টু ডাইনটা কুমারীকে এবার তা'র চোখের কথা ভাবতে বলল। পরদিন ভোরেও হান্‌স তা'র বন্ধুর পরামর্শে জয়ী হ'লেন। কুমারীর অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াল। এদিকে রাজার আনন্দ বাড়ল দ্বিগুণ। হান্‌স তা'র বন্ধুকে জড়িয়ে ধ'রে বলল,—"বন্ধু, আর একদিন যদি জয়ী হ'তে পারি তবে তোমার গুণের কথা ভুলব না।"

সে-রাত্রে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। হান্‌সও শীগ্‌গির শুয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে হান্‌সের বন্ধু ভীষণ দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে বেরিয়ে পড়ল। এবার তা'র বাঁকা তলোয়ারখানা ও তিনটি ছড়ি সাথে নিলে। ঠিক ১২টার সময় রাজকুমারী বের হ'য়ে গেলেন। দু'দিনের পরাজয়ে তাঁর চেহারা বদ্‌লিয়ে গেছে।

সে উজ্জ্বলতা আর নেই। বাইরে আস্‌তেই হান্‌সের বন্ধু ছড়ি দিয়ে তাঁ'কে মার্‌তে সুরু কর্‌ল। কুমারীর কোমল শরীর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝর্‌তে লাগ্‌ল। অতিকষ্টে কুমারী উড়ে' চল্‌লেন; পাহাড়ের ভিতর ঢুকেই সোজা চল্‌লেন হল্‌ঘরের দিকে। ডাইন তাঁ'কে অনেক সান্ত্বনা দিল, কিন্তু কুমারী সে কথায় আস্থা স্থাপন কর্‌তে পার্‌লেন না। ডাইন তাঁ'কে বল্‌ল,—"এবার এমন কথা ভাব্‌তে বল্‌ব যে, আমার চাইতে বড় ডাইন না হ'লে সে কিছুতেই তা'র উত্তর দিতে পার্‌বে না। তুমি কাল আমার মাথার কথা ভাব্‌বে।"

রাজকুমারী এতে অনেকটা আশ্বস্ত হ'লেন; তারপর চল্‌ল তাদের স্ফূর্ত্তি। সে-রাত্রে অনেকক্ষণ তাদের নাচগান চল্‌ল। ভোর হবার কিছু আগে ডাইন বল্‌ল,—"চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।"

যাবার পথে হান্‌সের বন্ধু তা'র তিনখানা ছড়িই তাদের পিঠে ভাঙ্‌ল। ডাইন যেই কুমারীকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফির্‌ছিল, অমনি হান্‌সের বন্ধু তা'র জটাওয়ালা দাড়ী ধ'রে তলোয়ারের এক আঘাতে তা'র মুণ্ডটা ঘাড় থেকে আলাদা ক'রে দিলে এবং তা'র শরীরটা নদীতে নিক্ষেপ কর্‌ল; আর মাথাটা ভাল ক'রে ধুয়ে একটা রুমালে বেঁধে ফিরে এল হোটেলে। পরদিন যখন হান্‌সের রাজবাড়ী যাবার সময় হ'ল তখন বন্ধু হান্‌সের হাতে রুমালে বাঁধা একটা জিনিস দিয়ে বল্‌ল—"হান্‌স! আজ যখন কুমারী তোমায় প্রশ্ন করবে তুমি তখন কোন কথা না ব'লে শুধু এ রুমালখানা খুলে ভিতরের জিনিসটা তা'র সাম্‌নে ধর্‌বে। তা'র আগে এটা কোথাও রেখো না বা কারুর হাতে দিও না, তুমি নিজেও খুল্‌বে না।"

হান্‌স বের ক'রে দিল সেই কাটামুণ্ড!

সভা আজ কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। দাঁড়াবার স্থানটুকুও নেই। রাজা মূল্যবান পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে সভা উজ্জ্বল ক'রে ব'সে আছেন। সর্ব্বত্র একটা আশা ও আনন্দের উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে। রাজকুমারী দীনভাবে সভায় প্রবেশ কর্‌লেন। তাঁর চেহারার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কুমারী অবসন্নভাবে একটা আসনে ব'সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌লেন তাঁর প্রশ্ন। হান্‌স মুহূর্ত্তমধ্যে বের ক'রে দিল সেই কাটামুণ্ড! মুণ্ডটা দেখে হান্‌স নিজেই চম্‌কে উঠ্‌ল! রাজকুমারী টল্‌তে টল্‌তে হান্‌সের দিকে ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"আজ থেকে তোমায় আমি স্বামিত্বে বরণ ক'রে নিলাম।"

হান্‌স তাঁর হাত ধর্‌তেই কুমারী মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন তা'র সবল বাহুর ভিতর।

সমস্ত রাজ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল—আনন্দের হল্লা চল্‌ল দিনরাত। রাজা তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার খুলে দিলেন। আনন্দের বন্যায় হান্‌স ভুলে গেল তা'র বন্ধুর কথা; কিন্তু বন্ধু ভুল্‌তে পার্‌ল না। সে রাজবাড়ীতে গিয়ে হান্‌সের সাথে দেখা কর্‌ল। হান্‌স তা'কে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল—"বন্ধু! তোমার জন্যই আমার এ সম্পদ্। আমার সাথে থেকে তুমি এ আনন্দের অংশ গ্রহণ কর।"

বন্ধু বল্লে,—"বন্ধু! তা' হয় না। আমার কাজ ফুরিয়েছে, এখন আমায় যেতেই হবে। তোমার সাথে আমার বিশেষ কোন পরিচয় হ'য়ে উঠে নাই। তুমি হয়ত জান না আমি কে, তাই যাবার আগে পরিচয় দিতে এসেছি। আমি সেই অকৃতজ্ঞ;—ঋণী ব'লে এ পৃথিবীর সবাই যাকে ঘৃণা করে, যার অপমানিত শবকে তুমি সর্ব্বস্ব দিয়ে রক্ষা করেছিলে। দুঃখময় পৃথিবীতে আমি চিরদিন অভাবের নিষ্পেষণে কাটিয়েছিলাম; তাই আমার ঋণের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর পরেও তুমি আবার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় ঋণী কর্‌লে; সে ঋণ এখন বোধ হয় কিছুটা শোধ কর্‌তে পেরেছি—এখন বিদায় দাও বন্ধু।" হান্‌সের চোখের সম্মুখে তা'র পথিক বন্ধুর শরীর আব্‌ছা হ'য়ে আস্‌ল, ক্রমে তা' আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল!

হান্‌স অবাক্ হ'য়ে সেই দিকে চেয়ে রইল—তারপর হাত তুলে চীৎকার ক'রে বল্‌ল—"হা ভগবন্! যে এত মহৎ, এত কৃতজ্ঞ, তা'রই নাম কলঙ্কিত ক'রে লাকে বলে—ঠগ, জোচ্চোর, অকৃতজ্ঞ! এ পৃথিবীতে যে চিরদিন ঘৃণ্য ও অকৃতজ্ঞ হ'য়ে রইল তা'র প্রতি তুমি সুবিচার ক'রো প্রভু!"

শ্রীবীণা সেন

কষ্টের ফল

কাপড় কাঁদিয়া কহে—"শুন ধোপা ভাই,
নিঠুর তোমার মত কভু দেখি নাই।
উপরে উঠায়ে পরে আছাড়িয়া জোরে
এমন করিয়া কেন কষ্ট দাও মোরে।"

হাসিয়া কহিল ধোপা—"আছাড়ি বলিয়া
নরগণ গায়ে দেয় আদর করিয়া।
নরের ভূষণ হও কষ্ট পাও ব'লে;
কষ্ট বিনা মিষ্টলাভ হয় কি ভূতলে?"

পেয়ার আহাম্মদ

বিচিত্র বার্ত্তা

(১)

মার্কিন মুল্লুক একটি আজব দেশ। ঐ দেশের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। সমগ্র আমেরিকা ঐ নামে পরিচিত হইলেও 'মার্কিন মুল্লুক' বলিলে সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেই বুঝায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-বাণিজ্যে, ধন-ঐশ্বর্য্যে—প্রায় সকল বিষয়েই সেই দেশের অধিবাসীরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের শতকরা মাত্র পাঁচজন লোকে লেখাপড়া জানে, কিন্তু সেই দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকই শিক্ষিত।

শিল্প-বাণিজ্যে তাহারা কিরূপ উন্নত—সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ড্ মোটরকারের আবিষ্কর্ত্তা হেন্‌রী ফোর্ড্ ও স্বনামখ্যাত পেট্রোল-ব্যবসায়ী রক্‌ফেলারের জীবন-কথায় আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। হেন্‌রী ফোর্ড্ প্রথম জীবনে সাপ্তাহিক ২৭৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহার দৈনিক আয় প্রায় বার লক্ষ টাকা! একমাত্র অধ্যবসায়ের ফলেই বিগত অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে তিনি এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। দৈনিক বার লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বা প্রতি ছয় মিনিটে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবের এড্‌সেল ফোর্ডের বাড়ীও ঐ মার্কিন মুল্লুকে।
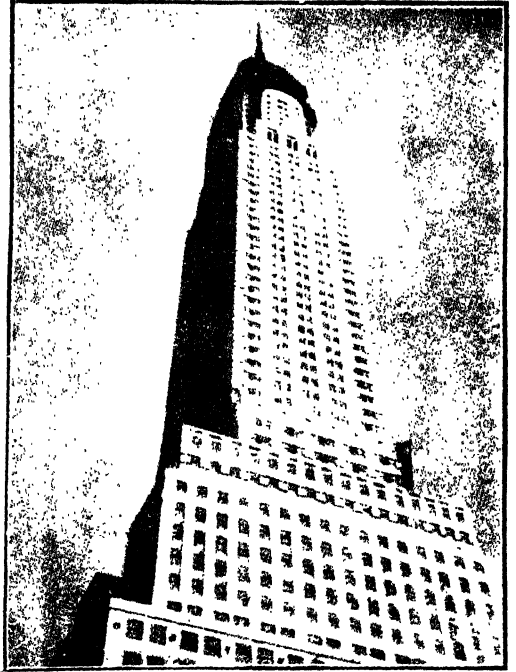
পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা

স্থপতি-বিদ্যায়ও তাহারা অতুলনীয়। আমাদের দেশে খালি জায়গা খরিদ করিয়া মানুষ তাহার উপরে বাড়ী তৈয়ার করে, কিন্তু সেই দেশে নাকি বাড়ী তৈয়ারের জন্য সব

সময়ে খালি জায়গার দরকার হয় না ; সেখানে বাড়ীর উপরের শূন্য স্থানও ক্রয়-বিক্রয় হয়। কাহারও হয়ত একখানা পাঁচ-সাততলা বাড়ী আছে। তাহার ছাদের উপরের খালি জায়গাটা অন্য একজন ক্রয় করিলেন ; তারপরে ঐ বাড়ীর বাহিরের চারি কোণ হইতে মজবুত থাম উঠাইয়া তাহার উপরে আবার কয়েকতলা বাড়ী উঠান হইল !

ইলা ইউরিং
(তাহার পাশে তাহার মা-বাপকে কত ছোট দেখাইতেছে !)

আমরা সাততলা, আটতলা বাড়ী দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু মার্কিন মুল্লুকের মস্ত মস্ত বাড়ীর সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না। সেই দেশে ৪০।৫০ তলা বাড়ী ত যথেষ্টই আছে। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যে বাড়ীর ছবিটি দেওয়া হইল তাহা ৬৭ তলা। উহার উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফুট। সম্প্রতি নাকি ঐ বাড়ীর চেয়েও উঁচু বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। কি তাজ্জব ব্যাপার !!

এইরূপ সু-উচ্চ অট্টালিকা ছাড়াও সেই দেশের আরও কয়েকটা বিচিত্র জিনিসের কথা শুনিলে মনে হইবে—ঐ দেশবাসীরা যেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার আকুল আগ্রহেই সেই সেই জিনিস তৈয়ার করিয়াছে !

নিউ-ইয়র্ক সহরের ‘স্বাধীনতা মূর্ত্তি’ (Statue of Liberty) পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম মূর্ত্তি। উহার উচ্চতা ১৫১ ফুট অর্থাৎ প্রায় একশ’ একহাত ! ঐ সহরের একটি রেলওয়ে-ষ্টেশনের নাম গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল্ টার্মিনেল্ ষ্টেশন। উহাতে ৪৭ খানা প্লাটফরম আছে।

বলা বাহুল্য, শিয়ালদহ বা হাওড়া ষ্টেশনের মত চারিখানা ষ্টেশন একত্র করিলে তবে ঐ ষ্টেশনের সমান হইতে পারে। সেখানে আরও একটি মজার জিনিস আছে। সেখানকার রেলওয়ে কারখানার একটা চিম্‌নি (ধূমনালী) ৩৫৩ ফুট উচ্চ আর উহার বেড় প্রায় ২৫০ ফুট!

রবার্ট ওয়াড্‌লো

প্রত্যেক ছোট-বড় সহরেই 'পার্ক' বা সাধারণের বেড়াইবার জায়গা থাকে; তাহা আর কত বড়ই বা হইয়া থাকে; কিন্তু আমেরিকার ইয়োলো ষ্টোন নেশানেল পার্কটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ—উহার পরিমাণফল কয়েক শত বর্গ মাইল।

যে সকল জিনিসের কথা বলা হইল তাহার সবগুলিই মানুষের তৈয়ারী। তাহাদের প্রত্যেকটির বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যায়—মানুষের অধ্যবসায় ও ধন-বলই উহাদের রূপ দিয়াছে। কিন্তু এখন যাহাদের কথা বলা হইবে তাহারা প্রকৃতির আপন হাতে গড়া। সেই সব কথা আলোচনা করিলে মনে হইবে—সেই দেশে প্রকৃতিও যেন সেখানকার অধ্যবসায়ী লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কাজ করিতেছেন।

কয়েক বৎসর আগে জানা গিয়াছে, সেই দেশের কোন চাষীর একজোড়া অতিকায়
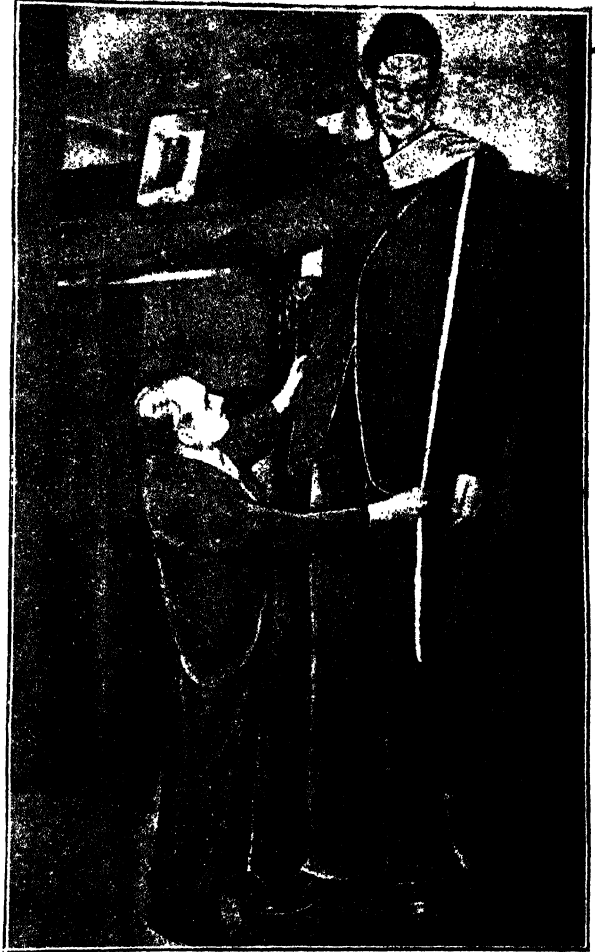
গরু আছে। তাহারা উভয়ে এক একটি হাতীর মত—প্রত্যেকটির ওজন একানব্বই মণ দশ সের! আর উহাদের উচ্চতা চারি হাত—অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা হইতে আধ হাত বেশি।

আমাদের দেশের রাস্তার মাঝে মাঝে যে সকল কাঠের পুল আছে তাহাদের উপর দিয়া হাতী চালান হয় না, কারণ হাতীর বিরাট দেহের চাপে কাঠের পুল গুঁড়া হইয়া যাইতে পারে। উক্ত মার্কিন চাষীর একটা গরু যদি কোন কারণে এদেশে আসিত, তবে তাহাকেও নিশ্চয়ই পুলের উপর দিয়া যাইতে দেওয়া হইত না। সে-দেশের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে গরু দুইটিকে দেখাইয়া লোকটি অজস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

মানুষ সাধারণতঃ সাড়ে তিন হাত বা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার চেয়েও সামান্য কিছু উঁচু হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর আগে জানা গিয়াছে—মার্কিন দেশে **ইলা ইউরিং** নামে একটি মেয়ে আছে, তাহার উচ্চতা ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি! নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকই ছিল, দশম বর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাহার শরীর বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপ স্থলে ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

ইলা ইউরিংএর মা-বাপের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। মেয়েটির অস্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কপাল ফিরিল; কারণ মেয়েটি একটা সার্কাস্ পার্টিতে যোগ দিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

এযাবৎ ইলা ইউরিংই পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম মানুষ বলিয়া পরিচিত ছিল। ইদানীং তাহার চেয়েও লম্বা মানুষের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সেই লোকটির বাড়ীও মার্কিন মুলুকে —চিকাগো সহরে। সে একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক—নাম **রবার্ট ওয়াড্‌লো**। তাহার উচ্চতা ইলার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি, অর্থাৎ ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি! পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবি দেখিলে মনে হইবে, তাহার জামার মাপ লওয়া দর্জির পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সব কারণেই বলিতেছিলাম, মার্কিন মুলুকে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও বুঝি পাল্লা দিয়া চলিয়াছেন!

(২)

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি কি বিচিত্র! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যেই ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লক্ষিত

হয়। জীবমাত্রের স্বাভাবিক গঠনই বৈচিত্র্যপূর্ণ; তা' সত্ত্বেও সময় সময় জীব-বিশেষের গঠনে অস্বাভাবিক কিছু পরিলক্ষিত হয়—যাহা দেখিয়া বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অবাক্ হয়।

একটি মানুষের দুই মাথা, চারি হাত, চারি চক্ষু প্রভৃতি হওয়ার অদ্ভুত সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এই ধরণের আরও কত বৈচিত্র্যময় সংবাদ শুনা যায়!

কিছুদিন পূর্ব্বে জানিতে পারা গিয়াছে—একটি মেয়ের বক্ষঃস্থলে জানালা আছে! মেয়েটির নাম **মেরিয়া মেলিস্‌জেভস্কি**। পোলাণ্ড দেশের অন্তর্গত গ্রুজোন সহরের এক দরিদ্র পরিবারে মেয়েটি জন্মগ্রহণ করে। সে মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে তাহার জন্ম হয়।

মেরিয়া মেলিস্‌জেভস্কি

'বুকের উপর জানালা' কথাটা অদ্ভুত শুনায় বটে; কিন্তু সেই দেশের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বক্ষপঞ্জরের ভিতরে যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, মেয়েটির হৃৎপিণ্ডও ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। তবে তাহার বক্ষপঞ্জরের ঐ অংশে অস্থি বা মাংস নাই। সেই জন্য পাতলা চামড়ার ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সুস্পষ্ট দেখা যায়।

চিকিৎসকগণের অভিমত এই যে, সামান্য মাত্র চোট লাগিলেও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মেয়েটির মৃত্যু ঘটিতে পারে; মেয়ের মাতাপিতার কিন্তু সেই ভাবনা মোটেই নাই।

মেয়েটি বেশ্ প্রফুল্ল ও আমোদপ্রিয়। সে তাহার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতই লেখাপড়ায় ও খেলায় খুব আমোদ পায়। দৌড়াদৌড়ি করিতেও সে ভালবাসে; তাহার ফলে দুই-একবার মুহূর্ত্তেকের জন্য সে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল মাত্র। তা' ছাড়া তাহার আর কোন বিপদ্ ঘটে নাই।

মেরিয়ার যে ছবি দেওয়া হইল তাহা দেখিলেই উহার বুকের কোন্ অংশ অস্থি-মাংস-হীন হইয়া জানালার আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীবরদাকুমার পাল

কি ও কেন?

গাছের কি প্রাণ আছে?

নিশ্চয়ই আছে। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

বন্ধু, যে দিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পে'তে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
... .
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি, আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।

আজ আমরা বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রপাতি দিয়া গাছে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি; কিন্তু আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ—কমপক্ষে আড়াই হাজার বছর আগে—লিখিয়া গিয়াছেন, **গাছের প্রাণ আছে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের অত্যন্ত অল্প হইলেও তাহাদের সুখ-দুখ বোধের ক্ষমতা আছে।** তোমাদের এ বিষয়ে যদি বেশী জানিতে ইচ্ছা হয় মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পড়িও।

প্রাণের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু প্রাণীর লক্ষণ বলিয়া দেওয়া যায়। সে তোমরাও বলিতে পারিবে। মানুষ, গরু, ভেড়া, বাঘ, ভালুক প্রভৃতিকে প্রাণী বলে কেন? তোমরা বলিবে—উহারা চলাফেরা করে, ছোট থেকে বড় হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চালায়, খায়-দায় সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করে; বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয়ও দেয়। তাই না আমরা রাস্তায় একটা লোক পড়িয়া আছে দেখিলে প্রথমেই দেখি তাহার নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া অসাড় হইয়াছে কি না। উপরে যাহা বলা হইল সেইগুলি প্রাণের লক্ষণ এবং যাহাদের মধ্যে ঐ লক্ষণগুলি দেখা যায় তাহারাই প্রাণী।

গাছে কি আমরা প্রাণের লক্ষণগুলি দেখিতে পাই না? গাছশিশুকে কি আমরা বীজ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখি না? তাহাকে কি ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হইতে, ফুল-ফল ধারণ করিতে, পরিশেষে বীজে সন্তান ধারণ করিয়া বংশ রক্ষা ও বিস্তারের ব্যবস্থা

করিয়া মরিতে দেখি না? লতাকে কি আমরা জমির উপর দিয়া কিংবা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া চলিতে দেখি না? লজ্জাবতী সম্বন্ধে কবি কি লেখেন নাই—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওটি লজ্জাবতী লতা
একান্ত সংকোচ-ভরে স'রে আছে একধারে··· ?

শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকা, শিকারকে ভুলাইয়া ফাঁদে 'পা' দেওয়ার নানাপ্রকার কৌশল, ও পতঙ্গকে ভুলাইয়া আনিতে ফুলের পাপড়িতে সৌন্দর্য্যের এত সমাবেশ, এত গন্ধ, মধু—সে কি বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক? বংশ রক্ষা ও বিস্তারের নানাপ্রকার কৌশল ও ব্যবস্থা কি জড়পদার্থ করিতে পারে? এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রপাতি ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন—গাছ প্রাণীর মতই শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য সম্পাদন করে। তাহার শরীরের প্রাণবস্তু—যাহা আশ্রয় করিয়া প্রাণের প্রকাশ—তাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীর একই উপাদানে গঠিত। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক নাই, উদ্ভিদেরও নাই, কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদে হৃদ্‌যন্ত্র ও নার্ভের অবস্থিতি প্রমাণ করিয়াছেন।

আর একটা কথা তোমরা মনে রাখিবে—অজৈব পদার্থ হইতে জৈব খাদ্য, যাহা সমস্ত জীবজগতের আহার্য্য—প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা একমাত্র সবুজ উদ্ভিদেরই আছে, আর কাহারও নাই; তাই সমস্ত জীবজগৎ সবুজ উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনধারণের খাদ্যের জন্য নির্ভর করে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি.

রত্ন-কণা

অলস না হ'য়ে ভাই করে যাও কাজ,
পোষণ করিয়া আশা হৃদয়ের মাঝ।
নিরাশ অলস কভু হ'য়ো না'ক তুমি,
সুখের আলয় হবে এই মর্ত্ত্য-ভূমি!*

শ্রীভবদেবচন্দ্র কর

* লেডি হোরের ইংরাজি কবিতার অনুবাদ

পূজার ছুটি

(শেষাংশ)

প্রায় মিনিট তিনেক পরে গান থামিল। মণ্টুর বাবা বলিলেন,—"দেখ এ গ্রামোফোনটাও কি রকম মজার যন্ত্র। আজ যার কথা শুনছি কাল হয়ত সে থাকবে না। কিন্তু ঐ রেকর্ডে তা'র কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত বাঁধা পড়ল।"

অনু বলিল,—"টকির গ্রামোফোন কিন্তু আরও আশ্চর্য! আচ্ছা মামাবাবু, বায়োস্কোপের সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রামোফোন চলে তা'র রেকর্ডগুলো বোধ হয় মস্ত বড়, না?"

—"টকিতে গ্রামোফোন চলে না তো।"

—"তবে ওতে কথা শোনা যায় কেমন ক'রে?"

—"বিজ্ঞান কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। আমরা তো পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের কথাই জানি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এ যুগে যে সকল যন্ত্র তৈরী করেছেন সে-সব সপ্ত আশ্চর্যকেও হার মানায়। এই টকির কথাই ধর না। মানুষের সচল ছবিতে লোকে খুসি হ'ল না, বললে ছবির সঙ্গে কথা না শোনা গেলে আর কি হ'ল? থিয়েটার দেখাও যায় শোনাও যায়—নীরব বায়োস্কোপে তো তা হয় না! অমনি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা সুরু হ'ল। অনু ভাবছ, গ্রামোফোন রেকর্ডে অভিনেতার কথা ধরা হ'য়েছে। এ রকম মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রথমে সত্যিই সে চেষ্টা হ'য়েছিল। কিন্তু তা'তে সুবিধে হ'ল না।"

—"কেন মামাবাবু?"

—"মুস্কিল হ'ল এই যে, পর্দার ছবি আর গ্রামোফোন সব সময় একসঙ্গে চালান যায় না। এক মুহূর্তের এদিক ওদিক হ'লেই সব গোলমাল।"

—"কেন?"

—"ধর, দুজনে পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করছে। পর্দায় তোমরা যুদ্ধের ছবি দেখছ। পিছন থেকে গ্রামোফোনে বাজছে,—

'রে পাষণ্ড ইষ্টদেবে করহ স্মরণ!
কৃতান্ত নিতান্ত আজি আসন্ন তোমার।
রে কুক্কুর! কৃতঘ্ন পিশাচ!
এই তব যোগ্য পুরস্কার—'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ হ'ল—'দুড়ুম্'

কিন্তু ওদিকে পর্দায় তখনও ঠোঁট নড়ছে। দু সেকেণ্ড পরে পিস্তল উঠল। তার-পর ধোঁয়া বেরোল পিস্তলের মুখ দিয়ে।—আচ্ছা ভেবে দেখ তো, এমনিধারা হ'লে অবস্থাটা কি রকম হ'বে! লোকটা গুলি খেয়ে যখন লুটিয়ে পড়ল তখন হয়ত গ্রামোফোনে গান সুরু হ'য়ে গেছে—

'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া'

দেখে শুনে লোকে কাঁদবে না হাসবে?"

তাঁহার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমার ছেলেবেলায় একবার একটা ভারি মজার কাণ্ড ঘটেছিল।"

মীনু বলিল,—"কবে বাবা!"

—"সে তোমাদের জন্মের অনেক আগে। আমি তখন কলেজে পড়ি। পূজার ছুটির আগে কলেজের ছেলেরা একটা নাটক অভিনয় করবে ঠিক হ'ল। কি পালাটা ঠিক মনে নেই। তবে তা'তে রাজা আর মন্ত্রীর পার্ট ছিল। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিল যে ছেলেটি, তা'র নাম বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা সে রাজার পার্ট নেয়, কিন্তু উদ্ধব বেঁকে বসল। সে বললে রাজার পার্ট আমিই নেব। সবাই বললে, মন্ত্রীর পার্ট তো তোমায় বেশ মানাবে তাই নাও না! উদ্ধব বললে, সেটি হচ্ছে না।"

—"তা তা'কে বাদ দিলেই তো হ'ত?"

—"তা'কে বাদ দেওয়া! সে অসম্ভব। যেমন তা'র চেহারা তেমনি তা'র গায়ের জোর। বিশ্বম্ভরের বুদ্ধি ছিল বেশি, কিন্তু উদ্ধবের গায়ের জোরকে সে ভয় করত। কে জানে কখন কি ক'রে বসে?"

—"রাজার পার্ট তা হ'লে সে-ই নিলে? আর বিশ্বম্ভরকে বাধ্য হ'য়ে নিতে হ'ল মন্ত্রীর পার্ট?"

মীনা মাঝখান হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি সেজেছিলে, বাবা?"

মীনার বাবা খুব গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"ওঃ সে মস্ত বড় পার্ট।"

—"কিসের পার্ট বাবা? সেনাপতির?"

—"না। মৃত সৈনিকের।"

তাঁহার কথায় সকলেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির বেগটা কিছু কমিলে মণ্টু জিজ্ঞসা করিল,—"তারপর কি হ'ল বাবা?"

—"হ্যাঁ, বিশ্বম্ভর তো নিলে মন্ত্রীর পার্ট। প্রতিদিন রিহার্স্যাল হয়। উদ্ধব রাজার পার্ট বলে, বিশ্বম্ভর বলে মন্ত্রীর পার্ট। অভিনয়ের আগের দিন ষ্টেজ রিহার্স্যালও হ'য়ে গেল। কোন গোলমালই হ'ল না।" —বলিয়া অনুর মামা একটু থামিলেন।

মণ্টু বলিল,—"তারপর ?"

—"তারপর অভিনয়ের দিন অভিনয় সুরু হ'ল। প্রিন্সিপ্যাল মশায়, প্রফেসাররা আর সব নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সামনের চেয়ারে বসেছেন। পিছনে ছেলেরা সব বসেছে বেঞ্চের উপরে। ভলান্টিয়াররা লাল ব্যাজ প'রে ঘোরাঘুরি করছে। এমন সময় ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে সিন উঠল। দর্শকদলের গল্প-গুজব থেমে গেল।"

—"উদ্ধব পার্ট করলে রাজার ?"

—"করল বৈকি! প্রথম অঙ্কে মন্ত্রীর পার্ট নেই, বিশ্বম্ভরকে তাই বেরোতে হয় নি। সে উইংসের পাশ থেকে 'প্রম্প্‌ট্‌' করছিল। অবশ্য সাজগোজ তা'র আগেই হ'য়ে গিয়েছিল। তা'র হাবভাব দেখে কে বুঝবে যে, সে পেটে পেটে এমন মতলব আঁটছিল?"

—"কি মতলব মামা ?" অনু জিজ্ঞাসা করিল।

—"সেই কথাই বলছি। দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়াতেই একটা গান হ'ল। গায়কের দল চলে গেলে রাজা প্রবেশ ক'রে স্বগত খানিকটা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা উদ্ধবের খুব ভাল রকমই মুখস্থ ছিল। সে ব'লে দিয়েছিল, তা'কে যেন কেউ প্রম্প্‌ট্‌ না করে। স্বগত পার্ট শেষ ক'রেই উইংসের দিকে ফিরে উদ্ধব বললে,—

'কি সংবাদ মন্ত্রিবর !
বিষণ্ণ কি হেতু তব বদনমণ্ডল,
কি কারণ দুশ্চিন্তার ?'

রাজার উক্তি শেষ হ'তে না হ'তেই মন্ত্রীর প্রবেশের কথা। কিন্তু মন্ত্রীর দেখা নাই। রাজা বিব্রত হ'য়ে বারবার উইংসের দিকে তাকাতে লাগল। না, কোনদিকেই বিশ্বম্ভরকে দেখা গেল না। এদিকে ব্যাপার দেখে দর্শকরা হাততালি দিতে লাগল। বেচারি উদ্ধব মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে কোন রকমে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তখন তা'র মনের অবস্থা যে কি তা তোমরা বুঝতেই পারছ।"

—"বিশ্বম্ভর তখন কি করছিল ?"

—"বিশ্বম্ভর তখন গ্রিনরুমের ভিতর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—'পেট গেল রে, বাবারে! কলিকের কি যন্ত্রণা রে'!"

—"আহা বেচারির ঠিক পার্টটার সময়ই কলিক হ'ল ?"

—"আরে কলিক কি সত্যিই হয়েছিল ? উদ্ধবকে সকলের সামনে লজ্জা দেবার জন্যেই তা'র কলিক। সে কথা তখন অবশ্য কেউ জানতে পারে নি। থিয়েটারের অনেকদিন পরে সে গোপনে আমাদের কাছে বলেছিল।"

—"তারপর থিয়েটার আবার হ'ল ?"

—"হ'ল বটে, কিন্তু উদ্ধবের পার্টটা তেমন জমল না। বেচারি ভারি মুসড়ে পড়েছিল। সে যখনই বেরোয় দর্শকরা চেঁচিয়ে বলে—'কি সংবাদ মন্ত্রিবর ?' আর অমনি তা'র পার্ট ভুল হ'তে থাকে! তাই বলছিলাম পর্দার ছবি আর গ্রামোফোন একসঙ্গে না চললে এই রকম হাসির কাণ্ড ঘটে।"

অনু বলিল,—"তা হ'লে টকিতে শব্দ হয় কেমন ক'রে ?"

—"অভিনেতা যখন অভিনয় করে, তখন কলের সাহায্যে তা'র অভিনয়ের ও তা'র কণ্ঠস্বরের ছবি একসঙ্গে তুলে নেওয়া হয়।"

—"কণ্ঠস্বরের ছবি ? সে কেমন ক'রে তোলা হয় ?" সকলে প্রশ্ন করিল।

অনুর মামা বলিলেন,—"সে ভারি মজার কাণ্ড! কোন শব্দ হ'লেই বাতাস কাঁপে। সে কথা তোমরা তো আগেই শুনেছ। ঐ যে কাকটা আলসের উপর ব'সে 'কা-কা' ক'রে ডাকছে তা'তে বাতাসটা কাঁপছে এক রকম। আবার ঐ যে মাথার উপর দিয়ে চিলটা উড়ে' গেল ওর ডাকে বাতাসে উঠল আর এক রকমের কাঁপুনি। প্রত্যেক শব্দের কাঁপুনি আলাদা আলাদা রকমের। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে গান তোলা হয় সে আর কিছু নয়—বাতাসের কাঁপুনির ছবি তা'তে দাগ কেটে তোলা হয়!"

—"টকিতেও ঠিক ঐ রকমের দাগ নেওয়া হয় বুঝি ?"

—"না, টকির রেকর্ড আলাদা। যে স্বচ্ছ ফিল্মের উপর বায়োস্কোপের ছবি ওঠে তা'রই নিচে শব্দেরও রেকর্ড হয়। এতে রেখাগুলো খোদাই হ'য়ে যায় না। ফোটোগ্রাফের মত রেখার ছবি ওঠে মাত্র।"

—"শব্দেরও কি ফোটো ওঠে বাবা? সেদিন আমাদের ছবি তোলার সময় বীনু যে কাঁদছিল, কৈ ছবিতে তো তা'র কান্নার আওয়াজ ওঠে নি!" মণ্টু বলিল।

মণ্টুর বাবা উত্তর করিলেন,—"বিদ্যুতের যন্ত্রের এমনি আশ্চর্য গুণ যে, শব্দকে আগে আলোতে পরিণত ক'রে নেয়। সেই আলোরই ছবি পড়ে ফিল্মে। আবার যখন সেই ফিল্ম আলোর সামনে ধ'রে লোককে দেখান হয়, তখন ঐ ছবির ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে শব্দে পরিণত হয়। কিন্তু এসব তোমরা আরও ভাল ক'রে বুঝবে একটু বড় হ'লে।"

তাহার পর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওঃ, বেলাও তো কম হয় নি। আজ তবে ওঠ। আবার আর একদিন গল্প হবে'খন।"

কিন্তু সেই একদিন আসিবার পূর্বেই অনুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল—কাজেই তাহাকে বাড়ি ফিরিতে হইল। তবে সে একেবারে নিরাশ হয় নাই। মামা বলিয়াছেন এবার প্রমোশন হইয়া গেলে সে কলিকাতার স্কুলে ভর্তি হইবে। বেশ মজা হইবে তখন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.

সাময়িকী

পরলোকে শরৎচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যাকাশের শারদীয় পূর্ণচন্দ্র শরৎচন্দ্র, সহসা চির-রাহু-গ্রস্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বাঙ্গালা ১২৮৩ সনের ভাদ্র মাসের ৩১শে, হুগলী জিলার দেবানন্দপুর নামক গ্রামে শরৎচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। শৈশবে পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়—গ্রামে; তিনি সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুর তেজনারায়ণ কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের কেহ কেহ স্পষ্টই প্রকাশ

করিতেছেন যে, শরৎচন্দ্র—কলেজে পড়া ত দূরের কথা—প্রবেশিকা পরীক্ষাও দেন নাই। সহাধ্যায়ীর কথা সত্য হইলে—শরৎচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার কথাই প্রমাণিত হইবে।

পিতা ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হইতেই শরৎচন্দ্র বীজ-গত সাহিত্যিক-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলগণের সাহিত্যিক-প্রতিভা দেখিয়া মনে হয়—তিনি মাতামহ বংশ হইতেও সাহিত্যিক শক্তিতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না—কাজেই বাল্য, কৈশোর, যৌবনে শরৎচন্দ্রকে দারুণ অভাবের তাড়নায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বাঙ্গালা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে, কিন্তু অভাব দূর হয় নাই! শেষে বীজ-গত সাহিত্যিক-শক্তিই তাঁহাকে অভাব হইতে মুক্ত ও ধনে-মানে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্—কারণ সাহিত্যসেবা আরম্ভ হইতেই তিনি অবাধ সম্মান ও অর্থলাভ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন কথার যাদুকর। তাঁহার ভাষা মন্ত্রশক্তির মতই মানুষের চিত্ত-দেবতাকে আকৃষ্ট ও অভিভূত করিত। তিনি যথার্থই 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'। তাঁহার ভাষায় জটিলতা—হেঁয়ালীর লেষমাত্র নাই—সুতরাং তাহা বুঝিতে কাহারও বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তিনিই এক ও অদ্বিতীয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ গৌরব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন—তাঁহাকে ডক্টর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা মাঘ রবিবার বেলা ১০টায় ৬১ বৎসর বয়সে এই প্রতিভার সুস্নিগ্ধ শশধর—দারুণ ক্যান্‌সার রোগে অস্তমিত হইয়াছেন।

পরলোকে হেরম্বচন্দ্র

১৩৪৪ সনের মাঘ মাসের ৪ঠা তারিখ বাঙ্গালার পক্ষে এক অভিশপ্ত দিন। কেননা ঐ দিন বেলা ১০টায় সাহিত্য-শশধর শরৎচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন,—আর দশ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই—রাত্রি অনুমান ৮টার সময় শিক্ষক-শিরোমণি হেরম্বচন্দ্র পরলোক-গমন করিয়াছেন। ছাত্র ও শিক্ষক জীবনে—বিশেষতঃ নৈতিক চরিত্রে—হেরম্বচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন।
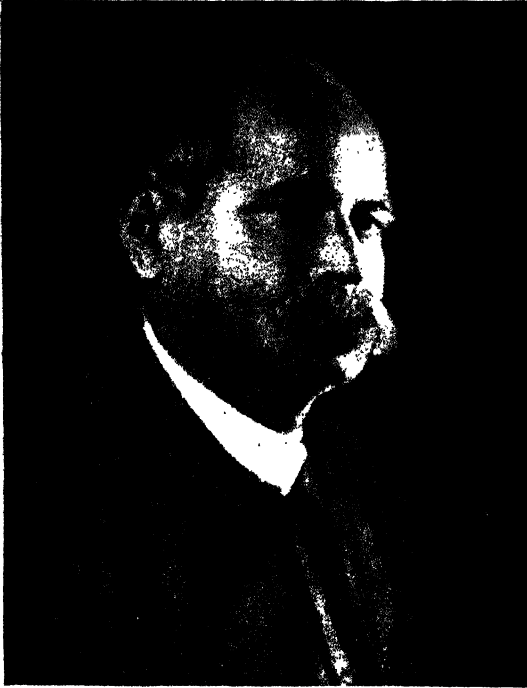
নদীয়া জিলায় পল্লীগ্রামে হেরম্বচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়কে আজও ফরিদপুর সহরবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। হেরম্বচন্দ্র ফরিদপুর হইতেই এণ্ট্রান্স্ পাশ করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাইয়া উত্তীর্ণ হন। তদানীন্তন প্রিন্সিপাল টনি সাহেব হেরম্বচন্দ্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

তিনি সরকারী চাকরি অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হন এবং প্রায় আজীবন সেই কাজে লিপ্ত থাকেন। মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য ঢাকা জগন্নাথ কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সাহিত্যে ডক্টর উপাধি পাইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর।

বর্ত্তমান সঞ্জীবনী নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে হেরম্বচন্দ্র অন্যতম। তিনি কেবল অধ্যাপক ছিলেন না—রাজনীতির সেবকও ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আশি বৎসর।

* * * *

মাস সাতেক পূর্ব্বে পাটনার বিহিটা ষ্টেশনে পাঞ্জাব এক্সপ্রেস্ ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে কয়েকশত যাত্রী হতাহত হয়। এলাহাবাদে বসিয়া তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে, আজও অনুসন্ধানকার্য্য শেষ হয় নাই। তার উপর গত ২রা মাঘ রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় সেই এলাহাবাদ হইতে ৮ মাইল দূরে বামরোলী নামক ষ্টেশনের দণ্ডায়মান মালগাড়ীর সহিত কলিকাতা হইতে দিল্লীগামী তুফানমেলের ঠোকাঠুকি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাত্রিপূর্ণ তিনখানি বগী ও ছয়খানি মালপূর্ণ ওয়াগন্ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে; সংবাদপত্রে তাহাদের নামও বাহির হইয়াছে। কতক যাত্রী নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। নিহতদের মধ্যে ৪ জন
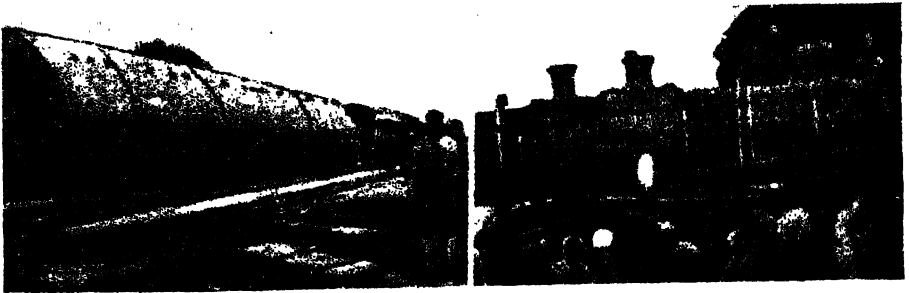
রেল কর্ম্মচারী ও একটি ইংরেজ বালকের নাম পাওয়া যায়। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে কে. কে. মুখোপাধ্যায় সপরিবারে যাত্রী ছিলেন—তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা নিহত হইয়াছে—তা ছাড়া তিনি নিজে, তাঁহার পত্নী ও অপর কন্যাটি আহত হইয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পত্নীর অবস্থা অত্যন্ত আতঙ্কজনক।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে স্নানের জন্য ই. আই. রেল হইতে চারিদিকে হিন্দু সাধারণকে সাড়া দেওয়া হইতেছে—সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের প্রলোভনও দেখান হইতেছে। এদিকে ই. আই. রেলে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটার সংবাদে দেশের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে!

দ্বিগর্ব্বকোষ পশুর কথা

তোমাদিগকে আজ এক অদ্ভুত রকমের পশুর কথা বলিব। এই অদ্ভুত পশুকে দ্বিগর্ব্ব পশু বলে। এই রকমের পশু নানাপ্রকারের আছে। তাহাদের মধ্যে কাঙ্গারুর জীবন-কাহিনী বেশ মজার এবং কৌতুকপ্রদ। এই জন্তুটির সম্বন্ধে তোমাদের অনেকের কিছু কিছু জানা আছে। আজ তাহার দুই-একটি খবর বিশদরূপে বলিতেছি।

কাঙ্গারু অষ্ট্রেলিয়া, ট্যাসম্যানিয়া এবং নিউগিনিতে পাওয়া যায়। এই বিরাট পৃথিবীর বুকে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কাঙ্গারু নামটির কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে সে সম্বন্ধে বেশ একটি মজার গল্প আছে ঃ—শ্বেতকায় জাতি ঐ দেশে পদার্পণ করিবামাত্রই জন্তুটি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করে। নিকটেই ছিল এক আদিম অধিবাসী। সাহেব সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে—"বাঃ জন্তুটি বেশ ত ? এর নাম কী ?"

আদিম অধিবাসীটি সাহেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া দেশীয় ভাষায় উত্তর দিল—"কাঙ্গারু"।

সে-দেশীয় ভাষায় কাঙ্গারু কথার অর্থ—'তুমি কি বলছ ?' সাহেবও সেই কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন উহার নাম কাঙ্গারু ! সেই হইতেই সাহেবেরা জন্তুটিকে কাঙ্গারু নামেই পরিচিত করিল।

কাঙ্গারু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন উহার উচ্চতা এক ইঞ্চি মাত্র হয়। অবশ্য সবগুলিই যে এক ইঞ্চি উঁচু হয় তা নয়, যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উঁচু হয় সেইটাই এক ইঞ্চি হয়। এক ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না বলিলে একটু মাত্র ভুল বলা হয় না। তোমরা ভাবিতেছ এমন একটি ক্ষুদ্র জন্তু কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে ? ভগবান পৃথিবীতে কাহাকেও নিরাশ্রয় করিয়া পাঠান না। প্রত্যেকেরই জীবনধারণ এবং জীবনরক্ষার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াই তিনি তাহাদগকে এই জগতে পাঠান।

কাঙ্গারু-জননীর তলপেটের নীচে একটি কোষ অর্থাৎ থলি আছে। শাবক ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই সদ্যঃপ্রসূত ক্ষুদ্রশাবকটিকে কাঙ্গারু-জননী ঐ থলিতে কুড়াইয়া লয়। আবার জীবজন্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত পণ্ডিত গবেষণা করেন, তাঁহারা বলেন—"এই উক্তি মিথ্যা। শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই গুড়ি দিয়া আপনার আশ্রয়ে প্রবেশ করে।" সেই থলির মধ্যে স্তন বা বাঁট থাকে। শাবক থলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাঁটটি নিজের মুখের মধ্যে লয় ; কিন্তু টানিতে পারে না। তখন কাঙ্গারু নিজের শরীর ফুলাইয়া দুগ্ধ বাহির করিয়া

দেয়। এমনিভাবে দুই চারিদিন চলে, তাহার পরে শাবকটি নিজে নিজে স্তন হইতে দুগ্ধ টানিয়া পান করে।

কাঙ্গারু দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। উহারা প্রায় ৯ ফিট্ পর্য্যন্ত উঁচু হয়। উহাদের গায়ে ধূসর বর্ণের লোম আছে; লোমগুলি এত সুন্দর যে দেখিলে মনে হয়, গায়ে ধূসর বর্ণের সার্জ্জের কোট্ চাপান আছে। মাথাটি ক্ষুদ্র, সাম্‌নের পা দুইখানি অতিক্ষুদ্র। কিন্তু পিছনের পা দুইখানি দেহের আকারের অনুপাতেই বেশ লম্বা এবং মাংসল। সেই পা দুই-

কাঙ্গারু
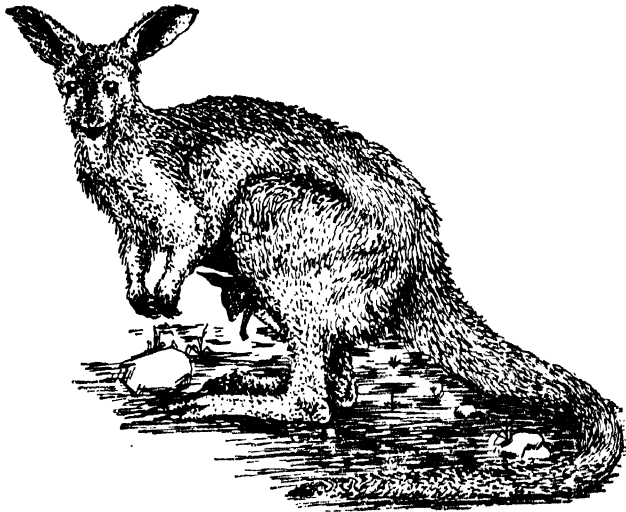
খানির জোরেই কাঙ্গারু তীরবেগে লাফাইয়া চলে। প্রতি লাফে উহারা ত্রিশ ফিট্ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে! পায়ের থাবার নখরগুলি অতি তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ নখরের সাহায্যে উহারা যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। লেজটি বেশ মোটা-সোটা; উহাও পায়ের কাজ করে। লেজের উপর ভর দিয়া মধ্যে মধ্যে উহারা দাঁড়ায়। ইহারা উদ্ভিদ্-ভোজী। গাছের ফলমূল প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে। উহারা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিতে বড়ই ওস্তাদ। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিতে পারিলে ইহাদের অন্তরে আর আনন্দ ধরে না।

শ্রীললিতমোহন হাজরা

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট দল

কলিকাতায় তৃতীয় টেষ্ট্‌ম্যাচে নিখিল ভারতীয় দলের কাছে হেরে যাওয়ার পর লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট দল বাংলা দেশের বাছাই করা দলের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী ম্যাচ খেলেন। বাংলা দেশের দলের নাম ছিল কুচবিহার দল—এ দলে প্রায় আদ্ধেকই ছিলেন অবিশ্যি কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজ খেলোয়াড়গণ। টেনিসনের দলের বিখ্যাত চারজন খেলোয়াড় না থাকা সত্ত্বেও যে কুচবিহার দল ভীষণভাবে পরাজিত হ'য়েছে এ কথা তোমাদের কাছে আর বল্‌বার প্রয়োজন নেই।

কলিকাতার খেলা শেষ ক'রে টেনিসনের দল খেল্‌তে গেলেন পাতিয়ালায়। পাতিয়ালার মহারাজার দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪২ রাণ করেন, আর লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে ৪৪৫ রাণ ক'রে ডিক্লেয়ার করেন। সকলেই নিশ্চিত জেনেছিলেন যে, পাতিয়ালার পরাজয় হ'বেই; কিন্তু অমরনাথ আর হাভেওলা খেলার গতি ফিরিয়ে দিলেন। অমরনাথ ১০৯ রাণ ক'রেও নট্‌-আউট্‌ রইলেন, হাভেওলা ১০৬ ক'রে আউট্‌ হ'লেন। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে নিজের দলকে বাঁচাবার যে শক্তি অমরনাথ দেখিয়েছেন তা' সত্যিই অপূর্ব্ব। খেলা হ'য়ে গেল 'ড্র'।

পাতিয়ালার খেলা শেষ ক'রে লর্ড টেনিসনের দল খেলেন দিল্লীতে দিল্লীর বাছাই দলের সঙ্গে। ১ম ইনিংসে টেনিসনের দলের রাণ হয় ৩৫৩ আর দিল্লীর দলের ৮ উইকেটে হ'ল ৩০৫, সুতরাং কোন দলই পরাজয় স্বীকার করে নি। এর পর মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে টেনিসনের দলের দুই দিন ব্যাপী খেলায় মধ্যপ্রদেশ এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'য়েছে যে, এর আর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এর একটা কৈফিয়ৎ শুন্‌তে পাওয়া যায় যে. জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় মেজর নাইডু এই দলে খেল্‌তে পারেন নি। দলে তাঁর মত খেলোয়াড় থাকলে অন্য খেলোয়াড়দের প্রাণে যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হ'ত এবং এত শোচনীয় পরাজয় হ'ত না, একথা সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য।

এর পরে লর্ড টেনিসনের দল মাদ্রাজে তিনদিন ব্যাপী মাদ্রাজের বাছাই দলের সঙ্গে খেলেন। এই খেলায় মাদ্রাজ দলের গোপালন এত ভাল খেলেছেন যে, তাঁকে নিখিল ভারতীয় দলে নেওয়া হ'বে ব'লে সকলেরই নিশ্চিত ধারণা হ'য়েছে, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য এইটুকু যে, ৯৮ রাণ ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন, মাত্র দুইটি রাণের জন্য তিনি সেঞ্চুরি করার সম্মান থেকে বঞ্চিত হ'লেন। লর্ড টেনিসনের দলের প্রথম ইনিংসে রাণ হ'ল ৪৪৮, হার্ড্‌ষ্টাফ্‌ একাই ২১৩ রাণ করেন। ইংলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড়

ভারতবর্ষে এসে এত রাণ এর পূর্ব্বে আর কখনো করতে পারেন নি; সুতরাং এই রাণ একটি "রেকর্ড" হ'য়ে রইল। মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসে হ'ল ৩০৫ রাণ, টেনিসনের দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩২৪ রাণ হ'য়েছিল, এড্রিচ্ ১৩০ রাণ ক'রেও নট্-আউট্ থাকেন; সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলাটি "ড্র" হ'য়ে যায়।

এর পরের খেলাটি হয় সেকেন্দ্রাবাদে মৌন্উদ্দৌলার টীমের সঙ্গে। এই খেলায় টেনিসনের দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪৮ রাণ ক'রে সকলে আউট হ'য়ে যান। সেকেন্দ্রাবাদের দলে ভারতের সর্ব্বত্র বিখ্যাত খেলোয়াড় অমরনাথ ও হিন্দেলকার ছিলেন। এই দলের প্রথম ইনিংসে ৩১৭ রাণ হ'ল, অমরনাথ খুব ভাল খেলে ১২১ রাণ করেন। লর্ড টেনিসনের টীমের বিরুদ্ধে এইটি তাঁর তৃতীয় "সেঞ্চুরী"। টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৩ রাণ করেন, কিন্তু সেকেন্দ্রাবাদের দল ৪ উইকেটেই ১২৭ রাণ ক'রে জিতে গেলেন ৬ উইকেটে। লর্ড টেনিসন দলের ভারতবর্ষে এইটি চতুর্থ পরাজয় এবং সত্যিই শোচনীয়

মাদ্রাজের চতুর্থ এবং বোম্বাইয়ের পঞ্চম "টেষ্ট্" ম্যাচ্ খেলার বিশেষ বিবরণ তোমরা আস্‌ছে মাসে পড়্‌তে পাবে। এখন তোমাদের বাংলাদেশের একটা বিশেষ ক্রিকেট খেলার কথা বল্‌ব।

ভারতবর্ষে "রণ্‌জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা" চল্‌ছে এই তিন বছর ধ'রে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা ও আসাম দল প্রথম রাউণ্ডে বিহার-দলকে পরাজিত ক'রেছে। তারপর তাঁদের খেল্‌তে হ'য়েছে মধ্যপ্রদেশ-দলের সঙ্গে—২৯শে থেকে ৩১শে জানুয়ারী অবধি। মধ্যপ্রদেশ-দলের অধিনায়ক ছিলেন জগদ্বিখ্যাত বৃদ্ধ খেলোয়াড় নাইডু। দলটি বেশ শক্তিশালীই ছিল। মুস্তাক আলি, ভায়া প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড় এই দলে ছিলেন। প্রথম ইনিংসে বাংলা ও আসাম দল মাত্র ১১০ রাণ করেন এবং মধ্য-প্রদেশ দল ১৫৪ রাণ করেন। বৃদ্ধ নাইডু ৭৬ রাণ ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, এখনও ক্রিকেট খেলার প্রতিভা তাঁর বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ফল হ'ল ঠিক উল্টো। বাংলা ও আসাম দল করেন ২১৭ আর মধ্যপ্রদেশ মাত্র ১৪৫, কাজেই বাংলা ও আসাম দল ২৮ রাণে জয়লাভ ক'রেছেন। তিন বছর ধ'রেই মধ্যপ্রদেশ বাংলার কাছে ক্রমাগত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা ও আসাম দলের ভাণ্ডারগাট্ ও কার্টার যথাক্রমে ৮৬ ও ৮৫ রাণ ক'রেই এই জয়লাভ সম্ভবপর ক'রেছিলেন। এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, এই বাংলা ও আসাম-দলে ছয় জন ইউরোপীয়ান খেলোয়াড় খেলেছেন, এবং তাঁদের দুই জনের ব্যাটিংয়ের জোরেই বাংলার জয় হ'য়েছে। বাঙালী খেলোয়াড়রা যা ব্যাটিং ক'রেছেন তা' না বলাই ভাল। বাংলা ও আসাম দলের অর্থই হ'ল—অন্তত ছয় জন সাহেব। অন্য কোন প্রদেশের টীমে সাহেব খেলোয়াড় নেই—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি.এ.

.গত মাসের ধাঁধার উত্তর

জাপান

উত্তরদাতাদিগের নাম

ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, কল্যাণ, অমিয়, প্রীতি, মিনি ও রাণু, ১৪৩৫৫ নং গ্রাহক ; শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, জিওলগড়া ; অনিল, অরুণ, রেণু, পতু, নীলা ও ধুকু, ১৬০১৪ নং গ্রাহক ; অসিতা, ইলা, দীপা, খুকু, মণ্টু, অনিতা, উমা, পাটনা ; অজয়, রাণু ও মিনু, দিল্লী ক্যান্ট্ ; বিনয়ভূষণ চন্দ্র, কটক ; মানসী ও কনক দাসগুপ্ত, আগরতলা ; ইষ্টপদ, ক্ষেপুত ; অরুণ, মণ্টু, বেলু, নিলু, ঝণ্টু, মীরা, মুক্তি ও হাতু, কুচবিহার ; নন্দ, ভানু, কণু, গতু, মনি, অজু, দেবেন, যমুনাজীবন, অনাদি ও নির্ম্মল, কাট্রাসগড় ; সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র, শান্তি, প্রীতি, অরুণ, বীরেন্দ্র ঘোষ, মাহেশখুন্ট ; শান্তিলতা, স্মৃতিকণা ও বিকাশ, জামনগর ; গিনি, টুলি, বেলা, রুলি, রুচি ও নবী, খামার—মালদহ ; শ্রীমঞ্জুমালা সেন, কাশীধাম ; শ্রীজ্ঞানদা চ্যাটার্জ্জি, কাটোয়া ; স্নেহ, সুনীল ও অনিল সরকার, দার্জ্জিলিং ; আরতি, প্রণতি, মিনতি, তৃপ্তি, ছবি, বিবি ও তরুণ মজুমদার, কণ্টাই ; তাপস ও তরুণ মিত্র, নন্দনবাগান—কলিকাতা ; অজিৎ, সুজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, হরগৌরী, বিনয়, অমল, বিরাজ ও অনন্ত ১৫৫১৪নং গ্রাহক ; রাণু, শিবানী, সুরুচি, অমিয়া, ছবি, উজ্জ্বলা, নির্ম্মল, সলিল, আভা, মণ্টু, গোপাল, বিজন, নৃপতি, মলয়, মীরা, উমা, সুষমা, খুকু, সন্তোষ, ফড়িং, অমিতা, পলাশ, বন্দনা, মঞ্জু, আগমনী, রাজসাহী ; বিভাস, হীরেন্দ্র ও সুখেন্দু চক্রবর্ত্তী, ফেণী ; প্রবীরকুমার রায়, পাবনা ; মণীন্দ্র গুহ, ১৫৭০৩ নং গ্রাহক ; মনোহর, রসুলপুর ; কৃষ্ণা গুপ্তা, বালীগঞ্জ ; সাধনা, অর্চ্চনা, গোপাল ও রাখাল, গৌহাটী ; অবনীচন্দ্র সান্যাল, ঘোড়ামারা,—রাজসাহী ; ১৪৯৮৯ নং গ্রাহক ; গিরীন্দ্র, নারায়ণ, শিবু, গঙ্গা, গতি, মাজিগ্রাম ; উর্ম্মিলাবালা দেবী, কলিকাতা ; আবদুল হাই, ইমাম, হাফিজ, তারিণী ইত্যাদি, বামনী মধ্য ইংরেজী স্কুল ; আরতি, অঞ্জলি, অনিমা ও অনিলকুমার সেন, জগন্নাথচক্ ; অশনি, অরুণ, অজিৎ, রণেশ ও সেফালী, কুচবিহার ; নুনু, গোবিন্দ, রবি, লীলা ও বেলা, নোয়াখালী।

ছবি ও গল্প

এই মাসের শিশুসাথীর মুখপত্রে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পর পর কয়েকটি দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। ঐ ছবি দেখিয়া একটি গল্প লিখিতে হইবে।

গল্প লেখার নিয়মাবলী

(১) কেবল শিশুসাথার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ গল্প লিখিতে পারিবেন।

(২) গল্পের শেষে লেখক বা লেখিকার পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ পূর্ব্বক উহ ২০শে ফাল্গুন তারিখের মধ্যে শিশুসাথী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। আমাদের বিচারে যে গল্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা পরবর্ত্তী কোনও মাসের শিশুসাথীতে ছাপা হইবে।

(৩) গল্পটি যেন শিশুসাথীর চারি পৃষ্ঠার মধ্যে ছাপান যাইতে পারে সেভাবে লিখিতে হইবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ—শিশুসাথীর **গ্রাহকদের** লিখিত গল্পের মধ্যে যে দুইজনের লেখা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে যথাক্রমে ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা মূল্যের পুস্তক এবং **গ্রাহিকাদের** মধ্যে যে দুইজনের লেখা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকেও অনুরূপ মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press ;
5, College Square, Calcutta.

৫২৫৭

ষোড়শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৪ { ১২শ সংখ্যা

আমার খোকন

ওরে আমার দুষ্টু খোকন মিষ্টি খোকন ওরে,
মোদের ভবন কর্‌তে আলো কে পাঠালো তোরে ?
নিকষ কালো মেঘের বুকে তড়িৎ হানে আলো,
খোকনমণির উজল হাসি তার চেয়েও ভালো।
কোন্ সে দেশের মায়াবী তুই বল্‌রে আমায় তাই,
তোকে দেখে দুঃখ ব্যথা সব যে ভুলে যাই।
সন্ধ্যাবেলা খোকন যখন ঢ'লে পড়ে ঘুমে,
জান্‌লা দিয়ে জোছ্‌না এসে খোকনের চোখ চুমে।
ঘুম থেকে জেগে খোকা ভয়ে কেঁদে ওঠে,
কোলে এসে রাঙা ঠোঁটে হাসি ওঠে ফুটে।
এক চোখে তার ঝরে জল, এক চোখেতে হাসি,
রোদের সাথে ঝরে যেন জোছ্‌না ধারা মিশি।

শ্রীমতী লীনা দত্তগুপ্তা

ছেলেখেলা

(আনাতোল ফ্রাঁস অবলম্বনে)

খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই মিলে তা'রা পাঁচজন—মণ্টু, হাঁদা, পাঁচু, পটে আর গণেশ।

তবে গুণ্‌তিতে অতগুলি হ'লে কি হ'বে, মত তা'দের কিন্তু একটি।

সৈন্য হ'তে পারার চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কিছু হ'তে পারে না।

পুষ্প মেয়ে বটে; তা'দের বোন—ভাইদের প্রায় এক বয়সী। তা'রও ভায়েদের সঙ্গে কোন মতভেদ নেই।

তা'র কেবলই আপ্‌শোষ হয়—আহা, সে যদি মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'ত; তা'হ'লে সেও কেমন বড় হ'লে সৈন্য হ'তে পা'র্‌ত!

সৈন্যদের ঝল্‌মলে পোষাক আর ঝক্‌মকে তলোয়ার দেখেই যে তা'দের লোভ হয়, তা' ঠিক নয়। সৈন্যরা লড়াই করে—তা'রা যে দেশের জন্য প্রাণ দেয়।

যে যত বড় ত্যাগ করে, সে যে তত মহৎ,—জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, এ'কথা সবাই মানে। তা'ই যদি হয়, তা'হ'লে দলে দলে যা'রা এমন অকাতরে প্রাণ দেয়, তা'দের চেয়ে আর বড় কে?

সেজন্যেই তো তালে তালে পা ফেলে সঙ্গীন্ কাঁধে ক'রে সৈনিকদের পথ দিয়ে যেতে দে'খ্‌লে তা'দের বুকের রক্ত না'চ্‌তে থাকে।

* * *

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হ'বে বলেই যখন ঠিক হ'ল, তখন একজন সেনাপতি চাই। হাঁদা হ'ল তা'দের সেনাপতি।

মস্ত বড় একখানা খবরের কাগজ মুড়ে একটা টুপি তৈরী ক'রে মাথায় দিয়ে সে একেবারে ঘোড়ার পিঠে চড়ে' ব'স্‌ল। একখানা চেয়ারের হাতল হ'ল তা'র ঘোড়া।

একজনের হাতে দেওয়া হ'ল একটা খালি সাবানের বাক্স; সে সেইটে চাপড়ে বাজ্‌না বাজা'তে বাজা'তে চ'ল্‌ল।

সেনাপতি আর বাজনদারকে বাদ দিলে সৈন্য হ'বার জন্য বাকি থাকে মোটে চা'রজন—তা'র মধ্যে আবার একজন মেয়ে।...তা' হোক, তা'তেই চলে যা'বে। তা' ভিন্ন আর উপায় কি?

—"হুঁসিয়ার ভাই সব, বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চল।"

সেনাপতি হুকুম দিতেই—রুল, পাখা, ছাতা, লাঠি, যে যা' যোগাড় ক'র্‌তে পা'র্‌ল তা'ই কাঁধে তুলে' নিয়ে সবাই দল বেঁধে এগিয়ে চ'লল।

* * *

ফ্রকের উপর ছোট্ট ডুরে শাড়ীখানায় কোমর বেঁধে নিয়ে, বাবার ছড়ি গাছা বাঁ কাঁধের উপর ফেলে পুষ্প যে রকম গম্ভীর-মুখে যেতে লাগল, তা' দে'খ্‌লে মনে হ'বে, সে যেন কত বড়ই না একটা কাজ ক'র্‌তে চলেছে।

পটে কোনকালেই চট্‌পটে নয়—ঠাণ্ডা, ভাল মানুষ, একটু বোকা ধরণের। সে চলেছে যেন নিতান্ত নাচার হ'য়ে।

পটের ছোট ভাই গণেশ দলের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। তবু, গোড়া থেকেই তা'র মনে মনে ইচ্ছা ছিল, সে-ই সেনাপতি হ'বে। কিন্তু তা'র আগে হাঁদা যখন চেয়ারের হাতলের উপর চড়ে' ব'সে সেনাপতি হ'য়ে গেল, সে তখন আর আপত্তি ক'র্‌তে পা'র্‌ল না। কারণ, আপত্তি ক'র্‌লে তো কেউ শু'ন্‌বে না। নিতান্ত অনিচ্ছাতেই তা'কে সৈন্য হ'তে হয়েছে বলে তা'র মুখখানা হ'য়ে রইল আঁধার।"

"আগে চল, আরো আগে চল ভাই"—বিপুল উৎসাহে হাতল চাপড়ে হাঁদা তা'র সৈন্যদের হুকুম দিল—"ওই দেখ পাশের ঘরে আমাদের শত্রুরা সব হাজির রয়েছে। চল আমরা নির্ভয়ে গিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়িগে।"

পাশের ঘরটা খাবার ঘর। টেবিলের দু'পাশে সারি সারি ক'রে চেয়ার সাজান

বাস্তবিক অমন নির্ব্বিরোধ শত্রু আর হয় না। একবার শুধু ঠেলে কাৎ ক'রে দিতে পা'র্‌লেই হ'ল। পা উঁচু ক'রে তা'রা মড়ার মত পড়ে' থা'ক্‌বে ; ধূলো ঝেড়ে উঠে' দাঁড়িয়ে আর লড়াই ক'র্‌তে আ'স্‌বে না।

হুড়মুড় ক'রে চেয়ারগুলো সব ফেলে দেওয়া হ'ল—ব্যস্‌, নিশ্চিন্ত।

—"ভাই সব, যুদ্ধ আমাদের শেষ হয়েছে। ওই দেখ শত্রুরা সবাই পড়ে' আছে। এস, এইবার আমরা খাওয়া দাওয়া ক'রে আজকের মত যুদ্ধের পালা সাঙ্গ করি।"

দেখা গেল, যুদ্ধ ক'র্‌তে সেনাপতির যেমন উৎসাহ, খাওয়া দাওয়া ক'রতেও তা'র উৎসাহ তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

আলমারি খুলে যে রসদ পাওয়া গেল, তা'কে নিতান্ত মন্দ বলা চলে না। লুচি, তরকারি, সন্দেশ আবার তা'র উপর একবাটি পায়েস। বিকালের জল খাবারের জন্য তৈরী ক'রে রাখা হয়েছিল।

হৈ হৈ ক'রে সবাই খেতে বসে গেল।

* * *

গণেশ কিন্তু খাবারে হাত দিতে পা'র্‌ল না।

যেখানে হাঁদা মাথা থেকে টুপিটা খুলে রেখে দিয়েছিল, তা'র চোখ ছিল সেই দিকে। সে শুধু ভাব্‌ছিল, সকলের চোখ এড়িয়ে সেটা কোনমতে হস্তগত করা যায় কি না।

খাওয়ায় উন্মত্ত হ'লে কাহারও আর অন্য দিকে মন্‌ থাকে না।

সুযোগ বুঝে গণেশ নিঃশব্দে টুপিটা তুলে' নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

নির্জ্জন ঘর ; আয়নার সাম্‌নে গিয়ে নির্ভয়ে এইবার টুপিটা মাথায় দিয়ে নিজের ছবির দিকে চাইতেই খুসির হাসিতে তা'র মুখ ভরে গেল।

এতক্ষণে সে সেনাপতি।

তা'র সৈন্য নেই—নাই বা রইল। কেউ তা'র হুকুম মান্‌বে না—না মানুক। তবু সকলের বড় সেনাপতির টুপি তো তা'র মাথায়।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

রাণা জঙ্গবাহাদুর .

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় প্রদেশ। এই প্রদেশের অন্তর্গত নেপাল রাজ্যে প্রায় ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে, রাণা জঙ্গবাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন নেপালরাজের এক সামান্য কর্ম্মচারী। সামান্য কর্ম্মচারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি নিজ বাহুবলে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে একদিন নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হ'ন। জঙ্গবাহাদুরের সমগ্র জীবনই অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ এবং প্রত্যেকটাই তাঁহার নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করে। সেই সকল ঘটনার কয়েকটি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

জঙ্গবাহাদুরের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তিনি একদিন দেখিলেন, তাহার পিতার এক দুর্দ্দান্ত অশ্ব বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে; তিনি তাহাকে খুলিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্বটি অমনি বেগে ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি অশ্বটির গলা জোরে জড়াইয়া ধরিলেন এবং স্থির হইয়া তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। অশ্ব যখন দেখিল যে, তাহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না—তখন সে শান্ত হইল।

সেই বৎসর একদিন জঙ্গবাহাদুর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, মন্দিরের নিকট একটি প্রকাণ্ড সর্প ফণা তুলিয়া বসিয়া আছে। সর্পটিকে ধরিবার জন্য তাঁহার মন নাচিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরের নিকট গিয়া সর্পটির ফণা সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। সর্পটিও তাহার দেহ দিয়া জঙ্গবাহাদুরের হস্ত জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু তাঁহার মুষ্টির মধ্যে নিস্ফল গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিল না। এই-রূপভাবেই তিনি তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বহু কষ্টে সর্পটিকে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর মধ্য দিয়া বাগমতী নদী প্রবাহিতা। পার্ব্বত্য নদী, কাজেই তাহার স্রোত ভীষণ—বিশেষতঃ বর্ষায় দুকূল প্লাবিত করিয়া বাগমতী ভীম গর্জ্জনে ধাবিত হয়। জঙ্গবাহাদুরের বয়স যখন দশ বৎসর তখন একদিন তিনি বর্ষার ভরা নদীতে নির্ভয়ে লাফাইয়া পড়িলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়া সেবার তাঁহাকে নদী হইতে উদ্ধার করা হইল।

প্রত্যেক বৎসর নেপালরাজের পক্ষ হইতে অরণ্যে হস্তী ধরিবার বন্দোবস্ত করা হইত। একবার একটা প্রকাণ্ড 'গুণ্ডা' হস্তী খেদায় পড়িল; কিন্তু কাহারও এরূপ সাহস

হইল না যে, তাহাকে বাঁধিয়া আনে। জঙ্গবাহাদুর দমিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ভীষণ-দর্শন বন্যহস্তীকে বাঁধিতে চলিলেন। সকলেই ভাবিল তিনি নিশ্চয়ই 'গুণ্ডা' হস্তীর পদতলে প্রাণ দিবেন; কিন্তু তিনি অতি সাবধানে ও কৌশলে হস্তীর নিকট গমন করিয়া তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিলেন।

একবার কাঠমাণ্ডুতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। সেখানকার অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত, সেইজন্য অগ্নি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। একটি গৃহ 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং সেই গৃহের সকলেই বাহির হইয়া আসিল—কিন্তু একটি রমণী ও তাহার একটি শিশুপুত্র বাহির হইতে পারিল না। সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও এমন সাহস হইল না যে, সেই দুইটি প্রাণীকে উদ্ধার করে। সহসা জঙ্গবাহাদুর সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনিবামাত্রই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রলয়াগ্নির ভিতর প্রবেশ করিলেন। লোকে ভাবিল, তিনি আজ জীবন্ত দগ্ধ হইবেন, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে রমণী ও শিশুটির সহিত বাহির হইয়া আসিলেন! চারিদিক্ আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার দেহের অনেক স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হয়।

একদিন কোন এক গৃহস্থের গৃহে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রবেশ করিল। সমস্ত গ্রামে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জঙ্গবাহাদুর সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ একটি ঝুড়ি আনাইয়া যে গৃহে ব্যাঘ্র ছিল তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। তিনি ঝুড়ি দ্বারা তাহাকে বাধা দিয়া তাহার গলা জোরে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"বাঘ ধরা পড়িয়াছে, বাঘ ধরা পড়িয়াছে।" ব্যাঘ্রটি তখন অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। সেই জীবিত ব্যাঘ্রটিকে তিনি নেপালরাজের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন।

নেপালরাজের 'হাতীশালার' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তীটি হঠাৎ পাগল হইয়া যায়। সে মাহুতকে মারিয়া সহরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল—যাহাকে সম্মুখে

পায় তাহারই প্রাণ সংহার করে। এই সংবাদ ক্রমে জঙ্গবাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি এক হস্তে একটি কুক্‌রী ও অন্য হস্তে একটি অঙ্কুশ লইয়া যে দিক্ দিয়া হস্তীটি আসিতেছিল সেই দিকে গমন করিয়া, রাস্তার পার্শ্বে একটি গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া বসিলেন। হস্তীটি সেইখানে আসিবামাত্রই তিনি তাড়াতাড়ি তাহার পৃষ্ঠের উপর লাফাইয়া পড়িয়া স্থির ভাবে বসিলেন। হস্তী তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তিনিও কুক্‌রী ও অঙ্কুশ দিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হস্তীটি ছুটিতে লাগিল। এইরূপে হস্তীটি এমন এক রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল যাহার কিছু দূরে সম্মুখে একটা কাঠের সেতু। সেই সেতুর উপর হাতীর পা পড়িলেই উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন; এধারে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিলেই প্রাণ যায়, ওধারে সেতুর নীচে পড়িলেও মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না—হস্তীর কর্ণ অঙ্কুশ দ্বারা সজোরে টানিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ চীৎকারে হস্তীটি ভীত হইয়া অন্যদিকে পলায়ন করিল। সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন। হস্তীটিও অতিরিক্ত মার খাইয়া শান্ত হইল।
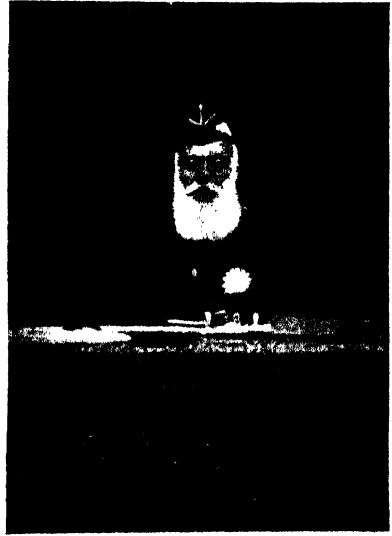
তখন জঙ্গবাহাদুর সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য হইতে রাজকুমারের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। একদিন রাজকুমার ত্রিশূলগঙ্গ নামক নদীর সেতুর উপর বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে রাজকুমারের এক অদ্ভুত খেয়াল হইল। তিনি পাশের একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া এই সেতুর উপর হইতে নদীর মধ্যে লাফাও।" ত্রিশূলগঙ্গার স্রোত এরূপ প্রবল যে, তৃণ পড়িলেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; সুতরাং কেহ নদীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কর্ম্মচারীটি করযোড়ে কহিল—"মহারাজ, জঙ্গবাহাদুর ছাড়া নেপালে এমন কোন বীর নাই যে, এই নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়ে।" অমনি জঙ্গবাহাদুরের ডাক পড়িল। তিনি দেখিলেন

যে, কুমার ছাড়িবার পাত্র নহেন, সুতরাং তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। নদীর উভয় তীর লোকে লোকারণ্য। জঙ্গবাহাদুর ঘোড়ায় চড়িয়া সেই সেতুর উপর হইতে নদীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। চারিদিকে হাহাকারের রোল উঠিল। তাঁহার অন্বেষণে বহু নৌকা প্রেরণ করা হইল। নৌকাগুলি কিছুদূর গমন করিয়া দেখিল যে, নদীর মধ্যে এক যায়গায় একটি চড়ার উপর তিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সিংহ

মা

মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর তিন ভুবনে নাই।
সত্য ন্যায়ের ধর্ম্ম থাকুক্ মাথার 'পরে আজি,
অন্তরে মা থাকুন মম ঝরুক স্নেহ-রাজি।
রোগ্-বিছানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণাতে মরি,
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধু-নামটি হৃদে স্মরি'।
বিদেশ গেলে ঐ মধু-নাম জপ করি অন্তরে,
প্রাণ যে কেমন করে আমার মন যে কেমন করে।
মা যে আমায় ঘুম পাড়াতো দোল্‌না-ঠেলে ঠেলে,
শীতল হ'ত প্রাণটা মায়ের হাতটা বুকে পেলে,—
পালিয়ে যেত মশা যে মা'র ঘুম্ পাড়ানী গানে,
শৈশবেরই মধুর স্মৃতি জাগ্‌ছে আজি প্রাণে।
মাগো আমি বিদেশ থেকে দিচ্ছি তোমায় চিঠি,
কেমন আছ জান্‌তে চাহে দেখ্‌তে চাহে দিঠি।
তোমায় স্মরি' চোখ্ ফেটে মোর, অশ্রু যে আজ ঝরে,
প্রাণ যে কেমন করে আমার মন যে কেমন করে।

কাদের নওয়াজ

ধর্ম্মের কল

হেঁসোডাঙার পালমশায়—নীলু পাল—বদরগঞ্জে এসেছিলেন সওদা করতে। সামনে পুজো, ছ' চার পয়সা যা বেচা-কেনা হবে, তা এই সময়ই।

কাল থেকে তিনি সওদা করেছেন বিস্তর। পূজোর সময় যা কিছু মাল-পত্র কিনলেন সবই সৌখীন। ফুলপাড় সাড়ী, ডুরে সাড়ী, লাল, কাল পাড় প্রমাণ ধুতী, লাল সাটিনের জামা, কামিজ, পাঞ্জাবী, রুমাল, তরল আল্‌তা, ছ'চার শিশি ফুলেল তেল, জুতো, কয়েক জোড়া তালতলার চটি, এর সঙ্গে মাথার কাঁটা, চুলবাঁধা ফিতে, জরী ত' ছিলই। এসব ও অঞ্চলে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া ওদিকে নীলুপালের দোকানের খ্যাতি খুব। সেখানে না পাওয়া যায় এমন জিনিষই নেই। সেইজন্য গাঁ থেকে যারা কল্‌কাতায় পড়তে আসে, তারা গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পালমশায়ের দোকানকে বলে—"হেঁসোডাঙার হোয়াইটওয়ে লেডল কোং—"

পালমশায়ের সওদা করা যখন শেষ হ'ল তখন বেলা ছুপুর। ভাদ্রের রৌদ্র—যত আলো, তার চতুর্গুণ তেজ। পালমশায়ের কালো শরীর ঘামে কষ্টি পাথরেব মত চক্ চক্ করছে। তিনি রামজী কাঁইয়ার বারান্দায় বসে পান চিবোতে চিবোতে ফর্দ্দ ধ'রে হিসেব করছেন। ফর্দ্দর শেষে ঠিক দিয়ে দেখলেন, মোট সওদা হয়েছে সাতানব্বুই টাকা ছুই আনা তিন পয়সা, এর মধ্যে মুটে ভাড়া গেছে ছ' পয়সা।

মনে মনে বল্‌লেন—"সব বেটা চোর, নিজে না এলে কি রক্ষে আছে? চুরি ক'রে সব শেষ ক'রে দেবে। জিনিষ-পত্রে টাকা পিছু এক পাই ত বেশি লাগেই, তা'র ওপর ছ'আনা দশ পয়সা মুটে ভাড়া। এই ত কাল থেকে একটা মুটে আমার সঙ্গে লেগেই আছে, তা'কে দিলাম ভাড়া বাবদ পাঁচ পয়সা, আর এক পয়সা জলখাবার। এও বেশি হ'ল। একে পূজোর ভীড়, তা'র ওপর আগে দর করা হয় নি। কাজেই বেটা ত পেয়ে বস্‌বেই—" বল্‌তে বল্‌তে তিনি একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে কোমর থেকে লাল খেরোর তেলচিটে গেঁজে খুলে তার ভেতরে যা ছিল, সব সাম্‌নে ঢাল্‌লেন। সেই সময় একটু রুমুঝুমু শব্দ হ'ল। রামজী হাঁটু গেড়ে বসে কাপড় ভাঁজ কর্‌ছিল। সেই শব্দে সেদিকে একবার চট ক'রে ফিরে তাকিয়েই সে নিজের কাজে মন দিল। তার সামনে তখন ছ'চারজন গ্রাহক ব'সে।

পালমশায় কড়ি ক'টা আর পাইটা বেছে নিয়ে থলেয় পূরে টাকা-পয়সাগুলো গুণে দেখ্‌লেন, মোটে আর আছে পাঁচ টাকা তেরো আনা আধ পয়সা। এখনও নিজ খাতে গোটা ছুই সওদা বাকী!

রামজী পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলে—"কিগো পালমোশায়, আজ যাওয়া হোবে না কি?"

"হুঁ, আমার গাঁঠ্‌রী ছুটো রইল—" ব'লে পালমশায় গেঁজের মুখটা গেরো দিয়ে বন্ধ ক'রে কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধলেন। তারপর গায়ের আধময়লা উড়ুনীর এক মুড়ো দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে' দাঁড়ালেন। কাদা-মাখা ও ছেঁড়া জুতো জোড়া পায়ে দিতে দিতে আবার বল্‌লেন—"ও শেঠজী, গাঁঠরী ছুটো রইল—"

হেঁসোডাঙা থেকে বদরগঞ্জ গরুর গাড়িতে পাকা সাড়ে নয় ক্রোশ। নদীপথে গেলে পথটা প্রায়

ক্রোশখানেক কম হয়, কিন্তু সে-পথ ধরবার এক অসুবিধা আছে। নদীটা কাকমারী থেকে ঘুরে গেছে পশ্চিমে। সেজন্য বরাবর নদীপথে যাওয়া যায় না, ক্রোশ পাঁচেক দূরে কাকমারীর ঘাটে নেমে গরুর গাড়ি নিতে হয়। বদলা-বদলী, তার ওপর বর্ষাকাল, আবার সময়ে সময়ে ঘাটে গাড়ির অভাব—এইজন্যে পালমশায় ঠিক করলেন একেবারে হাট থেকেই গরুর গাড়িতে যাবেন।

তার ঘণ্টা দুই পরে একখানা গরুর গাড়ি নিয়ে রামজীর দোকানে ফিরে আস্‌তেই রামজী হেসে বল্‌লে—"কি পালমোশায়, গাড়ি পেলে ?"

"অতি কষ্টে। কেউ যেতে চায় না—সব বেটার সুখের শরীর। বলে—কাদা ভাঙতে যাবে কে ? ওরে--এই—তোর নাম কি ? ময়না ? তোল্—তোল্—গাঁঠরী দুটো গাড়িতে তোল্—" বলে' পালমশায় গাড়োয়ানকে হাত নেড়ে ডাক্‌লেন।

ময়না পালমশায়ের দিকে একবার তাকালে মাত্র, তার বেশি আর কিছু করবার আগ্রহ দেখা গেল না।

পালমশায় একটু গরম হ'য়ে উঠ্‌লেন ; চড়া গলায় বল্‌লেন—"গাঁঠরী দুটো তুলে নে—"

ময়না তবুও নির্ব্বিকার ; সে বলদ দুটোকে যেমন খড় খাওয়াচ্ছিল, তেমনি খাওয়াতে লাগ্‌ল।

পালমশায় হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—"এই বেটা শয়তান। এখান থেকে পৌণে দু'টাকা ভাড়া কি কেবল যাবার জন্যে ? মাল উঠাবে নামাবে কে ?"

ময়না বল্‌লে—"তুমি।"

বাজার-হাটে গাড়োয়ান, মুটে, দোকানদারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বকাবকি হচ্ছে। ওর মধ্যে মজা নেই, সেই জন্যে কেউ ব্যাপারটার প্রতি মনোযোগ দেয় না। ঝগড়াটা যেমন হঠাৎ হয় তেমনি হঠাৎ থেমে যায়।

পালমশায় দেখ্‌লেন, এ হেঁসোডাঙার বাজার নয়, বিদেশ-বিভুঁই। এখন চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এর ব্যবস্থা হবে কাল সকালে দোকানে পৌঁছে। আর কিছু না ব'লে ভেতরে গিয়ে কাপড়ের গাঁঠ্‌রীটায় একটা ঠেলা দিলেন—বেজায় ভারী। সেই মুটে ভাড়াই লাগ্‌ল, কি ঝঞ্ঝাট। মুটেরাও সময় বুঝে হেঁকে বস্‌ল—দুটো মোট চার পয়সা।

শেষে অনেক দর কষাকষির পর ঠিক হ'ল, কাপড়ের গাঁঠ্‌রীটা তুল্‌তে এক পয়সা ; বাকী যা আছে সব পালমশায় নিজে তুলবেন।

ওদিকে বেলা গড়িয়ে এল। মোটঘাট তুলে পালমশায় যখন গাড়িতে উঠে বস্‌লেন তখন বিজয় চৌধুরীর ডিস্‌পেন্‌সারীর ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বাজ্‌ল ছ'টা।

ময়না গাড়িতে উঠে' বলদ দুটোর পিঠে ঠেলা দিতেই তারা 'ছটাক ছটাক' শব্দে রাস্তা দিয়ে জোরে হেঁটে চল্‌তে লাগ্‌ল। পালমশায়ও গাঁঠ্‌রী দুটোর গায়ে হাত দিয়ে, অন্য সওদাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লেন—সব ঠিক আছে। সঙ্গে তামাকের সরঞ্জাম ছিল। পরিশ্রম ও বচসায় দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, তাই চোঙ্গার মত টিনের কৌটোটা খুলে তামাক সাজ্‌তে বস্‌লেন। কল্‌কেতে তামাক ভরতে ভরতে তিনি ময়নার দিকে তাকিয়ে একটা কথা কেবল ভাব্‌ছেন—'লোকটাকে কোথায় দেখেছি?' কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না, কোথায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বাজার ছাড়িয়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়েছে, পালমশায়ও তামাক টান্‌ছেন। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে ছইয়ের মধ্য থেকে সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন—দু'পাশে জলে ডোবা আমনের ক্ষেত। জলের মধ্য থেকে গাছগুলোর কচি আগা একটু একটু মাথা তুলে আছে। দূরে গাঁ, রাস্তাটা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে অজগরের মত এঁকে বেঁকে সেদিক পানে চলে গেছে। রাস্তায় এক হাঁটু কাদা।

দৃশ্যটা পালমশায়ের ভাল লাগ্‌ল না। তিনি বার দুই হুঁকোটায় টান দিয়ে কলকেটা তার মাথা থেকে খুলে গাড়োয়ানকে বল্‌লেন—"এই নাও—ধর গো—"

গাড়োয়ান পিছন ফিরে হাত বাড়িয়ে কল্‌কেটা নিলে।

পালমশায় আবার ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—'এ লোকটাকে কোথায় দেখেছি?'

এমন সময় হঠাৎ অন্ধকার ক'রে এল। সন্ধ্যা হ'ল না কি? গাড়ি তখন পূব মুখো চলেছে। ছইয়ের পিছন দিয়ে পালমশায় তাকিয়ে দেখ্‌লেন, সারা পশ্চিম আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে—ঘন কালো। তার ছায়ায় ক্ষেতের জল কালো হ'য়ে উঠ্‌ল—যেন কালির পাথার। মাঝে মাঝে মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি নাম্‌ল না। সন্ধ্যাও হ'ল, আর ধানক্ষেতের জলের ওপর দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে বৃষ্টি ছুটে' এল। সেই সঙ্গে হু হু শব্দে বাতাস বইছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বলদ দুটো পাশের খালে গিয়ে পড়ে, কি, কাদায় বসে যায় ঠিক নেই! এই অবস্থায় পালমশায় গাড়োয়ানের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন।

গাড়িতে ওঠ্‌বার আগের ঘটনাটা তাঁর মনে পড়্‌ল। লোকটার চড়া মেজাজ, কড়া কথা, রুক্ষ চাউনি, পুষ্ট শরীর, ভোঁতা নাক, খাড়া চুল—সব মিলে তা'কে পালমশায়ের চোখে এমন একটা ভয়ঙ্কর মানুষের মত ক'রে তুল্‌লে যে, তিনি তাঁর গাঁঠ্‌রী দুটো ও প্রাণটার জন্যে বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন।

গাড়োয়ানের মনে তখন কি হচ্ছিল, জানি না। সে তালের টোকাটা মাথায় দিয়ে উবু হ'য়ে বসে মাঝে মাঝে বলদ দুটোকে লেজমলা, লকড়ীর হুলো ও গালাগাল দিচ্ছে। সেই সময় বলদ দুটো এক একবার তাদের কাদামাখা লেজ ছট্ ছট্ শব্দে এপাশে ওপাশে ঘোরাচ্ছে। তার ফলে লেজের

আগা থেকে কাদা ছিট্‌কে পড়ছে। কয়েকবার পালমশায়েরও ঠোঁটে, চোখের কোলে ও কানের পাশে লেজের কাদা লাগ্‌ল। তিনি কাদা মুছ্‌তে মুছ্‌তে ছইয়ের ভেতর সরে বস্‌লেন।

শরৎকাল। সেইজন্য কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টিও ধরে এল। মেঘের ফাঁকে তারা ঝিক্‌মিক্‌ কর্‌ছে। কিন্তু পালমশায়ের মনের মেঘ আর কাট্‌ল না। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"সামনে যে গাঁখানা ছিল সেখানা—?"

গাড়োয়ান ডানদিকের বলদটার পিঠে এক ঘা লকড়ী বসিয়ে বল্‌লে—"ছেড়ে এলাম—সাম্‌নে দাঁতভাঙা বিল—"

পালমশায়ের বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল—জায়গাটা ভাল নয়, সেই সঙ্গে চট ক'রে মনে পড়্‌ল দশ বছর আগেকার এক ঘটনা। এর এক জায়গায় তাঁর খুড়ো জগবন্ধু পাল ডাকাতের হাতে পড়েন। তাঁর প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! শেষকালে গেল কেবল মালপত্র ও ডান পা'খানা। পুলিশের কেরামতিতে ডাকাতরা সকলেই ধরা পড়ে। তিনি ডাকাতদের সকলকেই দেখে—কথাটা শেষ হ'তে না হ'তেই পালমশায়ের দম বন্ধ হ'বার মত হ'ল। ঐ গাড়োয়ানটাও যে ছিল তাদের মধ্যে! সর্ব্বনাশ! বেটার জেল হয়েছিল—আট বছর। জেল থেকে বেরিয়েই আবার ডাকাতি করতে আরম্ভ করেছে? এ পথে কেউ আস্‌তে চায় নি, ও বেটা স্বচ্ছন্দে বল্‌লে—"যাবো—"

পালমশায়ের বুক ঢিপ ঢিপ কর্‌ছে। একবার ভাব্‌লেন—মালপত্র ফেলে চুপি চুপি পিছন দিয়ে নেমে গাঁয়ের দিকে দৌড় দেন। প্রাণটা বাঁচ্‌লে ঢের ব্যবসা কর্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু তারপরই মনে হ'ল চারধারে জলকাদা; এই অন্ধকারে সাপখোপের মাথায় পা দেওয়াও বিচিত্র নয়; আবার গাড়ির পিছন পিছন যে কোন ডাকাত আস্‌ছে না তারই বা প্রমাণ কি? পালমশায় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজের ওপর তাঁর দারুণ রাগ হতে লাগ্‌ল। কেন নৌকায় গেলাম না? এখন এ যাত্রায় যদি রক্ষা পাই, সওয়া পাঁচ আনার হরির লুঠ দেব।

কিন্তু তারপরই মনে হ'ল,—সে ত পরের কথা, আপাততঃ বাঁচি কি কৌশলে? তিনি গাড়োয়ানকে খুশী কর্‌বার জন্যে বল্‌লেন—"তামাক খাবে গো?"

গাড়োয়ান বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল; বল্‌লে—"ঐ বটতলায় —"

পালমশায়ের বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। সেবারকার ডাকাতিটা হয়েছিল, বিলের ধারে বটতলায়। এবারও সেই বটতলায়! তাঁর কান, চোখ ও চিন্তাশক্তি হঠাৎ প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি শুন্‌তে পেলেন, কারা যেন কাছেই কোথায় কথা বল্‌ছে, ঐ যে সাম্‌নে একটা জায়গায় অস্পষ্ট আলো দেখা যায়।

গাড়োয়ানও এবার সজাগ হ'য়ে বসে বল্‌লে—"মশাই গো, বেশি নড়া-চড়া করো না, চুপ করে বস—"

পালমশায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বিল আর কতদূর?"

"ঐ ত সাম্‌নে বাঁ দিকে শ্মশানের আলো দেখা যায়—"

"কাছে গাঁ নেই?"

"আছে। পূবে এক ক্রোশ দূরে—"

কথাটা মনে মনে আলোচনা কর্তে কর্তে পালমশায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কতদিন গাড়ি বইছ?"

"দু' বছর—"

"তার আগে?"

উত্তরটা দেবার আগেই দূর থেকে কে যেন ভারী গলায় হাঁক দিলে—

পালমশায়ের গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত-পা আড়ষ্ট।

গাড়োয়ান চাপা গলায় বল্লে—"চুপ্ ক'রে বসে থাক—নড়া-চড়া ক'রো না—"

পালমশায়ের দু'চোখ জলে ভরে' উঠ্ল। তিনি ভাঙা গলায় বল্লেন—"আমায় প্রাণে মারিস্ নে—যা চাস্ দেব—"

"চুপ্ চাপ্ বসে থাক—একটুও নড়া-চড়া করো না।"

"আমায় প্রাণে মারবি নে ত?"

"মারবার যারা তা'রা আছে ঐ বিলের ধারে।"

"ময়না—বাপ আমার—তুই আমার ছেলের মত। যদি বাঁচাতে পারিস, একশ' টাকা বক্‌শিস্ দেব।" বল্‌তে বল্‌তে পালমশায়ের গলা ধ'রে এল।

পালমশায় গাড়োয়ানকে বললেন—"তামাক খাবে গো?"

এবার হাত কুড়িক দূর থেকে কে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"গাড়ি কার?"

"তোর বাপের—" বলেই ময়না বলদ জোড়ার পিঠে ঘন ঘন লকড়ী মারতে মারতে ডানধারে হুড়মুড় শব্দে নেমে পড়ল।

পালমশায় সভয়ে দেখ্লেন, গাড়ি জল ভেঙে চলেছে। পিছনে এক সঙ্গে আট-দশজন লোক চীৎকার করছে—"হা রে রে রে রে—"

পালমশায়ের গা দিয়ে ঘামের স্রোত বইতে লাগ্ল। তিনি কিছুই বুঝ্তে পারেন না—একি কাণ্ড! এ যে চারধারে জল!

মিনিট কতক পরে একবার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও বাপ ময়না! এ যে দেখ্‌ছি জল—"

"বেটারা এই জল ঠেলে ধর্‌তে পারবে না। আমার সঙ্গে শয়তানি—!"

"আমি ত কিছুই ঠাওর পাচ্ছি নে—"

"ঠাওর পাবার কি দরকার? তোমার মালপত্র নিয়ে বাড়ি পৌঁছলেই ত হ'ল? এ জল এক ক্রোশ জমিতক আছে। কোন জায়গায় এক কোমরের বেশি নয়। এর পর কাকমারীর সড়ক—"

পালমশায়ের বুকের ওপর থেকে হঠাৎ যেন একখানা পাথর নেমে গেল; হৃদ্‌পিণ্ডটা আহ্লাদে নেচে উঠ্‌ল।

ময়না বাহন দুটোকে ঘন ঘন উত্তেজিত কর্‌ছে আর এক একবার উঠে' দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে।

পালমশায়ও মাঝে মাঝে কানখাড়া করে শুন্‌ছেন। না, পিছনে যে কেউ আস্‌ছে, তার কোন লক্ষণই নেই। কেবল গাড়ির ভয়ে ব্যাংগুলো দু'পাশে ও সাম্‌নে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে লাফিয়ে পালাচ্ছে।

পালমশায় তামাক ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বছর দুই আগে তুমি কি করতে ময়না?"

"জেল খাট্‌তাম; আমার বাবাও জেলে গিয়েছিল—"

"কেন?"

"ডাকাতি ক'রে—"

"বটে! এখন সে আর ডাকাতি করে না?" বল্‌তে বল্‌তে পালমশায়ের বুকটা আবার কেঁপে উঠ্‌ল।

"সে জেলের মধ্যেই মারা গেছে।"

"তুমি এখন আর ওসব—"

"তখনও কর্‌তাম না। কেবল পাঁচজনের মিথ্যে সাক্ষীতে জেল খাটলাম। হেই টক্—টক্—হেনে:—"

"এই নাও ধর—"

ময়না পালমশায়ের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে এবার খুব জোরে জোরে টান দিতে লাগ্‌ল। টানে টানে কলকের মাথায় ফুট্‌ ফুট্‌ শব্দে ফুল্‌কী উড়্‌ছে, শেষে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

অতঃপর যাত্রী ও রথীতে আর কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না। পালমশায় কলকেটা ময়নার হাত থেকে নিয়ে তার আগুনটা জলে ঢেলে ফেলে দিলেন।

জল ঠেলে গাড়ি চলেছে। পালমশায়ের চোখে ঘুম নেই; ময়না কিন্তু মাঝে মাঝে ঢুল্‌ছে।

পালমশায় বসে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাঁর চোখের সাম্‌নে থেকে রাতের কালো পর্দাখানা একটু খসে পড়্‌ল; সেই সঙ্গে গাছের ভিজে ডালে বসে' ডানা ঝাপটে পাখীরা কলরব সুরু কর্‌লে, পুব আকাশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, জলাভূমি পার হয়ে গাড়িও উঠ্‌ল কাকমারীর সড়কে।

হেঁসোডাঙা আর ক্রোশখানেকেরও কম।

পালমশাইয়ের মেজাজ হঠাৎ একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছে। তিনি বল্‌লেন—"এইটুকু পথ পার হ'তে রাত কাবার করলি—?"

ময়না বল্‌লে—"জান কাবার হ'ত। রাত কাবার আর বেশি কি?"

শেষে একটু বেলা উঠ্‌লে, গাড়ি ধীরে ধীরে হাঁসোডাঙ্গার বাজারে এসে ঢুক্‌ল। খান কয়েক দোকান ছাড়ালেই পালমশায়ের ঘর।

পালমশায় হুঙ্কার দিলেন—"বেটা নেশাখোরের মত ঝিমিয়ে চল্‌ছে—"

ময়না জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তোমার ঘর কৈ ?"

"ঐ যে বাঁ ধারে কদম গাছের নীচে—"

গাড়ি ততক্ষণে ঠিক কদমতলায় এসে পৌছেছিল।

গাড়ি থামিয়ে একলাফে নেমে ময়না জোয়াল খুলে গাড়ির মুখ মাটিতে নামিয়ে রাখ্‌লে। পালমশায় ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দোকানের জন দুই লোক গাড়ি থেকে মাল-পত্র নামিয়ে নিলে।

রাস্তার ধারে একটি খোঁটা ছিল। ময়না বলদ দুটাকে তার সঙ্গে বেঁধে গাড়ি থেকে খড় নিয়ে তাদের খেতে দিয়ে লকড়ীটা বগলে চেপে দোকান ঘরে উঠে' দাঁড়ালো।

পালমশায় দোকানের মাদুরের ওপর বসেছেন; জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি চাস ?"

"কি কথা ছিল ?"

"কি কথা রে বেটা, ডাকাত ? তোকে পুলিশে দেব না এই ঢের—"

পালমশায়ের গলার স্বর তখন সপ্তমে উঠেছে। পুলিশের নাম শুনে চারধার থেকে লোক এসে জড় হ'তে লাগ্‌ল।

ময়না নির্ভীক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তোমার করেছি কি ?"

"করেছ কি বেটা ডাকাত ? কাল রাত্রে দাঁতভাঙ্গা বিলের ধারে নিয়ে গিয়ে আমায় মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিলে। ও পতিত ! ওরে কৈলেস ! এ লোকটা কে জান ? জগবন্ধু খুড়োর পা ভেঙ্গে দিয়ে যারা সব কেড়ে নিয়েছিল, এ তাদেরই একজন। বেটার আট বছর জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়েই আবার আরম্ভ করেছে—"

সকলে বল্‌লে—"তবে তুমি ত খুব বেঁচে গেছ।"

"আরে আমায় মারে কে ? বেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছি, ও বেটা জানে না যে, আমি ভূতের ওঝা, ভূতের পাল্‌কী চড়ে বেড়াই—" এই ব'লে পালমশায় ময়নার দিকে তাকালেন।

ময়নার কটা চোখ দুটো তখন হিংস্রতায় জ্বলছে। সে খাটো গলায় বল্‌লে—"ভাড়া দাও—পৌণে দু'টাকা—"

"বেটা, পৌণে দু'টাকা দিচ্ছি তোমায়। কালকের আর আজকের মুটে ভাড়াটা ওর থেকে কাট্‌ব—"

"কেন ?"

"নিশ্চয়ই কাট্‌ব—"

"তবে তোমার টাকা রাখ। আমার হক্কের ধন যদি হয় ত আদায় হবেই—" ব'লেই ময়না দোকানের বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে বলদ দুটোর সামনে থেকে খড়ের আঁটিগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগ্‌ল।

কৈলাস বল্‌লে—"পালমশায়, টাকাটা দিয়ে দাও, দিন-কাল ভাল নয়—"

পালমশায় বল্‌লেন—"অত ভয় করলে চলে না। তবে তুমি বল্‌ছ—আমার চারটে পয়সা বেশি গেল। ওরে নিতাই, বেটাকে এই ভাড়াটা দিয়ে দে।"

নিতাই পালমশায়ের হাত থেকে পৌণে দু'টাকা নিয়ে যখন ময়নাকে দিতে গেল, তখন সে গাড়িতে উঠেছে। নিতাইয়ের হাত থেকে ময়না ভাড়াটা নিয়ে গুণে, টাকা ও আধুলী বাজিয়ে দেখে ট্যাঁকে গুঁজে গাড়ি ছেড়ে দিলে। যাবার সময় একবার পালমশায়ের দিকে তাকালে।

পালমশায় বল্‌লেন—"মনে রাখিস্ আমার নাম নীলমণি পাল।"

ময়নার নীরব ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যেন বল্‌লে,—"তুমি সাপের লেজে পা দিয়েছ—"

বাজারের সকলে হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল—"বেটা আর কখনও এ পথে আসিস্ নে—"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ময়নার গাড়ি হেঁসোডাঙার বাজার ছাড়িয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার তিন বছর পরে, হেঁসোডাঙ্গায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার 'হোয়াইট ওয়ে লেড্‌ল কোং'কে দেখ্‌তে পেলাম না। শুনলাম—একরাত্রে আগুন লেগে বাজারের অর্দ্ধেক পুড়ে গেছে, সেই সঙ্গে হেঁসোডাঙ্গার 'হোয়াইট ওয়ে' ছাই হ'য়ে যায়। আর তার কিছুদিন পরে ময়না গাড়োয়ানও বাদায় ধান কাট্‌তে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছে। ঐ পোড়ার সঙ্গে মরার যোগ কি জানি না; কিন্তু পালমশায় বলেন—"ধর্ম্মের কল।"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কড়ি-ব্রাদার্স্

এককড়ি গান গায় দুকড়ির বাড়ীতে;
তিনকড়ি ঘরে বসি ঠোকে তাল হাঁড়িতে।
পাঁচকড়ি ডেকে কয়—'এস, দাদা ছকড়ি,
আমরাও দুজনায় ধরি তান হাঁ করি'।'
সাতকড়ি শুনে বলে—'তোরা যদি গাবি গান,
নকড়িরে ডেকে এনে ম'লে দেবো দুটি কান।'

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

কি ও কেন ?

ফলে শাঁস থাকে কেন ?

গাছ অচল জীব। তাহাকে বংশ রক্ষা করিতে হইবে। একটা আমগাছে হাজার ফল ধরা অতি সাধারণ কথা। সেই আমগাছ ডালপালা মেলিয়া কয়েক বর্গফুট জমির উপর দাঁড়াইয়া থাকে, এই জমিটুকু না হইলে তাহার চলিবে না।

স-সন্তান আমগাছ

এখন মনে কর হাজারটি আম পাকিল, এবং খসিয়া গাছের গোড়ায় সেই কয়েক বর্গফুট জমির মধ্যেই পড়িল। ফলের মধ্যে আছে গাছশিশুর ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায়। অনুকূল অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই কয়েক বর্গফুট জমির উপর হাজার শিশু জাগিয়া উঠিল। ইহাদের প্রত্যেকের জন্যই স্থান, বাতাস, আলো, খাদ্যদ্রব্য ও জল চাই। ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হইবেই,—অবিশ্যি অস্ত্রপাতি দিয়া নয়। তোমরা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা কুকুরীর পাঁচটি বাচ্চা হইলে মায়ের দুধ লইয়া মারামারি কামড়াকামড়ি হয়। যে বাচ্চাটি গায়ের জোরে অন্যগুলিকে হটাইয়া দুধ খায়, সে-ই হয় সবল ও সুস্থ এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকে।
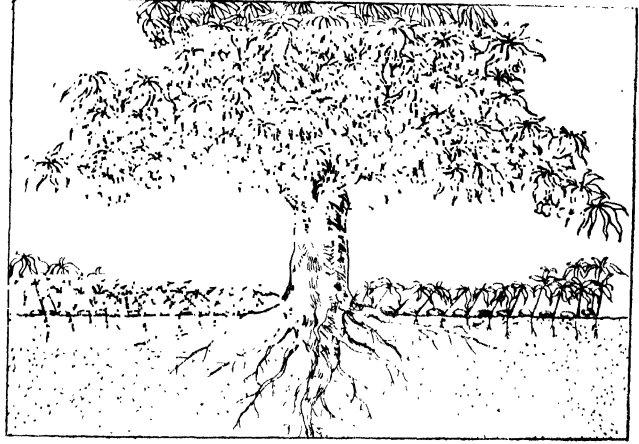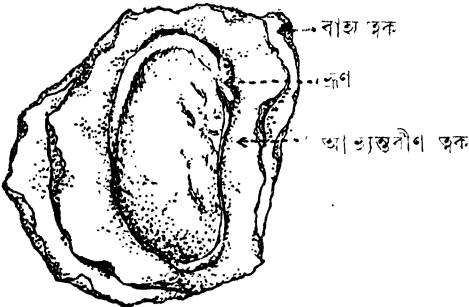
কচি আমের বীজ

আম-শিশুদের অবস্থাও কুকুরের বাচ্চার মতই। তাদের জননী তো আছেনই,

তাঁহার পক্ষেই সেই কয়েক বর্গফুট জমি যথেষ্ট নহে তাহার উপর হাজার শিশু ! আমাদের দেশের দুঃখিনী ভিখারিণী জননীর পাঁচটি সন্তানের মত অবস্থা নয় কি ?

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ৯৯৯টি আম-শিশু মরিল, একটি না-মরা হইয়া বাঁচিয়া রহিল। ইহার সন্তান-সন্ততি যদি হয় তবে তাহারা হইবে দুর্ব্বল, শীর্ণকায়। ক্রমে দুই-এক পুরুষের মধ্যেই সেই আমগাছের বংশ লোপ হইল।

কিন্তু প্রাণবন্ত গাছ বংশ লোপ হো'ক চায় কি ? বিশেষ করিয়া যে দেশে পরের ছেলেকে দত্তক পুত্র করিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা অছে ! বুদ্ধিমতী আমগাছ করিল কি জান ? ফলের মধ্যে পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিল। তাই না আজ কাশীর নেংড়া আমগাছ তোমাদের বাগানে, মজঃফরপুরের লিচুগাছ সুদূর বাংলার পল্লীগ্রামে ! এমন করিয়াই ভাল ভাল তরিতরকারীর গাছ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে —জন্তু জানোয়ারের সাহায্যে।

বীজে শাঁস কেন ?

বীজের মধ্যে গাছশিশু ভ্রূণ-অবস্থায় ঘুমাইয়া থাকে। মায়ের সঙ্গে তার তখন আর কোন সম্বন্ধই থাকে না। সময় মত অনুকূল অবস্থায় যখন সে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভূমিষ্ঠ হইবে তখন সে কি খাইয়া বড় হইবে ? নিজের খাবার তৈরি

ধান

রেড়ি
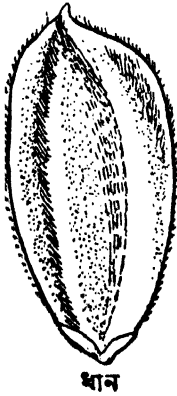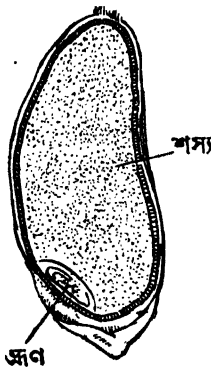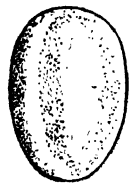
করিবার মত দেহের পরিণতি তখনো তো তার হয় নাই। মায়ের বুকে সঞ্চিত দুধের মত বীজেও খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

মটর, ছোলা প্রভৃতি বীজের খোসা ছাড়াইলে মোটা যে দুইটি দাল বাহির হয় উহা ভ্রূণের দুইটি পাতা। এই পাতা দুইটির মধ্যেই খাদ্য সঞ্চিত থাকে, আর সেই জন্যই দাল দুইটি অত মোটা। সুতরাং ছোলা মটরের মত বীজে ভ্রূণের শরীরের মধ্যেই তাহার জাগিয়া উঠিয়া খাইবার খাদ্য সঞ্চিত থাকে। আবার ধান, যব, গম, রেড়ি প্রভৃতি বীজের শস্য ভ্রূণের শরীরের বাহিরে সঞ্চিত থাকে।

ছোলা

ধান, গম, যব কিংবা ছোলা, মটর প্রভৃতি বীজের শস্য (শাঁস—সঞ্চিত খাদ্য) পরোক্ষভাবে ইহাদের বংশ-বিস্তারের সাহায্য করিলেও প্রত্যক্ষভাবে ইহার উদ্দেশ্য পৃথক্।

ছোলার ভ্রূণ

গাছশিশু মানবশিশুর মতই ভূমিষ্ঠ হইবার পর সঞ্চিত খাদ্যের উপর তাহার জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে। মানবশিশুর জন্য তাহার মায়ের বুকে দুধ সঞ্চিত থাকে, আর গাছশিশুর জন্য বীজে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। যত দিন সে সবুজ পাতা ধারণ করিয়া নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করিতে না পারে, ততদিন সে বীজে সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া বড় হয় ও জীবনধারণ করে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি.

ভূদাদুর চিঠি

(গড়ওয়াল বর্ণন)

গড়ওয়ালে কেদারনাথ ও বদরীনাথ থাকার দরুণ গড়ওয়ালীদের অনেক লাভ। যাত্রা-লাইনে ব্যবসা বা অন্য কাজ ক'রে অনেকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়।

গড়ওয়ালে এক এক গ্রামে এক এক জাতের লোকই বাস করে—কোন গ্রামে কেবল ব্রাহ্মণ, কোন গ্রামে কেবল ক্ষত্রীয়, কোন গ্রামে কেবল "কোলী-ডোম"—যারা এখানকার অছুত। এখানকার ক্ষত্রীয়েরা নিজেদের রাজপুত বলে।

রাজপুতনায় রাজপুতরা এক সময়ে স্বাধীন ছিল। তা'রা স্বাধীনতা এত ভালবাস্‌ত যে, যুদ্ধে হারবার পরও শত্রুর অধীনতা স্বীকার কর্‌ত না, দেশ ছেড়ে চলে' যেত। ঐ কারণে অনেক রাজপুত গড়ওয়ালে চলে' আসে ও ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে। এই

জন্য গড়ওয়ালী ক্ষত্রীয়েরা এখনও নিজেদের রাজপুত বলে। এখানকার ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাও সমতলভূমি থেকে এসেছিল। এখানকার আদিম লোক হ'ল কোলী-ডোম।

প্রায় দু'শ বছর আগে অজয়পাল নামে এক রাজা শ্রীনগরে রাজত্ব করতেন। তিনি নিজের রাজ্য বাড়াতে বাড়াতে সমস্ত গড়ওয়ালকে নিজের অধীনে আনেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা গড়ওয়ালে এসে খুব মারকাট ও লুটপাট করতে আরম্ভ করে। তখন গড়ওয়ালের রাজা ইংরাজদের নিকট সাহায্য চান ও সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ ইংরাজদের গঙ্গা, অলকগঙ্গা ও মন্দাকিনী নদীর পূর্ব্বভাগ উপহার দেন ও তাঁদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তখন থেকেই গড়ওয়াল দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল—টিহরি গড়ওয়াল (Tehri

বসুধারা ঝরণা

Garhwal)—যেখানে এখনও গড়ওয়ালী রাজা রাজত্ব করেন, ও ব্রিটিশ গড়ওয়াল (British Garhwal)—যাকে সাধারণতঃ গড়ওয়াল বলা হয়।

রাজপুতদের ক্ষেতে কাজ করা—একটা দেখ্‌বার জিনিস। তা'রা পরস্পরকে সাহায্য করে ও দল বেঁধে এক এক ক্ষেতে কাজ করতে যায়। কেউ কেউ ক্ষেতের কাজ করতে থাকে, কেউ কেউ ঢোলক বাজাতে থাকে, কেউ কেউ নাচতে থাকে, আর কেউ কেউ বা গান গাইতে থাকে। এম্‌নি ক'রে সকলেই কাজও করে, আবার আমোদ-আহ্লাদও ক'রে। ঐ হাড়ভাঙা খাটুনির পর যদি তা'রা হালুয়া আর মোটা মোটা লুচি খেতে পায় ত তাদের আনন্দ আর ধরে না।

রাজপুতদের মধ্যে আর একটি আমোদ-আহ্লাদ করবার প্রথা আছে। ঐ প্রথা "আয়ঠ্‌ওয়াড়্‌" নামে বিখ্যাত। তা'রা প্রথমে কোন দেবীর মন্দিরে চারদিন প্রদীপ জ্বালে এবং রাতে ঢোলক ও ডমরু বাজিয়ে খুব নাচে। তারপর দিনের বেলায় একটি পুরুষ-মোষকে মন্দিরের সামনে আনে। গ্রামের প্রধান, মোষের সামনে আসে ও তলোয়ার দিয়ে তা'কে স্পর্শ করে। তারপর মোষকে ছেড়ে দেয় ও তা'র পিছনে পিছনে দৌড়ায়। কখন মোষ তাড়া ক'রে লোকদের, আর কখন লোকেরা তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে মোষকে। সেই সময় গ্রামের সমস্ত লোকে নিজেদের কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে "মোষ-মানুষের" যুদ্ধ দেখ্‌তে থাকে। এই যুদ্ধ দেখ্‌তে তাদের ভারি ভাল লাগে।

মোষ দৌড়াতে দৌড়াতে যখন থম্‌কে যায়, তখন রাজপুতেরা তলোয়ার দিয়ে মোষের মাথা কেটে ফেলে ও দেবীর মন্দিরে নিয়ে যায়। তারপর একটি প্রদীপ জ্বেলে মোষের মাথার ওপর রাখে ও দেবীকে উৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস, দেবীই ইহাতে সন্তুষ্ট হ'ন।

গড়ওয়ালীরা খুব দেব-দেবীর পূজা করে ও ছাগল বলি দেয়, সময় সময় মোষও বলি দেয়। তা'রা নতুন লাঙ্গল যখন বাড়ীতে আনে, তখন পূজা কর্‌বার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে আনে ও পূজার পর লাঙ্গল ব্যবহার করে।

গ্রামে সব লোকেই ভূত প্রেত মানে। তাদের কাছে অনেক রকম ভূতের গল্প শোনা যায়। তা'রা অহেড়ী-ভূতকে বড় ভয় করে। তা'রা বলে—"অহেড়ী ভূতের পা হয় উল্টা।" তোমরা নীচের ছুটি ঘটনা থেকে জান্‌তে পার্‌বে তাদের কেমন ক'রে ভূতে পায় ঃ—

একবার একজন লোকের বাড়ী ফির্‌তে পথে রাত হ'য়ে যায়। যখন সে পথ দিয়া যাচ্ছিল তখন সে যেন শুন্‌ল কেউ তা'কে বল্‌ছে—"থামো, আমিও আস্‌ছি, তোমায় ছাড়্‌বনা, কেন ওখানে থুথ্‌ ফেল্‌লে ?" লোকটি বুঝে গেল যে, তা'র পিছনে ভূত আস্‌ছে। সে খুব তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল ও গায়ত্রী জপ কর্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ী পোঁছেই সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেল। এই না দেখে বাড়ীর সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ কর্‌ল। ক্রমে গ্রামের লোকেরা এসে জড় হ'ল। সকলেই বল্লে, ভূতে পেয়েছে। তখন তা'রা দৌড়াল রোজা ও নরসিংহদেবতাকে ডাক্‌তে।

যে লোকের ওপর মন্ত্রের জোরে "দেবতা" আসেন তা'কে গড়ওয়ালীরা "নরসিংহদেবতা" বলে। গ্রামের নরসিংহদেবতা এসে ভূতে পাওয়া লোকটির কাছে

বস্‌ল। রোজা তখন প্রদীপ জ্বেলে ডমরু বাজাতে বাজাতে মন্ত্র পড়্‌তে লাগ্‌ল। ডমরু বাজাতেই "নরসিংহদেবতা" নাচ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ভূতে-পাওয়া লোকটি তখন জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি কর্‌ছ তুমি?" নরসিংহদেবতা চেঁচিয়ে বল্লে—"কি আদেশ বাবা।" তারপর গরম চিমটে নিজের হাতে ও জিভে লাগিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"তুমি কে? তুমি কি চাও?" এই না ব'লে ভূতে-পাওয়া লোকটির মাথায় গরম চিমটের ছেঁকা দিল। ভূতে-পাওয়া লোকটি বল্লে—"আমি অহেড়ীভূত, আমি একে খাবো।" নরসিংহদেবতা বল্লে—"তুমি পালাও, তা না হ'লে পুড়িয়ে মার্‌ব।" এই না ব'লে আবার তা'র মাথায় ছেঁকা দিল। তারপর ভূতে-পাওয়া লোকটি বল্লে—"পুড়িও না, পুড়িও না, পালাচ্ছি।" এই বল্‌বার পরই লোকটির জ্ঞান হ'ল।

আর একবার রাত্তিরে একটি মেয়ে বাড়ীর বাইরে এসে ডাক্‌ল—"দাদা খাবার দেওয়া হয়েছে, খেতে আসুন।" তা'র দাদা তখন লোকদের সঙ্গে গল্প কর্‌ছিল। সে যখন বাড়ী গেল তখন দেখ্‌ল, তার বোন রান্না ঘরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছে। সকলেই বল্লে, ভূতে পেয়েছে। নরসিংহদেবতা ও রোজাকে ডাকা হ'ল। তা'রা এসে ভূত ছাড়াল। যখন মেয়েটির জ্ঞান হ'ল, তখন সে বল্লে—"আমি দেখ্‌লুম একজন পা-উল্টো লোক আসনে বসে রয়েছে, তারপর যে কি হ'ল আমি আর জানি না।"

এই রকম ঘটনা মধ্যে মধ্যে গ্রামে ঘটে' থাকে। লোকদের ভূতে এত দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা'রা এর বিরুদ্ধে কোন তর্ক শুন্‌বে না।

চাষ কর্‌বার সময় যদি লাঙ্গলের ওপর দিয়ে কোন সাপ চলে যায় তা হ'লে ঐ লাঙ্গল ফেলে দেয়, কারণ তাদের বিশ্বাস বাড়ীতে ঐ লাঙ্গল থাক্‌লে অমঙ্গল হবে। যদি কোন বাছুরের জন্ম কার্ত্তিক মাসে হয়, তা হ'লে গরু ও বাছুর দুইই কাহাকেও দিয়ে দেয়, কারণ তা'রা ঐ গরুকে 'অপয়া' মনে করে। এই রকম কুসংস্কার তাদের মধ্যে অনেক আছে।

গড়ওয়ালে মেয়ের বাপ-মা মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয় না ও কোন চেষ্টা করে না। তা'রা চুপচাপ থাকে। তাদের কাছে ছেলেদের বাপ-মার তরফ থেকে লোকের পর লোক বিয়ের জন্য খোসামোদ কর্‌তে আসে।

বিয়ের যখন সমস্ত ঠিক্‌ঠাক হ'য়ে যায়, তখন এক এক ঠোঙায় চারটি ক'রে ফুলুরি বা লাড্ডু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী পাঠায় ও সঙ্গে সঙ্গে বলে—"অমুক তারিখে উপস্থিত হবেন।" এই হ'ল বিয়ের নিমন্ত্রণ কর্‌বার প্রথা।

বরযাত্রীদের রওনা হ'বার একদিন আগে গ্রামের সমস্ত লোকদের ভোজ দেওয়া হয়। সকলেই বিয়েতে সাহায্য করে ও খাটে। সেদিন সকালে গণেশপূজা হয় ও বরের মাথা মুড়ান হয়। আজকাল মাথা না মুড়িয়ে একটু চুল কাট্‌লেই কাজ চলে যায়। বরকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে স্ত্রীলোকেরা গান কর্‌তে কর্‌তে বরের গায়ে দূর্ব্বাঘাস ছোঁয়ায় ও যব-বাটা আর হলুদ খুব মাখায়। বর স্নানের পর টোপর ও হল্‌দে কাপড় প'রে মন্দিরে যায়। বর যখন মন্দির থেকে পূজা ক'রে ফেরে তখন লোকেরা, যার যেমন ক্ষমতা, এক টাকা, দু' টাকা ক'রে তা'কে দেয়।

কনের বাড়ীতেও বিয়ের আগের দিন গণেশপূজা হয়। বরের পাল্‌কী যখন কনের বাড়ীর কাছে পৌঁছায়, কনের বাপ তখন নিজের কাঁধ তা'তে একটু লাগায়।

বিয়ের রাতে দু' পক্ষেরই পুরুত বর ও কনের বংশের পরিচয় দেয়। তারপর মন্ত্র পাঠ ক'রে বিয়ে হয়।

বরযাত্রীরা যখন কনেদের বাড়ীতে খেতে বসে তখন তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয় ও প্রত্যেককে একটি ক'রে গেলাস ও এক টাকা বা দু' টাকা ক'রে ভোজন-দক্ষিণা দেওয়া হয়।

বিয়েতে ছেলেরা থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, চা'ল-গম, লাঙ্গল ও টাকা পায়। অনেকে ঘোড়া-গরুও পায়।

গড়ওয়ালীরা নিজেদের মধ্যে গড়ওয়ালী ভাষাতেই কথা বল্‌বে। এ ভাষা অনেকটা হিন্দির মতন। এর রূপ সব জায়গায় এক নয়। দূরত্ব হিসাবে অনেক প্রভেদ আছে। "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"—বল্‌তে গেলে পৌড়ীতে বল্‌বে—"তুম্ কখ্ ছয়্ জানা" ;—আর ল্যান্‌স্‌ডনে বল্‌বে,—"তুম্ কথঈঁ জান্থু ছ।"

নদীর ধারে অনেক জায়গায় আটার কল আছে। এই কল চালাতে খরচ খুব কম হয়, নদীর জলের তোড়ে কল চল্‌তে থাকে। সেইজন্য গম পেষাতে বেশি খরচ লাগে না।

কোন কোন গ্রামে লোকেরা লম্বা লম্বা চীড়গাছের (pine) গুঁড়িকে কুরে' কুরে' খালের মত ক'রে কাটে ও তা'র দ্বারা ওপর থেকে ঝরণা বা নদীর জল নীচের ক্ষেতে নিয়ে যায়।

এখানে সব জাতের লোকেই মাংস খায়। জঙ্গলে যায় হরিণ ও বুনো শূয়র

শিকার করতে। এখানে সজারু আছে খুব। মাংস খাবার জন্য সজারু শিকার করে। সজারুর গর্ত্তে প্রথমে ধোঁয়া দেয়, সজারু যখন বেরিয়ে পালাতে যায় তখন তা'রা লাঠি দিয়ে মেরে ফেলে।

গ্রামে সদাসর্ব্বদা দেশলাই ব্যবহার করে না। জ্বলন্ত কাঠকয়লাকে ছাই চাপা দিয়ে বেশ জীইয়ে রাখে এবং ঐ দিয়ে দিনের পর দিন উনুন ধরায়। অনেক সময় চকমকিপাথর ঠুকেও আগুন করে। এখানে সব রকম শস্যই উৎপন্ন হয়, তবে বেশি পরিমাণে নয়। ফলও কিছু কিছু সব রকমই হয়, এক এক জায়গায় আমও হয়। কোন কোন জঙ্গলে খুব তেজপাতা পাওয়া যায়, তবে লোকেরা উহা ব্যবহার করতে জানে না, কেবল গরুকে খাওয়ায়।

এখানে চকোর পাখী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা উহা খেতে বড় ভালবাসে। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন চকোর ডাক্‌তে থাকে। লোকেরা, বিশেষতঃ ছেলেরা, সেই সময় শিকার করে।

ছেলেরা অনেক সময় একটা পাথরে দড়ি বাঁধে ও সেটাকে খাড়া ক'রে রাখে এবং তা'র কাছে চা'ল-গম ছড়িয়ে দেয়। যখন চকোর সেখানে চা'ল-গম খেতে আসে তখন দড়িতে টান দেয় ও চকোর পাথর-চাপা পড়ে। অনেক সময় তা'রা খাঁচার ভেতর চা'ল-গম রাখে ও দড়ি দিয়ে খাঁচার দরজাকে ওপরে টেনে রাখে। যেম্‌নি চকোর ঐ সব খেতে ভেতরে যায় অম্‌নি দরজা ফেলে দেয়। চকোর খাঁচার ভেতরে বন্ধ হ'য়ে যায়, আর পালাতে পারে না।

মধ্যে মধ্যে দশ-বার বছরের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বন-ভোজন ক'রে। সকলেই নিজের নিজের বাড়ী থেকে কিছু কিছু আটা ও আলু নিয়ে আসে ও কোন ঝর্ণার ধারে যায় ও সেখানে রান্না ক'রে মহা আনন্দে খায়।

এখানকার লোকেরা কয়েকটি নদীকে গঙ্গা বলে। অলকনন্দাকে বলে বদরীনাথের গঙ্গা, মন্দাকিনীকে কেদারনাথের গঙ্গা ও ভাগীরথীকে বলে গঙ্গোত্রীর গঙ্গা। দেবপ্রয়াগের ওপরে শুধু গঙ্গা নামে কোন নদী নেই। দেবপ্রয়াগ হ'ল অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম-স্থল। সঙ্গমের পর দেবপ্রয়াগের নীচের দিকে মিলিত নদীর নাম হ'ল গঙ্গা।

বর্ষাকালে পাহাড়ী জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে কাঠের ঠিকাদাররা হাজার হাজার

কাঠের তক্তা ভাগীরথী ও অলকনন্দাতে ছাড়ে। তক্তা ভাস্‌তে ভাস্‌তে হরিদ্বারে আসে এবং সেখান থেকে রেলে ক'রে অন্য জায়গায় পাঠান হয়।

গড়ওয়ালের উত্তরভাগ বরফে ঢাকা। সেখানে কেবল গরমকালে অল্প-সংখ্যক লোক বাস করে। তা'রা শীতকালে নীচে দক্ষিণ গড়ওয়ালে নেমে আসে ও কোন গ্রামের নিকট নিজেদের আড্ডা গাড়ে। সেই সময় গ্রামে ঘু'রে ঘু'রে শিলাজীত, কম্বল, চামর, হিং ইত্যাদি বেচে।

উত্তর গড়ওয়ালে চাষ খুবই কম হয়। এখানে ঘাসের জমি বেশী আছে। সেইজন্য লোকেরা ভেড়া ও ছাগল পালন করে। গড়ওয়ালের অন্যভাগ থেকেও লোকেরা গরমকালে

চমরী গাই

নিজেদের ঘোড়া এই ঘাসের জমিতে ছেড়ে যায় ও বরফ পড়্‌বার আগে আবার নিয়ে যায়। এই ক'মাসের মধ্যেই ঘোড়া এত হৃষ্ট-পুষ্ট হ'য়ে যায় যে, সহজে চেনা যায় না।

উত্তর গড়ওয়ালের লোকেরা ভেড়া ও বকরির লোম থেকে কম্বল গাল্‌চে ইত্যাদি নিজেদের হাতে বুনে তৈরী করে। স্ত্রীলোকেরা কম্বল পরে ও কোমরে চাদর জড়ায়। এই কম্বল-সাড়ীকে তা'রা "লাওয়া" বলে। পুরুষেরা উলের পাজামা ও "মির্জ্জাই" পরে। তা'রা নিজেদের পোষাক নিজেরাই তৈরী করে। দক্ষিণ ও মধ্য গড়ওয়ালের লোকেরা সাধারণ সাড়ী, ধুতি, পাজামা ইত্যাদি ব্যবহার করে।

শীতকালে যখন উত্তর গড়ওয়ালীরা দক্ষিণে আসে, তাদের সঙ্গে অনেক লোমভরা বকরি ও ভেড়া থাকে। তাদের পাহারা দেয় ও চরায় একটি বড় কুকুর।

উত্তর গড়ওয়ালে বরফঢাকা জায়গায় চমরীগাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য ঐ জাতীয় গরুর গায়ে খুব ঘন বড় বড় লোম থাকে। এই গরুরই লেজ কেটে চামর তৈরী হয়।

উত্তর গড়ওয়ালে এক জাতীয় লোক থাকে যাদের "ভোটিয়া" বলা হয়। ভোটিয়ারা বেশীর ভাগই ব্যবসা করে। তা'রা গরম ও বর্ষাকালে তিব্বত থেকে উল নিয়ে আসে এবং সেই উল দিয়ে কম্বল, পট্টু, গাল্‌চা প্রভৃতি তৈরী ক'রে শীতকালে দক্ষিণ গড়ওয়ালে নিয়ে বেচে। তা'রা নিজেদের ভেড়া ও বকরির ওপর মাল বোঝাই ক'রে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়েও যায়।

অনেক যাত্রী বদরীনাথ থেকে ফের্‌বার সময় হরিদ্বারে আবার না এসে, অন্য পথ দিয়ে রামনগর (নৈনিতাল) যায় ও সেখান থেকে রেলগাড়ী ধরে।

যদিও রামনগর গড়ওয়ালের মধ্যে নয়, তবুও দু' একটা কথা এর বিষয়ে বল্‌তে চাই। রামনগর একটু অদ্ভুত রকমের জায়গা। একে অনায়াসে স্থল-বন্দর (land port) বলা যায়। এর একদিকে সমতল ভূমি আর অন্য দিকে পাহাড়। এখানে পাহাড় ও সমতল উভয় দেশের জিনিস ব্যবসার জন্য আসে। পাহাড়ী জিনিস সমতল দেশে ও সমতল দেশের জিনিস পাহাড়ে চালান হয়। যদিও রামনগর একটি ছোট্ট সহর তবু এখানে সারা বছর, কেবল বর্ষাকাল ছাড়া, খুব বেচা-কেনা হয়।

এখানে কোসীনদী থেকে অনেকগুলি খাল বা'র করা হয়েছে। জলভরা খালের ধারে রামনগর ভারি সুন্দর দেখায়। এ জায়গার একটি বিশেষত্ব আছে। সারা বছর প্রত্যেক দিন রাত সাতটা-আটটা থেকে সকাল সাতটা-আটটা অবধি ভীষণ জোরে ঝড়ের মত বেগে পাহাড় থেকে নীচের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া চলে। উহার দরুণ কপাট খুলে' ঘরে কোন হালকা জিনিস রাখা যায় না।

দুনিয়া যে এক বিচিত্র জায়গা তা কেবল ভারতবর্ষে ভ্রমণ কর্‌লেই জানতে পারা যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

ভুদাদু

শ্রীবিজয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দান

ওহে দাদা !   কথা আছে, শোন শোন এবারে ;—
আছে কিছু ?   দিতে পার ?   পড়ে গেছি নাচারে।
ভয় কি ?   অমন ক'রে আঁৎকিয়ে উঠো না।
কেড়ে কুড়ে নেবো না ক,—থামো —থামো – ছুটো না ॥
যার আছে যতটুকু সেই এই ছুনিয়ায়।
আপনার খুসীমত সবাইকে দিয়ে যায় ॥
দান করা মহাধর্ম্ম—জেনো—এই কলিতে।
বল কি হে ?   কে কি দেয় ?   তাও হবে বলিতে !
এই ধরো—
ধনবানে 'ধন' দেয়, 'প্রাণ' দেয় মানীতে।
পথে পথে 'আলো' দেয় রেতে রাজধানীতে ॥
'ধার' দেয় মহাজন, 'শান' দেয় ছুরিতে।
খেলাতে 'বাহবা' দেয়, 'জেল' দেয় জুরিতে ॥
দেবতারা 'বর' দেয়, 'শাপ' দেয় ঋষিরা।
প্রজারা 'খাজনা' দেয়, 'চাষ' দেয় চাষারা ॥
কুকুরকে 'নাই' দেয়, 'হাই' দেয় মাছেতে।
'ডুব' দিয়ে 'থাই' দেয়, 'তাই' দেয় নাচেতে ॥
'কুক্' দিয়ে সেকালেতে কর্‌তো হে ডাকাতি।
দোষ হ'লে বদ্‌লোকে 'খোঁটা' দেয় কি হাতী-ই ॥
হাত-টানে 'গ্যাঁড়া' দেয়, 'গাল' দেয় কুলোকে।
ফাঁক পেলে 'গুঁতো' দেয় সকলেই ভূ-লোকে ॥
'ঘাম' দিয়ে জ্বর ছাড়ে, 'ঘুষ' দেয় পাজীতে।
'চাল্' দেয় ঘুঘু-লোক ভারী কারসাজিতে ॥
কয়েদীকে 'ছেড়ে' দেয়, 'ছাপ' দেয় চিঠিতে।
টাকাকড়ি 'জল' দেয়, 'জান্' দেয় লাঠিতে ॥
ব্যঞ্জনে 'ঝাল' দেয়, 'ঝাঁপ' দেয় মরিয়া।
'টিট্‌কারি' দেয় লোকে ছুতোনাতা ধরিয়া ॥

'ঠিক' দিয়ে কেরাণীরা 'ঠেলা' দেয় জ্যায়দা।
'ডুব' দেয় দেনাদার, 'ডাক' দেয় প্যায়দা॥
ফাঁকিবাজ 'ঢিলা' দেয়, 'তেল' দেয় আশাতে।
হাই তুলে 'তুড়ি' দেয় বসে বসে বাসাতে॥
ভুল হ'লে 'থুড়ি' দিয়ে 'থামা' দেয় সে কাজে।
সবে মিলে 'দুও' দেয়, হেরে যায় একা যে॥
বোকাদের 'ধোঁকা' দেয়, 'নোল' দেয় কাছিতে।
নিয়ত 'নাকাল' দেয় আহারেতে মাছিতে॥
সাগরেতে 'পাড়ি' দেয়, 'প্যালা' দেয় গুণীকে।
কুড়ে লোকে 'ফাঁকি' দেয়, 'ফাঁসী' দেয় খুনীকে॥
'ধান' দিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌ত হে সেকালে।
ময়নাতে 'শিস্‌' দেয় ভাল ক'রে শেখালে॥
'বাহাদুরী' দেয় লোকে, দেয় সব 'গুলিয়ে'।
সেয়ানারা 'ভোগা' দেয় বোকাদের ভুলিয়ে॥
কানেতে 'মোচড়' দেয় তানপুরাখানাতে।
ময়রারা 'বাঁত' দেয় জল দেওয়া ছানাতে॥
'রা' দেয় না কোনো মতে মিট্‌মিটে লোকরা।
'লাফ' দিয়ে চ'লে যায় তেজীয়ান্ ছোকরা।
বুড়োগুলো 'বাধা' দেয়, 'বলে' দেয়—সাবধান!
সাহেবে 'সেলাম' দেয়, চোরে দেয় 'সট্‌কান'॥
হাকিমে 'হুকুম' দেয়, 'হামা' দেয় খোকারা।
ভরা রাতে থেকে থেকে 'হাঁক্‌' দেয় ও কারা?
এত দিয়ে তবু, হায়! মন 'ধরা' দেয় না।
'চুপ' দোব! বল কি হে? বেড়ে দেখি বায়না!
'বুক' দিয়ে টেনে করি—ত্যাখো না ত চোখেতে॥
গোটা দুই 'টাকা' দিতে ব্যথা লাগে বুকেতে?
ওরে বাবা! 'মার' দেবে! দফা দেবে চুকিয়ে!
'চম্পট' দিই বাবা! শেষটায় এ কি এ!

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. কাব্যসাংখ্যতীর্থ

শাস্তি

এক ছিল কাঠুরে। সে যেমন ছিল বুড়ো তার কুড়োলও তেমনি ছিল পুরোণো। সারাজীবন কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে সেটা হ'য়ে পড়েছিল ভোঁতা। এখন তা'তে শাণ দেওয়া চাই। তাই কাঠুরে গেল পাহাড়ের ঝর্‌ণার পারে। ঝর্‌ণার জলে ক্ষয় পেতে পেতে পাথর গুলো খুব পালিশ হয় এবং তা'তে ভাল ধার ওঠে। তাই কাঠুরে একটা পাথরের উপর ব'সে অপর একটা পাথরে ঘ'সে কুড়োলে শাণ দিচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ এক দুষ্ট কাঁকড়া গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে কটাস্‌ ক'রে তার পায়ে দিলে এক কামড়। বুড়োর তা'তে হ'ল বেজায় রাগ। সে কাঁকড়া ধর্‌তে গেল কিন্তু কাঁকড়া ততক্ষণে আবার লুকিয়েছে তার গর্ত্তে। তা'তে বুড়োর রাগ গেল বেড়ে; আর কিছু না পেয়ে ধারাল কুড়োল দিয়ে মার্‌লে কোপ এক লেবু গাছে।

"তুমি আমায় মিছামিছি কাট্‌ছ কেন?"—বল্‌তে বল্‌তে গাছ তা'র উঁচু ডাল থেকে ধপাস ক'রে ফেলে দিলে একটা বড় লেবু—আর তা' পড়্‌ল এক হাঁসের পিঠে। হাঁস তখন খুঁজ্‌ছিল খাবার। সে চটে মটে খাবার ফেলে দিয়ে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ভেঙ্গে ফেল্‌ল এক পিঁপড়ের বাসা। পিঁপড়ের বাসার কাছে ছিল এক সাপের গর্ত্ত। তা'রা ভাব্‌ল, সাপই বুঝি তা'দের বাসা ভেঙ্গেছে; তা'রা তখন লাগ্‌ল সাপের বুকে পিঠে। পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণায়
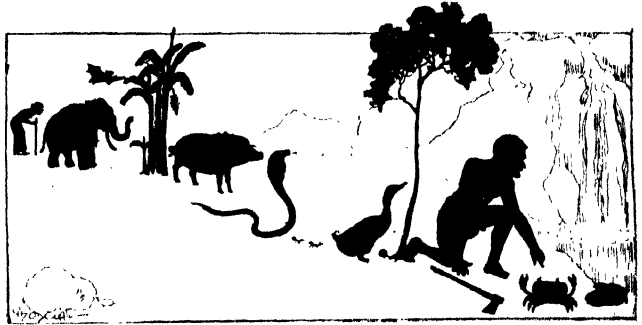
সাপ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল। এসেই দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে চলেছে এক বুনো দাঁতাল শূয়োর। বুনো শূয়োরকে দিলে সে কামড়ে। সাপের বিষে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে শূয়োর ছুট্‌তে লাগ্‌ল এদিক ওদিক। হঠাৎ সাম্‌নে এক কলার ঝাড় দেখ্‌তে পেয়ে ফেল্‌লে তারই একটা উপ্‌ড়ে। সে কলা গাছে ঘুমুচ্ছিল এক বাদুড়। ঠ্যাং উপরের দিকে তুলে গাছের পাতা আঁকড়ে ধ'রে ঘুমুচ্ছিল সে নিঝুম। হুড়মুড় ক'রে কলার গাছ পড়ে যাওয়ায় সে হঠাৎ জেগে উঠে' ভয়ানক ভয় পেল, আর এদিক ওদিক ছুটোছুটি কর্‌তে কর্‌তে

ঢুকে গেল এক হাতীর কাণে। হাতী তা'তে পাগলের মত শুঁড় তুলে এদিক ওদিক ছুটতে আরম্ভ করল। আর কিছু না পেয়ে সেও উপ্‌ড়ে ফেল্‌ল এক গাছ, আর সেটা পড়্‌ল এক বুড়ীর ঘরের উপর। বুড়ীর ঘরটি ছিল কত কালের পুরোণো। গাছের ভারে তা' ভেঙ্গে পড়্‌ল—হুড়মুড় শব্দে। বুড়ী ছুটে বেরিয়ে এসে সাম্‌নেই দেখে হাতী।

তখন বুড়ীর যা রাগ—সে হাতীর শুঁড়ের উপর আঙ্গুল তুলে বল্‌ল—"হাতী মশায়, আমার ঘরটি ভেঙ্গেছ, এখন আমি থাকি কোথায় বল। আমার ঘর তৈরী ক'রে দাও, নইলে তোমার শুঁড়টি আমি দিচ্ছি কেটে।" শুঁড় কাটার নামে হাতী গেল ভড়্‌কে। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে শুঁড় নামিয়ে বল্‌ল—"আমার দোষ কি বল? যত দোষ বাদুড়ের। আমার কাণের ভিতর ঢুকে কি শুড়শুড়িই না দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমি গাছের উপর গিয়ে পড়েছিলুম।" বুড়ী তখন বাদুড়ের কাছে গেল।

বাদুড় বল্‌ল—"যত দোষ ঐ শূয়োরের। সে কেন আমার গাছ উপ্‌ড়াল? তোমার যেমন ঘর গেছে আমারও ত তেমনি।"

তখন বুড়ী আর জন্তুরা গিয়ে ধর্‌ল শূয়োরকে।

শূয়োর বল্‌ল—"আমার দোষ কি? যত দোষ সাপের।"

তখন সবাই গেল সাপের কাছে।

সাপ বল্‌ল—"আমার দোষ কি? যত দোষ পিঁপড়েদের।"

পিঁপড়েরা বল্‌ল—"আমাদের দোষ নেই। যত দোষ হাঁসের।"

তারপর সবাই মিলে হাঁসের কাছে গেলে হাঁস ঠোঁট উপরের দিকে তুলে লেবু গাছ দেখিয়ে বল্‌ল—"যত দোষ ওই লেবু গাছের।"

লেবু গাছ বল্‌ল—"যত দোষ ঐ বুড়ো কাঠ্‌রের, দেখ না আমার গোড়ায় কেমন কোপ বসিয়েছে।"

কাঠ্‌রে তা' শুনে বল্‌ল—"দোষটা আমারই হ'ল?" তারপর সে আঙ্গুল তুলে ধরে বল্‌ল—"এই দেখ কাঁকড়া কেমন ক'রে আমার আঙ্গুল কামড়িয়েছে।"

তখন সকলে মিলে কাঁকড়াকে ডেকে বার কর্‌ল তার গর্ত্ত থেকে। কাঁকড়ার আর কাউকে দোষ দেবার ছিল না, তাই সে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল। কিন্তু জন্তুরা কেউ তা'তে সন্তুষ্ট হ'ল না। সবাই বল্‌ল—"তুমি ভয়ানক বোকামি ক'রেছ। আমরা তোমাকে ডুবিয়ে মার্‌ব। এখন তুমিই বল ঠাণ্ডা জলে মর্‌বে, না গরম জলে মর্‌বে।

কাঁকড়া খানিক ভেবে বল্‌ল—"ঠাণ্ডা জলে।" জন্তুগুলি তখন কাঁকড়াকে ঝরণার তলায়—ঠাণ্ডা জলের নীচে ঠেসে দিলে। অমনি কাঁকড়া এক ডুবে চ'লে গেল ঝরণার তলায়, আর সেখানে লুকিয়ে রইল নুড়ি পাথরের মাঝখানে।

শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা

কেসিন্‌

"কেসিন্‌" কথাটি তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইতিপূর্ব্বে শোননি, কিন্তু কেসিনের তৈরী কোন না কোন জিনিস খুব সম্ভব তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখেছ। এই "কেসিন্‌" জিনিসটি কি এবং কিভাবে প্রস্তুত হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু-চার কথা বল্‌ছি।

কেসিন্‌ এক রকম শক্ত এবং খুব চক্‌চকে জিনিস। ইহা একটি রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। কেসিন্‌ কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় তা' শুন্‌লে তোমরা হয়তো অবাক্‌ হ'য়ে যাবে। কেসিন্‌ তৈরী করা হয় দুধ থেকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেসিনে দুধের এতটুকুও গন্ধ পাওয়া যায় না। দুধের মত তরল পদার্থ থেকে একটা শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী জিনিস প্রস্তুত করা যায় এবং তা' দেখ্‌তে মোটেই দুধের মত নয়, কিংবা তাতে দুধের কোনও গন্ধও নেই—এই রকম শুনতে প্রথমতঃ কি রকম লাগে; কিন্তু হয়তো তোমাদের চোখের সাম্‌নে টেবিলের ওপরেই একটা সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্র আছে যা' কেসিন্‌ থেকে তৈরী করা হ'য়েছে।

মাঠা তোলা দুধ অর্থাৎ দুধ থেকে মাখন তুলে নেওয়ার পরে সেই দুধের দই তৈরী করা হয়। সেই দই থেকে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক রকম শক্ত জিনিস পাওয়া যায়। এই শক্ত জিনিসটিকে একটি ট্রে বা থালাজাতীয় পাত্রের ওপর রেখে, কিছুক্ষণ ধ'রে গরম করার পরে যে জিনিসটি পাওয়া যায় তার নাম কেসিন্‌ (casein)। কেসিন্‌কে গুঁড়ো ক'রে নানারকম রঙের সাহায্যে ইচ্ছামত রং করা যায়।

কেসিন্‌ থেকে যেরকম আকারের প্রয়োজন, ঠিক সেই রকম আকারেরই জিনিসপত্র তৈরী করা যায়। ধাতুনির্ম্মিত নানাপ্রকারের ছাঁচের মধ্যে কেসিনের গুঁড়ো ভর্ত্তি ক'রে,

তা'তে ইচ্ছামত রং মিশিয়ে সেই ছাঁচগুলো খুব গরম করা হয় এবং পরে একটি যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত চাপ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ এইভাবে চাপ দেওয়ার পরে, চাপ দেওয়া যন্ত্র বন্ধ করা হয় এবং ছাঁচগুলো ঠাণ্ডা হ'লে খুলে ফেলে কেসিনের জিনিসগুলো বার করা হয়। তখন এই সকল কেসিনের জিনিসপত্র খুব শক্ত এবং উজ্জ্বল হয়। কেসিনে তৈরী জিনিসপত্র স্বভাবতঃই খুবই চক্‌চকে হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার কর্‌লেও তা'দের ওপরকার পালিশ নষ্ট হয় না।

দুধ থেকে কেসিন্ কি ক'রে প্রথমে তৈরী করা হয় সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন কোনও একজন রাসায়নিকের একটি বেড়াল, তিনি যে ঘরে গবেষণা কর্‌তেন সেই ঘরে হঠাৎ ঢুকে প'ড়েছিল। সেই ঘরে নানারকম রাসায়নিক জিনিস ছিল এবং তাদের মধ্যে একটি কাঁচের পাত্রে ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্ (formaldehyde) নামক একটি তরল রাসায়নিক পদার্থ ছিল। বেড়ালটি পাছে কিছু নষ্ট করে এই ভয়ে তা'কে তাড়া দিতেই সে পালিয়ে গেল, কিন্তু তার পায়ের ধাক্কা লেগে খানিকটা ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্ ছিটকায়ে নিকটে একটি পনীরের পাত্রে পড়্‌ল। সেই পাত্রে খানিকটা পনীর ছিল। ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্ পনীরের ওপর পড়ার কিছুক্ষণ পরে সেই পনীর একেবারে শক্ত হ'য়ে গেল। তাই দেখে সেই রাসায়নিক ঐ পনীর নিয়ে গবেষণা আরম্ভ কর্‌লেন এবং তাঁর গবেষণা এবং চেষ্টার ফলে দুধ থেকে কেসিন্ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করা হ'ল। তোমরা নিশ্চয়ই জান পনীর দুধ থেকেই তৈরী হয়। এই আবিষ্কারের মূলে কিন্তু ঐ বেড়ালটি! যদি বেড়ালটি ঐ ঘরে না ঢুক্‌ত তা' হ'লে কেসিন্ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভব হ'ত না। এই সামান্য একটি কারণে একটি নূতন জিনিস প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত হ'ল!

ধাতুনির্ম্মিত জিনিসের তুলনায় কেসিন্ থেকে প্রস্তুত জিনিসপত্র দামে অনেক সস্তা। তা'ছাড়া কেসিনে তৈরী জিনিসপত্র অতি সহজে এবং যে কোনও আকারে প্রস্তুত করা যায়। এই জিনিসগুলো ধাতুনির্ম্মিত জিনিসের তুলনায় দেখ্‌তে অনেক সুন্দর। এই সকল কারণে আজকাল কেসিন্ থেকে ছাতার হাতল, ফাউন্টেনপেন, কাগজচাপা-দেওয়া ইত্যাদি নানারকমের জিনিস তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু দুধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না গেলে কেসিন্ তৈরী করা সম্ভবপর হয় না, সেইজন্যে আমাদের ভারতবর্ষে খুব সহজে কেসিনের জিনিসপত্র তৈরী করা একরকম অসম্ভব। কারণ; আমাদের দেশে বর্ত্তমানে খুব

কম লোকই নিয়মিতভাবে দুধ খেতে পায় এবং উপস্থিত যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় তা' সকলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি ভবিষ্যতে এই দেশে কখনও বহু পরিমাণে দুধ পাওয়া যায় এবং সকলে নিয়মিতভাবে খাওয়ার পরেও অতিরিক্ত দুধ পড়ে থাকে, তা'হ'লে তখন এই দেশে কেসিন্ তৈরী করা সম্ভবপর হ'বে এবং সেই কেসিন্ থেকে নানাপ্রকার জিনিস প্রস্তুত করা যাবে।

শ্রীরাধাভূষণ বসু, এম. এ., বি. এস্-সি, বি.-কম্

সেথায় আমার ঘর

সেথায় আমার ঘর।
সবুজ পাতার মাঝে যেথায় খেলে চাঁদের কর।
লাউয়ের ভারে মাচান দোলে,
ফুল দেখা দেয় কুঁড়ির কোলে,
মৌ-পিয়ারা বসে যেথায় সবুজ পাতার 'পর।
সেথায় আমার ঘর।

সেইখানে মোর ঘর।
নদীর মাঝে আছে যেথায় নিঝুম বালুচর।
পাশ দিয়ে তার নৌকা বেয়ে,
মাঝিরা সব সারি গেয়ে,
পাল তুলে দে' নৌকা চালায় তর্-তর্-তর্-তর্।
সেইখানে মোর ঘর।

লেখা সান্যাল

যুদ্ধ থামাও

কালীঘাট রোড্ দিয়া চলিয়াছি—দেখি পথের একদিকে লোকের ভিড়। কৌতূহল হওয়ায় অগ্রসর হইয়া দেখিলাম ছোট একটা চীনা ছেলে, তারই চারিদিকে লোকেরা দাঁড়াইয়াছে। ছেলেটার বয়স? কতই বা—খুব বেশী হয়ত চৌদ্দ বৎসর। ছেলেটাকে দেখিয়া বড় মায়া হইল—লোকের ভিড় ঠেলিয়া ছেলেটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। ছেলেটাও "Save me" বলিয়া আমার একখানা হাত ধরিল। আমি ছেলেটির হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইয়া হাজরা পার্কের দিকে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির সহিত আমার দিব্যি আলাপ জমিয়া গেল।

ছেলেটির নাম থিন্‌সিন্—বাড়ী তাহার ছিল চীনের নান্‌কিন্ সহরে। থিন্‌সিনের বাবা নান্‌কিন্ সহরের একজন বড় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জাপানীরা যখন নান্‌কিন্ সহর আক্রমণ করে, তখন থিন্‌সিনের বাবা মারা যান। ছেলেটির ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাই লিখিতেছি ঃ—

"অনেক দিন থেকেই শুনেছিলাম জাপানীরা আমাদের দেশ আক্রমণ ক'রেছে। বাড়ীতে আমরা ছিলাম পাঁচজন মাত্র—আমার বাবা ও মা, দাদা, আমি আর আমাদের একজন পুরাণ ঝি। আমার বাবা বেশী চাকর রাখ্‌তেন না—ব'ল্‌তেন তা'তে ছেলেরা অলস হ'য়ে যায়—আর কতকগুলো টাকা বৃথাই নষ্ট হ'য়ে যায়। যা'হোক আমরা দু'ভাই এক স্কুলেই পড়্‌তাম—দাদা আমার চেয়ে এক ক্লাশ উপরে পড়্‌তেন। আমার বাবা ছিলেন সদানন্দময়। তাঁর কতকগুলো ভাল নিয়ম ছিল। সবাইকে এক সঙ্গে খেতে হ'বে, খাওয়ার পর একটু গল্প ক'র্‌তে হ'বে—আবার ভোরবেলা উঠেই প্রার্থনা কর্‌তে হ'বে। ব'ল্‌তে ভুলে গেছি আমাদের বাড়ীতে একখানা বুদ্ধের মূর্ত্তি ছিল। আমাদের সকলকেই ঘুম থেকে উঠেই সেই মূর্ত্তির কাছে সবার আগে প্রার্থনা ক'রে তবে অন্য কাজে হাত দিতে হ'ত।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বাবার মুখে একদিনও হাসি দেখিনি। আমার মাও যেন কেমন গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলেন। এক রাত্রে আমি ও দাদা বিছানায় শুয়ে আছি—দাদা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু আমার ঘুম আসেনি, তাই বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছি—আর বাবার বিষাদে মলিন মুখখানার কথা ভাব্‌ছি।

হঠাৎ বাবার ও মার কথা শুন্‌তে পেলাম। বাবা বল্‌ছেন—'আমি বলি এখনও

তুমি ছেলে দুটোকে নিয়ে পালিয়ে যাও। ছেলে দুটো বাঁচ্‌লে বংশের নাম থাক্‌বে। আমার তো যাওয়া আর সম্ভব নয়—চাকরির জন্য আমাকে এখানে থাক্‌তেই হ'বে। শুনেছি জাপানের সৈন্যদল একেবারে নান্‌কিনের সীমানায় এসে পড়েছে—এবার এরা নান্‌কিন সহর আক্রমণ কর্‌বে।' আজকাল আক্রমণ মানে এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়্‌বে, নয়তো শ্বাসরোধ করার জন্য গ্যাস ছড়িয়ে দিবে—কত লোক যে তা'তে মারা যাবে, তার অন্ত নেই।'

মা তখন বাবাকে বল্লেন—'হাঁ দেখ, তুমিই কিনা ব'লেছিলে জাপানের লোকেরা আমাদেরই মত গৌতম-বুদ্ধের ধর্ম্ম নিয়েছে। বুদ্ধদেব তো ব'লেছেন কেউ কাহাকে হিংসা ক'রো না—এতে যে লোক মারা যাবে তা'তে কি হিংসা হ'বে না? কত নিরপরাধ শিশু যুদ্ধের গোলা-বারুদে মারা যাবে—তা'রা শত্রুর কাছে কি অপরাধ ক'রেছে?'

বাবা বল্লেন—'ধর্ম্মের কথা রেখে দাও—এখন কি আর লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে? লোকে এখন চায় টাকা-পয়সা—আর কেবল বেশীর জন্য লোভ।'

মা বল্লেন—'তথাগত তা' হ'লে নিশ্চয়ই এদের শাস্তি দেবেন। আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না—ছেলেগুলাও থাক্‌বে। মরিত সবাই একসঙ্গে মর্‌ব।'

বাবা বল্লেন—'তাঁর যা ইচ্ছা তাই যেন হয়। আমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি—যদি বয়স থাক্‌ত তা'হ'লে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে ব'লে আস্‌তাম,—যুদ্ধ করোনা, যুদ্ধ করোনা—সবাই মিলে সুখে থাক। কিন্তু সময় নেই—তাই সমস্ত সাধ আকাঙ্খাই অপূর্ণ র'য়ে গেল। আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে লোককে ব'লে বেড়াতাম—কি ভাবে আধুনিক সভ্যতার স্পর্শে এসে মানুষ ধর্ম্ম ও ভগবানকে ভুলে গেছে। ধর্ম্ম এখন হ'য়েছে ভণ্ডামি মাত্র।'

মা বল্লেন—'থাক, এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর। নানা প্রকার ভাবনার মধ্যেই দিনগুলো যাচ্ছে—রাত্রেও যদি না ঘুমাতে পার, তা'হ'লে শরীর যে একেবারে ভেঙ্গে যাবে।'

—'আর ঘুমিয়েছি! কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হ'য়েছে রাত্তিরে যখনই সামরিক বিউগল্‌ বেজে উঠ্‌বে, তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বাইরে যেতে হ'বে। যদি কোনও চৈনিক রাজকর্ম্মচারী এই আদেশ অমান্য করে, তার শাস্তি হ'বে প্রাণদণ্ড!'

একটু পরে বাবা ও মা ঘুমিয়ে পড়্‌লেন ব'লেই মনে হ'ল। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না। রাত্রি একটা হ'য়ে গেল—জেগেই রয়েছি—হঠাৎ শোনা গেল, চীনদেশের সামরিক আহ্বান বিউগল-এর শব্দ। বাবার কথাই সত্য হ'ল—এই

রাত্তিরেই বাবাকে যেতে হ'বে বাইরে। মন আমার একেবারে বিরক্তিতে ভ'রে গেল। কেন—এই জাপানের লোকেরা কি চায় ?

বিউগল্-এর আবার শব্দ হ'ল—এবার বাবা জেগে উঠে বস্‌লেন। মাও উঠে বস্‌লেন। দাদাও উঠে বস্‌লেন। বাবা মাকে বল্লেন—'দেখ, তা'হ'লে আমার কথাই সত্য হ'ল—সত্য হ'বে তা' আমি জানতুম কিন্তু এত শীঘ্র যে সত্য হ'বে, তা আমি ভাবিনি। একটি কথা তোমাকে ব'লে যাচ্ছি, আমাদের ঘরে যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিখানা আছে সেখানা নিয়েই তোমরা এখান থেকে পালিয়ে যেও। জাপানীরা হয় তো গোলা-বারুদ ছুড়্‌বে—আমাদের বুদ্ধদেবের গায়েও পড়্‌বে। তিনি কষ্ট পান এটা আমার সহ্য হ'বে না। আর—তোমরা যত শীঘ্র পার এখান থেকে চলে যেও।'

তাড়াতাড়ি ক'রে পোষাক প'রে বাবা আমাদের দু'ভাইকে একটু আদর ক'রে, মা'র দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাহিরের দিকে পা বাড়া'লেন।

বাবাকে বেশীদূর যেতে হয় নি'—হঠাৎ দরজার সাম্‌নেই রাস্তায় 'গুড়ুম' শব্দ ক'রে এসে পড়্‌ল জাপানীদের একটা বোমা। বাবা রাস্তার উপরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন।

বাবাকে এ অবস্থায় দেখে দাদা তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁ'কে ধরে ঘরের মধ্যে আন্‌তে গেলেন। তিনিও রাস্তায় গিয়ে 'উঃ গ্যাস্' বলেই একটা চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন।

আমার তখন মনে হ'ল যুদ্ধের কথা বল্‌তে গিয়ে বাবা একদিন ব'লেছিলেন যে, আজকাল এরোপ্লেন থেকে নীচে একরকম গ্যাস্ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই গ্যাস্ যা'দের নাকের ভিতর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে, তা'রা তখনই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়। বাবা তাই আমাদের জন্য 'গ্যাস্ মুখোস' কিনে এনেছিলেন।

আমি ও মা তাড়াতাড়ি ক'রে 'গ্যাস-মুখোস' পরে এসে বাবাকে ও দাদাকে ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম।

দাদার আর জ্ঞান হয়নি'—একই অবস্থায় চারদিন কাটিয়ে তিনি মারা যান। বাবার তিন দিন পরে জ্ঞান হ'য়েছিল। জ্ঞান হওয়ার পর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'তা'হ'লে তোমরা ভালই আছ। দেখ, আমি যাচ্ছি—দুঃখ নেই—সকলকেই একদিন যেতে হবে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির কথা আমি যা ব'লেছি তা' ভুলে যেও-না কিন্তু।'

তারপর বাবা হাতযোড় ক'রে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে বল্লেন—'হে তথাগত, তুমি

দেখো, তোমারই অহিংসার ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে এরা কি ভাবে পরস্পরকে হিংসা ক'রে কত নিষ্পাপ শিশু, কত অবোধ জীবের এরা প্রাণনাশ করে। আশীর্ব্বাদ কর, পর জন্মে যেন পৃথিবীতে এসে যুদ্ধ বন্ধ করার কাজে লেগে যেতে পারি—'

এরপর বাবা যে জ্ঞান হারালেন আর তাঁর জ্ঞান হয়নি'। বাবার এই অবস্থা দেখে মা আমাদের পূজার ঘরে গিয়ে বস্‌লেন—তিন চার ঘণ্টা চলে গেল তিনি আর ফিরেন না দেখে আমি ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে দেখি আমার মা সেখানে পড়ে আছেন—তাঁর দেহে প্রাণ নেই।

বাবা, মা ও দাদার শেষ কাজ ক'রে আমি দেশ হ'তে রওনা হ'য়েছি—দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব আর সবারই হাত ধরে ব'ল্‌ব—'ভাইসব! যুদ্ধ ক'রো না, যে কয়দিন আছ—হিংসা না ক'রে পৃথিবীর সবাইকে খুসী করার জন্য, সবার মুখে হাসি ফুটাবার জন্য চেষ্টা কর—তা'তেই পাবে প্রকৃত আনন্দ।'—এখানেও তাই এসেছি।"

এইখানে থিনসিন্ থামিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু তুমি যে এত দেশে ঘুরে বেড়াবে, এত অর্থ কোথায় পাবে এবং যদি বিপদে পড় তা'হ'লেই বা কি হ'বে?"

থিন্‌সিন্ তাহার বুকপকেট হইতে গৌতম-বুদ্ধের সুন্দর একখানা ছোট্ট শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি বাহির করিয়া, মূর্ত্তিখানা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"তাঁ'র যা' ইচ্ছা তাই তো আমি পালন করব। তিনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্য কর্‌বেন।"

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম্. এ. বি. টি.

দুনিয়ার বিস্ময়

বড়দিনের উপহার

উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো উপসাগরের তীরে নিউ অর্লিয়ান্‌স্ (New Orleans) একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট তূলা পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হ'য়ে থাকে। সেদিক দিয়ে বণিক্-মহলে তা'র নামডাকের অন্ত ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে যাতে ক'রে আজ সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের, বিশেষ ক'রে চিকিৎসকদের, 'বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে তা'র উপর। ব্যাপারটা ঘটে গত বড়দিনের সময়।

ফ্রাঙ্ক ছেবিনা (Frank Chabina) চাষীর ছেলে—বয়স মাত্র আঠারো বছর। একদিন খানিকটা চূণের গুঁড়ো তা'র বাঁ চোখে উ'ড়ে পড়ে।

চূণ অত্যন্ত ক্ষয়কারক জিনিস। যারা পান খায় তা'রা জানে, পানে চূণ বেশী হ'য়ে গেলে কি দুর্দ্দশাটাই হয়; জিহ্বা ও গালের ভিতরটা হেজে যায়—ঝাল-নুন-টক্ খেলে কট্‌কট্ ক'রে ধরে—চোখের জলে, নাকের জলে একসা হ'তে হয়। আঁচিল হ'লে অনেক সময় পানের বোঁটায় চূণ নিয়ে আঁচিলের উপর ঘস্‌লে—অমন শক্ত আঁচিলও ক্ষয়ে চামড়ার সমতল হ'য়ে যায়। তাছাড়া ফোঁড়ার উপর চূণ লাগালেও অনেক সময় উপরকার চামড়া ক্ষয়ে ফোঁড়ার মুখ হয়, ভিতরের পুঁজরক্ত বেরিয়ে রোগীকে আরাম দেয়।

চোখের বিভিন্ন অংশ

২ কর্ণিয়া ৬ লেন্স খ রেটিনা ঘ চোখের সহিত মগজের সংযোগকারী স্নায়ু (Opitic Nerve)

মানুষের চোখ অত্যন্ত কোমল ও সূক্ষ্ম অংশে গঠিত। সুতরাং এ হেন ক্ষয়কারী চূণ লেগে উহার যে অনিষ্ট হ'বে তা'তে আর সন্দেহ কি? ছেবিনার চোখটা নষ্ট হ'য়ে গেল। চোখের সম্মুখভাগেই কর্ণিয়া (Cornea) নামে (২) একটা পর্দ্দা আছে; সেটা কাঁচের মত স্বচ্ছ—তা'র ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে। তা'রই পেছনে আছে চোখের মণি বা লেন্‌স (Lens) (৬)—সেটাও যে স্বচ্ছ তা' না বল্লেও চলে। সকলের পেছনে আছে একটা সূক্ষ্ম স্নায়ুজাল—তা'র নাম দেওয়া হয়েছে রেটিনা (Retina) (খ)। কোন জিনিস থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে কর্ণিয়া ভেদ ক'রে মণির ভিতর দিয়ে পড়ে গিয়ে রেটিনায়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি হয় একটা অনুভূতির। অমনি স্নায়ুর পথ বেয়ে একটা সাড়া চলে যায় মগজের ভিতর যে দৃষ্টিকেন্দ্র থাকে সেখানে; তা'র ফলে আমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে জিনিসটার সুস্পষ্ট ছবিটি। এই হ'ল দৃষ্টিশক্তির মোটামুটি রহস্য।
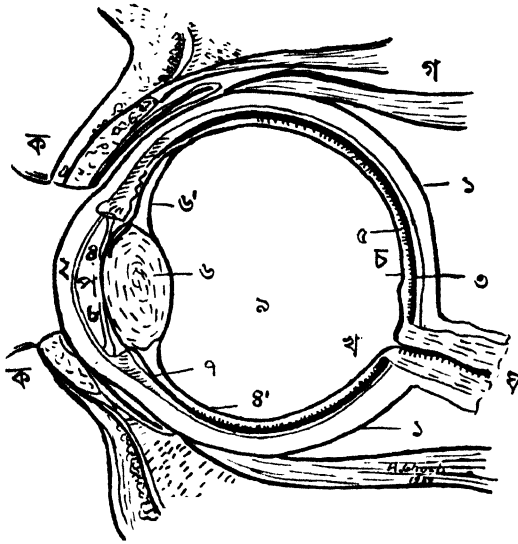
চূণের গুঁড়ো লেগে বেচারি ছেবিনার চোখের প্রথম স্বচ্ছ পর্দ্দাটাতেই ঘা হ'য়ে সেটা নষ্ট হয়ে গে'ল—তা'র ভিতর দিয়ে চোখের মধ্যে আর আলো ঢুক্‌তে পারে না—কাজেই সে চিরদিনের জন্য বাঁ চোখটার দৃষ্টিশক্তি হারাতে বস্‌ল।

ডাক্তারেরা দেখে শুনে বল্‌লেন—"চোখ্‌টাকে তুলে ফেলে দিতে হবে।"

তাঁদের মধ্যে একজন কেবল আশা দিয়ে বল্‌লেন—"যদি কোন লোক তা'র একটা ভাল চোখ তুলে ফেলে এই ছেলেটিকে দিতে রাজী হয়, তবে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি চোখটাকে সারাবার কোন উপায় হয় কি না!"

বৃথা আশা! কে দিতে যাবে তা'র ভাল চোখটাকে পরের জন্য তুলে—বাকি জীবন কানা হ'য়ে থাক্‌তে?—ক্ষণিকের জন্য আশার আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে ছেবিনার মন আবার নিরাশার আঁধারে ডুবে গেল!

কিন্তু সকলকে চমকিত ক'রে মূর্ত্তিমান ত্যাগের মত এগিয়ে এল আটষট্টি বছরের বুড়ো এক ছুতোরমিস্ত্রি—নাম তা'র জন্ এমস্ (John Amos)। সিংহের মত দৃঢ় তা'র মন—মায়ের মত কোমল তা'র হৃদয়। সে বল্‌ল—"আমি তো প্রায় সত্তরের কোঠায় পা দিয়েছি—জীবনপথের চলা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। যেটুকু বাকি আছে সেটুকু এক চোখেই চল্‌তে পার্‌ব। কিন্তু এ বেচারির যাত্রা তো সবে সুরু হ'য়েছে। ওর সাম্‌নে পড়ে রয়েছে সুদীর্ঘ অচেনা পথ—প্রাণে রয়েছে কত না রঙীন আশা আকাঙ্ক্ষা! এই অকালে, সংসার-প্রবেশ-মুখে, যাত্রাপথের সুরুতেই একটা চোখ হারালে ও যে পঙ্গু হ'য়ে পড়্‌বে—পথ চল্‌তে পায়ে পায়ে হোঁচট্ খাবে। তাই আমি, সানন্দে আর সাগ্রহে আমার একটি চোখ ওকে দিচ্ছি—বড়দিনের এবং ওর জন্মদিনের উপহার স্বরূপ।" বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো এমসের চোখমুখ তৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ডাক্তারেরা বুড়োর সাহস ও উদারতা দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে গেলেন—তাদের চোখের কোণও ভিজে এল! তা'রা বুড়োকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও বিপদের কথা বোঝাল; কিন্তু বুড়ো দম্‌ল না—তা'র সঙ্কল্পে সে অচল অটল!

তখন সুরু হ'ল ডাক্তারের কাজ। অস্ত্র ক'রে বুড়ো এমসের একটা চোখ তুলে ফেলা হ'ল। তারপর ছেবিনার চোখে অস্ত্র করে কর্ণিয়ার যে অংশটুকু নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল সেটুকু বাদ দেওয়া হ'ল—আর সেখানে বসিয়ে দেওয়া হ'ল বুড়োর চোখের সুস্থ কর্ণিয়ার অংশ!

পুড়ে গিয়ে বা আরো নানা কারণে চামড়ায় ঘা হ'লে, সে ঘা যদি ঠিকমত ভাল না

হ'তে চায়, তবে সময় সময় অন্য জায়গা থেকে তাজা চামড়ার অতি পাতলা স্তর কেটে এনে সেখানে বসিয়ে দিতে হয় ; চামড়াটা ঘায়ের উপর এঁটে বসে যায়, তা'র ফলে ভিতরে ঘা শুকিয়ে যায়, অথচ চামড়ার কোন বিকৃতি হয় না। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হ'য়েছে গ্রাফটিং (Grafting)। শুধু চামড়া নয় মাংস, হাড় প্রভৃতিও অনেক সময় গ্রাফ্‌টিং করার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় গোলাগুলির আঘাতে অনেক সৈনিকের নাকমুখের নানা অংশ উড়ে গিয়ে মুখের চেহারা বিকৃত হ'য়ে যায় ;

অস্ত্র ক'রে এমসের চোখ তুলে ফেলা হ'য়েছে

কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার অস্ত্রোপচারে তা'দের কারো কারো চেহারা বেশ চলনসই ক'রে তোলা হয়েছিল। কিন্তু চোখের মত এমন সূক্ষ্ম ও কোমল যন্ত্রের উপর এমন ধরণের গ্রাফ্‌টিং কর্‌তে আজ পর্য্যন্তও কেউ সাহস করেনি—কারুর মনে এমন দুঃসাহসিক চিন্তাও বোধ হয় জাগে নি।

যাহোক্‌ অস্ত্র করা শেষ হ'লে দু'জনের চোখেই পটি বেঁধে দেওয়া হ'ল। তারপর চল্‌ল ঘা শুকাবার জন্য অপেক্ষা। দুই রোগী আর ডাক্তারের মনে সে কি দারুণ উৎকণ্ঠা—আশানিরাশার দোলা !

এত বড় দান, এত আকুল আকাঙ্ক্ষা, এমন অধ্যবসায়ের জয় না হ'য়ে যায় না ! ছেবিনা আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল—তা'র মনে হ'ল সে যেন নূতন জন্ম পেল !

আজকালকার দিনে এমন উদার ও মহান দান, আর এমন অস্ত্রোপচারনৈপুণ্য—এক কথায় অপূর্ব্ব !—

খোদার উপর খোদকারী

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ জীবদেহের সব খবরই জান্‌তে পেরেছে বটে, ঠিক তেমনটি কিন্তু তৈরী কর্‌তে পারে নি। যেমন—লিভার বা যকৃত কি দিয়ে তৈরী, কোথায় থাকে, কি তা'র কাজ এ সব খবরই সে জানে—কিন্তু ঠিক তেমনটি আজ পর্য্যন্তও তৈরী হয় নি!—কিন্তু তাই ব'লে মানুষের বৈজ্ঞানিক শক্তি নেহাৎ তুচ্ছ কর্‌বারও নয়। ভগবানের সৃষ্টির সীমারেখা স্পর্শ কর্‌তে না পার্‌লেও—আজকাল তা'র কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা সে কর্‌ছে! তা'রই দু'টি উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল।—

(১)

মানুষ রোগে ভুগে বা কোন দারুণ আঘাতের ফলে অনেক সময় রক্তশূন্য অর্থাৎ ফ্যাকাসে হ'য়ে পড়ে। রক্তশূন্যতার নানা রকম উৎকৃষ্ট ঔষধ থাক্‌লেও এক এক সময় এমন অবস্থা এসে পড়ে যখন অবিলম্বে দেহে তাজা রক্তের প্রয়োজন হয়। তখন কোন সুস্থ লোকের দেহ থেকে তাজা রক্ত নিয়ে শিরার ভিতর দিয়ে রোগীর দেহে প্রবিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়—তা'র ফলে দেহে রক্তের পরিমাণ তখুনি তখুনি বেড়ে যায়, দেহের সকল যন্ত্রগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সতেজ হয়! এই প্রথাকে বলে 'ব্লাড্ ট্র্যান্‌স্‌ফিউসান্' (Blood Transfusion)। যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত লোকজন আহত হচ্ছে—সেখানেই এইভাবে রক্ত ইন্‌জেক্‌সনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী! সাধারণ জীবনে রক্ত দেবার লোক যথেষ্টই পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সমরপ্রাঙ্গণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রক্তের অভাব মিটাবার জন্য অত লোক পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সেখানে সৈন্যের দলই বেশী—তাদের সুস্থ দেহ থেকে রক্ত নিয়ে তাদের তো দুর্ব্বল করা চলে না! অথচ উপযুক্ত পরিমাণ রক্তের অভাবে অনেককে বাঁচানই যায় না! এতদিনে এই মহা সমস্যার সমাধান বোধ হয় হ'ল। রক্তের সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ হ'লেও, এতদিন শরীরের বাইরে কেউ রক্ত তৈরী কর্‌তে পারে নি। কিন্তু ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রেডারিক্ গোটেন্-ডেন্‌কার্ দুই বৎসর ধ'রে অনেক গবেষণার পর এমন একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার ক'রেছেন যা রক্তের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে মানুষের রক্তে যে যে গুণ আছে তা'র সবই থাক্‌বে। এই আবিষ্কার যদি সত্যসত্যই সাফল্যের

জয়মাল্য লাভ করে, তবে রক্ত জোগাড় করবার জন্যে সুস্থ মানুষের খোঁজ করতে হবে না—রাসায়নিক উপাদানে যখন তখন প্রয়োজন মত প্রচুর রক্ত তৈরী ক'রে কাজে লাগান যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে এটা একটা মহাপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হ'বে!

আমরা কিন্তু কায়মনোবাক্যে আকাঙ্ক্ষা করি যে, সেদিন ক্রমশঃ পেছিয়ে যাক্ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যসত্যই উহার প্রচলনের প্রয়োজন হ'বে। জগতে শান্তি চিরবিরাজ করুক—হিংসাদ্বেষ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে মুছে যাক্—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা! নিত্য রোগজর্জ্জরিত মানবজাতির রোগযন্ত্রণার অবসান করতে পারলেই এই আবিষ্কারের প্রকৃত সার্থকতা হ'বে।

(২)

লণ্ডনের 'স্যাভয় হোটেল', পৃথিবীর সেরা ও জাঁকজমকপূর্ণ হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম। লণ্ডনের অভিজাতসম্প্রদায় বা বড়ঘরের লোকেরাই সেখানে বেশীর ভাগ খায়-দায়, স্ফূর্ত্তি করে।

সেদিন হোটেলের সুসজ্জিত হলঘরে কতকগুলি বিশিষ্ট লোকের সমাগম হ'য়েছে। মিষ্টার রূপার্ট নামক জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে সেখানে সকলে পরিচিত হ'বেন—সেই জন্যই একটু বিশেষ ব্যবস্থা হ'য়েছে সেদিন। মিষ্টার রূপার্টের মধ্যে নাকি এমন একটা চমকপ্রদ অভিনবত্ব আছে যা'তে সবাইকে আশ্চর্য্য হ'তে হবে।

সকলেই গল্পগুজবে সময় কাটালেও কিন্তু সবারই চোখ একবার ঘড়ির দিকে আর একবার হলঘরের দরজার দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সবাই উৎগ্রীব—উৎকর্ণ!

ঘড়ির কাঁটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে শব্দ হ'ল—খট্‌মট্‌ খট্‌মট্‌। ঘরের মধ্যে সবাই রুদ্ধশ্বাসে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্ত্ত পরেই ঘরের ভিতর ঢুকলেন দুইজন ভদ্রলোক—একজন বহু আকাঙ্ক্ষিত মিষ্টার রূপার্ট, আর একজন তা'রই সঙ্গী মিষ্টার এলবার্ট্ ক্রুজিগার (Albert Creuziger)।

মিষ্টার রূপার্টের দিব্য ফিট্‌ফাট্ চেহারা আর পরিপাটি পোষাক-পরিচ্ছদ। তিনি এসেই মাথার টুপি খু'লে সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"আপনাদের সব কুশল তো (How are you)?" তবে গলার আওয়াজটা কেমন একটু যেন ক্যান্‌কেনে—চাপা!

সমবেত জনতা তখন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে আছে!

মিষ্টার ক্রুজিগার একটি সিগারেট রূপার্টের মুখে গুঁজে দিলেন ও নিজেই দিয়াশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলেন। রূপার্ট দিব্য আরামে সিগারেট টান্‌তে লাগ্‌লেন।

লোকদের বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

তারপর মিষ্টার ক্রুজিগার একে একে রূপার্টের বিচিত্র কার্য্যাবলির বর্ণনা ক'রে গেলেন!—শুন্‌তে শুন্‌তে জনতার চোখ বিস্ময়ে ফেটে পড়্‌তে লাগ্‌ল—তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

তোমরা বোধ হয় অবাক্ হ'য়ে ভাবছ—টুপি খুলে নমস্কার করা, সিগারেট খাওয়া প্রভৃতির মধ্যে এমন কি একটা অভিনবত্ব আছে?

আছে বই কি। মিষ্টার রূপার্ট ভগবানের তৈরী মানুষ নন—তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা বিংশশতাব্দীরই জনৈক শিল্পী। মিষ্টার ক্রুজিগার সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীর নাম বাইরে প্রকাশ ক'রে বলেন নি—সে বিষয়ে শিল্পীরই নিষেধ ছিল ব'লে। প্রায় দশ বছরের মত দীর্ঘ সময় অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অর্দ্ধলক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে রূপার্টের জন্ম! ভগবানের সৃষ্ট মানুষের এত কাছাকাছি রূপার্ট পৌঁচেছে যে, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যন্ত তাক্ লেগে গেছে! রূপার্ট গ্লাসে জল গড়াতে পারেন—টুপি তুলে' কায়দাদুরস্ত অভিবাদন কর্‌তে পারেন—সিগারেট টান্‌তে পারেন—ঘরকন্নার টুক-টাক কাজ কর্‌তে পারেন—এমন কি মোটরগাড়ী পর্য্যন্ত চালাতে পারেন। ভেবে দেখ কি অদ্ভুত ক্ষমতা এর সৃষ্টিকর্ত্তার!

ছবিতে দেখ, মিষ্টার ক্রুজিগার রূপার্টের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন!

—অনুসন্ধানী—

মহত্ত্ব

অসীম গগন ভরি' তারকার সারি,
জেগে রয় অন্তহীন স্বপন বিথারি।
একমাত্র চাঁদ পড়ে রাহুর কবলে,
স্পর্শে না বিপদ-ছায়া তারকার দলে।
বড়র মহত্ত্ব শুধু গৌরবে, বিক্রমে
সুচারু বিকাশ নাহি লভে কোন ক্রমে ;
পরিপূর্ণ রূপ তার বিপদ-নিকষে,
ধরা দেয় বর্ণে, রঙে, কঠোর পরশে।

দেওয়ান মোস্তাফিজর রহমান, বি. এ., বি টি.

ইংরেজি বারমাসের নামের ইতিহাস

জানুয়ারী (January)

শত শত বর্ষ পূর্ব্বে রোমানরা জেনস্ (Janus) নামে দুই মুখ-বিশিষ্ট দেবতাকে পূজা করত। সেই হ'তে প্রথম মাসের নাম হ'য়েছে জানুয়ারী।

ফেব্রুয়ারী (February)

অতি পূর্ব্বকালে রোমানদের ফেব্রুয়া (Februa) ব'লে একটা পর্ব্ব ছিল। সেই হ'তে দ্বিতীয় মাসের নাম হ'য়েছে ফেব্রুয়ারী।

মার্চ্চ (March)

রোমানদের যুদ্ধ-দেবতার নাম ছিল মার্স (Mars)। তাই তৃতীয় মাসের নাম হ'য়েছে মার্চ্চ। অতি পূর্ব্বে এই মাস ছিল রোমানদের বৎসরের প্রথম মাস।

এপ্রিল (April)

এপ্রিলের অর্থ মুক্ত (opener)। প্রকৃতপক্ষে ওদের দেশে এ সময় হ'তে বসন্তের দ্বার খুলে যায়। সেই অর্থে চতুর্থ মাসের নাম এপ্রিল।

মে (May)

গ্রীকদেবতা এটলাসের মেয়ে মেইয়া (Maia) সমস্ত পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছিল। আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে যে, এক কচ্ছপ পৃথিবীটাকে পিঠে রেখেছে। তাঁর নামে পঞ্চম মাসের নাম হ'য়েছে মে।

জুন (June)

রোমান দেবী জুনোর (Juno) নামে ষষ্ঠ মাসের নাম হ'য়েছে জুন।

(July)

পূর্ব্বে রোমানরা জুলাই মাসকে কুইনটিলিস (Quintilis) বল্‌ত। ইহার অর্থ পঞ্চম বৎসর। কিন্তু পরে জুলিয়াস্ সিজার (Julias Caesar)-এর নামানুসারে সপ্তম মাসের নাম জুলাই রাখা হয়েছে।

অগাষ্ট (August)

প্রথম রোমান সম্রাট্ অগষ্টাসের (Augustus) নামেই আগষ্ট মাসের নাম।

সেপ্টেম্বর (September)

সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম। প্রাচীন রোমে ইহা সপ্তম মাস ছিল। তখন মার্চ্চ ছিল প্রথম মাস। এখন জানুয়ারী থেকে সুরু হওয়ায় সেপ্টেম্বর নবম মাস হ'য়েছে।

অক্টোবর (October)

অক্টোবর অর্থ অষ্টম। ইহা এক সময় অষ্টম মাস ছিল, কিন্তু ইহা এখন দশম মাসে পরিণত হইয়াছে।

নভেম্বর (November)

রোমান দেবতা গীফক্‌স্ (Fawkes) এর প্রতিমূর্ত্তি ৫ই নভেম্বর পুড়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই মাসের অর্থ নবম মাস। গীফক্‌সের নাম বজায় রাখবার জন্য এই মাসের নাম নভেম্বর রাখা হ'য়েছে।

ডিসেম্বর (December)

ডিসেম্বর অর্থ রোমীয় গণনায় দশম মাস। বর্ত্তমানে ইহা বৎসরের শেষ মাস।

শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

খেলা-ধূলা

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট দল

এবার লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের চতুর্থ ও পঞ্চম টেষ্ট্ ম্যাচের বিশেষ বিবরণ তোমাদের কাছে বল্‌বার কথা ছিল। তাই এখানে বল্‌ছি ঃ—চতুর্থ টেষ্ট্ ম্যাচ্ ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদ্রাজে আরম্ভ হয়। বিখ্যাত টেষ্ট্ খেলোয়াড় মুস্তাক আলি ও নিসার এই খেলায় যোগদান কর্‌তে না পারায় ভারতবাসী মাত্রেই হতাশ হ'য়ে প'ড়েছিল, কারণ ওরকম দু'জন পাকা খেলোয়াড় না থাক্‌লে ভারতীয় পক্ষে জয়লাভ প্রায় অসম্ভব; কিন্তু ক্রিকেট খেলায় অসম্ভবও কোন কোন সময় বেশ সম্ভব হ'য়ে উঠে। মাদ্রাজের টেষ্টে ভারতীয় দল যে রকম জয়লাভ ক'রেছে এবং টেনিসনের টীমও যে নিদারুণ পরাজয় বরণ ক'রে নিয়েছে, তা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে সত্যই অভিনব।

ভারতীয় দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট্ করতে সুরু করেন; কিন্তু কেউই তেমন সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। হিন্দেলকার, অমরনাথ প্রভৃতি বাঘা বাঘা খেলোয়াড় কিছু কর্‌তে না পারায় সকলে যখন হতাশ হ'য়ে পড়্‌লেন, তখন মানকদ অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়ে একটু আশার সঞ্চার কর্‌লেন। প্রথম ইনিংসে ভারতীয়ের হ'ল মোট ২৩৬ রাণ, মানকদ ১১৩ রাণ ক'রেও নট্-আউট রইলেন। হাভেওয়ালার ৪৪ রাণও অবিশ্যি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পর টেনিসনের টীম ব্যাট্ কর্‌তে সুরু করেন। অমর সিং ও মানকদের বল এমনই খুলে গেল যে, টেনিসনের অত বড় দুর্জ্জয় টীম মাত্র ৯৪ রাণে কাত হ'য়ে পড়্‌ল। ভারতীয় দল আর দ্বিতীয় ইনিংস না খেলে টেনিসনের দলকে "ফলো" করাতে বাধ্য কর্‌লেন। এরকম শক্তিশালী টীমকে এর পূর্ব্বে এমন অপদস্থ আর হ'তে হয় নি। দ্বিতীয় ইনিংসে এঁরা অনেকটা ভাল খেল্‌লেন বটে, কিন্তু ১৩৬ রাণ ক'রে সকলে আউট হ'য়ে গেলেন। এমনি ক'রে চতুর্থ টেষ্টে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৬ রাণে জয়লাভ করেন।

প্রথম চারটি টেষ্টের দুইটিতে লর্ড টেনিসনের টীম, আর দুইটিতে ভারতীয় দল জয়লাভ করেন; এই অবস্থায় বোম্বের ব্রাবোর্ণ্ ষ্টেডিয়ামে ১২ই ফেব্রুয়ারী পঞ্চম টেষ্ট্ ম্যাচ্ সুরু হয়। লর্ড টেনিসনের টীম টসে জিতে প্রথম ব্যাট্ করা সুরু করেন; কিন্তু

অমর সিং, নিসার ও মানকদের অদ্ভুত বোলিংয়ের ফলে মাত্র ১৩০ রাণে তাঁ'দের প্রথম ইনিংস্ শেষ হ'ল। ভারতীয় দলের জেত্‌বার বেশ আশা হ'ল বটে, কিন্তু ব্যাট্ কর্‌তে গিয়ে পোপ্ আর ওয়েলার্ডের বলে কেউই দাঁড়াতে পার্‌লেন না, কেবলমাত্র আমীর এলাহি ৩৮ রাণ ক'রে নট্-আউট রইলেন। প্রথম ইনিংসে ভারতীয়দের রাণ-সংখ্যা হ'ল ১৩১। টেনিসনের দল কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বেশ ভাল খেল্‌লেন এবং ২৮৮ রাণ কর্‌লেন। ভারতীয়দলের পক্ষে ২৮৮ রাণ করা অসম্ভব ব'লে মনে হয় নি, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় দল, ভদ্রলোকের এক কথার মত, ১৩১ রাণ করেন; সুতরাং তাঁ'রা লর্ড টেনিসনের কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌লেন ১৫৬ রাণে।

রণ্‌জী ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা

রণ্‌জী ক্রিকেট-প্রতিযোগিতার কথা তোমাদের গতবারে কিছু কিছু ব'লেছি। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হ'য়ে গেছে বোম্বাইয়ে—জামনগর দলের সঙ্গে হায়দরাবাদ দলের। জামনগরে মানকদ, অমর সিং, ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি ভারতীয় দলের অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন; হায়দরাবাদ দলে তেমন নামজাদা বড় কেউ ছিলেন না। এ অবস্থায় জামনগর অনায়াসেই জয়লাভ কর্‌বে—এইটিই ছিল সকলের বিশ্বাস।

জামনগর প্রথমে ব্যাট্ ক'রে মাত্র ১৫২ রাণ করে; আর হায়দরাবাদ কর্‌লে মোটে ১১৩ রাণ। দ্বিতীয় ইনিংসে জামনগরের ওয়েন্‌স্‌লি, অমর সিং ও মুবারক আলির জোর ব্যাটিংয়ের ফলে রাণ হ'ল ২৭০, সুতরাং হায়দরাবাদ ২১২ রাণ পশ্চাতে প'ড়ে রইল, জিতবার কোন আশা রইল না। দ্বিতীয় ইনিংসে হায়দরাবাদ এমনই খেল্‌তে লাগ্‌ল যে, অমর সিং, ব্যানার্জ্জী ও মানকদের বলের সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হ'ল। অসম্ভবও সম্ভব হ'ল, হায়দরাবাদ এক উইকেটে জামনগরকে পরাজিত ক'রে এবারকার মত রণ্‌জী ট্রফী লাভ কর্‌লে। এই দলের আইবরা ১৩৭ রাণ ক'রেও নট-আউট্ রইলেন। ভারতের কোনও ব্যাটস্‌ম্যানের কাছে অমর সিং এমন অপদস্থ আর হন নি।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

চড়কমেলা

গাজন পরে সাজন ক'রে বস্‌লো চড়কমেলা,
জাঁক-জমকে চল্‌লো কত রঙ-বেরঙের খেলা।
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং বাজায় ঢাকী পালক-দোলা ঢাক,
চড়কগাছে পিঠ-ফোঁড়ানো মানুষটি খায় পাক।
দেশ-বিদেশের মেয়ে পুরুষ ভিঁড় বাধালো এসে,
হেলেদুলে ছেলের দলে দেখ্‌তে চলে হেসে।
খোকা-খুকি চল্‌ল সেজে, সঙ্গে বাড়ীর দাসী,
বেজায় আমোদ!—কিন্‌বে তারা আগেই ভ্যাঁপু-বাঁশী।
মনিহারী দোকানগুলো ঝল্‌মলিয়ে ওঠে,
তাক্‌লাগানো সখের জিনিস কিন্‌তে সবাই জোটে।
শিব দরবেশ মোল্লা গণেশ হাতী ঘোড়া কত—
থাকে থাকে কেমন থাকে পুতুল শত শত।
একটি যদি কেনে খোকা, বায়না ধরে খুকি,
কিনে দিলেই, অম্‌নি ভাঙে ঠকাস্‌ কোরে ঠুকি'।
"হায়রে মজার ঘুগ্‌নিদানা"—হাঁক্‌লো ফিরিওলা,
তর্‌ তর্‌ তর্‌ নাচ্‌লো শুনে ছেলেগুলোর নোলা।
বেগ্‌নি পাঁপর ছ্যাঁক্‌-কুল্‌কুল্‌ হচ্ছে ভাজা তেলে,
সেই দিকেতেই ঝুঁক্‌লো সবাই মণ্ডা মেঠাই ফেলে।
ধনীর ছেলে কতই জিনিস কিন্‌লো মেলায় যেয়ে,
গরীব শিশু রইল শুধু ফ্যাল্‌-ফেলিয়ে চেয়ে।
একটি পয়সা দিলেন দাতা তাহায় ভালবাসি',
চাঁদের মত উঠ্‌লো ফুটে গালভরা তার হাসি।
দু'শো রগড়! পাঁশ্‌শো মজা!! মেলার মাঠে আজ,
সুখের নিঝর অঝোর ঝরে সবার হৃদয়-মাঝ।
পুরাণ বরষ বিমল হরষ ঢাল্‌লো যাবার বেলা,—
গাজন পরে সাজন ক'রে বস্‌লে চড়কমেলা।

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ

Printed and Published by A. Dhar, at the Sri Narasimha Press;
5, College Square, Calcutta.